তৃতীয় খণ্ড

বাঙালীর লিপি ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস

অধ্যাপক ড. এস. এম. লুৎফর রহমান

বাঙালীর
লিপি-ভাষা বানান ও জাতির
ব্যতিক্রমী ইতিহাস

(৩য় খণ্ড)

ডক্টর এস .এম. লুৎফর রহ্‌মান
নজরুল-প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
বাঙালা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধারণী সাহিত্য-সংসদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশক :
এস. এম. বিপাশ আনোয়ার

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ধারণী সাহিত্য-সংসদ
২৫৪, ভেতরবাড়ী লেন, রথ খোলা, ঢাকা
মোবাইল—০১৭১-৪৫২৮৯৬, ৮৬২৮১৬০

গ্রন্থসত্ত্ব :
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল :
ফেব্রুয়ারী-২০০৬

প্রচ্ছদ :
আব্দুর রহিম বুলবুল

মূল্য : তিন শত টাকা মাত্র

মুদ্রণ : ধারণী প্রিন্টার্স এণ্ড এ্যাড.
২৫৪, ভেতরবাড়ী লেন,
রথখোলা, ঢাকা।

ISBN : 984-32-3139-2

BANGALEER LIPI, VASHA, BANAN O JATIR BYATIKRAMI ITIHASH . (The Exceptional History of The Bangalee Race and their Script, Spelling, as well as Language -Vol.III). By DR. S. M. LUTFOR RAHMAN, Nazrul-Professor and Ex.-Chairman in the Department Of Bengali, Dhaka University. Pubhished by Dharani Shahitya Samsad, Dhaka, Bangladesh. First Edition, February - 2006. Price Taka- 300-00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	তৃতীয় খণ্ডের দিবাচা	৯
২.	ইতিহাসের বে-ইনছাফী ও বক্তিয়ারের তলোয়ার/	১৫
৩.	গৌড়ে আইয়ামে জাহেলিয়াৎ ও সেন আমলের দু'শ বছর/	৪১
৪.	গৌড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিয়াহী ও ইছলামিক তজল্লী	৫৭
৫.	বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা—বৌদ্ধমন্ত্র—'কলিমা জাল্লাল'	৭৩
৬.	তুর্কী ও ছোলতানী আমলে বাঙালা দেশের ও বাঙালা ভাষার সামাজিক পরিবেশ	১১৩
৭.	উনিশ শতকের ফারছী-বাঙালায় লেখা পরিচিত পুথির অপরিচিত মূল্যায়ন	১৩৩
৮.	ফারছী-বাঙালায় লেখা বটতলার পুথি-সাহিত্যে মুছলিম অবদান	১৭৭
৯.	বাঙালীর অবিভক্ত বাঙালা ভাষার বিভাজনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূমিকা ও তার জাতীয়তাবাদী তাৎপর্য	২৬১
১০.	উনিশ শতকের হিন্দু কলমে লেখা দুই জাতির দুই বাঙালা ভাষার নমুনা	২৯৯

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

'বাঙালীর লিপি-ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস'-সম্পর্কে একটি অভিমত

www.pathagar.com

"বাংলা" বানানে আপত্তি

ক.

...."অনুস্বারের ধ্বনি বাঙ্গালা ভাষায় "ঙ"-এর উচ্চারণের সহিত অভিন্ন হইয়া দাঁড়ানোর ফলে, "বাঙ্‌লা" শব্দকে "বাংলা" রূপে লেখা হয়। কিন্তু "বাঙাল—বাঙালী" এই শব্দ-দ্বয়ে অনুস্বার লেখা অসম্ভব।..... এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃতে অনুস্বারের যে উচ্চারণ ছিল,... তাহার বিচার করিলে **অনুস্বার-যুক্ত "বাংলা" শব্দের-সংস্কৃত মতে উচ্চারণ দাঁড়ায় "বাআঁলা"; উত্তর-ভারতে এখন অনুস্বার-যুক্ত "বাংলা" উচ্চারিত হইবে "বান্‌লা" রূপে, দক্ষিণ-ভারতে "বাম্‌লা" রূপে**। এই সমস্ত কারণে, "ঙ"-দিয়া "বাঙ্‌লা" লেখাই যুক্তিযুক্ত।"

—ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যেহেতু এই শব্দের বিশুদ্ধ রূপ প্রায় সবখানেই "বাঙ্গালা" লিখেছেন, সেজন্য আমি এ-গ্রন্থের সর্বত্রই "বাংলা", "বাঙ্‌লা" "বাঙলা" বা "বাংগলা" (ঙ-এর নিচেয় হস্‌ চিহ্ন না দিলে, তার উচ্চারণ 'বাংগোলা' দাঁড়ায়; আর হস্‌-চিহ্ন দিলে ; তার উচ্চারণ দাঁড়ায় "বাংলা"-র মত) না-লিখে, আধুনিক কালের শুদ্ধ রূপ 'বাঙালা' লিখেছি। "বাঙালী"-র সাথে সংগতি রাখতে "বাঙালা" শব্দরূপ ব্যবহার ক'রেছি। বর্তমান "বাংলাদেশ" বোঝাতে লিখেছি "বাঙ্‌লাদেশ"।

—গ্রন্থকার।

www.pathagar.com

"বাংলা" বানানে বিদেশী-আপত্তি

খ.

আমেরিকান গবেষক মিসেস ম্যারি ফ্রান্সিস ডানহাম, তাঁর 'জারী-গান'-নামক গ্রন্থের ভূমিকায় "বাংলা" বানানে শব্দটি গ্রহণ না করার কারণ জানাতে লিখেছেন—

"I use the word Bengali instead of Bangla in reference to language. Although Bangla is preferred by many people today, I was unable to master its use before this book was due at the press. **I experimented with using Bangla instead of Bengali, but found trouble devising an adjective from it.** The word Bengali serves conveniently in English both as a noun and an adjective, where as Bangla is a noun, requiring special handling as an English word to use as an adjective. "

—Mary Frances Dunham.

www.pathagar.com

ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস-পাঠে
চর্বিত-চর্বণ-কান্ত
নতুনতত্ত্ব-পিয়াসী
সকল-পাঠক
প্রকৃত ইতিহাস-সন্ধানী
লেখক-গবেষক রাজনীতিক ও
আত্মসচেতন সমালোচকের
দস্তমুবারকে—

লু.র

www.pathagar.com

তৃতীয় খণ্ডের
দিবাচা

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে অবশেষে 'বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এ-বছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে এ-বইয়ের কাজ শেষ হয়। তাই এ-বইকে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারীর শ্রেষ্ঠ উপহার ব'লে গণ্য করা যায়।

বইখানির প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের মত এ-খণ্ডেও প্রচুর নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও চমকপ্রদ ব্রাহ্মণ্যবাদী, মুছলিম-বিদ্বেষী, ইতিহাস-বিরোধী—এক শ্রেণীর অমুছলমানের ভাষা-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ ও ধর্ম-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যাবে। এ-বই লিখতে লিখতে যত এগিয়েছি, ততই ঐ সব বিদ্বেষের নতুন নতুন চেহারা দেখে আবাক হ'য়েছি। আরও অবাক হ'য়েছি—এ-কারণে যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী একটি ছোট্ট গোষ্ঠী এদেশের একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল জাতি—মুছলমানদের কী অসীম ঘৃণা-বিদ্বেষের চোখে দেখেছে এবং অকল্পনীয় শত্রুতা বুকে নিয়ে তাদের দু'শ বছর মানসিক ভাবে 'সমাহিত' ক'রে রেখেছে। এভাবে তারা আরও কতদিন রাখবে, তা এখনি বলা সম্ভব নয়। কেউ কেউ মনে করেন,—'এ-দেশের এই বে আক্কেল মুছলিম জন-কওম আর কোন দিন-ই আপন ভাষা, শিক্ষা, কৃষ্টি-ঐতিহ্যের ধারে-কাছেও যেতে পারবে না। কারণ তারা এখন আত্ম-চেতনাহীন, নিষ্ঠাহীন, হিম্মৎহীন অত্যন্ত অগভীর শিক্ষায় শিক্ষিত এক জনকওমে পরিণত হ'য়েছে।' আমি অবশ্য তাঁদের সাথে একমত নই। কারণ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

ব'লেছেন—'সত্য যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন অসত্যের দৌরাত্ম্য চ'লতে থাকে। সত্য জেগে উঠলেই অসত্যের দৌরাত্ম্য দূর হয়।' 'আল্ কোরআনে'র কথায় 'হক' ও 'বাতিলে'র লড়াইয়ে বাতিলের-ই পরাজয় হয়। সে-কথায় একীন রেখে "বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস"-এর এই তৃতীয় খণ্ড আত্ম-সচেতন, দেশ-সচেতন, ভাষা-সচেতন ও জাতি-সচেতন বাঙালা ভাষাও সাহিত্যের পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। যাঁরা আমার লেখা ভালবাসেন এবং এ-বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প'ড়ে অশেষ উৎফুল্ল হ'য়ে যাঁরা আমাকে টেলিফোনে, পত্র-মাধ্যমে ও পত্র-পত্রিকায় সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে উৎসাহ দান ক'রেছেন—তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রছি।

আমাদের লিপি, ভাষা, বানান ও জাতির সত্যিকার রূপ-চেহারার পুরো ধারণা যাঁর পেতে চান, তাঁরা বাঙালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে যত বই লেখা হ'য়েছে; তা যে-যত পারেন পড়ুন; কিন্তু সেই সাথে আমার বইগুলোও পড়ুন। আর তা পড়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রথম পড়ুন—বাঙ্লা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আমার লেখা "বাঙালা বানানের উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস"। তারপর পড়ুন—আমার লেখা "বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস"-প্রথম খণ্ড, তারপর দ্বিতীয় খণ্ড, তারপর তৃতীয় খণ্ড। এই চারটি বই পড়ার পর পড়ুন—"বাঙালা ভাষা ও বানানের ঐতিহাসিক বিপর্যয়—উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন"। এরপর আপনাকে প'ড়তে হবে—শীঘ্রই বাঙ্লা একাডেমী থেকে প্রকাশিতব্য "আধুনিক জাতিতত্ত্বের নিরিখে বাঙালীর জাতি-পরিচয়"—বইখানি। এ-ক'খানি বই ধারাবাহিক ভাবে প'ড়লে, তবেই এ-দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের লিপি ভাষা-বানান ও জাতি-পরিচয় সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও পজেটিভ ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

এ-খণ্ড প্রকাশের সাথে বাঙালা ভাষার গত এক হাজার বছরের ইতিহাস সম্পর্কে আমার ব্যতিক্রমী ও সত্যনিষ্ঠ বক্তব্য মোটামুটি পূর্ণতা পেল। এ-বক্তব্য অবশ্য আরও দু'এক খণ্ডে প্রকাশের সুযোগ আছে। আল্লাহর ইচ্ছায় সময় পেলে, ভবিষ্যতে তা পাঠক-সমাজকে তোহ্ফা দেবার ইচ্ছা রইল। আপাততঃ এই তিন খণ্ডেই বাঙালা ভাষার ইতিহাসের মোটা মোটা দাগ নিয়ে আমার বিশেষ বক্তব্য হাজির করা হ'ল। মনে করিয়ে দিতে চাই যে, **এ হ'ল ভাষার ইতিহাস**—সাহিত্যের ইতিহাস নয়।

বাঙালা লিপি, বাঙালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

www.pathagar.com

এবং ইতিহাসের তরফে আমি আলোচ্য তিন খণ্ডে যে-সব কথা ব'লেছি; সে-সব বিষয়ে কোথাও কোন ভুল-গ'লতি বা ত্রুটি বিচ্যুতি কারও নজরে প'ড়লে কিবা কোন পরামর্শ থাকলে—তা আমাকে জানাবার জন্য সচেতন পাঠকের নিকট বিশেষ অনুরোধ রইল। প্রাপ্ত সাহায্য-সহযোগিতা স্বীকৃতিসহ পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশ করা হবে।

বলা দরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালা বিভাগ থেকে "বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস" লেখার জন্য বিভাগীয় প্রধান মরহুম মুহাম্মদ আবদুল হাই-এর সময়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'য়েছিল। সে-কাজে ব্যয়ের জন্য সেকালে পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে সে-ইতিকহাস লেখা সম্ভব হয়নি। এ-ক্ষেত্রে মতামতের বিভিন্নতা এবং কর্ম-সমন্বয়ের অভাব-ই ছিল প্রধান বাধা। তাই গত পঞ্চাশ বছরে যে-কাজ আর্থিক যোগান থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি; আমি বিনা অর্থে সে-কাজের এক বড় অংশ, বিশেষ ক'রে 'ভাষার ইতিহাস' অংশ—লিখে 'শেষ' ক'রতে পেরেছি। এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে শোকর গুজার ক'রছি। যদিও আমার এ-বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা-সংস্থা বা বাঙালা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হ'তে পারেনি; তথাপি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালা বিভাগে কর্মরত অবস্থায় বাঙালা ভাষার তিন খণ্ড ইতিহাস আজ আমি বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জাতির হাতে তুলে দিতে পারায় আনন্দিত।

বাঙালা ভাষার এই বিশ্বায়নকালে একথা গর্ব ও গৌরবের সাথে ইয়াদ ক'রতে হয় যে, বাঙালা ভাষা এ-দেশে মুছলমানরা পয়দা ক'রেছিল, সে-ভাষার ইজ্জৎকে হেফাজৎ করার জন্যও মুছলমানরাই জীবন দিয়েছিল। আর সে বাঙালা-ভাষা এ-কালেও (১৯৯৯এ) মুছলমানদের উদ্যোগেই "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা"র শাহী মুকুট মাথায় নিয়ে; মুছলমানদের-ই উদ্যোগে—ভিন্ দেশের (সিয়েরাঁ লিয়ন) অন্যতম 'রাষ্ট্র ভাষা'র ইজ্জৎ লাভ ক'রেছে। আর এ-বছর (২০০৬ খৃ. অ.), সেই বাঙালা ভাষাই জাতিসংঘেরও অন্যতম ব্যবহারিক ভাষা হবার দাবীদার।

আজকের দিনে বাঙালা ভাষার এই গৌরবময় আমলে, তার মুল ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কতখানি জরুরী—তা সহজেই বোঝা যায়। আমি সেই প্রয়োজন সাধ্যমত আনজাম দেবার কোশেশ ক'রেছি। কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে, কোন লাভালাভের বা দোস্তী-দুশ্‌মনীর কথা না ভেবে—যে-সত্য নানা ভাবে আমার সামনে হাজির হ'য়েছে—তা-ই অকপটে তুলে ধ'রেছি। হয়তো সব কথা ব'লতে পারিনি। যেটুকু ব'লেছি—তাছাড়া আরও অনেক কথা বলা যেত। আরও অনেক

www.pathagar.com

কথা বাকি র'য়ে গেছে। তথাপি আল্লাহ্ যেটুকু বলার তৌফিক দিয়েছেন—সেটুকু ব'লেছি। তার মধ্যে সত্য-প্রীতি ও আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। নতুন কালের পাঠকান—এই দুটো বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'লে শ্রম সার্থক হবে।

পরিশেষে বলা জরুরী যে, আমার এ-গ্রন্থ—একান্তভাবেই চর্বিত-চর্বণ-ক্লান্ত, সত্য নিষ্ঠ—সাধারণ পাঠকের জানার এবং নতুন শতকের আত্ম-আবিষ্কারে অনলস গবেষণায় আগ্রহী তরুণ গবেষকগণের গবেষণা-কর্মে দিশা দানের জন্য লেখা। বাঙ্‌লাদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার লিপি-ভাষা-বানান ও জাতি-কেন্দ্রিক রচনাগুলোর ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালিত হ'লে, বিবৃত বক্তব্যের সমর্থনে আরও বহু তথ্য পাওয়া যাবে। তার নজীর দিতে এ-বইয়ের 'পরিশিষ্ট' রূপে যোজিত একটি অভিমতের প্রতি সকলের নজর আকর্ষণ ক'রছি। এভাবে বাঙলাদেশ ও ভারতীয় বাঙালার লিপি-ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস-রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞান-নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-গবেষণায় প্রকৃত রেনেসাঁর সূচনা ক'রতে হ'লে এরকম অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই ক'রতে হবে। আমি সেদিকে সকলের নজর আকর্ষণ ক'রে, বাঙ্‌লাদেশ, বাঙালা ভাষা ও বাঙ্‌লাদেশী জাতির সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

লু.র

বাঙালা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন—৮৬২৮১৬০ (বাসা)
E-mail-drlrahman @yahoo. com
২১ শে ফেব্রুয়ারী-২০০৬ ।

www.pathagar.com

ভাষা-বদলের দু'টি কারণ

মুছলমানদের ফারছী-বাঙালার পরিবর্তে হিন্দুদের সংস্কৃত-বাঙালার প্রবর্তন কেন প্রয়োজন হ'য়েছিল, সে-বিষয়ে 'সমাচার দর্পণে'র নিম্নোক্ত দু'টি কোটেশনের প্রতি বর্তমান কালের পাঠকদের নজর আকর্ষণ ক'রছি।

ক.

"First and foremost the haughtiness of the Javans—will be brought low, which will be Much service to us. When the Bengali language is brought to use the Mussalmans will be driven out, for they are not and never will be able to read and write Bengali."

অর্থ—(ফারছী-বাঙালার বদলে সংস্কৃত-বাঙালা এবং সরকারী ভাষা ফারছীর বদলে ইংরেজী চালু হ'লে—) 'প্রথম এবং প্রধানতম (উপকার এই হবে) যে, যবনদের হামবড়াভাব ক'মে যাবে; যা আমাদের মহা উপকারে আসবে। তখন (এই সংস্কৃত-) বাঙালা ভাষার ব্যবহার থেকে মুছলমানরা বিতাড়িত হবে। কারণ (তারা এই বাঙালা ভাষা) কখনও লিখতে এবং প'ড়তে পারবে না।'

খ.

"With Sanskrit are associated the days of India's greatest glory, with Persian and Arabic the days of her defeat, humiliation and bondage. The budding patriotism of Hindu everywhere is therefore naturally eschew Persian and Arabic words as badges of slavery in the long run, however considerations of utility are sure to override more sentimental predilections."

অর্থ—(সংস্কৃতের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে, এ-কারণে যে),—'সংস্কৃতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতের মহোত্তম গৌরবময় দিনগুলোর (কথা; পক্ষান্তরে) আরবী-ফারছীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে—ভারতের পরাজয়, অবমাননা এবং দাসত্বের (স্মৃতি)। সুতরাং সর্বত্র অঙ্কুরিত হিন্দু-দেশাত্মবোধের (এই সময়ে) স্বাভাবিকভাবেই আরবী-ফারছী শব্দ দাসত্বের বন্ধন ব'লে বিবেচিত। অতএব প্রায়োগিক বিবেচনায় ভবিষ্যতে অবশ্যই আমাদের বিশেষ ভাবালুতা বর্জন ক'রতে হবে।" (ব্যবহার ক'রতে হবে—নতুন ভাষা, নতুন বাঙালা তথা সংস্কৃত-বাঙালা)।

*কোটেশন-দু'টো সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত জনাব মনসুর আহমদ-এর প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

www.pathagar.com

ইতিহাসের বে-ইনছাফী ও
বখ্‌তিয়ারের তলোয়ার

১.

অতীতের 'সত্য বিবরণ'কেই 'ইতিহাস' বলে। কিন্তু মুছলমানদের, ইংরেজদের ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের লেখা 'ইতিহাস' এক নয়। এই তিনটি ধর্মীয় জন-কওমের মধ্যে মুছলমান ঐতিহাসিকরা যতটা নিরপেক্ষভাবে অন্য ধর্মের লোকের ইতিহাস রচনা ক'রেছেন, ইংরেজ ও ব্রাহ্মণরা তা করেননি। ব্রাহ্মণদের ইতিহাস-চেতনার ওপর কটাক্ষ ক'রে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"হিন্দুদের ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা নাই, যাঁহারা..... ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আমি তাহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণেরা এতই বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই সকল পাপ-কথা যেন কেহ না শোনে, এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের কীর্তি লোপ করিয়া দিয়াছিলেন।" অন্য ধর্মের লোকের ভাষা-পরিভাষায় কথা বলা, অন্যদের কথা বলা, গল্প লেখা, ইতিহাস রচনা করা কিংবা অন্য কোন জাতির স্মৃতি, ইত্যাদি অবিকৃত রাখা যে 'ঘোর অধর্ম' এবং সে-সব বিষয় 'আলোচনা করাও পাপ'—এই ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাবের কথা স্পষ্ট ভাষায় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ঐ 'বৃহৎ-বঙ্গে'র আরও অনেক স্থানে উল্লেখ ক'রেছেন। তাঁর ঐ উল্লেখ থেকে মনে হ'তে পারে, কেবল সেন-আমলেই ব্রাহ্মণরা জৈন-বৌদ্ধদের ইতিহাসকে পাপ-কথা মনে ক'রে দ্রুততার সাথে স্বেচ্ছায় ধ্বংস ক'রেছেন। প্রকৃত পক্ষে তা নয়। তাঁরা প্রাচীনকালে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক, নির্গ্রন্থদের আর পরবর্তীকালে 'মুছলিম ও বৃটিশ আমলে'ও মুছলমানসহ অপরাপর অব্রাহ্মণ জনকওমেরও ইতিহাস লেখেননি; রাখেননি। "পাপ-কথা" গণ্য ক'রে সে-সবও তাঁরা "ঘোর শত্রুতা"বশতঃ লুপ্ত ক'রেছেন অথবা বিকৃত রূপ দিয়েছেন।

অনেকেই মনে ক'রতে পারেন; ইতিহাসের এই বে-ইনছাফীর আমল অনেক আগেই শেষ হ'য়ে গিয়েছে। এখন ওঁরা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে, উদার ও আধুনিকমনা হ'য়ে উঠেছেন। তাঁরা এখন আর সেন-বর্মন আমলের জাতি-বিরোধী-মানসিকতায় আবদ্ধ নন। এ-কথা যে, কতটা ভুল, মিথ্যা, 'মুছলমানদের আত্ম-প্রতিফলনমূলক চিন্তা, তা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি

www.pathagar.com

বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়েও বঙ্কিমচন্দ্র অন্য ধর্মের লোকদের সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু মানসিকতার আসল রূপ ব্যাখ্যা ক'রে লিখেছেন—"কিন্তু এ-সকলে (ইতিহাসে) বাঙালার কোন ঐতিহাসিক ঘটনা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরাজী গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই।...যে-বাঙ্গালী এ-সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ ক'রে, সে বাঙ্গালী নয়।" বঙ্কিম চন্দ্রের এ-লেখা পড়ার সময় হুঁশিয়ার থাকা দরকার যে, মুছলমানদের তিনি বাঙালী ব'লে স্বীকার করেননি। তাই মুছলিম ঐতিহাসিকদের প্রতি বাক্যবমি ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"আত্মজাতি গৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুছলমানের কথা, যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়।... বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব। সকলেই লিখিবে। (মুছলমান বাদে)। যে-বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।" বঙ্কিমের মতে "গোহত্যাকারী ক্ষৌরিত-চিকুর মুছলমানরা" যেহেতু "বাঙ্গালী" নয়; সেই হেতু তাদের লেখা ইতিহাসও তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তিনি হিন্দু লেখকদের বাঙ্গালার ইতিহাস লেখার জন্য ডাক দিয়েছেন। তাঁর ডাক বিফল হয়নি।

তবে, হিন্দুর চোখ দিয়ে, হিন্দু কলমে লেখা, মুছলিম-বিদ্বেষী ইতিহাসের সূচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের পরে নয়; তাঁর আগেই। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দু পণ্ডিতরাই এর পহেলা আনজাম দাতা। ঐ কলেজের যে-সব পণ্ডিত এ-বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন ও তাঁদের যে-সব রচনা আধুনিক ইতিহাসের বাচ্চা পয়দা করে; সেগুলো হ'ল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "বত্রিশ সিংহাসন", "রাজাবলী", রাজীব লোচনের "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-রায়স্য চরিত্রং;" রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" (১৮০১খৃ.) প্রভৃতি। এর পরেই রচিত হয়—রমেশচন্দ্র দত্তের "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস", বঙ্কিমচন্দ্রের "বাঙ্গালার ইতিহাস" এবং রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।" (১৮৭২খৃ.)। ঐ সব বইয়ের মধ্যে অতি কুখ্যাত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং"-এর পথ ধ'রেই বঙ্কিমচন্দ্রের মুছলিম-বিদ্বেষী ইতিহাস-চেতনা অগ্রসর হয়। ফলে, যে গাল-গল্প, মুছলিম-বিদ্বেষ ও উপকথাদি অবলম্বন ক'রে,—১৮০১ সাল থেকে **হিন্দু-ইতিহাস** লেখা শুরু হয়, সে-ধারা আজও অব্যাহত আছে। ইতিহাসের ঐ বে-ইনছাফীর নতুনতর বিকাশ পূর্বোক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গলা

www.pathagar.com

ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" দেখা যায়। ন্যায়রত্ন এ-বইয়ে অতি অন্যায়ভাবে, বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যে মুছলিম অবদান একেবারে মুছে দিয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে বে-ইনছাফীর সূচনা এভাবেই। রামগতির পুস্তক-ই বাঙালা ভাষা ও বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাসে, বে-ইনছাফীর পহেলা দলিল।

২.

সবাই জানেন, মুছলিম আমল শেষ হবার পর, আঠারো শতকের শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তো বটেই, এমনকি, বিশ শতকের পহেলা দশক তক, বাঙালার মুছলমানরা রাজ্যহারা, ক্ষমতাহারা, চাকুরী হারা; শিক্ষাহীন, অর্থহীন এবং প্রায় অস্তিত্বহীন একটি জনকওমে পরিণত হয়। অপরদিকে, এক-ই সময়ে বিপরীত ধারায় বাঙালার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও তাঁদের অনুচর—বিদেশী-বিধর্মী, বিভাষী ইংরেজদের সহযোগিতায় নিজেদের মুছলিম আমলের তুলনায় আরও বেশী প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী, অর্থবান ক'রে গ'ড়ে তোলে। **সেই সাথে তারা ১৮০১ সাল থেকে বাঙালা ভাষা এবং বাঙালীর শিক্ষা-সাহিত্য ও ইতিহাস-ঐতিহ্যেরও মোড় ঘুরিয়ে দিতে থাকে।** এদেশের ভাষা-ব্যাকরণ ও সাহিত্যে; বিপরীত স্রোত সৃষ্টিতে—**মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল যা শুরু করেন; তা ছিল ভাষা ও সাহিত্যকে ব'দলে দেয়া। মুছলিম-ভাষা ও মুছলমানী সাহিত্য কবর দিয়ে, হিন্দু-ভাষা ও হিন্দু সাহিত্য গ'ড়ে তোলা।** 'বাঙালা ভাষা ও বাঙালা সাহিত্যে'র বদলে, 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য' গ'ড়ে তোলার এই মুছলিম-বিদ্বেষী চেতনা, বঙ্কিমচন্দ্রই ছড়িয়ে দেন ইতিহাস-নৃতত্ত্ব-জাতিতত্ত্বের মত বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও। এর ফলে, বৃটিশ আমলে; যে-অকল্পনীয় বে-ইনছাফী সম্বল ক'রে, আধুনিক ব্রাহ্মণ্যবাদী 'দেশের ইতিহাস', 'ভাষার ইতিহাস', 'জাতির ইতিহাস' ও 'সাহিত্য-কালচারের ইতিহাস' হিন্দু কলমে লেখা হ'য়েছে,—তার **একটি অবধারিত আখলাক হ'ল, 'মুছলিম বর্জন'। মুছলমানের ধর্ম, মুছলমানের ভাষা, মুছলমানের নাম, ভাষা-পরিভাষা, মুছলিম সাহিত্য ইত্যাদি বাদ দিয়ে, বিকৃত ক'রে কিংবা কালিমা-লেপন ক'রে লেখা। আর তাকেই "সত্য" ব'লে প্রচার করা। একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় ব'লে হাজির করা।** এভাবে, ইংরেজ-আমলে নবোত্থিত হিন্দু জাতীয়তাবাদী লেখকগণ, বৃটিশদের বদলে মুছলমানদের শত্রু বানিয়ে, যে-ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (Indian Nationalism) গ'ড়ে তোলেন; তা' হয়তো সম্ভব হ'ত না, যদি সে-সময় সারা বাঙালার মুছলমানগণ তাদের শত শত বছরের প্রবহমান জীবনধারা, ভাষা-চর্চা, সাহিত্য-চর্চা এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়তে আর নতুন ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষা, ভাষা

www.pathagar.com

ও সাহিত্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে বাধ্য না হ'ত। প্রায় এক থেকে দেড় শ' বছর পর; তারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার, মূল—বাঙালা ভাষার অধিকার, বাঙালী জাতি-পরিচয়ের অধিকার, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অধিকার ছেড়ে দিয়ে, তারা; আধুনিক শিক্ষার জন্য ঢুকতে পারে—হিন্দু স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর **তখন তাদের না-আছে ইতিহাস-জ্ঞান, না-আছে আত্মজ্ঞান। তখন কোন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের তো প্রশ্নই ওঠে না।** তখন তাদের স্কুল-কলেজে ব'সে, ছাপা বই প'ড়ে, যা শিখতে ও মানতে বাধ্য হ'তে হ'য়েছে—**তা হ'ল—'মুছলমান** মিথ্যাবাদী', 'পরস্বাপহারক', 'ক্ষৌরিতচিকুর', 'মদ্যপ', 'নারী-লোভী' এবং 'হিন্দু বিদ্বেষী'। ইঙ্গ-হিন্দু শিক্ষকরা শিখিয়েছেন—'মুছলমানরা খুনী, লুণ্ঠনকারী, বিদেশী। মন্দির ভাঙা, মূর্তি ভাঙা, আর তলোয়ার চালিয়ে হিন্দু-বৌদ্ধদের মুছলমান বানানোই ছিল তাদের কাজ। তারা এত অত্যাচারী ছিল যে; নবাব সিরাজ, গর্ভবতী হিন্দু মহিলাদের ধ'রে এনে পেট চিরে দেখতো, পেটের মধ্যে বাচ্চা কেমন ভাবে থাকে। তার জন্য নদী দিয়ে নৌকোয় যুবতীরা যেতে পারত না। রানী ভবানীর বিধবা মেয়েটি পর্যন্ত নবাব সিরাজের লালসার শিকার হ'য়েছে। কাজেই ইছলামের মত খারাপ ধর্ম আর মোছলমানের মত বেহদ্দ বদ-বজ্জাত দুনিয়ার কোথাও নেই।' এ-ইতিহাস ইঙ্গ-হিন্দুরা লিখেছে, মুছলমান ছাত্ররা প'ড়েছে। সাধারণ পাঠকরা তা জেনেছে ও মেনেছে। আর এ-ভাবেই বঙ্কিমের দেখানো পথে 'বাঙালা' ও 'বাঙালী'র ইতিহাস গ'ড়ে তোলা হ'য়েছে বৃটিশ আমলে।

তারপর, পাকিস্তান সৃষ্টির কিছু আগে-পরে, যখন মুছলমানরা ইতিহাস লেখার জন্য কলম ধ'রেছেন, তখন ঐ সব শেখা ও শেখানো কথাই তাদের 'ইকো' (প্রতিধ্বনি) ক'রতে হ'য়েছে। নইলে পাশ করা যায়নি। চাকুরী পাওয়া যায়নি। **ফলে, বিকৃত, মিথ্যা, অপূর্ণ, বিপরীত, এক পক্ষীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু-ইতিহাস-ই হ'য়ে উঠেছে—মুছলমানের ইতিহাস। বাঙালা ও বাঙালীর ইতিহাস।** আধুনিক মুছলিম ইতিহাস লেখকগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ-ইতিহাসের-ই অচেতন অনুলেখক মাত্র। খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁরা কেউ কেউ হ'তে পেরেছেন—'প্রতিবাদী' এবং 'আবিষ্কারক'। ইতিহাসে বে-ইনছাফীর প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার স্রোত চ'লে আসছে এভাবেই।

এদেশী মুছলমানদের আত্মভোলা আখলাক-খাছিয়তের কারণেই তারা সহজেই হ'য়ে প'ড়েছে—**সময়ের শিকার, ষড়যন্ত্রের শিকার ও পরিস্থিতির শিকার। ঘৃণা-বিদ্বেষের শিকার।** এসব তারা বুঝেও বোঝেনি। গায়ে মেখেও মাখেনি। তারা 'উদারতা' দেখিয়েছে। কিন্তু 'বাস্তবতা' বোধের প্রমাণ দেয়নি। তাঁরা শত শত বছর

www.pathagar.com

এক দেশে, এক মাটিতে বাস ক'রেও তথাকথিত 'আর্য্য-মানসিকতা'র খোঁজ পায়নি। খোঁজ করেওনি। তাই তারা ঐতিহাসিক ভাবে বে-ইনছাফীর শিকার হ'য়েছে ও হ'চ্ছে সহজেই।

রাজ্যহারা, ভাষা-হারা, সাহিত্যহারা, অর্থহীন, আত্ম-পরিচয়হীন শুধু ধর্মীয় নামে **নামঙ্কিত মুছলমানরা তাই রাষ্ট্র-ক্ষমতা হারাবার দীর্ঘ এক শ' তিপ্পান্ন বছর (১৭৬৫-১৯৪৭খৃ.) পর, যখন রাজ্য পেল, অর্থ পেল, পদ-পদবী পেল; তখন দেখা গেল; সেই প্রাপ্তিকে পূর্ণতা দেবার মত কোন উপকরণ-ই তাদের হাতে নেই। কোন উপলব্ধিও** নেই। তাদের রাজ্য আর রাজধানী যাওয়ার সাথে সাথে গেছে; কিতাবখানা (গ্রন্থাগার), মোহাফেজখানা; জায়গীরদারী, মনসবদারী, জমিদারী, ওয়াক্ফ এস্টেট ইত্যাদি।

এসব বিলোপের সাথে সাথে হারিয়ে গেছে—তৎসংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ—যা ইতিহাসের উপাদান হ'তে পারত। এমনকি, বৃটিশ আমলে যে-সব নতুন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক লাইব্রেরী গ'ড়ে তোলা হয়—তাতে মুছলমানদের বই, পুথি-কিতাব, দলিল-দস্তাবেজের কিছু মাত্র স্থান দেয়া হয়নি। সেগুলো রাখা হয়নি কোথাও। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ"-এর মত প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গীয় হিন্দু সাহিত্য পরিষৎ' হ'য়েই আছে। এ-প্রতিষ্ঠানে ক'খানা মুছলমানের লেখা বই-কিতাব, পত্র-পত্রিকা আছে, তা একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে। তাঁরা হিন্দুর লেখা পুরানো বই, পুস্তক, পুস্তিকা, পাণ্ডুলিপি সব-ই রেখেছেন; কেবল রাখেননি কোন মুছলমানের লেখা পুরানো বা নতুন বই-কিতাব। বাউলদের সম্পর্কে গবেষণা ক'রতে গিয়ে এদেশের অনেক স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক লাইব্রেরী ঘুরে আমার এই অভিজ্ঞতা হ'য়েছে যে, কী দারুণ ঘৃণা-বিদ্বেষে ভরপুর হ'য়েই না হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা; তাঁদের মাতা সরস্বতীকে "যবন-স্পর্শদোষ" থেকে বাঁচাতে মুছলিম-সৃজনশীলতার নজীর 'কাট-টু সাইজ' ক'রে রেখেছেন।

তার ফলে, তথ্য-জগতে যে একদেশদর্শিতা ও শূন্যতার সৃষ্টি হ'য়েছে, তার পুরো সুযোগ নিয়েছে ও নিচ্ছে মুছলিম-বিদ্বেষীরা। তারা এক দিকে মুছলিম ঐতিহাসিকদের—ঐতিহাসিক ব'লেই স্বীকার করেননি; অন্য দিকে, তাদের বই-কিতাব হেফাজৎ (Preserve) করেননি। **সে জন্য নতুন রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' পেয়েও আমরা যেমন কিছু ক'রে উঠতে পারিনি; 'বাঙ্‌লাদেশ' কায়েম ক'রেও তেমনি কোন কিছু ক'রে উঠতে পারছিনে। আমাদের নতুন কিছু করার মত না-আছে উপকরণ, না-আছে উপলব্ধি। একারণেই ইতিহাসের সর্ব ক্ষেত্রেই**

সঞ্চরমান বে-ইন্‌ছাফীর নিচেয়-ই আমাদের দস্তখৎ ক'রে চ'লতে হ'চ্ছে। বে-ইনছাফীকেই ইনছাফ ব'লে মেনে নিতে হ'চ্ছে।

বস্তুতঃ দেশ ও জাতির ইতিহাসের সাথে ভাষা, সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস, গবেষণা, মূল্যায়ন ও প্রকাশনা-ক্ষেত্রে মুছলমানদের তরফে যে-সব বে-ইন্‌ছাফী করা হ'য়েছে—তার মধ্যে নিচের বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখ্য ।

১. **বাঙালা ভাষার উৎপত্তি-নির্ণয় ও যুগ-বিভাগে বে-ইন্‌ছাফী**। এ-তরফে, 'ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য্য জনগোষ্ঠী' ও তাদের 'ভাষার বিবর্তন-প্রকল্পে'র কাল্পনিক কাহিনী—ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও বর্ণবাদী স্বার্থে চিরস্থায়ী রূপ দেবার জন্য গ'ড়ে তোলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সেমিটিক জাতি ও আরবী ভাষার ভূমিকা কবরস্থ করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ-বিষয়ে পূর্বেই সম্যক আলোচনা করা হ'য়েছে* ।

২. **ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসে গৌড়ে "অন্ধকার যুগ" ব'লে কোন যুগের কথা নেই**। ইতিহাসে আছে পাল আমলের পর সেন-আমল এবং তারপর মুছলিম-আমল বা ছোলতানী আমল। অথচ বাঙালা সাহিত্যের হিন্দু ঐতিহাসিকগণ এবং তাঁদের অনুসারী মুছলিম ঐতিহাসিকরাও; সেন আমলের পর মুছলিম আমলের গোড়ার দিককে "অন্ধকার যুগ" ব'লে একটা "যুগ" চাপিয়ে দিয়েছেন। এ-বিষয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী, এমনকি হিন্দু 'মার্কসাবাদী'রাও এক মত হ'য়ে লিখেছেন যে,—"বখতিয়ার-এর "বঙ্গ বিজয়"-(আসলে "গৌড় বিজয়")এর পর, প্রায় আড়াই শ' বছর যাবৎ 'বাঙালা' দেশ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন।" হাল আমলে এদেশের দু'একজন, 'সাহিত্যের মুছলিম ঐতিহাসিক,' এর বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিবাদী হ'লেও; তাঁরা একথা জোর দিয়ে ব'লতে পারেননি যে, ঐ "অন্ধকার যুগ"টি আসলে ছিল—'সেন যুগ'। সেন যুগের 'অন্ধকার'কেই চাপিয়ে দেয়া হ'য়েছে—মুছলিম আমলের 'আলোকিত যুগে'র ওপর। আর তা করা হ'য়েছে বিশ শতকে লেখা, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাসে। ইতিহাসের এই বে-ইন্‌ছাফী নব ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান কালের এক বিশেষ 'অবদান'—তা মানতেই হবে। যথাস্থানে, এ-বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

৩. বাঙালা সাহিত্যের মুছলিম-বিদ্বেষী ইতিহাস লেখক ও ভাষা বিশারদগণ আরও যে-একটি হিমালয় সদৃশ বে-ইন্‌ছাফী কাজ ক'রেছেন—তা হ'ল বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-এর পদাবলী "ব্রজ ভাষায়" রচিত ব'লে ছাপ্পা

* দেখুন–এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড।

www.pathagar.com

(Seal) মারা। আসলে, এ-বুলি যে, তখনকার বাঙালার ও বাঙালীর-ই বুলি ছিল, "ব্রজের বুলি" নয়; তা তাঁরা বেমালুম চেপে গিয়েছেন। বিদ্যাপতির সময় মিথিলা বাঙালার-ই শাসনাধীনে আসে। আর সেই সময় থেকে সতের শতক পর্যন্ত পদাবলীর সমগ্র যুগের সংগীত রচনা করা হয়, বাঙালার-ই গণমুখী ভাষায়। বাঙালার বৈষ্ণব কবিদের পরে—সে-ভাষা ও গানে মুছলমান ছূফী কবিরাও সুর মেলান। অথচ সেকাল ও একালের মুছলিম-বিদ্বেষী ও বাঙালা ভাষা-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ কখনও উল্লেখ করেননি যে, ঐ ভাষাটি আসলে 'বাঙালা' ভাষাই। ইতিহাসে বে-ইনছাফীর এই দিকটির কথাও পূর্বে আলোচনা করা হ'য়েছে।*

৪. বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের বিশ শতকের ইতিহাস লেখকগণ এক-ই ধারায় একথা বলেননি যে, **বাঙালা ভাষা মুছলিম আমলে পয়দা হয় এবং ঐ ভাষা মুছলিম কুলজাত, আরবী-ফারছীর "সন্তান"**। আর সেই কারণে **বৃটিশ-পূর্ব ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণ, ধর্ম-বিদ্বেষ, ভাষা-বিদ্বেষ ও জন-বিদ্বেষের বশে, ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বাঙালা ভাষা', 'বাঙালা দেশ' ও 'বাঙালী জাতি'—এই তিন জোড়া শব্দ সদর্থে কোথাও লেখেননি। "বাঙালা" ভাষা এই নামটিও তাঁরা অস্বীকার ক'রে, লিখেছেন—"ভাষা" মাত্র**। একারণেই মুছলিম আমলের ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবরা বাঙালা ভাষাকে যেমন "ব্রজবুলি" নাম দিয়েছেন; তেমনি বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার, পরবর্তী "ফারছী বাঙালা"–নামটিও উল্লেখ করেননি। তাঁরা বাঙালা ভাষার মূল ধারাটি নষ্ট ক'রে "সংস্কৃত-বাঙালা" চালু করার পর-ই মাত্র আঠারো শতকে ঐ "ভাষা"কে "বাঙালা ভাষা" ব'লে কবুল ক'রেছেন। সেজন্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"বাঙ্গলা ভাষা নামটি খুব-ই আধুনিক।" (বৃ. ব., ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৯)। দীনেশচন্দ্র সেন মুছলমানদের লেখা বই-কেতাবগুলো প'ড়লে জানতে পারতেন—**"বাঙ্গলা ভাষা" নামটি বহু প্রাচীন; আর তা মুছলমানদের-ই দেয়া। এ-নাম হিন্দুরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মাধ্যমে "বঙ্গভাষা" (সংস্কৃত-বাঙালা) সৃষ্টি করার পর-ই মাত্র গ্রহণ করে। তাও 'বঙ্গভাষা' অর্থে**। অতএব, মুছলমানদের কাছে যে-নাম খুব-ই প্রাচীন, হিন্দুদের নিকট সে-নাম খুব-ই আধুনিক হবার কারণ এই যে, তাঁরা সাহিত্যের ইতিহাসকে, ভাষা-নামকে —নিরপেক্ষভাবে বিচার করেননি। তাই মুছলিম আমলে যে-'বাঙালা ভাষা'কে কেবল "ভাষা" ব'লে ঘেন্না ক'রেছেন; বৃটিশ আমলে সে-ভাষাকে তাঁরা 'মুছলমানী বাঙালা', 'ইছলামী বাঙালা' ইত্যাদি ব'লে ছাপ্পা মেরে সরিয়ে দিয়ে "বঙ্গভাষা" নামে 'সংস্কৃত-বাঙালা' তৈরী ক'রে, তবেই তা কবুল ক'রেছেন। এ-ভাবে মুছলিম-

*দেখুন–এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড।

www.pathagar.com

বিদ্বেষের যে-পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন; তা, বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের গোটা ইতিহাসে, বে-ইনছাফীর এক অতুলনীয় দলিলে পরিণত হ'য়েছে। তার কিছু স্বরূপ ইতঃপূর্বে উন্মোচন করা হ'য়েছে।

৫. বাঙালা ভাষার মতই বাঙালা গদ্য রচনারও আদি অবদান মুছলমানদের-ই। এ-কথাও ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্য-ইতিহাস-লেখকান চেপে না গিয়ে পারেননি। তারা এক্ষেত্রে মুছলমানদের কোন লিখিত-উপকরণ তো খুঁজেই দেখেননি; এমনকি, অমুছলিম লেখকদের প্রাচীন চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে, কাব্য-কবিতায় যে-সব নজীর র'য়েছে—সেগুলোরও কোন নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। তাই কিছু কিছু নজীর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়; সচেতনভাবেই বৃটিশ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এক্ষেত্রে মুছলিম-অবদানের কথাটা সযত্নে চেপে গিয়েছেন। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে এরকম বে-ইনছাফী অন্য কোন দেশের কোন জনকওম ক'রেছে কিনা, তা জানা নেই। যথাস্থানে এবিষয়ে সম্যক আলোকপাত করা হ'বে।

৬. অবিভক্ত বাঙালীর শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যের মূল গণমুখী ধারাটি অস্বীকার করার আর একটি 'গণেশী কর্ম' মুছলিম পুথি-সাহিত্যের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দা প্রচার। ১৮০০ খৃ. তক, সমস্ত হাতে লেখা বই-কেতাব "পুথি" ব'লে পরিচিত হ'লেও, পরবর্তী কালের মুছলিম-বিদ্বেষী পণ্ডিতরা হিন্দুদের লেখা পুথিগুলোর নাম দেন—"গ্রন্থ" বা "পুস্তক"; আর মুছলমানদের লেখা বিরাট বিরাট গ্রন্থগুলোর নাম দেন কেবল "পুথি"-ই। জাতীয় দায়িত্ব পালন ও সাহিত্যের মূল স্রোত অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এই সব পুথির মুছলমান লেখক-প্রকাশকরা কী ভূমিকা রাখেন; সে-বিষয়ে বাঙালা সাহিত্যের কোন অমুছলিম 'ঐতিহাসিক' আদৌ কোন আলোচনা করেনি। দীনেশচন্দ্র সেন বাঙালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মুছলিম নবাব-বাদশা-ছিপাহছালারদের কিছু তারিফ এবং ব্রাহ্মণদের কিছু নিন্দা ক'রলেও, তিনি তাঁর আমলেই ছাপা অসংখ্য মুছলমানী পুথির একখানাও উল্টে-পাল্টে দেখেছেন ব'লে মনে হয় না। ড. সুকুমার সেন তাঁর বিরাট "বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস"-গ্রন্থের চার খণ্ডের কোন খণ্ডেই মুছলিম কাব্য-ধারার কনক চাঁপা, গোলাপ ফুলের আদৌ উল্লেখ করেননি। তবে "ইছলামি বাংলা সাহিত্য" নামে প্রকাশিত তাঁর পুস্তিকাখানি নেহাত যেন হিন্দু স্কুলে মুছলমান মৌলবী সাহেবকে বেতন দেবার একখানি 'খেরো খাতা' মাত্র। সাহিত্যের ঐ সব ঐতিহাসিক—মুছলমান-রচিত ব'লে, এই সাহিত্য-ধারাকে, বাঙালা সাহিত্যের–ইতিহাসের বাইরে রেখে, চরম বেইমানী ও বে-ইনছাফী ক'রেছেন। সেই সাথে তাঁরা ঐ সাহিত্য, যাতে মুছলমানদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা না পায়, সুকৌশলে তার ব্যবস্থাও ক'রেছেন। পুথি-সাহিত্য-

www.pathagar.com

আলোচনায় সে-বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করা হবে।

৭. মুছলমানদের সাহিত্য, ভাষা ও লিপি ইত্যাদি সম্পর্কে ইন্‌ছাফ ও সে-সব সম্পর্কে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বে-ইন্‌ছাফের একটি তুলনা এখানে করা যেতে পারে। ছোলতানী ও মোগল আমলে মুছলমানরা যখন বাঙালার শাসক ছিলেন এবং "ধর্ম ও রাষ্ট্রকে শক্তিশালীকারী" (মুইজ-উদ্-দুনিয়া ও দ্বীন) ব'লে গৌরববোধ ক'রতেন, সে-সময় তাঁরা টোলে–পাঠশালায় ফারছী ও বাঙালা ভাষার সাথে সংস্কৃতও প'ড়তে দিয়েছেন। হিন্দু কবিদের ডেকে এনে খেলাৎ-খয়রাৎ, উৎসাহ-উদ্দীপনা-উপঢৌকন দিয়ে তুষ্ট ক'রে; হিন্দুদের ধর্মকাব্য—ধর্মগ্রন্থ তরজমা করিয়ে; অব্রাহ্মণ হিন্দুকেও সে-সব জানবার-পড়বার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। "কাফেরদের বই-কিতাব ও ভাষা" ব'লে কোন ঘৃণা-নিন্দা করেননি। অথচ বৃটিশ আমলে সেই হিন্দুদের-ই অলি-আওলাদগণ তাদের স্কুল-কলেজে মুছলমানদের ঢুকতে দেয়নি। প'ড়তে দেয়নি। মুছলমানদের বানানো বাঙালা ভাষা ও বাঙালা সাহিত্যকেও একেবারে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ ক'রেছে। সেগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা ও তাদের—কদর করা তো দূরের কথা; 'ইছলামী বাঙালা', 'মুছলমানী সাহিত্য', 'বটতলার পুথি' ইত্যাদি ব'লে, সে-সব একেবারে সাহিত্যের বৃত্তের বাইরে 'ছুঁড়ে ফেলেছে'। আর এই বর্জনকে চিরস্থায়ী বিসর্জন রূপে কায়েম রাখার জন্য বিশ শতকের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এবং তাদের আধুনিক অনুসারীরা পাঠ্যসূচী ও গবেষণা-প্রকাশনার চৌহদ্দিতেও; বাঙালার এই মূল সাহিত্য ধারাকে; এক পা রাখার সুযোগ রাখেনি। মুছলিম আমলে মুছলমানদের দ্বারা হিন্দু লিপি-ভাষা ও সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা দেবার এই প্রতিদান কী অদ্‌ভুত! কী বিস্ময়কর! আর সব থেকে বিস্ময়কর এই যে—এর সাথে বাঙ্‌লাদেশের এক শ্রেণীর মুছলমান আলিম-ফাজিলও হাত মিলিয়েছে।

৮. শুধু লিপিরক্ষা, ভাষা-সৃষ্টি ও সাহিত্য-নির্মাণে নয়; প্রকাশনা-ক্ষেত্রেও যে, মুছলিম প্রকাশকরা কেবল 'বটতলা এলাকায় নয়, কোলকাতার অনেক এলাকা'য় প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান খুলে বসেন এবং আধুনিক কলেজ স্ট্রীট্-(কলিকাতা) এর প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের তারাই পিতৃপুরুষ বা পথ প্রদর্শক, একথাটা বিনয় ঘোষ কিছুটা স্বীকার ক'রলেও, অন্যেরা এড়িয়ে গেছেন সযত্নে। এই বে-ইন্‌ছাফীর ফলেই যে-দেশে রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্-এর তথ্য অনুসারে (১৮৫৭-তে) এক কোলকাতা শহরে বছরে প্রায় আড়াই হাজার পুথি-কিতাব ছাপা ও বিক্রি হ'ত—আজ তার ছিটেফোঁটারও কোন অস্তিত্ব নেই। অথবা থাকলেও কোন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি তার খোঁজ রাখেন না। বাঙালায় এম. এ. পাশ করা

www.pathagar.com

এখনকার কোন ছাত্র-ছাত্রী জানে না, 'বটতলা' আর 'পুথি' কি? তারা এখন 'বটতলা' ব'লতে বট গাছের ছায়া ঢাকা এলাকা; আর 'পুথি' ব'লতে 'পাণ্ডুলিপি' বা Manuscript বোঝে।

৯. লিপি, ভাষা, সাহিত্য, গবেষণা প্রভৃতি নিয়ে, এই মুছলিম-বিদ্বেষী বে-ইনছাফীর কারণেই জানা সম্ভব হয়নি যে, সতের-আঠারো শতকের মুছলিম ভাষা-গবেষক ও বর্ণ-সংস্কারকগণ বাঙালা ভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে কী অসাধ্য সাধন করেন। **তাঁরা আরবী লিপি ও ভাষার ভিত্তিতে বাঙালা লিপি ও ভাষার গবেষণা ক'রে একান্নটি বাঙালা হরফের বদলে মাত্র আঠারোটি বাঙালা হরফে (৪টি স্বরবর্ণ ও ১৪টি ব্যঞ্জন বর্ণ) বাঙালা লেখার প্রচলন করেন**। দীনেশচন্দ্র সেনের মত 'উদার' ব্যক্তিও এ-খরবটা জেনে, চেপে গেছেন। বৃটিশ-পূর্ব আমলে, মুছলিম বাঙালা ভাষাবিদ্‌দের এই অতুলনীয় কীর্তি মুছে ফেলার জন্য পুথি সাহিত্যের দিকে কোন ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত মুছলমানও যাতে চোখ তুলে না তাকায়, তার ব্যবস্থা খুব ভালভাবেই করা হয়। এ-ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার জন্য মুছলমান-অমুছলমান কোন গবেষককেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ডক্টরেট ডিগ্রী পাবার জন্য পুথি-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ক'রতে দেওয়া হয়নি; হয় না। এদেশে পাকিস্তানী আমলে এর দু'টি মাত্র ব্যতিক্রম লক্ষণীয়।

পূর্বেই বলা হ'য়েছে—আমি জনাব কবি মুফাখখারুল ইসলামের নিকট শুনেছি, ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'পুথি-সাহিত্য' সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছায় ড. **সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট যান এবং তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন**। কিন্তু সুনীতিকুমার তাতে সায় দেননি। তিনি তাঁকে 'পুথি-সাহিত্য' গবেষণায় নিরুৎসাহ করে, 'ছুফীবাদ' নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ ক'রতে বলেন। বাধ্য হ'য়ে এনামুল হক—তা-ই করেন। শিক্ষা-সাহিত্য-গবেষণা জগতে মুছলমানদের 'মিস্-গাইড' (Misguide) করার **এই সচেতন বে-ইনছাফী; বিস্ময়কর হ'লেও অর্থহীন নয়। আজও ভারতে যাঁরা এম.ফিল. পি-এইচ ডি. ক'রতে যান, তাদের ইছলাম-মুছলিম-বিরোধী বিষয়ে গবেষণা-কর্মে যত উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়; ইছলাম-মুছলিম-সাপেক্ষ বিষয়ে তা দেওয়া হয় না। আর গবেষণার বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮-১৯ শতকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ** রাখা **হয়**।

১০. এভাবে বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস এবং গবেষণা ও দান-অবদানের প্রতি বে-ইনছাফী কেবল একবার, এক রকমে করা হয়নি বা হ'চ্ছে না।

এই ধারায় বিশ শতকের সাহিত্য-সামগ্রীর উপাদান-সংগ্রহ ও প্রকাশনা-মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও মুছলিম সংগ্রাহক ও গবেষকদের কিভাবে ব্যবহার করা হ'য়েছে এবং পরে তাদের ছুঁড়ে ফেলা হ'য়েছে—তার দু'একটি মাত্র নজীর-ই যথেষ্ট।

৩.

সবাই জানেন, আধুনিক বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার মূল উপাদান সংগ্রহে চট্টগ্রামের মুন্‌শী আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদের কী ভূমিকা ছিল। যদিও প্রাচীন পুথি-সংগ্রহের আদি উদ্যোগ ভারতের বড় লাট-ই ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নেন, তথাপি সরকারী অর্থে পুথি-সংগ্রহের কাজ শুরু হয়—১৮৮৪ সালে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর মাধ্যমে। সেই সময় থেকে বছরে চব্বিশ শ' টাকা ব্যয়ে বাঙালা পুথি সংগ্রহের কাজ চ'লতে থাকে। ঐ টাকা ব্যয়ের ভার প্রথম রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতে পড়ে; পরে সে-দায়িত্ব পান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী **এ-টাকা ব্যয় ক'রেই একাধিকবার, বৌদ্ধ পুথি খুঁজতে নেপাল যান এবং দেশেও বৌদ্ধদের লেখা বাঙালা পুথি ত্রিশ বছর যাবৎ খোঁজ করেন।* কিন্তু তিনি বা তাঁর সাথীরা একখানি মুছলমানী প্রাচীন পুথি খোঁজার প্রযোজন বোধ করেননি। এ-সময় 'সাহিত্য পরিষৎ'-কর্তৃপক্ষ বৈষ্ণব ও নাথ-সাহিত্যও সন্ধান করেননি**। তাঁরা তখন কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি খোঁজায় ব্যস্ত। এ-সময়-ই পাণ্ডুলিপি খোঁজার আসরে নামেন (১৮৯৩ সাল থেকে) মরহুম আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ। আর তিনি-ই পহেলা বৈষ্ণব, নাথ ও মুছলিম সাহিত্যের নজীর উদ্ধার করা শুরু করেন। তাঁর এ-কাজ সম্পর্কে ব্যোমকেশ মুস্তফি লিখেছেন—"মুনশী আবদুল করীম কর্তৃক অজ্ঞাতপূর্ব, অশ্রুতনাম, কৌতূহলোদ্দীপক বিস্ময়কর বহু প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে।" এই সূত্রে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর পরিচয়ও হয়। পরিচয় পরিণত হয় ঘনিষ্ঠতায়। কর্মকর্তারা তাঁকে পুথি-সংগ্রহ ক'রে 'সাহিত্য পরিষদে' পাঠাতে ও পুথির বিবরণ লিখে 'পরিষৎ-পত্রিকা'য় ছাপার জন্য পাঠাবারও অনুরোধ জানান। **কিন্তু এ-ব্যাপারে সরকারী অনুদান থেকে পুথি-সংগ্রহ-বাবদ একটি পয়সাও তাঁকে দেওয়া হয়নি। তিনি মুছলিম, হিন্দু-যোগী, বৈষ্ণব, শাক্ত বাছ-বিচার না ক'রে সব 'জাতি'র সব কবির লেখা পুথি অসীম ক্লেশে সংগ্রহ ও সম্পাদনা ক'রলেও, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত আটখানি পুথির মধ্যে বাউল তত্ত্ব বিষয়ক আলী রাজার 'জ্ঞান-সাগর' ছাড়া একখানিও ইছলাম-বিষয়ক মুছলিম পুথি প্রকাশিত হয়নি।**

*দেখুন—ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। বৌদ্ধ চর্যাপদ (২য় সংস্করণ, ঢাকা-২০০৫), পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

এমন কি, মহাকবি আলাওল-রচিত ও সাহিত্য-বিশারদ-সম্পাদিত "পদ্মাবতী"-গ্রন্থখানিও 'সাহিত্য পরিষৎ' কিংবা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেনি । অন্যপক্ষে, তাঁর সম্পাদিত ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়', রতি দেব-এর 'মৃগ-লুব্ধক', নরোত্তমের 'রাধিকার মান ভঙ্গ'—সাহিত্য-পরিষৎ থেকে ছাপা হ'য়েছে। এছাড়া, সাহিত্য-বিশারদ তাঁর সংগৃহীত যে ৬০০ 'প্রাচীন পুথির বিবরণ' 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশ করেন; বর্তমানে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত প্রাচীন পুথির বিবরণের মধ্যে তার মাত্র তিন-চারখানার বিবরণ স্থান লাভ ক'রেছে। পুথি-সাহিত্য-সংগ্রহে তাঁর অবদান কিছুমাত্র উল্লেখ করা হয়নি। তাঁর সংগৃহীত পুথির বিবরণ একেবারে বাদ দেয়া হ'য়েছে। নামটিও।

শুধু 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নয়; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও যে, তাঁর সঙ্গে কি-আচরণ ক'রেছে, সে-বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য কিছু স্পষ্ট উক্তি রেখে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে-সকল বিষয় মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নাথ-সাহিত্য বিষয়ক তাঁহার সংগ্রহ এবং আলোচনা নানা কারণেই মূল্যবান হইয়া আছে; অথচ বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার সম্পর্কে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, **এই বিষয়ে তাঁহার যে স্বীকৃতি প্রাপ্য ছিল, তিনি তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন**। একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গানে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় স্বর্গতঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, ভবানীদাস নামক কবি গোপীচন্দ্রের 'পাঁচালী' নামে ময়নামতীর গানের-ই বিষয় লইয়া অনুমান দুই শত বৎসর পূর্বে একখানি কাব্য রচনা করেন। চারিখানি প্রাচীন পুথির পাঠ মিলাইয়া শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব চাটগাঁ হইতে এই ভবানীদাস-বিরচিত 'গোপীচন্দ্রের গানের' একখানি খসড়া তৈরী করিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিয়াছিলেন।' কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই 'খসড়া'খানি লইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই; দীনেশচন্দ্র সেন কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়াছিলেন ।

যে-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গানে'র সংস্করণে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় মুনশী সাহেবের পাঠ হইতে বহুল পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়কে তাঁহার সম্পর্কিত পুথির সাহায্য দান

www.pathagar.com

করিবার উদ্দেশ্যে মুনশী সাহেব যে তাঁহার 'খসড়া' বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঠান নাই, তাহা দীনেশবাবু নিজেই স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, 'তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিয়াছিলেন'—অন্য কাহাকেও কোনভাবেই ব্যবহার করিবার জন্য তিনি পাঠান নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এই তিনজনের নামে সম্পাদিত হইয়া 'গোপীচন্দ্রের গান' নামক যে-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার শেষাংশে মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক চারিখানি পুথি মিলাইয়া ভবানী দাসের যে-পুথি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা আনুপূর্বিক প্রকাশিত হয়, **কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহাতে মুন্‌শী সাহেবের নাম উল্লেখিত হয় নাই**। **উক্ত তিনজন সম্পাদকের সঙ্গে সম্পাদক হিসাবে মুন্‌শী সাহেবেরও নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন ছিল,** কিন্তু দীনেশবাবুর মত অনুসারে মুনশী সাহেবের খসড়া হইতে 'বহুল পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ' করা সত্ত্বেও **সম্পাদক হিসাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই**। **অথচ** তিনি-ই ভবানী দাসের 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' পুথিখানির **প্রথম সন্ধান** দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে; 'চারিখানি পুথি মিলাইয়া' ইহার একটি আদর্শ পাঠ তৈরী করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্গতঃ দীনেশচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে পুথিখানি প্রকাশ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে তিনজন সম্পাদকের নাম থাকা সত্ত্বেও মুন্‌শী সাহেবের নাম তাহা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে**। সেই জন্যই বলিয়াছি, মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ নাথসাহিত্য সম্পর্কে যে মৌলিক সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়াছেন, তাহার যথাযথ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। যাঁহারা তাঁহাকে সেদিন তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না। কারণ, **যে-অসাধারণ পরিশ্রম এবং আগ্রহ সহকারে তিনি কেবল প্রাচীন পুথি সংগ্রহই নহে, তাহাদের শ্রমসাধ্য এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহা সকল যুগেই দুর্লভ**।"

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য-লিখিত "মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও বাংলার নাথসাহিত্য" নামক প্রবন্ধে উক্ত তথ্য উপহার দেবার পর, বিষয়টি সম্পর্কে আরও যে-আলোচনা ক'রেছেন; তার কোথাও,—কেন মুন্‌শী সাহেবের নাম ও তাঁর সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি বাদ দেয়া হ'ল; তার কারণ খুলে বলেননি। সে-কারণটি হ'ল, এই যে, **মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তাঁর সংগৃহীত ১০ খানি গোরক্ষ বিজয়-এর ও চার খানি গোপীচন্দ্রের গান-এর পুথির পাঠ মিলিয়ে স্থির করেন যে, মূল গ্রন্থ ভবানীদাসের রচনা নয়; তা কবি ফয়জুল্লাহ্‌র রচনা**।

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পক্ষে এ-সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে, সে-সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কোন মুছলমানের লেখা পুথি-পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। এজন্য তাঁরা মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্য **বিশারদ-এর-সম্পাদিত গ্রন্থের ("খসড়া" নয়; ওটা ছিল পুরোপুরি সম্পাদিত "গোরক্ষ বিজয়"-এর পাণ্ডুলিপি) নাম বদলিয়ে, পাঠ বদলিয়ে, সিদ্ধান্ত বদলিয়ে, এমনকি, সংগ্রাহক এবং মূল সম্পাদকের নামটি পর্যন্ত বদল ক'রে (যবন স্পর্শ-দোষশূন্য ক'রতে) "গোপীচন্দ্রের গান" প্রকাশ করা হয়। বাঙালা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে এমন মুছলিম-প্রেম ও "নিরপেক্ষতা"র আরও বহু নজীর র'য়েছে।**

জৈন-বৌদ্ধদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, মূর্তি ও মঠ-মন্দির দখল ক'রে—ধ্বংস ও আত্মসাৎকর্মে মুছলিম-পূর্ব আমলে ব্রাহ্মণরা গৌড়-বঙ্গে কি রকম পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন, সে-বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন অনেক লেখায় অনেক কথা লিখলেও , তিনি নিজেই 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'-'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' প্রকাশকালে, ঐ সব পালা গানের বিশিষ্ট সংগ্রাহক মরহুম কবি জসীম উদ্দীনের প্রতি কী আবিচার ক'রেছেন; তার কোন উল্লেখ করেননি। 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' ব্যতীত ড. সেন, তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র বিভিন্ন সংস্করণের মাল-মশলা-চয়নে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের লেখাগুলো ব্যবহার কালে, কি ক'রেছেন, তা'ও একবারও ভেঙে বলেননি। সচেতন ভাবে তা গোপন ক'রে গিয়েছেন। তাই ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য না লিখে পারেননি যে, দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর, তিনি মরহুম সাহিত্যবিশারদকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"আপনি যে-সকল প্রবন্ধ নানা-পত্রিকায় লিখিয়া আমার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য উপকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা দেখার সুযোগ আমার ঘটে নাই।" দ্বিতীয় সংস্করণ-রচনায় না-ঘ'টলেও, তৃতীয় থেকে অষ্টম সংস্করণ পর্যন্ত "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" প্রকাশকালে ঐ সব 'প্রস্তুত করা উপকরণ' (বিশেষে ক'রে, যা তাঁর-ই জন্য "প্রস্তুত") নিশ্চয়-ই তা "দেখার সৌভাগ্য" তাঁর হ'য়েছিল। কিন্তু ঐ বইয়ের কোথাও সে-কথার উল্লেখ, সে-ঋণ স্বীকার—আছে কি?

শুধু দীনেশচন্দ্র সেন নন; তখনকার এবং তাঁর পরবর্তী সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের কেউ-ই এই "যবন"-ব্যক্তির নিকট কোন ঋণ-স্বীকার করেননি। অথচ **এই ব্যক্তি বিনা পদ-পদবী-অর্থ-লালসায় যে আট শতাধিক প্রবন্ধ ও প্রায় আড়াই হাজার পুথি-সংগ্রহ ও আলোচনা ক'রে, বাঙালা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস রচনার মূল ভিত্তি তৈরী করেন;** তা তিনি না ক'রলে, দীনেশচন্দ্র সেন,

www.pathagar.com

সুকুমার সেন ও অন্যান্য **সাহিত্যের সেন-রাজাদের হাতে ঐতিহাসিক-ভাষাতাত্ত্বিকদের ইতিহাস-ভাষাতত্ত্বের বিপুলায়তন বপুর বই-কেতাবের জন্মই সম্ভব হ'ত না।**

১৮০১ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে এই ইছলাম ও মুছলিম-বিদ্বেষী মানসিকতা নিয়ে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' ও 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়'কে কেন্দ্র ক'রে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাঙালা দেশ, বাঙালী জাতি বাঙালা ভাষা-সাহিত্যের যে-ইতিহাস গ'ড়ে তোলা হয়; তাতে সর্বত্রই মুছলমানদের সম্পর্কে যে, বে-ইন্ছাফীর পরিচয় দেওয়া হ'তে থাকে; তাকে সচেতন বে-ইনছাফী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এর কারণ—বিশেষ ব্রাহ্মণ্যবাদী মুছলিম-বিদ্বেষী মানসিকতা; যা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় খোলাখুলি ব'লে গেছেন। তিনি জানিয়েছেন—'মুছলমানের দ্রব্য যত ভাল, উন্নত, পুষ্টিকর ও রুচিবান-ই হোক; তা হিন্দুর নিকট পরিত্যাজ্য। তা হিন্দুর কাছে 'বিষ'; হিন্দুর কাছে—পাপ।' তাই তাদের কাছে—মুছলমানের ভাষা—পাপ; মুছলমানের সাহিত্য-পাপ, মুছলমানের ইতিহাস—পাপ; মুছলমানের ধর্ম ও রাজত্বও 'পাপ'। এসব, পাপ কথা—'নিজেদের কথা' নয় ব'লে তারা জৈন—বৌদ্ধ ও মুছলমান আমলে কিছু লেখেননি। বৃটিশ আমলে, ইংরেজদের খাতির এবং দান-খয়রাৎ-খেলাৎ ইত্যাদি পাবার জন্য যখন লেখা শুরু করেন; তখন তা যে, পাপ- চেতনা-মুক্ত হবে না, সে-কথা সত্য।

এবার এই "পাপ কথা" বৃটিশ আমলের ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত আধুনিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সামন্ত-পুরোহিত 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদী' (হিন্দুবাদী) বুর্জোয়া ও তথাকথিত মার্কসবাদী বাঙালা সাহিত্যের তুখোড় ঐতিহাসিকরা "ইতিহাস"-নামে কোন্ রঙে রঙিন ক'রে লিখেছেন; লিখিয়েছেন এবং বখ্তিয়ারের তলোয়ারের ওপর তাদের সেই নানা রঙের নানা ছোপ কি রকম প'ড়েছে; এবার তার আলোচনা পেশ করা হবে।

৪

৬০১ হিজরীর ১৯শে রমজান (১২০০ সালের সেপ্টেম্বর মাস) দিল্লীর ছোলতান কুতুবুদ্দীন-এর অন্যতম ছিপাহ্ছালার ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন-বখ্তিয়ার মাত্র সতের জন সৈন্যসহ এসে গৌড় রাজ্য দখল করেন। গৌড়ের রাজা তখন লছমনিয়া বা লক্ষ্মণ সেন। ইতিহাসের এই সহজ ঘটনা , মুছলিম-বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্র সহ্য ক'রতে না পেরে, ভাঁড়ামি ক'রে লিখেছেন—" সতেরো জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ-উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিনহাজ উদ্দিন বাঙ্গালা

www.pathagar.com

জয়ের ষাট বৎসর (আসলে ঊনত্রিশ বৎসর—বর্তমান লেখক) পরে, এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি; তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেননা, অসম্ভব কথা। আর মিনহাজ উদ্দিন তাহা অপেক্ষা অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লান বদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পরিচিত,আমার কথা বিশ্বাস কর না।

কিন্তু সে সাত শত বৎসর মরিয়া গিয়াছে। সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জান না। তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। আমি বলিতেছি, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি। আর মিনহাজ উদ্দীনের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি কি স্বকপোলকল্পিত, তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই। কিন্তু সেই গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিত চিকুর, মুছলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ-বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিনহাজ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজীতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকুরী হয়। বিশ্বাস না করিবে কেন?”

আমরা এখানে এই চুট্‌কীর বিষয়ে কিছু না ব'লে, কেবল ড. দীনেশ চন্দ্র সেন-এর মত হাজির ক'রতে চাই। তিনি লিখেছেন—“তাঁহারা (বঙ্কিমচন্দ্রের মতের অনুসারীরা) মিনহাজের কথিত বৃত্তান্তটা একেবারেই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিতে হইয়াছেন।

কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, মুছলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ (না, গৌড় দেশ?) বিজিত হইয়াছিল এবং এই বিজয়-সংক্রান্ত প্রধান ঘটনা—নবদ্বীপ-অধিকার। **নদীয়া জয়ের ৩৪ বৎসর পরে মিনহাজ এই বিবরণটি লিখয়াছিলেন এবং তিনি দুই জন যোদ্ধার মুখে ঘটনাটি আদ্যন্ত শুনিয়াছিলেন । এই দুই যোদ্ধাই মহম্মদ বক্তিয়ারের অভিযানের সঙ্গী ছিল**। মিনহাজের কথিত-বিবরণ তৎসাময়িক লোকের মুখে শ্রুত। ইহা দেশ-প্রীতির (না, সম্প্রদায়) অনুপ্রেরণায় একবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কি প্রকারে? বিজয়ী যোদ্ধাদের পক্ষে স্বীয় শৌর্য-বীর্য বাড়াইয়া বলা এবং অপর পক্ষকে হীন করিবার চেষ্টা কতকটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া **সমস্ত ঘটনাটিই কল্পনার সৃষ্টি, একথা বলা ঠিক নহে**।”

এভাবে, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাসে যে-বে-ইনছাফী—বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুসারী-অনুরাগীরা চাপিয়ে দেন—ড. দীনেশচন্দ্র সেন সে-বে-ইনছাফীর জবাব

দিলেও, সাহিত্যের ইতিহাসের পরবর্তী লেখকদের কাছে—তাঁর ঐ সুচিন্তা ও সুযুক্তি বিশেষ পাত্তা পায়নি। ঐতিহাসিকরা বঙ্কিমকেই পাত্তা দিয়েছেন বেশী। **সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুছলিম-বিদ্বেষীরা তো বটেই, সেই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ব্রাহ্মণপন্থীরা এবং তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ মার্কসবাদীরাও এ-ব্যাপারে বঙ্কিম-অনুসারী। দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না।**

বস্তুতঃ যে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় রাজা ও 'ব্রাহ্মণ'গণ বাঙালা দেশের বাইরে অবস্থিত কর্ণাট-কান্যকুব্জ থেকে 'লোটা-কম্বল সম্বল' ক'রে গৌড়ে **এসে ওঠে এবং দয়াবান পাল রাজাদের দয়া-দাক্ষিণ্যে পহেলা জেঁকে বসার সুযোগ পায়; তাঁরাই সেন রাজাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ক'রে, ডেকে আনে মুছলমানদের । এক-ই ভাবে, তাদের-ই উত্তর পুরুষ সামন্ত-পুরোহিত-ব্রাহ্মণ ও মোহন্ত গোসাঁইরা মুছলিম রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ক'রে; তাদের "বঙ্গ-জননী"কে বিক্রি ক'রে দেয় ইংরেজদের কাছে। তারপর পরম আরামে খুশী মনে তাদের চরণ** সেবা ক'রতে ক'রতে—মুছলমানদের যে, এক-আধটু গালাগালি দিয়ে সাত শ' বছর পরও খানিক তৃপ্তি পাবে, সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তা' হয়নি নব গঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহ্য; ধারাবাহিকতা হারাতে পারে; এই বিবেচনাতেই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ ক'রে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও খেলা-কলমে লিখেছেন—"তুর্কীদের বাঙ্গলা বিজয়ের ফলে দেশের উপর দিয়া একটি প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। দেশময় মারামারি কাটা কাটি নগর ও মন্দির ধ্বংস, অভিজাত বংশীয় পণ্ডিতদের উচ্ছেদ প্রভৃতি অরাজকতা চলিয়াছিল। এরূপ সময় বড় দরের সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব।"

প্রায় এক-ই মানসিকতার অধিকারী মার্কসবাদী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিভাগ-পূর্বকালে (১৯৩৫-এ), বখ্‌তিয়ার খলজীর আগমনকে "তুরস্কের শেল বাঙ্গলায় পড়ে" ব'লে মন্তব্য ক'রেছেন। ড. দত্ত ব্যতীত মার্কসবাদী, সাহিত্যের ইতিহাস লেখক গোপাল হালদারও লিখেছেন—"খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দ শেষ হ'তে না হ'তেই বাঙালার ওপরে তুর্‌কী আক্রমণের ঝড় ব'য়ে গেল। সম্ভবতঃ তখন খৃষ্টীয় ১২০২ অব্দ।" এসময় থেকে আড়াই শ' বছরাধিককালকে, ঐ সব ঐতিহাসিক 'অন্ধকার' যুগ ব'লে বয়ান ক'রেছেন। এই দু'-আড়াই শ' বছর ধ'রে বাঙালা সাহিত্য-চর্চার কোন নমুনা-নিশানা পাওয়া যায়নি ব'লে, তাঁরা এ-সময়কে, ভূদেব চৌধুরীর ভাষায়—"সর্বাত্মক বিধ্বংসের কাল" ব'লে মোহর (Seal) মেরেছেন। বলা দরকার যে, "সর্বাত্মক বিধ্বংস"-এর কাল হিসেবে ঐ "অন্ধকার যুগ"কে তাঁরা

www.pathagar.com

'সাহিত্য-রচনার প্রামাণিক নজীর'-এর 'অভাব'-অর্থে গ্রহণ না ক'রে, জনজীবনের ধ্বংস-বিপর্যয়-অর্থে গ্রহণ ক'রেছেন। তাই বখ্‌তিয়ার ও তাঁর পরবর্তী ছোলতানদের—'অবিচার, অত্যাচার, বর্বরতার নজীর' রূপে গ্রহণ ক'রে 'হিন্দু মহাসভা'পন্থী ড. অতুল সুর লিখেছেন—"বিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলজি.....এক হাতে কোরান, অপর হাতে তলোয়ার নিয়ে বাঙালায় (না, গৌড়ে?) প্রবেশ ক'রেছিল। ধর্মীয় উন্মাদনার নেশায় মুছলমানরা গোড়া থেকেই হিন্দুর মঠ-মন্দির-মূর্তি ভাঙা ও ধর্মান্তরকরণের অভিযান চালিয়েছিল।" ইত্যাদি। বাঙালা সাহিত্যে "অন্ধকার যুগে"র কারণ নাকি এটাই!

অতিশয় অবাক ব্যাপার এই যে; কংগ্রেসপন্থী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু মহাসভা বা বি. জে. পি. পন্থী ড. অতুল সুর এবং মার্কসপন্থী তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী গোপাল হালদার প্রমুখ—**গৌড়ে মুছলিম হুকুমৎ কায়েম, তাদের সমদর্শিতা এবং সুশাসনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে এক ও অভিন্ন-কণ্ঠ। অতি উচ্চ কণ্ঠও বটে।** তাই গোপাল হালদার "১২০০ অব্দ শেষ হ'তে না হ'তে তুরকী আক্রমণের ঝড় ব'য়ে গেল" ব'লেই "তামাম শুদ্‌" করেননি। তিনি আরও ব'লেছেন—"১৪৫০ অব্দ পর্যন্ত বাঙালার জীবন ও সংস্কৃতি তুর্ক আঘাতে ও সংঘাতে ধ্বংস ও অরাজকতায় মূর্ছিত, অবসন্ন হ'য়ে ছিল। এই সন্ধিযুগের ইতিহাস তাই সাহিত্যে শূন্যতার ইতিহাস।" বে-ইনছাফী ইতিহাস-বিচারে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী, **মুছলিম-বিদ্বেষী (ব্রাহ্মণ্য পন্থী) ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী মনীষীদের কী তাজ্জব এই ঐক্যবদ্ধ মিথ্যা উচ্চারণ!**

মার্কসবাদী গোপাল হালদার ১৪৫০ সাল তক "বাঙালার জীবন ও সংস্কৃতি তুর্ক আঘাতে ও সংঘাতে ধ্বংস, অবসন্ন ও মূর্ছিত" ছিল ব'ললেও ভূদেব চৌধুরী সময় একটু কমিয়ে দিয়ে লিখেছেন—"১৩৪২ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াছ শাহী সুশাসন প্রবর্তনের আগে বাঙালীর (না, গৌড়ীয়দের) জাতীয়জীবন এক নিরন্ধ্র বিনষ্টির ঐতিহ্যে ভরপুর এবং সৃজনহীন ঊষরতায় শূন্য।"

বলা দরকার যে, এ-সব কথা বিশ শতকের সেই সময়ের 'ইতিহাস'-এ লেখা হয়; যখন সারা উপমহাদেশে এবং গোটা বৃটিশ বাঙালায় মুছলমান ও হিন্দু নেতাদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের ভয়ানক লড়াই চ'লছিল। সারা দেশের আসন্ন আজাদীকে নিজ নিজ শ্রেণী ও ধর্মীয় জনকওমের তরফে দখল ক'রে নেয়ার জন্য যখন মুছলমান ও হিন্দুগণ একে অপরের 'জানী দুশ্‌মনে' পরিণত হ'য়েছিল। এ-

www.pathagar.com

সময়ের মুছলিম-বিদ্বেষী হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর মানসিকতা এম. এন. রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি হাতে গোনা দু'চার জন পরিহার ক'রতে পারলেও সুনীতিকুমার, গোপাল হালদার, ভূদেব চৌধুরীরা তা পারেননি। পারেননি ড. অতুল সুরও । **চেতনার দিক থেকে, আলাদা আলাদা হ'লেও, তারা মুছলিম- বিরোধিতায় সবাই —এক ও ঐক্যবদ্ধ।**

এ-কথা মনে রেখে ওঁদের ঐ সব একঢালা মন্তব্য পরীক্ষা করা দরকার। তা হ'লে জানা যাবে, বখ্তিয়ার গৌড় দেশ "আক্রমণ" করেননি। কারণ তিনি তাঁর বিশাল "বিহার বিজয়ী সেনাবাহিনী"—বিহারেই রেখে এসেছিলেন। তিনি মাত্র সতের জন ঘোড় ছওয়ারসহ—খোলা তলোয়ার নিয়েও নদীয়ার রাজপুরীতে ঢোকেননি। কেননা, তাঁরা বিনা বাধায় রাজপুরীর দরোজায় হাজির হন এবং দ্বাররক্ষীদের কাছে, নিজেদের "অশ্ব বিক্রেতা" ব'লে পরিচয় দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। খোলা তলোয়ার হাতে এলে, নিশ্চয়-ই বিনা বাধায় তাঁদের ঢুকতে দেয়া হ'ত না। কাজেই যাঁর সাথে সেনাবাহিনী নেই; কামান-বন্দুক নেই , যাকে কোন বাধা পেতে হয়নি; লড়াই ক'রতে হয়নি, রাজপুরীর দারোয়ানজীরা যাঁদের কোষবদ্ধ অসিধারী শাহী মেহ্মান ভেবে 'স্যালুট' ঠুকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছে, আর দুপুরের আহারে রত রাজা, যখন তুর্কীদের আসার খবর শুনে, একখানা চামচ উঁচা ক'রে তুলে ধরারও হিম্মৎ না-দেখিয়ে, সোনার থালার ভাত—সোনার থালায় ফেলে রেখেই না-খেয়ে সোনার ছেলের মত খিড়কী দরোজা দিয়ে পালিয়ে পূর্ব-দেশে চ'লে আসেন; তখন "তুর্কী আক্রমণের ঝড়" ব'য়ে যায় কি ভাবে, তা বোঝা কঠিন। আসলে, **ঐ ঝড় যে, বিশ শতকের মুছলিম-বিদ্বেষী, ইতিহাস-বিদ্বেষী হিন্দুর মগজ-উৎপন্ন কাল্পনিক "ঝড়"—তাতে কোন সন্দেহ নেই।**

অতএব, গৌড়-বিজয়ী ইখ্তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ার-এর কোষবদ্ধ তলোয়ারের ওপর বিশ শতকীয় বিশ্বাসঘাতক সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের একাংশ যত রকম রঙ্-ই চড়ান না কেন; ইতিহাসের তাতে কিছু আসে যায় না। সেকালে বখ্তিয়ার যে গৌড়ে "আক্রমণকারী" রূপে নয়; বরং "আছানদান কারী" রূপে "ফেরেশ্তা"র মত আবির্ভূত হন; তা ঐতিহাসিক সূত্রেই জানা যায়। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ, 'ধর্মপূজা- বিধান'-এ সংকলিত "কলিমা জাল্লাল" "নিরঞ্জনের রুষ্মা" প্রভৃতি রচনাই তার বিশেষ প্রমাণ। তাই বিজেতা জাতির ওপর বিজয়ী জাতির জোর জুলুমের নজীর দেখাতে ঐ সব ঐতিহাসিক; স্পেনীয়দের পেরুতে ও মেক্সিকোতে; ওলন্দাজদের আফ্রিকায় এবং তুর্কীদের ইস্তাম্বুল-(কনস্ট্যান্টিনোপল)এ, আত্যাচারের যে-তথ্য হাজির করেন, তা বখ্তিয়ার খিলজির

গৌড় দখলে, দেখানো চলে না। বখ্তিয়ার-এর বিজয়কে, 'বিজয়' না ব'লে, তিনি 'এলেন, দেখলেন, ঢুকলেন এবং দখল পেলেন' বলাই উচিত। এই আসাও তাঁর নিজের ইচ্ছায় নয়; তাঁকে সেন-দরবারের কোন চর গিয়েই যে ডেকে, গোপনে পথ দেখিয়ে রাজপুরীতে নিয়ে আসে, সে-কথা ড. দীনেশচন্দ্র সেন-ই কেবল নন, ড. সুকুমার সেনও তাঁর "বঙ্গ ভূমিকা" বইয়ে কবুল ক'রেছেন। 'গৌড় জয়' ক'রতে তাই মুছলিম ছিপাহছালারকে কোন লড়াইয়ের মুখোমুখী হ'তে হয়নি। এক ফোঁটা খুন-খারাবি ক'রতে হয়নি। এক চুল বাধা পেতে হয়নি। গৌড় দখলের পর, তিনি আশপাশ এলাকায় অভিযান চালিয়েও রাজ্য সীমা বাড়াবার কোশেশ করেননি। বখ্তিয়ারের তিব্বত জয়ের ইচ্ছা ছিল। সে-দিকে অভিযানও চালিয়েছিলেন। কিন্তু তিব্বত জয় ক'রতে পারেননি। তাই এই গৌড় ও বিহার-বিজয়ী বীরের ইন্তেকালের সময়, বিহার ছাড়া **গৌড় রাজ্যের পঞ্চাশ বর্গ মাইল বরেন্দ্র ভূমি** মাত্র তাঁর দখলে ছিল। অন্য সব এলাকাই ছিল, অমুছলিমদের দখলে। অপর দিকে, ইখ্তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খিলজির কোমরের খাপে ঢাকা তলোয়ার দেখেই পালিয়ে যাওয়া লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর অলি-আওলাদগণ 'বঙ্গাল'-(তথাকথিত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ) এলাকা এক শ' পঁচিশ বছর দখল ক'রে থাকেন। ফলে, গোটা গৌড়-বঙ্গাল এলাকা ১৩৫২ সালের আগ তক মুছলিম-শক্তির দখলে আসেনি। গৌড় জয়ের পর ১২৯৮ সালে মুছলমানরা সপ্ত গ্রাম, এবং ১৩২২-এ বিক্রমপুর বা সোনার গাঁ দখল করেন। ১৪৩৫-এর আগে বঙ্গাল-এর দক্ষিণ এলাকাও তুরকীদের দখলে যায়নি। হিন্দুদের দখলেই থেকেছে। তারপর-ই মাত্র সমগ্র 'বঙাল'-'গৌড়', রাঢ়-বরেন্দ্র এক মুছলিম-শাসনে ঐক্যবদ্ধ 'বাঙালা' নামক একটি দেশে পরিণত হয়। গৌড় নাম ডুবে গিয়ে, নতুন দেশটির নাম হয় 'বাঙালাহ্'। এ-সময়েও মুছলমানদের সাথে হিন্দুদের কোন লড়াই ক'রতে হয়নি। লড়াই হ'য়েছে, মুছলমানের সঙ্গে মুছলমানের। তাই "১২০০ খৃষ্টাব্দ শেষ হ'তে না হ'তেই সারা বাঙলার ওপর তুরকী আক্রমণের ঝড় ব'য়ে গেল"—**গোপাল হালদারের এ-বয়ানের মধ্যে আক্রোশ আছে, ইতিহাস নেই।**

এক-ই ভাবে, ঐ সময়কালের মধ্যে সারা দেশে মারামারি-কাটাকাটি, মন্দির-ধ্বংস, লুণ্ঠন, নারীর ইজ্জৎ হরণ ইত্যাদির যে-অভিযোগ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী, ড. অতুল সুর প্রমুখ ক'রেছেন, তাও পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে। ড. **অতুল সুর তো ঐ কাল-পরিধিকে আরও বাড়িয়ে ১৭৫৭ সালের পলাশীর লড়াই তক টেনে এনেছেন।** তিনি লিখেছেন—'সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরকাল বাঙালায় মুছলমান রাজত্ব ছিল।...বহু হিন্দুকে তারা ধর্মান্তরিত ক'রেছিল, মঠ-মন্দির ভেঙে ফেলে, তার-ই উপাদান দিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসা,

www.pathagar.com

খানকাহ্ ইত্যাদি নির্মাণ ক'রেছিল। এটা বখ্তিয়ার খিলজির আমল থেকেই শুরু হ'য়েছিল এবং পরবর্তী অনেক ছোলতান-ই তার অনুসরণ ক'রেছিলেন।".... ইত্যাদি।

বেইমান "ঐতিহাসিক"দের এই আষাঢ়ে 'গপ্প' খতিয়ে দেখলে জানা যায়—গৌড়ের আদিনা মছজিদের ধ্বংসাবেশে হিন্দু মন্দিরের অলংকরণ-চিহ্ন র'য়েছে—তা ঠিক। কিন্তু ঐ নজীর দেখিয়ে গৌড়ে তুরকী জোর-জুলুমের প্রমাণ ছাবুত (প্রতিষ্ঠা) করা যায় না। কেননা, তা অসত্য ও ইতিহাস-বিরোধী। ইতিহাসের ইনছাফী রায় ভিন্ন। কারণ, ঐ মছজিদে হিন্দু মন্দিরের অলংকরণ এবং উপাদানের যে-সব চিহ্ন পাওয়া যায়, মশহুর স্থাপত্যবিদ্ ও মন্দির-বিশেষজ্ঞ, ঐতিহাসিক স্টেপ্লটন ও সুখময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, সে-সব গৌড়ের ছোলতান সিকান্দর শাহ্, কোন মন্দির ভেঙে এনে লাগাননি। বরং তাঁর-ই তৈরী মছজিদ ভেঙে রাজা গণেশ সেখানেই মন্দির নির্মাণ করেন। (ভারতের অযোধ্যায় এখন যেমন বাবরী মছজিদ ভেঙে তার ওপর রাম মন্দির বানানো হ'চ্ছে।)। এ-বিষয়ে আল সাখাওয়ীর লেখা থেকে জানা যায় যে, সে-মন্দির্ গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন, তখ্তনশীন হ'য়ে পুনরায় মছজিদে পরিবর্তন করেন। এর সাথে তুর্কীদের কোন সম্পর্কই ছিল না। এই ধরনের অপরাপর অভিযোগও—ইতিহাসের খাপ খোলা তলোয়ারের আঘাত দিয়ে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেখানো যায়। কারণ অভিযোগগুলো ডাহা মিথ্যা।

তাই ড. দীনেশচন্দ্র সেন ঠিক-ই লিখেছেন—তুরকীদের "বঙ্গ বিজয়(গৌড় বিজয়)এ জনসাধারণের কোন বিশেষ ক্ষোভের উৎপত্তি হয় নাই। মুছলমান-আগমনে বঙ্গীয় জনসাধারণ বরঞ্চ কতকটা হৃষ্টই হইয়াছিল।" কেননা, তাঁর ভাষায়—পাঁচটি কারণে, "খাছ বাঙ্গলায়ও সেনেদের রাজত্ব জনসাধারণের প্রীতিকর হয় নাই।" কেননা তিনি (খেয়াল না ক'রে পারেননি যে, গৌড়ীয় জনসাধারণ যোগী পাল, 'ভোগী পাল', 'মহীপাল' দেবদের নিয়ে 'গীত' (Ballad) রচনা ক'রলেও কেউ 'বল্লাল সেন', 'লক্ষ্মণ সেন', 'হেমন্ত সেন', 'বিশ্বরূপ সেন' প্রমুখের নামে তারিফ ক'রে কোন 'গীতি' লেখেননি। না. হিন্দু—না বৌদ্ধ;—না মুছলমান। কোন লোক-কবিও নয়। অথচ পরবর্তীকালের মুছলমান বীর নারী–পুরুষদের নিয়ে মুছলমান ও হিন্দু বৌদ্ধ সব জনকওমের লোক-কবিরাই বীর-গাথা (Ballad) রচনা ক'রেছেন। যেমন দেওয়ান মদীনার পালা।

এভাবে, সেন-বর্মণ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এ-দেশের জনগণের মনে কখনও ঠাঁই পায়নি। যারা শাসক হিসেবে সব যুগেই মহা অত্যাচারী ছিল। তাঁদের-ই সমর্থনে

www.pathagar.com

এ-শতকের ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এক শ্রেণীর হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর লেখক ও ঐতিহাসিক সেন-আমলের সকল রকম অপকর্মের বোঝা সেই সব মুছলিম বিজেতা ও শাসকদের অদৃশ্য ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, যাঁরা না এলে, সারা দেশ 'হায়ওয়ানী রাজ্যে' পরিণত হ'ত। হয়তো পুনরায় দেখা দিত মাৎস্যন্যায় এবং গণ-বিপ্লব। **বেঈমানদের এই বে-ইনছাফী ইতিহাস-চর্চার নামে 'পাপকথা'-চর্চার প্রসঙ্গে** আরও বলা যায় যে, **ধর্মগত অসহিষ্ণুতা মুছলমানদের বৈশিষ্ট্য নয়; তা অবধারিত ভাবে একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈশিষ্ট্য।** তাই বাঙালার ইতিহাসে, পাঁচ শ' বছর ধ'রে মুছলমানরা যে, জোর ক'রে হিন্দুদের মুছলমান করেননি; সে কথা ড. অতুল সুর স্বীকার না ক'রলেও, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও দীনেশচন্দ্র সেন স্বীকার ক'রেছেন। তাই এ-তরফে ড. সেন-এর কথায় কিছুটা ইনছাফ-এর নজীর **পাওয়া যায়। তিনি ছাফ ছাফ লিখেছেন—" হিন্দুর যেখানে প্রকৃত দুর্বলতা এবং মুছলমানের যেখানে প্রবল শক্তি, সেইখানে তাহাদের আক্রমণ অনেকটা সফল হইল। এই সকল (সামাজিক অনাচার ইত্যাদি) অন্যায় ভ্রাতৃবিরোধ ও ঘৃণার রাজ্যে মুছলমান নির্ঘৃণ ও সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব লইয়া আসিলেন। পতিত বৌদ্ধগণকে তো হিন্দুরা কোণ ঠাসিয়া এমন এক জায়গায় লইয়া আসিয়াছিলেন যেখানে তাহারা পশুর অধম হইয়া জীবন যাপন করিতেছিল—যে-স্থানে তাহারা থাকিত, সে-স্থান হিন্দু গৃহস্থের অস্পৃশ্য, তাহাদের ছায়া মাড়াইলে স্নানের ব্যবস্থা। ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া মুছলমানরা বলিলেন—"আমাদের রাজা-প্রজা নাই, বামুন-চণ্ডাল নাই। আমরা এক পংক্তিতে বসিয়া খাই। দুনিয়ার এক মালিক। আমরা তাহার-ই সম্পর্কে সকলে ভাই।"** এই কথা এদেশের নিম্নশ্রেণীর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে অমৃত-প্রলেপের ন্যায় কাজ করিল। আজ যদি হিন্দুর প্রাণে বিন্দুমাত্র ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকিত, কৃতজ্ঞতার লেশ থাকিত; তবে কি পূর্ব বঙ্গে শত-সহস্র লোক মুছলমান হইয়া যাইত। উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গে (তখনকার বঙ্গাল-এ) বৌদ্ধের সংখ্যা খুব বেশী ছিল, সেইখানেই ইছলাম কৃতকার্য হইল।" বলা দরকার যে, ড. দীনেশচন্দ্র সেন এখানে "আজ যদি হিন্দুর প্রাণে কৃতজ্ঞতার লেশ থাকিত" ব'লে যে উক্তি ক'রেছেন, **সেটা ঘুরিয়ে না নিয়ে তাঁর বলা উচিত ছিল**—"আজ যদি হিন্দুর প্রাণে বিন্দুমাত্র ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকিত, কৃতজ্ঞতার লেশ থাকিত"—তাহ'লে যে-মুছলমানরা "ভাই" ব'লে; তাদের কাছে টেনে, কোলে তুলে নিয়েছিল; সাড়ে পাঁচ শ' বছর যাবৎ তাদের পদ-পদবী, চাকুরী, খেলাৎ, আদর, কদর, মান-ইজ্জৎ, ভাষা, সাহিত্য, ধর্মাচারে স্বাধীনতা ও সহযোগিতা দিয়েছিল, সেই তাদের বিরুদ্ধে অকুণ্ঠচিত্তে মিথ্যা লিখে, ইতিহাসকে যথার্থ "পাপকথা" বানাবার ধৃষ্টতা দেখাত না।

www.pathagar.com

অতএব, বিশ শতকের মুছলিম-বিদ্বেষী বেইমান ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহাসিকরা আজ যা-ই লিখুন, একথা সত্য, "যে-সকল নৈতিক শক্তি লইয়া বিশ্বাসের খড়্গ হস্তে মুছলমান আসিয়াছিল। সেই খড়্গে আমাদের (হিন্দুদের) পরাজয় হইয়াছে। লৌহ বা ইস্পাতের খড়্গে নহে।" এক-ই কথা ব'লেছেন—ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও। তিনি ড. দীনেশ চন্দ্র সেন থেকেও এক ধাপ এগিয়ে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ইছলাম ও মুছলমানদের আচার-আচরণের উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—"মুছলমানরা আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন। তার ফলে, তাদের ভেতরে মূল জাতীয় বা স্বজাতীয় ব'লে কোন ভাব ছিল না। যে-কোন দেশের, বর্ণের বা জাতির লোক মুছলমান হ'লেই সে ইছলামীয় সমাজের মধ্যে স্বচ্ছন্দ্যে স্থান পেয়ে থাকে। ইছলামের এই সাম্যবাদ বিজিত জাতিগুলির হৃদয় জয় করে এবং এর ফলে আরবদের দ্বারা বিজিত জাতের লোকেরা অনেক স্থলে প্রায়শঃই সম্পূর্ণভাবে মুছলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রে নিত। এইচ. জি. ওয়েলস মহাশয় বলেন যে, ইছলামের অভ্যুত্থানের যুগে তদপেক্ষা উদার সমাজ-পদ্ধতি অন্য কোন সম্প্রদায় মানবজাতিকে উপহার দিতে পারেনি। ইছলামীয় সাম্যবাদ ভারতে খুব কার্যকরী হ'য়েছে। সেজন্য ভারতে মুছলমানের সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপক্ষা সর্বাধিক। বাঙ্গলা দেশের বেলায়ও **সেই অনুমান ক'রে বলা হয় যে, পতিত জাতির ভিতর থেকেই বেশী সংখ্যায় লোক মুছলমান** হ'য়ে পড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীতে বারবোসা নামে কোন এক ইউরোপীয় পর্যটক এ-বিষয়ে মন্তব্য ক'রেছিলেন যে, 'বাঙালীরা হু হু ক'রে মুছলমান হ'চ্ছিল।" লেখক অবশ্য সে-সময় উচ্চ শ্রেণীর বর্ণ হিন্দুরাও যে মুছলমান হ'চ্ছিল, সেকথা ব'লেছেন। তাঁদের মুছলমান হবার কারণ কোন রকম জবরদস্তি ছিল না। এ-বিষয়ে ড. দত্ত লিখেছেন—"ঐতিহাসিকরা বলেন, হিন্দুদের মুছলমান-করণ, মোঘল রাজত্বের অপর ভাগেই অর্থাৎ তুর্কী ও পাঠান শাসনকালেই বিশেষ ভাবে হ'য়েছিল। এই সময় কেবল পতিতেরা নয়, উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও নতুন শাসনের সুবিধা পাবার আশায় দলে দলে স্বীয় ধর্ম ত্যাগ ক'রতে লাগল।...সেকালে তথাকথিত উচ্চ জাতীয় শ্রেণী ব'লতে বোধ হয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য বংশীয় লোকদের বোঝাত।"...সে যা-ই হোক, একথা সত্য যে, মুছলমানরা কখনও কোথাও এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে হিন্দু-বৌদ্ধদের মুছলমান বানায়নি। বরং ড. দত্ত হোছেন শাহ ও তাঁর পরবর্তী ছোলতানদের সমদর্শিতা সম্পর্কে লিখেছেন—"...হোছেন শাহ্ ... "উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ" সত্ত্বেও তাঁর শরীর-রক্ষীদের সেনাপতি ছিল কেশব বসু, গোপীবসু (পুরন্দর খাঁ), সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী সাকর মল্লিক (সনাতন গোস্বামী) ও দবীর খাস (রূপ গোস্বামী) এবং অন্যান্য হিন্দুরা আমলাতন্ত্রের মধ্যেই ছিল। হোছেন শাহের উড়িষ্যা বিজয় ও

www.pathagar.com

হিন্দু মন্দির ধ্বংসের সময় বড় বড় হিন্দু কর্মচারীরা তাঁর সঙ্গে ছিল। **এই ভাবে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাঙ্গলার ইতিহাস থেকে যথেষ্ট নজীর পাওয়া যায় যে, "ধর্মের প্রাচীর দিয়ে এ-প্রদেশে অথবা ভারতের অন্য কোন স্থানে হিন্দু বনাম মুসলমান-সংগ্রাম সংঘটিত হয়নি।** এই যুগে ভারতীয়রা (এবং বাঙালীরাও) ধর্মের ঐক্যের পরিবর্তে সমশ্রেণীর স্বার্থের ঐক্যই ভালভাবে চিনেছিল। শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রাম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে বাদ দিয়ে চ'লেছিল।" **অর্থাৎ এদেশে প্রকৃত ধর্ম-নিরপেক্ষতা মুছলমানরাই "সার্ধ্ব পাঁচ শত বৎসর" কায়েম রাখে।** এ-কথা এম. এন. রায়, রজনী পাম দত্ত প্রমুখও কবুল ক'রেছেন।

৫.

অতএব, উপরের আলোচনা থেকে এ-কথা স্পষ্ট হ'য়েছে যে, বাঙালায় মুছলিম আমলের প্রকৃত নিরপেক্ষ ইতিহাস, আর ব্রাহ্মণ্যবাদী মুছলিম-বিদ্বেষী সাহিত্যের ইতিহাসে বর্ণিত—"ইতিহাস" এক নয়। **মুছলমান বিজেতারা এদেশে এসে কখনও কারো বাড়া ভাতে ছাই দেননি। বরং সকলকেই যত্নের সঙ্গে আহার, শান্তি ও নিরাপত্তা যুগিয়েছেন। সেই "আহার" কেবল পেটের নয়—মনেরও।** তাঁরা 'এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে তলোয়ার' নিয়েও ধর্মপ্রচার করেননি। বরং **কোরান-এর সাহায্যে তাঁরা শান্তি, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও সুবিচারের বাণী শুনিয়ে প্রকৃত ধর্ম-নিরপেক্ষতার নজীর স্থাপন ক'রেছেন;** আলোকময় জীবনের পথ দেখিয়েছেন, **আর তলোয়ারের 'বাট' দেখিয়ে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সব রকম অনাচার-অত্যাচার থেকে সকল জনসমাজকে হেফাজৎ ক'রেছেন। তাই বাঙালায় মুছলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠতার অন্যতম কারণ—সেকালের ইছলামী সুশাসন।**

প্রকৃত পক্ষে, গৌড়-বাঙালায় মুছলিম শাসন-কায়েমের সূচনা থেকে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা-মীর কাসিম তক; কোন শাসক-ই কখনও হিন্দুর মঠ-মন্দির ভেঙে সংগৃহীত উপরকণ দিয়ে মছজিদ, খানকাহ্, দরগা-দরবার গ'ড়ে তোলেননি। তাঁর একটি বিশেষ কারণ—ঐ সব দ্রব্য বা উপকরণ মুছলমানদের নিকট 'না পাক' বা 'অপবিত্র'। তাই মূর্তি-মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত কোন উপকরণ-ই মুছলমানরা মছজিদ-মকবেরা, দরগা-দরবারে (পীর-মাশায়েখদের বাসস্থানে) ব্যবহার ক'রতে পারেন না। তাছাড়া , অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের উপর, জোর-জবরদস্তি না-করার সুস্পষ্ট নির্দেশ কোরান শরীফে র'য়েছে (দেখুন—ছুরা কাফেরুন)। অন্যদিকে, মঠ-মন্দির ধ্বংস করা ও সে-সব দখল ক'রে আত্মসাৎ করা যে, একটি সুপরিচিত ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজকার্য, ধর্মীয় কর্ম এবং হিন্দু ঐতিহ্য; তা সারা উপমহাদেশের জৈন-বৌদ্ধদের

www.pathagar.com

বিলুপ্তির ইতিহাস পাঠ ক'রলেই জানা যায়। বিষয়টি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন অনেক কথা লিখেছেন। আমরাও এ-বিষয়ে পরে সম্যক আলোচনা করব।

তাই এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের 'ইতিহাস' লিখতে গিয়ে যে-সব ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী মুছলিম-বিদ্বেষী এক চোখো ইতিহাসবিদ্ **ইতিহাসের নামে চরম বেইমানী ও বে-ইনছাফীর সাথে প্রকৃত "পাপ কথা" রচনা ক'রেছেন**; তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বিশ শতকের মুছলিম নব জাগরণ-(রাজনৈতিক)কে বিভ্রান্ত ও বিতর্কিত করা। সাধারণ মুছলমান ও অমুছলমানদের মধ্যে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টি ক'রে; ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিকে সারা উপমহাদেশের কোটি কোটি মুছলমান ও অব্রাহ্মণদের ঘাড়ে শক্ত ভাবে চাপিয়ে দেয়া। এই বিশেষ প্রয়োজনে, ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী মুছলিম বিদ্বেষী সাহিত্যিক-ঐতিহাসিকদের, সাহিত্যের ইতিহাস থেকে মুছলিম অবদানের নাম-নিশানাটুকুও মুছে না দিয়ে উপায় ছিল না। তাই তাঁরা কেবল সিরাজউদ্দৌলার খাপে ঢাকা তরবাবিকেই নয়; ইখ্তিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ বখ্তিয়ারের কোষবদ্ধ তলোয়ারকেও সমানভাবে মসীলিপ্ত ক'রেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বখতিয়ারের তলোয়ার যে, পাল-পরবর্তী আমলে গৌড়-বঙালের দু'শ' বছরের ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিয়াহীকে ইছলামিক তজল্লীতে রওশন পুরনূর (আলোকময়) ক'রে তোলে; সেই সত্য ইতিহাস, নবজাগরণকামী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চেপে না গিয়ে উপায় ছিল না। কারণ তা ছিল, তাঁদের-ই পূর্ব পুরুষদের কলংকময় ইতিহাসকে ঢেকে রাখার জন্য একান্ত জরুরী। সে-কোশেশ তাঁরা এখনও ক'রে চ'লছেন।

এবার সেই মুছলিম-পূর্ব অন্ধকারময় জামানার মোখ্তছর পরিচয় দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. দীনেশচন্দ্র সেন — বৃহৎ বঙ্গ- ১ম ও ২য় খণ্ড কলি-১৯৯৩।

২. দীনেশচন্দ্র সেন — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৮ম সংস্করণ, কলি-১৩৫৬।

৩. দীনেশচন্দ্র সেন — ময়মনসিংহ-গীতিকা কলি-১৯৭৩।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্কিম-রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র) কলি-১৩৯৩।

৫. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার — রাজাবলী কলি-১৩১২।

৬. রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — রমেশচন্দ্র-রচনাবলী ১ম খণ্ড, (নাম পত্র ছিন্ন)।

৭. এস. এম.লুৎফর রহমান — বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস-১ম ও ২য় খণ্ড (ঢাকা ২০০৪ ও ২০০৫)।

৮. সুকুমার সেন — ইসলামি বাংলা সাহিত্য বর্ধমান-১৩৫১।

৯. সুকুমার সেন — বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, কলি-১৯৭০।

১০. মুহম্মদ এনামূল হক ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত — আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ-স্মারক গ্রন্থ ঢাকা-১৯৬৯।

১১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ৮ম সংস্করণ, কলি-১৯৭৪।

১২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — ODBL. Vol. I.-III. Cal-1985.

১৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালা ভাষা-প্রসঙ্গে (জিজ্ঞাসা-সংস্করণ)।

১৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত — সাহিত্যে প্রগতি কলি.-১৯৪৫।

১৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (নামপত্র ছিন্ন)

১৬. গোপাল হালদার — বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রাচীন যুগ) ৩য় সংস্করণ-কলি-১৩৭০।

১৭. ভূদেব চৌধুরী — বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (নামপত্র ছিন্ন)

১৮. অতুল সুর — ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় কলি-১৯৮৮।

১৯. রেভা. জেমস লঙ্ (মোহাম্মদ হাবীবুর রশিদ-অনুদিত) — আদি পর্বে বাংলা প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা ঢাকা-১৯৮৮।

www.pathagar.com

গৌড়ে আইয়ামে জাহেলিয়াৎ ও
সেন-আমলের দু'শ বছর
(১১শ-১২শ শতক)

সকলেই জানেন—'আইয়াম্' আরবী শব্দ; অর্থ—সময়, কাল বা যুগ। 'জাহেলিয়া'ও আরবী শব্দ। অর্থ—মূর্খতা, পথ-ভ্রষ্টতা, অন্ধকার ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে, কোন দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যদি জনগণের জানমালের নিরাপত্তা না-থাকে, মৌলিক ও মানবিক অধিকার না থাকে; সমাজের উঁচু তলার লোকেরা এবং রাজশক্তি বা শাসক শ্রেণী—স্বেচ্ছাচারী, পাপাচারী, অত্যাচারী, অন্যায়কারী, বিচার-বিবেচনাহীন, মূল্যবোধহীন ও গণ-নিপীড়ক হয়; তবে সেই দেশের সেই সময়কে 'আইয়ামে জাহেলিয়াৎ'— বা 'মূর্খতার যুগ', 'অন্ধকার যুগ' ইত্যাদি বলা যায়। মহানবী হজরৎ মুহম্মদ-(স.)এর জন্মকালে আরব দেশে এ-রকম যুগ দেখা দেয়। সে-জন্য ঐ সময়কে বিশেষভাবে আরবের 'আইয়ামে জাহেলিয়াৎ' বলে।

ঠিক এক-ই রকম 'আইয়ামে জাহেলিয়াৎ' বা 'অন্ধকার যুগ' দেখা দেয়—পাল-সেন-বর্মন আমলে—(১০০০—১২০০খৃ.অ.) 'গৌড়-বঙ্গে'ও। তখন গৌড়ে, রাঢ়ে বা 'বঙ্গে' কোন সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা কিংবা মানবাধিকার, মূল্যবোধ, সম্প্রীতি ইত্যাদি কিছুই ছিল না। রাজদরবারে তো বটেই, সেই সঙ্গে সারা দেশে নারীর অসহায়তা, নির্যাতন, হয়রানি এবং পুরুষের যথেচ্ছাচার প্রকট রূপ ধারণ করে। সে-আমলে, রাজ-প্রাসাদ পাপাগার, রাজা ও রাজপুরুষেরা কামাচারী এবং প্রজাকুলের প্রতি অত্যাচারী হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন জনগণের না-ছিল শিক্ষার অধিকার, ন্যায়-বিচারের প্রত্যাশা কিংবা ভূমি-মালিকানা। গৌড়ে তখন রাজধর্ম ছাড়া অন্যধর্ম পালন ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। শিক্ষা-সংস্কৃতি ছিল—ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এজন্য ঐ সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক ও নৈতিক বিষয়সমূহ সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপে নির্দেশ করা যায়। যথা,—

১. নারীর প্রতি অসম্মান ও তাদের বিলাস-পণ্য রূপে গণ্য করা।
২. অতিশয় যৌন-চেতনার প্রসার এবং রাজা থেকে গ্রাম-প্রধান অবধি তার বিস্তৃতি।

www.pathagar.com

৩. ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে ও শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সংঘাত এবং কেবল ব্রাহ্মণদের-ই প্রাধান্য।
৪. গৌড়ীয় প্রজাসাধারণের ন্যায়-বিচার পাওয়ার অনিশ্চয়তা ও অনিরাপত্তা।
৫. কামকলা পূর্ণ রুচিহীন সাহিত্য-কাব্য, সংগীত, ভাস্কর্য, মন্দির-অলংকরণ ও তথায় দেবদাসী-ব্যবস্থা।
৬. জ্যোতিষ-চর্চার ব্যাপক প্রসার ও জনগণের অসহায়তা—ভাগ্যবাদিতা, বীর্যহীনতা।
৭. রাজ্য, ও রাজপুরুষদের সর্বোতমুখী অত্যাচার, অবিচার, স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতি এবং প্রজাপীড়ন।

এই সাতটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়েই সেন-আমলে 'গৌড়ে আইয়ামে জাহেলিয়াৎ' দেখা দেয় এবং তা অব্যাহতভাবে প্রায় দু'শ বছর চ'লতে থাকে।

তাই সবার আগে এ-আমলের **সেই জাহেলিয়াতের, বিশেষ ক'রে সেন-দরবার কেন্দ্রিক নীতি-নৈতিকতার সামাজিক** পরিচয় দেওয়া হবে। তারপর আলোচনা করা হবে অন্যান্য বিষয়।

যাহোক, ইতিহাস বলে যে, একাদশ শতকে গৌড়ের পাল-হুকুমৎ বা রাজত্ব মিছমার করেন কম্বোজ, চোল ও কলচুরিগণ। তারপর কর্ণাট থেকে আসা সেনেরা। তাঁরা উড়ে এসে জুড়ে বসেন। সেনেরা আর্য বামুন ছিলেন না। ছিলেন—ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়। সাদা কথায় ক্ষত্রিয়। রাজা ছিলেন ব'লে, শরাফতির দাবী ছিল। তাই তাঁরা বামুন ব'লে, ইজ্জৎ আদায় ক'রে নিতেন। গৌড়ে জবরদখল ক'রে চেপে বসা, এই সেনদের তরফে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—"রাঢ় দেশের শূরেরা এবং পূর্ব বঙ্গের বর্মনেরা বিদেশাগত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাঁহারা বাঙ্গালীর গলায় লৌহ শৃঙ্খল পরাইতে আরম্ভ করে। পরে কর্ণাটাগত সেনেরা তাহা সম্পূর্ণ করে।" বলা দরকার যে, তখন দেশের নাম 'বাঙালা" ছিল না; ছিল গৌড়। আর 'লোয়ার বেঙ্গল' বা 'নিম্ন বঙ্গে'র নামও "পূর্ববঙ্গ" ছিল না—ছিল–'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গালা'। তখন জাতি-চেতনাও ছিল গরহাজির। তাই সে-সময় 'গৌড় দেশ' ও 'গৌড়জন' কথাগুলো চালু ছিল ব'লেই; শূর-সেন বর্মন-রাজারা 'বাঙালীর গলা'য় নয়, গৌড়ীয় ও 'বাঙ্গাল'দের গলায় লৌহ শেকল পরায়। সে শেকল কি রকম কষ্টদায়ক ছিল, তা ড. দত্ত, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অকপটে লিখেছেন। ড. দত্ত ব'লেছেন—"ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালীর শৌর্য-বীর্যের ও গুণ-গরিমার চিহ্ন একেবারে মুছিয়া দিয়াছে।"

www.pathagar.com

এর ফলে, তখন যে-সামাজিক বিপর্যয় ঘটে—তা পাল আমলের সাম্য, শান্তি ও সমৃদ্ধিকে একেবারে মিছমার ক'রে দেয়। সমাজের গোটা চেহারাই যায় ধ্ব'সে। এবিষয়ে ড. দত্তের আক্ষেপ—"বাঙ্গলার সামাজিক পট; সেন যুগ হইতে পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে, সেই নির্মমতার কোন স্মৃতি-ই বাঙ্গলা সাহিত্যে নাই।" সেনদের অত্যাচার-ই যে, মুছলমানদের 'গৌড় বিজয়' সহজ ক'রে দেয়, ড. দত্ত সে-বিষয়ে লিখেছেন—"এক দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদিগের অত্যাচার, অন্যদিকে বৌদ্ধদের বিক্ষোভ এই দুই অবস্থা সম্মিলিত হইয়া মুছলমান তুরকীদের দ্বারা বাঙ্গলা বিজয় সহজ করিয়া দেয়।"

বিদেশী দখলদারদের ঐ জুলুমের যে "সীমা-পরিসীমা ছিল না;" সে কথাও ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন। এর ফলে, পাল-যুগের সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জনপদ একেবারে নাস্তানাবুদ হয় এবং জনগণের জাত-ইজ্জৎ একেবারে নষ্ট হয়। দেশের কথা থাক, তখন খোদ্ সেন রাজ-দরবারে নীতি-নৈতিকতা, নারীর ইজ্জৎ, রাজার আচার কেমন ছিল, তা থেকেও আসল অবস্থা আঁচ করা চলে। 'আইয়ামে জাহেলিয়াৎ'-অর্থ যদি 'অত্যাচারের যুগ', 'বর্বরতার যুগ', 'অন্ধকারময় যুগ' বা 'মূর্খতার যুগ' ব'লে গণ্য করা হয়; তবে তা গৌড়ে সেন-আমলে কি রূপ ধারণ করে; সে-কথা ইতিহাসে ভাল ভাবেই লেখা আছে। দীনেশচন্দ্র; সেন-দরবারের রুচি-নীতি, যৌনতা, বিলাসিতা, ন্যায়পরায়ণতা ওগয়রহের (ইত্যাদির) পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—"লক্ষ্মণ সেনের সময়ে দেব-মন্দির গাত্রে যে-সকল যৌন বিষয়ক মূর্তি অঙ্কিত হইতে শুরু হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, কাম-শাস্ত্রের সমস্ত বন্ধনগুলির (আসনগুলির) দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহা পরিকল্পিত হইয়াছিল। যে-সকল তীর্থে বাল-বিধবা, শিশু, যুবক, পিতামাতার সহিত পুত্র, পুরোহিতের সহিত তরুণী শিষ্যা, শাশুড়ীর সহিত পুত্রবধূ, দেবর ও ভাসুরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি গৃহস্থ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ সর্বদা যাতায়াত করিতেন, সেই সব তীর্থের দ্বারে এই সকল মূর্তি যে-সকল শিল্পী উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ দিয়াছিলেন কে? অধ্যাত্মবাদী লোকেরা ঐ প্রশ্নের নানা ভাবে উত্তর দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন এই সকল স্ত্রী-পুরুষের মূর্তির নগ্নভঙ্গি দেখিতে পাই, তখন তীর্থ-গামিনী তরুণীর লজ্জারুণ চক্ষু ও বৃদ্ধ গুরুজনের মুখ বিকৃতি, তরুণ যুবকের দ্রুত পলায়ন-চেষ্টা; এসকলও তো সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই। চাক্ষুষ প্রমাণের কাছে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কোথায় ভাসিয়া যায়। বিবেক সেই পবিত্র স্থলে এই সকল বীভৎসতার কোন রূপ-ই অনুমোদন করে না। (একাদশ), দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গের (গৌড়ের) বহু মন্দির-গাত্রে এই রূপ বীভৎস-চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহা স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জেলার মেহের কালীবাড়ীর নিকট হইতে

www.pathagar.com

এক বৃহৎ কাষ্ঠফলকে আমরা নগ্ন নরনারীর এই রূপ চিত্র পাইয়াছি। উহা তথাকার দাস-রাজাদের রথে সংলগ্ন ছিল। দাস-রাজা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কলিকাতার অতি নিকটে আন্দুলমৌড়ীর প্রসিদ্ধ কুণ্ড বাবুদের বহু প্রাচীন, অধুনা অব্যবহার্য একখানি রথে এই রূপ চিত্র ছিল। খেজুরাহ মন্দিরেও ঐরূপ মূর্তি দেখিয়াছি, তাহার ফটোগ্রাফ আমার নিকট আছে। মেহেরের এই শ্লীলতা-বিগর্হিত নরনারীর বীভৎস-মূর্তিযুক্ত কাষ্ঠফলকখানি আমার নিকট আছে। পুরী ও খেজুরাহ মন্দিরের মূর্তিগুলি এই এক-ই পর্যায়ের। এই যৌনলীলার চিত্র ত্রয়োদশ-চর্তুদশ শতাব্দীর পরে অঙ্কিত হয় নাই।" ড. সেন আরও লিখেছেন—"দ্বাদশ শতাব্দীতে যৌন সম্বন্ধ যতটা শ্লথ হইবার হইল। দেশের সাহিত্যে, দেশের শিল্পে, দেশের সমাজে, সর্বত্র যৌন সম্বন্ধের বাধাবিঘ্ন একেবারে দূরীভূত হইল। কামদেবের অপ্রতিহত রাজত্ব আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ সেনের সভায় মন্ত্রীরা প্রকাশ্যভাবে নর্তকীদের সঙ্গে ব্যভিচারের মূল্য লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন (শেক শুভোদয়া, ষোড়শ পরিচ্ছেদ)। "অস্মিন রাজ্যে মন্ত্রী পারদারিক [এ রাজ্যের মন্ত্রী পরপত্নী-প্রণয়ী] ইত্যাদি কথা এই উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে।

গৃহস্থ পরিবার রাজদরবারে নর্তকী জোগাইত। বিদ্যুৎ-প্রভা ছিল গঙ্গানটের পুত্রবধূ। সে ব্যাভিচার-প্রাপ্ত অর্থ আনিয়া শ্বশুরের হাতে দিত। উপার্জন অল্প হইলে, তাহা লইয়া গোলযোগ ঘটিত। কলিঙ্গাঙ্গনাদের সঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের কুমার-লীলা তাম্র-শাসনে সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল প্রসঙ্গ লইয়া "ধোয়ী কবি" 'পবনদূত' লিখিয়া রাজকীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের শ্যালক কর্তৃক কুমার দত্তের গৃহস্থ বধূকে ধর্ষণের অনেক কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শেক শুভোদয়াতে ঘটনাটি এই ভাবে বিবৃত হইয়াছে—'একদা মাধবী নাম্নী এক বণিকবধূ গঙ্গাস্নান করিয়া তাহার কটি-লম্বিত বিপুল কুন্তলগুচ্ছ রৌদ্রে শুকাইতেছিল, এই সময়ে রাজ্ঞী বল্লভার ভ্রাতা লক্ষ্মণ সেনের শ্যালক কুমার দত্ত রাজার প্রধান ঘোড়াটায় চাপিয়া গঙ্গাতে জলপানার্থ আসিল এবং সেই রূপবতী বণিক-বধূকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কুমার দত্ত মাধবীকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া বলিল, "তোমার গায়ে যে সকল অলঙ্কার আছে, তাহা হইতে অনেক বেশী অলঙ্কার আমি দিব, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের একটা সময় নির্দ্ধারণ কর, তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে কি না দিতে পারি।" মাধবী এই সকল কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিল না, মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন কুমার দত্ত বলিল, "উত্তর দিতেছ না কেন? আমি যদি তোমাকে এখন ধরিয়া লইয়া যাই, তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারিবে?" মাধবী বলিল, "তুমি কামান্ধ হইয়া মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি কে এবং আমি কে—তাহা ভাবিয়া দেখ। তুমি

www.pathagar.com

রাজপুত্র, তুমি এই রূপ ঘৃণিত কাজ করিলে, লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে। আর যে-সকল ভয় দেখাইতেছ, তাহার-ই বা মূল্য কি? মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যে পরস্ত্রী ধর্ষণ করে, এমন শক্তি কাহার? ("কস্য শক্তির্বিদ্যতে বিজয়-রাজ্যে পরস্ত্রীং ধর্ষয়িতুং শক্নোতি?")।" কুমারদত্ত পুনরায় নানারূপ প্রলোভন ও ভয় দেখাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হইল। এই সময় পুরবাসিনীরা অনেকে গঙ্গাস্নানের জন্য তথায় উপস্থিত হইল। কুমার দত্ত চলিয়া গেল এবং মাধবী তাহার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গৃহে গমন করিল।

কুমারদত্ত গৃহে যাইয়া স্থির থাকিতে পারিল না। এক জন নাপিতানীকে মাধবীর নিকট পাঠাইয়া দিল। সেই স্ত্রী লোকটি আসিয়া মাধবীকে অনেক লোভ দেখাইয়া বলিল, "তোমার রূপ-লাবণ্য দেখিয়া কুমার দত্ত মৃতবৎ—আমার গৃহে অপেক্ষা করিয়া আছে, তোমার মুখের অনুকূল কথা পাইলে সে প্রাণ পাইবে।" নাপিতানীকে মাধবী অনেক তর্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কিন্তু নাপিতানী সেদিন মাধবীর "সম্মার্জনীর তাড়া" খেয়ে পলাতে বাধ্য হ'লেও যাতায়াত ত্যাগ ক'রল না এবং একদিন প্রতারণা ক'রে কুমারদত্তকে মাধবীর গৃহে নিয়ে এল। ড. সেন-এর ভাষায়—"কুমারদত্ত নাপিত-বধূর কথায় প্রতারিত হইয়া মাধবীর গৃহে উপস্থিত হইল। মাধবী পলাইবার উপক্রম করিলে সে তাহার শাড়ীর আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল এবং সেখানে তখন একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল। মাধবীর চীৎকারে পাড়াপড়শীরা তথায় উপস্থিত হইল এবং কুমার পালাইয়া গেল। লোকজন পরিবৃত হইয়া মাধবী মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল। মন্ত্রী উমাপতিধর বলিলেন—"আমি যথোচিত চেষ্টা করিব; কিন্তু এই কুমারদত্ত রাজার শ্যালক, রাজ্ঞী বল্লভার ভ্রাতা। আমার দ্বারা এই অভিযোগের বিচার হইবে না। রাজা স্বয়ং বিচার করিবেন, তবে কিছু শাস্তি অবশ্যই হইবে। তুমি দরবারে যাও, আমি তথায় শীঘ্র যাইতেছি।" মাধবী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিল। যখন মাধবী কুমার দত্তের কথা বলিল, তখন সভাসদেরা স্থানুর ন্যায় বসিয়া রহিল, শুধু একে অন্যের মুখের দিকে চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না। গোবর্দ্ধন-আচার্য রাজসভার বিচারক। তিনি সন্ন্যাসী, দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে বসিয়াছিলেন। তিনি মাধবীকে স্নিগ্ধভাবে আহ্বান করিয়া সকল কথা তাহার মুখে শুনিতে লাগিলেন। তখন রাজমহিষী বল্লভা দাসীর সহিত রাজসভার দ্বার আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"এই উমাপতিধর ঘোর পাপিষ্ঠ, এই ব্যক্তির প্রেরণায় অভিযোগটি হইয়াছে। এ-সমস্তই ইহার ষড়যন্ত্রের ফল—হে সভাসদগণ! আপনারা বিচার করুন"। রাজ্ঞী এই কথা বলিলে সমস্ত সভা চুপ হইয়া গেল। রাজা স্বয়ং

www.pathagar.com

মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, রাজ্ঞী মাধবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নির্লজ্জে! পরপুরুষরতা দ্বিচারিনী, তুই কোন্ সাহসে আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছিস? ইহার জন্য তোকে অনুতাপ করিতে হইবে। আমি তোকে এমন শাস্তি দিব, যাহাতে তুই ভবিষ্যতে কাহারও মন্ত্রণায় এরূপ কাজ করিতে সাহসী হইতে পারিবি না।" মাধবী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যাইয়া রাজ্ঞীর পাদমূলে নিপতিত হইল এবং সকাতরে বলিল,—"ধর্মশীলে মা, আমায় ক্ষমা করুন। এই গৌড়রাজ্যের সম্রাট সমর-বিজয়ী মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেন, আপনি তাঁহার পত্নী, আমায় ক্ষমা করুন। এই রাজ্যে চিরকাল সুবিচার হইয়া আসিয়াছে, কেহ এখানে বলপ্রয়োগ করিতে পারে নাই। এখন বুঝিতেছি, বল যাহার, এই পৃথিবী তাহার। আপনার কুলে এবং পিতৃকুলে এরূপ ব্যবহার ছিল না যে, একজনের পত্নীকে অপরে গ্রহণ করে। মা, আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে আমি আপনার ভ্রাতাকেই ভজনা করিব।".....মাধবী এই কথা বলিলে, রাজ্ঞী তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া লাথি মারিলেন। ভয়ে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না। গোবর্দ্ধনাচার্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া লক্ষ্মণ সেনকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আপনি যেরূপ ধার্মিক তাহা বুঝিলাম। মহারাজার এই রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হইবে।" এই বলিয়া একটা খনিত্র লইয়া ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজ্ঞীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"রাজার পত্নী—এই গৌরবে তুমি ধর্মের মাথায় পদাঘাত করিতেছ। তোমার ভাই ইহাকে ধর্ষণ করিতে গিয়াছিল, তুমি ইহাকে প্রহার করিতেছ। এই রাজ্য শীঘ্রই নষ্ট হইবে। আমি শুনিয়াছি ৫২ পুরুষ পালগণ রাজত্ব করিয়াছেন। **পূর্বকালে রাম পাল রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র এক স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করিয়াছিল, এই অভিযোগে রামপাল তাহাকে শূলে দিয়াছিলেন।** এখনও রামপালের এই বিচারের প্রশংসা গ্রাম্যগীতে শোনা যায়। সকলে বলে রাজা রামপাল তাহার পুত্র অপরাধী বা নিরপরাধ হউন, তাঁহাকে শূলে দিয়াছিলেন।"

এই বলিয়া দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া গলদশ্রুনেত্রে গোবর্দ্ধনাচার্য চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। সভাসদগণ একেবারে নিস্তব্ধ রহিল। তখন রাজা স্বয়ং সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া গোবর্দ্ধনাচার্যের পায়ে ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এই সময়ে সেক (শেখ) জালালুদ্দিন এবং অপর কয়েকজন সভাসদ কুমারদত্তের নিন্দা করিতে লাগিলেন। রাজা খড়গ হস্তে কুমারদত্তকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মাধবী অগ্রসর হইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মহারাজ, ক্ষমা করুন, ইনি আমার কর ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার প্রাণ যায় নাই, জাতিও যায় নাই। আমার প্রতি যে-ব্যবহার-ই করিয়া থাকুন, ইহাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমার দুর্দৈব অথবা জন্মান্তরে কৃত দোষেই ইনি এই সব করিয়াছেন। এখন এই

www.pathagar.com

অসঙ্গত ব্যাপারটার শান্তি হউক।" মাধবী এই কথা বলাতে সভাস্থ সকলেই তাহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।'

লক্ষ্মণ সেনের সভা-পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের লিখিত যে—"শেক শুভোদয়া" থেকে দীনেশচন্দ্র সেন সেকালের গৌড় রাজদরবারের ও জনপদের ঐ নৈতিক চিত্র উপহার দিয়েছেন, তাতে আরও অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সে-সব কাহিনীর অপর একটি হ'ল—"একদিন রাজা [লক্ষ্মণ সেন) গঙ্গাস্নান করিয়া স্তোত্রপাঠ করতঃ মন্ত্রীর সহিত চিন্তিত চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন।

[তখন তথায়] কোন এক রজকের স্ত্রী রাজার কাপড় কাচিতে অবস্থান করিতেছিল। সে কাপড় কাচিতে থাকিলে তাহার স্তনের কাপড় সরিয়া যাওয়ায় রাজা পুনঃ পুনঃ তাহার স্তন যুগল দর্শন করিতেছিলেন। সেই রজকের স্ত্রীও রাজাকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ হাসিয়া কাপড় সরাইতেছিল। রাজা [কৃত্রিম] ক্রোধের সহিত বলিলেন—"পিতার সহিত বিষ্ঠা খাও"। রাজা পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন। রাজার শ্যালক চারুদত্তও সেখানে ছিল। সে ভাবল, রাজা তাকেই একথা ব'লেছেন। তখন সে গিয়ে রাণী বল্লভার নিকট রাজার বিরুদ্ধে নালিশ ক'রল। রাণী ছুটে এলেন—রাজার কাছে। এসে ক্রন্দন-কোলাহল শুরু ক'রলেন। তখন রাজা মন্ত্রীকে ব'ললেন—"এই পাপ তিনটিকে নিবারণ কর।" তিন পাপ যথাক্রমে রজকী, চারুদত্ত ও রাজ-মহিষী বল্লভা। মন্ত্রী শেষোক্ত দু'জনকে ঠেকাতে না পেরে, রজকীর নিকটে গিয়ে ব'ললেন—"নাপিতানী, রজকী, বেশ্যা এবং সূতিকা [ধাই?] ইহাদের নাসিকা-কর্ণ ছেদন করা কর্তব্য। যেহেতু স্তন ভিন্ন ইহাদের আলোচনার বিষয় আর কিছু নাই।"

তারপর রজকী তাহা শুনিয়া ক্রোধের সহিত বলিয়াছিল। "শোন, হে মূর্খ মন্ত্রিবর, তুমি আমার সম্মুখে কেন বৃথা বাক্যালাপ করিতেছ। আমার স্তন যুগল দেখিয়া কাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছে?.... দেখ, আমি সর্বদাই বৈদ্যগৃহে যাইতে ইচ্ছুক, যেহেতু আমার এই স্তনযুগল পরস্পর পরস্পরকে উপেক্ষা করিয়া বর্ধিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যভাগ নিম্ন, সুতরাং আমার সুখ কোথায়?

হে মন্ত্রিন্, দেখ আমার এই স্তনযুগলের ভার পুনঃ পুনঃ বর্ধিত হইতেছে। অতএব, তুমি আমাকে একটি ঔষধ দাও। পরের মনে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়।"

এই রূপে সেই চপলা রজকী মন্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করিতে থাকিলে, তাহার স্বামী তাহাকে বলিল—"ওহে ভবিত্রি, মন্ত্রীর সহিত কি বলিতেছিস?" সে তাহাকে বলিল, "মহাত্মা রাজপুত্র, আমার স্তনযুগল দর্শন করিয়াও মন্ত্রীকে পাঠাইয়াছেন।"

www.pathagar.com

এরপর একদিন ঐ রজকী রাজবাড়ীতে কাপড় দিতে এলে সে রাজা ও মন্ত্রীর দৃষ্টিতে পড়ে। তখন মন্ত্রী, রাজাকে বলে, "রাজন্ এই সেই পাপীয়সি, যাহার দুর্বাক্যে আমি বিদ্ধ হইয়াছি।" তখন রাজা তাকে অশ্বালয়ে বন্দী ক'রে রাখার নির্দেশ দিলেন। সে তখন রানীর নিকট গিয়ে রাজা ও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ ক'রল। রানী—রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌দের ডাকলেন। রাজার কৈফিয়ৎ [বর্তমান ও আগের ঘটনার] নেওয়া হ'ল। রাজা অকপটে রানীর কাছে স্বীকার ক'রলেন—"একদিন আমি স্নান করিয়া স্তুতি পাঠ করিতে থাকিলে এই পাপীয়সীর কাপড় কাচিবার সময় স্তনের কাপড় সরিয়া যাওয়ায় আমি তাহা দেখিয়াছিলাম। সে আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল।"

তখন সভাসদ্‌দের নিকট মন্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে রানী জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"হে ব্রাহ্মণগণ, তোমরা রাজমন্ত্রীর চেষ্টার বিষয় আমাকে বল।" তখন হলায়ুধ মিশ্র রজকীকে আনিয়া বলিয়াছিলেন—"পাপীয়সি! রাজা স্তুতি পাঠ করিতে থাকিলে, তুমি স্তনের কাপড় সরাইয়াছিলে কেন?" তখন রজকী বলিল, "আমি যথার্থ বাক্য বলিতে পারি, কিন্তু ভয়ে বলিতেছি না।" তখন মিশ্র বলিয়াছিলেন—"তুমি ভয় করিও না, যথার্থ বল।" সে বলিয়াছিল, "আমি জানি মহাপাত্রগণ রাজার উপাসনা করেন। যাঁহার প্রতি রাজা দৃষ্টিপাত করেন, সে মহোৎসাহ লাভ করে। আমি জানিয়াছিলাম রাজা আমার স্তনযুগল পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতেছেন। সুতরাং আমি ধন্য, এই জন্যই আমি স্তনযুগল দেখাইয়াছি। ইহা যে কমিয়া যাইবে তাহা নহে। রাজা যাহাতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা কেন করিব না, এই রূপ-ই আমি জানি। ইহা জানিয়া ব্রাহ্মণগণ আপনারা যাহা করা কর্তব্য তাহা করুন।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ কেহ একটি বাক্যও বলিলেন না। সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজপত্নী ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমরা যথার্থ বাক্য বলিতেছ না কেন? কলিতে ব্রাহ্মণগণ পাপবুদ্ধি।" তখন ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হে পাপীয়সি রাজপত্নী, তোমার স্বামী পরস্ত্রী কামনা করে। কেন তুমি আমাদিগকে এই রূপ বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করিতেছ?" সমস্ত ব্রাহ্মণ, রাজপত্নী ও রাজাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন।" এছাড়া, 'শেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থে বিবৃত; বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলা নামক নর্তকীদ্বয়ের কাহিনীও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেকালে লক্ষ্মণ সেনের রাজদরবারী, পুরবাসী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী তথা রাজপদোপজীবীগণ—কিরকম ইতর জীবন যাপন ক'রতেন—তা এ-কাহিনীতে অতিশয় স্পষ্ট।

এরকম আরও একটি কাহিনী আছে—যা থেকে রাজার প্রধানমন্ত্রীর চরিত্র

www.pathagar.com

সম্পর্কে জানা যায়।

কাহিনীটি হ'ল; রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যুৎপ্রভা নামক একজন নর্তকীর বিরোধ ছিল। বিদ্যুৎপ্রভার শ্বশুর গঙ্গনাট মন্ত্রীর দুর্নাম প্রচার করেন। মরহুম হজরৎ শেখ জালাল উদ্দীন তবরেজীর সাক্ষাতে একদিন এ-বিষয়ে বিদ্যুৎপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, কেন সে মন্ত্রীর নিন্দা করে। তখন বিদ্যুৎপ্রভা বলিতে লাগিল। কোন এক দিন মন্ত্রী লোক পাঠাইয়া আমাকে ও শশিকলাকে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"হে নর্তকীদ্বয়! তোমরা একবার আমাকে ভজনা কর।" আমি শশিকলার সহিত বলিয়াছিলাম—"আচ্ছা আপনার যাহা ইচ্ছা, আমরা (দুই জনে) তাহাই করিব। তারপর সঙ্কেত করিয়া রাত্রে মন্ত্রীর বাড়ী গিয়াছিলাম। যাইয়া রাত্রিতে মন্ত্রীর সহিত নানারূপ সুরত-সম্ভোগ করিয়াছিলাম। সকাল হইলে মন্ত্রী আমাদের দুইজন নর্তকীকে মাত্র কুড়ি টাকা দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া আমরা মন্ত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিলাম। তুমি একজন প্রধানমন্ত্রী, রাজার সমান। পঞ্চাশ টাকা দাও এবং আমাদের উপযুক্ত অলঙ্কার দাও।" এই রূপ বার বার বলা সত্ত্বেও কিছু পাই নাই। বাড়ীতে আসিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলিয়াছিলাম, আমরা তাহার টাকা লই নাই।—এই জন্য ঝগড়া, অন্য কোন কারণে নহে।"

এ-অভিযোগ শোনার পর, মন্ত্রী প্রমাদ গুণলেন। তিনি নর্তকীকে ধমক দিয়ে সভাসদ্‌দের ব'ললেন—"আমি পাপীয়সি নর্তকীকে যথোচিত শাস্তি দিব"। তাই শুনে বিদ্যুৎপ্রভা পুনরায় মন্ত্রীকে সেই জনসমক্ষে ব'লল—"হে মন্ত্রিন্‌, আমি তোমার সহিত রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে এক পয়সাও দেও নাই; এক্ষণে আবার শাস্তি দিতে চাহিতেছ।" মন্ত্রী বলিলেন, "এক্ষণে তোমার সাক্ষী কে আছে বল?" তখন সে বলিল, "যে পরের স্ত্রীর কাছে যায়, সে কি সাক্ষী করিয়া যায়? তোমার একথা বলিতে লজ্জা করিল না? ....সভাসদগণ বলুন, আমাদের দোষ অথবা মন্ত্রীর দোষ।" রাজা শুনিয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শেখ ভিন্ন সকলেই অধোমুখে অবস্থান করিয়াছিল। সেখ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, 'এই রাজ্যের এই ব্যবহার। এই রাজ্যে মন্ত্রী পরস্ত্রীগামী, রাজাই বা কেন হইবে না।'

বলা দরকার যে, 'শেখ শুভোদয়া' থেকে আরও জানা যায়—গৌড় নগরে ও হিন্দু-বৌদ্ধ জনসমাজে তখন ব্যাভিচার এতই ব্যাপক রূপ লাভ করে যে, শ্বশুর-শাশুড়ী,—পুত্রবধূর ব্যভিচারের কথা জেনেও তাদের শাসন করা দূরে থাক; বরং কম-উপার্জনের জন্য বকুনি দিয়েছে।

www.pathagar.com

হলায়ুধ মিশ্র-লিখিত এসব বিবরণের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ নেই। পূর্বোক্ত বিবরণের মধ্যে মুছলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত-পূর্বকালে গৌড়ের রাজদরবার তথা লক্ষণসেনের রাজ-সভার নৈতিক অধঃপতন ও রাজা-মন্ত্রী-সভাসদ-রাজকর্মচারী, নট-নটী-সামন্ত শ্রেণী কিভাবে একে অপরের "জাতিনাশ" ক'রত; তা হলায়ুধ নিজেই লিখে গেছেন। হলায়ুধ-এর বিবরণ থেকে আরও জানা যায়—রাঢ়ী-বারেন্দ্রীর কৌলিণ্যের দ্বন্দ্ব সেকালে ব্রাহ্মণদের থেকে শুরু ক'রে তাঁতী-পোদ-কৈবর্তদের মধ্যেও প্রসারিত হয়। সেন রাজারা ও তাদের সহযোগী-সমর্থক শ্রেণীও কি রকম কূটচালে ফেলে রাজপুত, তাঁতী ইত্যাদির জাতি নাশ ক'রত, তার জীবন্ত বিবরণ 'শেখ শুভোদয়া'য় থাকা সত্ত্বেও একালের কোন হিন্দু ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক সে-সব কথা একবারও উল্লেখ করেন না। **যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায়, জাতি-নাশে সে-কালের হিন্দুরা এমন উচ্চতায় উপনীত হন যে, মুছলিম শাসকবর্গ তার ধারে কাছেও কখনও পৌঁছতে পারেননি।** নজীর দিতে এখানে 'শেখ শুভোদয়া'য় বর্ণিত রাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক একদল তাঁতী ও এক দল রাজপুতের বিরোধ লাগিয়ে তাদের জাত-মারার ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

তাহ'ল—একদিন একদল তাঁতী ও একদল রাজপুত এসে রাজদ্বারে সমবেত হ'য়ে রাজাকে ভূমিতে পতিত হ'য়ে ব'লেছিল—"আমাদিগের মধ্যে অগ্রে কাহাকে সুপারি প্রদান করা হইবে?" অর্থাৎ দু'দলের মধ্যে কোন্ দল কুলীন? কোন্ দল রাজার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ? যিনি রাজার বিবেচনায় এই দু'দলের নেতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ , তারা তাঁকেই "তাম্বুল" দেবার জন্য রাজাকে অনুরোধ জানাল। মন্ত্রী তখন তাদের পরদিন আসতে ব'ললেন । পরদিন তারা এলে, মন্ত্রী সবাইকে পান-সুপারি-সন্দেশ নিয়ে গঙ্গাতীরে যেতে ব'ললেন। মন্ত্রীও সাথে গেলেন।

পথে এক রাজপুত্র বা রাজপুত, মন্ত্রীকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। তখন রাঢ়দেশীয় তন্তুবায়গণ—তাদের নিজেদের একজনকে রাজপুত প্রণাম ক'রেছে ব'লে মনে ক'রল। এরপর, মন্ত্রী তাদের সঙ্গে এক চক্রান্ত ক'রে চারজন তাঁতীকে পাঠালেন, সেই রাজপুতকে ধ'রে আনার জন্য। রাজপুত একজন সৈনিকের সাহায্যে তাঁতীদের বেঁধে রাখল। খবর পেয়ে মন্ত্রী সেই সৈনিক ও আটক চারজন তাঁতীকে সভায় আনয়ন ক'রলেন। ব'ললেন, 'তুমি পথ দিয়া যাইতে যাইতে অগ্রে কোন্ বসাককে প্রণাম করিয়াছিলে তাহা বল? কিন্তু রাজপুত তার জবাব না দিয়ে রাজাকে ব'লল—"হে রাজন... রাঢ়-বরেন্দ্রর মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ তাহা বলুন।... আমি গঙ্গাতে স্নান করিতে যাইতেছিলাম। যাইতে যাইতে মন্ত্রীকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গিয়াছিলাম।" তখন মন্ত্রী ব'ললেন—

'দু'জন বসাকের মধ্যে সে কাকে প্রণাম ক'রে গিয়েছে?' একথা বলায় রাজপুত, রাজাকে সম্বোধন ক'রে হায় হায় ক'রে উঠল। "আপনার সম্মুখে মন্ত্রী আমার জাতি নাশ করিল। এই কথা বলিয়া [রাজপুত] পুনরায় ভূমিতে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। রাজা তারপর দু'দলের দু'জন নেতা-তাঁতীকে বেঁধে রাখার আদেশ দিলেন। অন্য তাঁতীরা চ'লে গেল।

পরদিন সকালে একজন তাঁতী "পুরাতন পাঁচটি কপর্দ্দক" ও "কণ্ঠে চম্পক মালা" ধারণ ক'রে রাজবাড়ীতে এসে রাজার নিকট হাজির হ'ল।

পথে (সম্ভবতঃ মন্ত্রীর কূটবুদ্ধিতে প্রণোদিত হ'য়ে] বিদ্যুৎপ্রভা এক গাছতলায় ব'সেছিল। সে তাঁতীকে দেখে, তার নিকট থেকে চাঁপা ফুলের মালাটি নেবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় শুরু ক'রল। কিন্তু তাঁতী কিছুতেই তা না-দিলে—"বিদ্যুৎপ্রভা তাহাকে উভয় হস্তদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়াছিল এবং বলপূর্বক পুষ্পহার কাড়িয়া লইয়াছিল। তারপর সে রাজার নিকট যাইতে লাগিল। এও অর্থাৎ বিদ্যুৎপ্রভাও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

তারা দু'জনেই রাজার কাছে হাজির হ'লে, বিদ্যুৎপ্রভা ঐ তাঁতীর কোল জড়িয়ে ধ'রেছিল। তা দেখে রাজা জিজ্ঞেস করলেন—"হে পাপীয়সি। তুমি কি জন্য আমার দেশবাসী তন্তুবায়ের কোমর ধরিয়াছ? শীঘ্র ইহাকে ছাড়িয়া দাও। তখন বিদ্যুৎপ্রভার জবাব—"শ্রীমানের দেশবাসী এই তন্তুবায় আমাকে পুরাতন পাঁচটি কর্পদ্দক দিতে স্বীকার করিয়া আমার সহিত রমণ করিয়াছে। কিন্তু আমি এক্ষণে তাহা চাহিলে সে দিতে অস্বীকার করিতেছে।" ...তখন মন্ত্রী (যিনি এই নাটের গুরু) তন্তুবায়কে জিজ্ঞেস ক'রলেন—'হে তন্তুবায়।.....তুমি কি নর্ত্তকীর—সঙ্গে রমণ করিয়াছ? সে বলিল—"হে মন্ত্রিন্! এ আমার সম্বন্ধে সমস্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছে।"

তখন বিদ্যুৎপ্রভা রাজাকে ব'লল—"আমার সহিত রমণ করায় আমার গায়ের গন্ধ তন্তুবায়ের গায়ে লাগিয়া গিয়াছে, আপনি পরীক্ষা করুন।" রাজা ভৃত্যদের আদশে দিলেন—"তাঁতীর শরীর পরীক্ষা ক'রতে। "ভৃত্যগণ তন্তুবায়ের দেহ পরীক্ষা করিলে গন্ধ পাইয়াছিল।" নর্তকী তখন তার নিকট থেকে "কপর্দ্দকগুলি বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছিল" ।.....

পরদিন রাজা আবার তাঁতীদের ডাকিয়ে আনেন। তারা এলে বলেন—"তোমরা সকলে পাক কর। অন্নাদি পাক করিয়া তোমরা পৃথক পৃথক ভোজন কর।" রাজার আদেশে তাদের তণ্ডুলাদির সাথে সব জিনিস দেওয়া হ'ল।

www.pathagar.com

আরও দেওয়া হ'ল দশটা খাসি। দু'দলকে তা সমান ভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'ল।

ছাগলের মালিক ব'লল—'তার ছাগলের হিসেব কে রাখবে'। তাঁতীরা ব'লল—'তারা রাজাকে ছাগলের লেজ পাঠিয়ে দেবে'। সে-সময় রাজসভায় গঙ্গানট হাজির ছিল।" রাজা তাকে ছাগহত্যা ক'রে, সেগুলোর লেজ একটা ভাঁড়ে ক'রে নিয়ে আসতে ব'ললেন।

তখন [রাজা বা মন্ত্রীর প্ররোচনায়] গঙ্গানট কৌশল করিয়া একটি কুকুরের লেজ ভাণ্ডের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ভোজনের পর তাঁতীরা সবাই রাজপ্রাসাদে রাজার কাছে এসে হাজির হ'ল। রাজাকে অনেক ধন্যবাদ জানাল। রাজাও তাদের অভিনন্দন জানালেন। তারপর ব'ললেন—"হে তন্তুবায়গণ, তোমরা কতগুলি খাসি ভক্ষণ করিয়াছ?" তাঁতীরা ব'লল—"আপনি ছাগ পুচ্ছ বাহির করিয়া বিচার করুন।" তখন গঙ্গানট ছাগলের লেজগুলো বের ক'রে গণনা ক'রল। দশটা লেজ পাওয়া গেল।

কিন্তু "সেই পুচ্ছগুলির মধ্যে একটি পুচ্ছ বক্র হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ সোজা করিলেও তাহা বক্র হইয়া যাইতে লাগিল। তখন সকলে বলিতে লাগিল ইহা কুকুরের লেজ।... আপনারা দেখুন, পাকা ইট বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেও ইহা বাঁকিয়া যাইতেছে, কিছুতেই সোজা হইতেছে না? তখন, সকলে উচ্চ হাস্য করিয়াছিল।" ঐ হাসি ছিল—তাঁতীদের জাত মারার সফলতার এবং তাদের বোকা বানাবার হাসি। তাঁতীরা অবশ্য অধোবদনে ছিল; তারা এ-হাসিতে যোগ দিতে পারেনি।

পরদিন প্রভাতে রাজা সব তাঁতীকে আনিয়ে—"ঘৃত ও পনস একত্র করিয়া সকলকে ভোজন করাইয়াছিলেন।" ভোজনান্তে তারা যার যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল। ফিরে গিয়ে তারা রাতে সভা ডেকেছিল। রাজবাড়ীতে যে-অপমান ও লজ্জা তারা ভোগ ক'রেছিল, সে-সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছিল। তারপর তারা একমত হ'য়েছিল—"আমরা ঘৃত-পনস ইচ্ছা করিয়া খাইয়াছি, ইহা কেহই মনে করিও না।" সেই গোপন নৈশ বৈঠকে রাজা বা মন্ত্রীর একজন চরও উপস্থিত ছিল। সে হ'ল—গঙ্গানটের পুত্র ও বিদ্যুৎপ্রভার স্বামী জয়নট। জয়নট তাঁতীদের কথার প্রতিবাদ ক'রলে, তাঁরা-তাকে এমন উত্তম-মাধ্যম দিল যে, বেচারা প্রায় মরমর। কিছুক্ষণ মারার পর, "সে মরার মত পড়িয়া রহিল।" তখন সমস্ত তাঁতী ব'লল—"যদি এই পাপ নট মরিয়া যায়, তাহা হইলে রাজা জানিয়া ইহার সম পরিমাণ ধন লইবে।"

www.pathagar.com

এদিকে বিদ্যুৎপ্রভা এই খবর শুনে ছুটে এল এবং জয়নটকে জড়িয়ে ধ'রে বিলাপ ক'রতে লাগল। ... তারপর সে গঙ্গানটের ভৃত্য ও স্বীয় শাশুড়ীকে সাথে নিয়ে রাজদরবারে উপনীত হ'ল। সে রাজার নিকট অভিযোগ ক'রল। রাজা দু'পক্ষ শুনে তাঁতীদের ব'ললেন—"সম পরিমাণ ধন দান কর। তোমরা সকল ধন লইয়া আইস।" তখন বিদ্যুৎপ্রভা ব'লল, সে তার স্বামীকে চায়, তাকে সে কোথায় পাবে? রাজা তাকে সমপরিমাণ ধন নিয়ে ঘরে যেতে ব'ললেন। কিন্তু তাঁতীদের তখন আরও লাঞ্ছনা বাকি ছিল।

বিদ্যুৎপ্রভা তাতে রাজী না হ'য়ে ব'লল—"হে রাজন্! আমি স্বামী ভিন্ন এক মুহূর্ত বাঁচিতে পারিব না। তাহা ছাড়া, স্বামী ভিন্ন রাত্রিতে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার স্বামী মরিলে, কে আমার স্বামী হইবে?"... বার বার সে একথা বলাতে একজন তাঁতী তাঁর নিকট এসে ব'লল—"হে পাপীয়াসি নর্তকী! তুমি আমাদের মধ্যে কাহাকে চাও? যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে লও।" মন্ত্রীও তাই ব'ললেন।

তখন বিদ্যুৎপ্রভা—"কোন একটি যুবক তন্তুবায়ের কোমর ধরিয়া লইয়া আসিয়াছিল। সে তাহাকে আনিয়া নিভৃতে বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বলিয়াছিল, "হে তন্তুবায়! তুমি আমাকে ইচ্ছামত রমণ কর।" সে লজ্জায় মরিয়া ছিল। তখন সে তাহাকে ছাড়িয়া অপর এক যুবক তন্তুবায়কে ধরিয়াছিল। তাহাকেও সে (বিদ্যুৎপ্রভা) সেই রূপ বলিয়াছিল। তাহা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। বিদ্যুৎপ্রভা বলিল, "হে সভাসদগণ। আপনারা শুনুন, এই তন্তুবায় রমণ করিতে জানে না। তাহা হইলে কিরূপে পুত্রোৎপত্তি হইবে?" ... রাজা তখন তার "গালে এক চড়" মেরে বিদায় দিতে ব'ললেন। কিন্তু কেউ তা ক'রতে সাহস পেল না। তখন বিদ্যুৎপ্রভা রাজার নিকটে এসে ব'লল—"হে রাজন্! আপনার আজ্ঞায় কেহই আমাকে মারিতেছে না। এক্ষণে শ্রীমানের নিকট আসিয়াছি। আপনি আমাকে সুন্দর ভাবে সাজাইয়া ইচ্ছা মত মারুন।"

এটা শুধু 'শেখ শুভোদয়া' থেকে নয়; অন্যান্য সূত্র থেকেও জানা যায়। তাই দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতেই রাজপ্রাসাদ একদিকে পণ্ডিতগণের কোলাহলে, অপরদিকে নর্তকীদের ও গণিকাদের নূপুরধ্বনি ও গীতবাদ্যে মুখরিত হইয়াছিল। কেশব সেন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু "কুরঙ্গী সদৃশ লজ্জানতা সুন্দরীগণের নীবিবন্ধ বিসরণে ব্যস্ত থাকিতেন" (বাঙ্গালীর বল, ১৮০ পৃ.)। বিদ্যাপতির 'পুরুষ-পরীক্ষা'য় দেখা যায়,—লক্ষ্মণসেনের বহু পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও তিনি আদর করিয়া 'উত্তমা', কাহাকেও 'স্বাধীন

www.pathagar.com

ভর্ত্তৃকা' বা 'অভিসারিকা', কাহাকেও 'উৎকণ্ঠিতা' বা 'বিপ্রলব্ধা' অথবা 'কলহান্ত রিতা' কিংবা 'বাসকসজ্জা' নাম দিয়া, সেই নামোচিত, বেশভূষা পরাইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেন। এই সব কাহিনী একদিকে রাজগৃহে সংস্কৃতের প্রভাব কত বেশী হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করে, অপর দিকে রাজার বিলাস-বৃত্তির পরিচয় দেয়।

বল্লভা ও বসুদেবী নাম্নী লক্ষ্মণসেনের যে দুই প্রধানা মহিষী ছিলেন, তাহার উল্লেখ আমরা স্টেপলটন-সম্পাদিত 'গৌড়-পাণ্ডুয়া' নামক পুস্তকে পাইতেছি।...সুতরাং এই বিষয়ে 'শেখ শুভোদয়া'র কথা যে বিশ্বাস্য তৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধার কারণ নাই।"

তাই দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত—"লক্ষ্মণ সেনের সভার যে চিত্র আমরা শেখ শুভোদয়াতে দেখিতে পাই, তাহা জ্ঞান-গরিমা, পাণ্ডিত্য ও শিল্প-কলায় শোভান্বিত হইলেও বঙ্গের (গৌড়ের) জাতীয় চরিত্রে যে ঘুণ ধরিয়াছিল, এবং নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতি হেতু যে উহা অধঃপাতের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময়ের প্রায় সাত শত বৎসর পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে আবার একবার এই দেশে নৈতিক অধোগতি হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় বারের রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল।" মুছলমান রাজশক্তির নিন্দা-মন্দ ও প্রশংসা উভয়-ই করা সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্র সেন ব'লতে বাধ্য হ'য়েছেন—"মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক নবদ্বীপ আক্রমণের পূর্বে বঙ্গদেশ যে নৈতিক অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহার চিত্র নানাদিক দিয়া আমাদের চ'ক্ষে পড়িতেছে।"

কেবল নৈতিক অধোগতি নয়, সামাজিক অধোগতিও তখনকার গৌড় দেশে কি রকম ভয়ানক চেহারা নিয়েছিল, সেদিকেও দীনেশচন্দ্র সেন নজর না দিয়ে পারেননি। তাই সে-বিষয়েও আলোকপাত ক'রতে তিনি লিখেছেন—"হিন্দুর জাতিভেদ যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা নির্ম্মম ও অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। হিন্দু রাজাদের জন্য নিম্ন-শ্রেণীর শত-সহস্রলোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে। তাহাতেই তাঁহাদের সিংহাসন রক্ষা পাইয়াছে। পল্লীগ্রামে তাহারাই ভদ্রলোকের ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে; ব্রাহ্মণগণ তাহাদের-ই প্রসাদে ব্রাহ্মণীদিগকে লইয়া সুখে-শান্তিতে পারিবারিক জীবন কাটাইবার সুবিধা পাইয়াছেন, অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের জন্য প্রাণ দিয়াছে। ব্রাহ্মণদের মন্দির তাহারাই রক্ষা করিয়াছে; এই প্রাণপণ সেবা-পরিচর্যা ও ভদ্র গৃহস্থের সম্মান রক্ষার পুরস্কার স্বরূপ তাহারা কি পাইয়াছে? সেই দেবমন্দিরে তাহাদের উঁকি মারিবার ক্ষমতা নাই; সেই ব্রাহ্মণের পা ছুঁইয়া ধূলি গ্রহণের অধিকার তাহাদের নাই;—এই সকল অন্যায় ভ্রাতৃবিরোধ ও

www.pathagar.com

ঘৃণার রাজ্যে মুছলমান নির্ঘৃণ ও সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব লইয়া আসিলেন। পতিত বৌদ্ধগণকে তো হিন্দুরা কোণ ঠাসিয়া এমন এক জায়গায় লইয়া আসিয়াছিলেন, যেখানে তাহারা পশুর অধম হইয়া জীবন যাপন করিতেছিল—যে-স্থানে তাহারা থাকিত, সে-স্থান হিন্দু গৃহস্থের অস্পৃশ্য, তাহাদের ছায়া মাড়াইলে স্নানের ব্যবস্থা।"

গৌড়ে এগারো ও বারো শতকের সেন-বর্মন ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন-আমলে, এমনিভাবে আইয়ামে জাহেলিয়াতের বা সমূহ মূর্খতার যে কালিমালিপ্ত চিত্র পাওয়া যায়, তাতে গৌড়ে তখন নারীর ইজ্জৎ-আব্রু ব'লে কিছু ছিল না; রাজ-পরিবারে পবিত্রতা ব'লে কিছু ছিল না; ছিল না—কোন ন্যায়-অন্যায় বিচার। রাজ-ভোগ্যা পৃথিবী তখন রাজার শ্যালকেরও অবাধ ভোগ্য হ'য়ে উঠেছিল। নারীর নীবীবন্ধন মোচনে সতত ক্লান্ত ছিলেন—রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজ সভাসদগণও। অপরাপর শ্রেণীর রাজ-কর্মচারীদেরও তখন ঐ এক চেতনাই ছিল উগ্র। তা রূপায়িত হ'ত সেন-দরবারের কবিদের কাব্যে, নাচনেওয়ালীদের নাচে, গায়কদের গানে, ভাস্করদের মূর্তিলেখায়, মন্দিরের রেখাচিত্রে, দেবদাসীদের দেবার্চনারূপ পুরোহিত-ভজনায় এবং তীর্থে তীর্থে সমাগত পুর-নারীদের চলনে-বলনে, সাধনে-ভজনে। এই কারণেই কবি জয়দেবের জন্ম সেন-দরবারেই ঘ'টেছিল। "দেহি পদপল্লব মুদার্‌রম,"—পুরুষের লেখার বা বলার আযোগ্য এই বাক্য; দেশের ও জাতির পৌরুষ কতখানি নিচেয় নেমে গেলে, লেখা সম্ভব; জয়দেবের তা জানা ছিল ব'লেই তিনিও উপমা সৃষ্টির আড়াল টেনে দেবতা কৃষ্ণই ও-লাইন লিখেছেন ব'লে প্রচার করেন। আসলে, সারা দেশটাই যে, তখন লক্ষ লক্ষ জীবিত-মানুষ-কৃষ্ণে ভ'রে গেছিল—তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ-সময় গৌড়ে সেন যুগের নয়া প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদ-প্রতিষ্ঠার প্রধান খুঁটি বল্লাল সেনের সময়কার কুলীন শ্রেণী একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায় এবং তার ফলে, গোড়া বামুনরা নতুন ক'রে কৌলীন্য প্রথার প্রচলনের খোয়াব দেখতে থাকেন। তাতে কৌলিন্য খোয়াবার ভয়ে রাজন্য শ্রেণীর মধ্যেই সংঘাত দেখা দেয়। দেশের নির্যাতিত-নিপীড়িতদের ক্ষোভ তো ছিলই; তার ওপর, জাত মারামারি, কৌলিন্যের আঘাত প্রভৃতি সারা গৌড়মণ্ডলের সামাজিক পরিবেশ, রাষ্ট্রীয় অবস্থা একেবারে মিছমার ক'রে দেয়। তখন ধর্মীয় পরিবেশ, জন-পরিবেশ, ভাষা-পরিবেশ, সাহিত্য-পরিবেশ ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিবেশ চরমভাবে নষ্ট হওয়ার ফলে, গোটা গৌড়মণ্ডলে উচ্চবিত্ত বামুন শ্রেণীর বাইরে অন্য কোন শ্রেণীর বিদ্যাধিকার, শিক্ষাধিকার, সামাজিক অধিকার ছিল না; রাজনৈতিক অধিকার তো নয়-ই। তারা না-পেত সরকারী বিচার, না

www.pathagar.com

পেত সামাজিক (সমাজপতিদের) বিচার। জমির ওপর অধিকারও তাদের ছিল না। দেশে তখন হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজে ভাষা ছিল দু'টা—সংস্কৃত বা দেব-ভাষা; আর অপভ্রংশ বা ইতর ভাষা—ইতর জনের ভাষা। ঐ দেব-ভাষা ছিল জনগণের ধরা-ছোঁয়া, চেনা-জানার বাইরে। তাতে লেখা হ'ত কাব্য-দর্শন, অভিধান, ব্যাকরণ, শাস্ত্র আর জ্যোতিষবিদ্যা। দেশে ও রাজদরবারে তখন তন্ত্রমন্ত্র, ডাকিনী-যোগিনী, গণক-জ্যোতিষীর খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ-হালের জন্য দুঃখ ক'রে লিখেছেন—গৌড়জন তখন 'যোগী পাল, ভোগী পাল, মহীপালের গীত'-এর বদলে 'শিবের গীত' গাইত।

পাল-যুগের তিন-চার শ' বছরে গ'ড়ে তোলা সু-উন্নত গৌড়ীয় ভাষা-(গৌড়ীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত) ও সমানাধিকারবাদী অহিংস জীবন-ব্যবস্থার অবসান ঘ'টেছে। নৈতিকতার সামূহিক ধ্বংস সাধন সেন-বর্মনদের প্রায় দু'শ বছরের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় অপশাসনের ছিল নিষ্ঠুরতম উপহার। ব্রাহ্মণরাই ছিল সে-উপহারদাতা।

পরিশেষে বলা আবশ্যক, কোন দেশ যখন অন্ধকারে ডুবে যায় বা 'আইয়ামে জাহেলিয়াতে'র কবলে পড়ে, তখন কেবল সমাজের উঁচু তলার মানুষরাই কলুষ-জীবন যাপন করে না; সকল স্তরের মানুষ-ই হয় তার শিকার। হয়—নীতি-নৈতিকতাহীন, মূল্যবোধহীন, শিক্ষা-সাহিত্যহীন, কামুক এবং মূর্খ। তখন সমাজে কোন শাসন ও শৃঙ্খলা থাকে না; কেউ আইন-কানুন মানে না। প্রবলের উপর দুর্বলের জুলুম—তখন এমন সীমাহীন হ'য়ে ওঠে যে, ধর্মভীরু নিরীহ মানুষের পক্ষে তখন দেশ ছাড়া ব্যতীত গতি থাকে না। দেশের ওপর তখন গজব নেমে আসে। গৌড়ে সেন-আমলের শেষ পঞ্চাশ বছরের শাসনামলে সারা দেশে সেই 'গজব' নেমে আসে। ফলে, তা থেকে রেহাই পেতে বৌদ্ধ ও অপরাপর অব্রাহ্মণ জন-মানুষকে দলে দলে দেশ ত্যাগ ক'রে 'বঙ্গালে', আসামে, নেপালে, তিব্বতে চলে যেতে হয়। সরকারী নেক-নজরে কওম-চেতনা (সাম্প্রদায়িক চেতনা)— তখন সারা দেশকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে যে, রাজা ও রাজকর্মচারীরা—তখন ব্রাহ্মণ ছাড়া বৌদ্ধ ও অপরাপর অব্রাহ্মণ জনমানুষকে 'মানুষ' ব'লেই গণ্য ক'রত না। পাল আমলের সঙ্গে তুলনা ক'রে সেন-রাজা ও রাজকর্মচারীদের এই এক চোখোমীর চমৎকার বিশ্লেষণ হাজির ক'রেছেন ড. নীহার রঞ্জন রায়—তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস" আদি পর্বে। অতএব, এ-রচনায় পাল-শাসন-উত্তর রাঢ়-গৌড়-বঙ্গালে শূর-সেন-বর্মন আমলে, সর্ব দিকে 'আইয়ামে জাহেলিয়াৎ' কি রূপ নিয়ে দেশ ও জনসমাজকে গ্রাস ক'রেছিল, তার আরও হকিকৎ (সত্য বিবরণ) ক্রমে ক্রমে হাজির করা হবে।

www.pathagar.com

গৌড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিয়াহী ও ইছলামিক তজল্লী

গৌড়ে সেন-বর্মণ আমলের 'ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিয়াহী'-(অন্ধকার)ময় 'আইয়ামে জাহেলিয়াতে'র কিছু পরিচয় এর আগে হাজির করা হ'য়েছে। প্রায় দু'শ বছর যাবৎ টিকে থাকা ঐ ছিয়াহী বা আঁধার সারা গৌড়ে ছড়িয়ে ছিল। সে-আঁধার ঘিরে রেখেছিল, সকল সাধারণ ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও অপরাপর হিন্দু জন কওমকে। বখতিয়ার খিলজীর গৌড়ে তশরীফ গ্রহণ, সেই অমানিশার ঘোর ছিয়াহীর ওপর, প্রথম আলোক রেখার সূচনা ঘটায়। আর তা ছিল গৌড়ে বড় মিষ্ট, শান্ত, শান্তিময়, মধুর এক ছোবেহ ছাদেক। তাঁর পূর্ববর্তী ছূফী সাধক, মহা অলি, দরবেশ হজরৎ শেখ জালাল উদ্দীন তব্‌রেজী—যিনি লক্ষ্মণ সেনের রাজ-দরবারে সাদরে গৃহীত হন, গৌড়ে ইছলামের তজল্লী (আলোকোচ্ছ্বাস) নিয়ে আসেন। বখ্‌তিয়ারের খাপে ঢাকা তলোয়ার—এল, সেই তজল্লীতে সারা গৌড়মণ্ডল আলোকময় ক'রে তুলতে। কিন্তু মুহাম্মদ বিন-বখ্‌তিয়ার ও তাঁর উত্তর-ছোলতানগণ সারা দেশ তথা গোটা গৌড়মণ্ডল দু'এক বছরের ভেতরেই দখলে নিতে পারেননি। তার কোশেশও তাঁরা করেননি।

ঐতিহাসিক ভাবে, গোটা দেশে তথা সারা 'বঙ্গ-বঙ্গালে', মুছলিম হুকুমৎ কায়েম হওয়ার খবর খুঁজলে জানা যায়, রাঢ়ের শূরদের, গৌড়ের সেনদের ও বঙ্গালা বা তথাকথিত পূর্ব বঙ্গ-এর বর্মনদের হঠিয়ে সারা দেশে ইছলামিক তজল্লী এককভাবে ছড়িয়ে প'ড়তে লাগে প্রায় একশ' পঁচিশ বছর। ইতিহাসের পাতা খুললে জানা যায়, ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খিলজি ১২০০ খৃষ্টাব্দে গৌড় দখলের পর, সপ্তগ্রাম, সোনার গাঁও এবং পরে দক্ষিণ বাঙালা তুর্‌কী হুকুমতের আওতায় আসে। লক্ষ্মণ সেন গৌড় থেকে পালিয়ে বঙ্গাল বা 'পূর্ব' ও 'দক্ষিণ বাঙালা' এলাকায় চ'লে আসেন এবং ঢাকার নিকটস্থ বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর বংশধররা ১২৫ বছর যাবৎ টিকে থাকেন। এই মুখ্‌তছর বয়ান থেকে পষ্ট বোঝা যায়, প্রায় আড়াই শ' বছর যাবৎ সারা বঙ্গাল-গৌড়ে আইয়ামে জাহেলিয়াৎ ও জুলমতের ছিয়াহী টিকে ছিল এবং তা অল্পে অল্পে দূর হ'চ্ছিল—ইছলামী হুকুমৎ বা মুছলিম শাসন-বিস্তারের সাথে সাথে।

www.pathagar.com

সিন্দাবাদের তেলেছমাতি তলোয়ারের তেজস্ক্রিয় আগুনের মতই তুর্কীদের ধারালো তলোয়ারের বিজলী ঝিলিক আর মুছলিম অলি-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ, দরবেশদের ইছলামিক আকিদা এবং আখলাক-খাছিয়ৎ-এর যৌথ রক্তপাতহীন অভিযানে সারা গৌড় মণ্ডলের ছিয়াহী দূর হ'য়েছিল। ফুটে উঠেছিল, দিনের আফ্তাব ও রাতের মাহ্তাবের মত ইছলামী হুকুমতের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় শক্তি। মুছলিম ছোলতানদের ন্যায়বিচার, মহান পীর- দরবেশ দ্বীনদারদের মহা পবিত্র ধর্ম-জীবন ও ইছলামী শিক্ষার নজীরবিহীন সাম্যবাদী মানব-চেতনা; গৌড়ীয়দের জীবনে এনে দেয় পরম স্নিগ্ধ নূরানী নূর বা ইছলামিক তজল্লী। গৌড়ে 'ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিয়াহী' ও এই ইছলামিক তজল্লীর স্বরূপ উপলব্ধির জন্য নিম্নে এক-ই আমলের ন্যায়-বিচারের দু'টি চিত্র তুলে ধ'রছি। সেন-আমলের চিত্র দুটির **একটি হ'ল—জালিম শাহীর প্রতিকারহীন ধর্মীয় জুলুমের**। সে জুলুম চালায় বামুনরা, বৌদ্ধদের ওপর। সময়টা নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। তবে ঘটনাটি এগারো-বারো শতকের হওয়াই সম্ভব। লোমহর্ষক ঐ ঘটনাচিত্রটি পাওয়া যায়—দেবকী নন্দনের 'শীতলা-মঙ্গলে'। দেবকী নন্দন লিখেছেন—

"আপনি ত্যজিলেন প্রাণ দেব নিরঞ্জন।
বাম উরু ভাগে হইল ধর্ম্মের শাসন॥
বিষ্ণু হইল কাষ্ট তাতে ব্রহ্মা হুতাশন।
বাম উরু ভাগে পোড়া গেল নিরঞ্জন॥"

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই চরণগুলো কোট্ ক'রলেও কবিতাংশের মূল কথা খুলে বলেননি। বৌদ্ধরা কিভাবে হিন্দু ধর্মে স্থান নিল, সে-কথা বোঝাতেই তিনি শুধু ঐ কোটেশন ব্যবহার ক'রেছেন। কিন্তু ঐ শ্লোক বা বয়েৎ–এর তফছির থেকে কি খবর জানা যায়, তা দেখা দরকার। শ্লোকটি প'ড়লে বোঝা যায়, ধর্ম, নিরঞ্জন, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা—এই চারটি দেবতা; দেবকী নন্দনের ঐ চরণ গুলোয় বর্তমান। ওদের মধ্যে ধর্ম-দেবতা আসলে বৌদ্ধ 'ধর্ম্ম'। তাই বৌদ্ধরা আজও উচ্চারণ করেন—"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।"—'আমি ধর্মের আশ্রয় নিলাম।' 'নিরঞ্জন'ও 'বৌদ্ধ দেবতা'। তিনি পরম 'বুদ্ধ' বা 'ঈশ্বর'। তাই বৌদ্ধরা এখনও বলেন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"—'আমি বুদ্ধের আশ্রয় নিলাম।' কিন্তু বিষ্ণু ব্রাহ্মণদের দেবতা; ব্রহ্মাও তাই। সচেতনভাবে বয়েৎটি প'ড়লে বোঝা যায়—কবি তাঁর ঐ রচনায় ব্রাহ্মণদের দ্বারা একটি 'বৌদ্ধ শেষকৃত্যে'র বিবরণ দিয়েছেন। ঐ সৎকার হ'চ্ছে—বিষ্ণুর বাম উরুর ওপর। (বাম উরু এখানে মরা পোড়াবার শ্মশান।) বিষ্ণু হ'লেন নিজেই কাষ্ঠ। আর পোড়াবার অগ্নি—'ব্রহ্মা'। এর সরল অর্থ হ'ল—'ব্রাহ্মণদের দেবতা

www.pathagar.com

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে বৌদ্ধ ধর্ম শাসন করার বা বিলোপ ঘটাবার জন্যে 'ধর্ম'-(বৌদ্ধ)নিরঞ্জনকে পুড়িয়ে দিলেন। (বলা দরকার যে, গৌড়ে বৌদ্ধদের ওপর ব্রাহ্মণদের এই রকম জুলুম-এর বয়ান 'শঙ্কর-বিজয়'-এও পাওয়া যায়।) অতএব, মুছলিম-পূর্ব আমলে গৌড়মণ্ডলে জালিম শাহীর জুলুম কি রূপ নিয়েছিল তা কোন কল্পনার বিষয় নয়। ঐ ধরনের লেখাগুলোই তার ইসাদী।

এবার গৌড়মণ্ডলের ঐ জুলমৎ-ই ছিয়াহী কবে, কিভাবে, কারা দূর করে, তাঁরও একটি সমকালীন চিত্র-নজির হাজির করা যায়। সেটি হ'ল বহু কথিত 'শূন্য পুরাণ"-এর "নিরঞ্জনের রুষ্মা"। একাদশ শতকে লেখা ঐ কবিতায় রামাই পণ্ডিত নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত লিখেছেন—

'জাজপুর' নামক গাঁয়ে (পুরে) ষোল শ' বৈদিক বামুন-পরিবারের বসবাস। তারা সাবাই ব্রাহ্মণ। তারা দান পেলেই খুশি নয়, তার সাথে 'দক্ষিণা' (উপরি)ও চায়। সেই বামুনগণ এতই জালিম যে, 'দক্ষিণা' (আসলে ভিক্ষা) আনতে গিয়ে বৌদ্ধ গৃহস্থকে ঘরে না পেলে; তার ভুবন তথা ঘরবাড়ী সব-ই পুড়িয়ে দেয়। (এখানে 'শাপ দিয়ে পোড়ায় ভুবন' অর্থ 'ঘরে আগুন দেয়া', তা বোঝা কোন তক্‌লিফের কাজ নয়)। এর ওপর নতুন জুলুম—যেন জুলুমের পর জুলুম। দেশের রাজাও সদ্ধর্মী-(বৌদ্ধ)দের দুশ্‌মন। তাঁর হুকুমে মালদহে অর্থাৎ গৌড় রাজ্যে গরীব নিরীহ প্রজাদের ওপর নানা রকম কর্‌ বসানো হ'য়েছে। সেই কর না দিতে পারলে সদ্ধর্মী-(বৌদ্ধ) প্রজাদের আর রেহাই নেই। তারা কর না পেলে, একেবারে বিনাশ করে। রাজ-কর আদায়কারীরা আপন-পর চেনে না। তাদের জুলুমের জাল পাতার, দিকদিশা নেই।

রাজার পক্ষে রাজকর্মচারী আর ধর্মের পক্ষে ব্রাহ্মণদের যৌথ জুলুম, এতই বলশালী যে, ইচ্ছে হ'লেই দশবিশ জন বামুন জড় হ'য়ে, সদ্ধর্মীদের নির্ভয়ে নিকেশ করে। তারা 'বেদমন্ত্র' উচ্চারণ করে। তাদের মুখ দিয়ে (যেন) ঘন ঘন আগুন (দুর্বাক্য বা অভিশাপ) বের হয়। সবাই তাদের দেখে ভয় পায় বা ডরে কাঁপে। জালেমদের এই জুলুম থেকে রেহাই পাবার জন্যে সবাই মনে মনে ধর্ম-(দেবতা—পরম বুদ্ধ বা নিরঞ্জন) কে ডাকল—'হে দেব। তুমি বাঁচাও। এ-সব জালিমের হাত থেকে তুমি ছাড়া আর কে বাঁচাবে?' এমনিভাবে বামুনরা অবিচার, অনাচার, অত্যাচার ক'রে 'সৃষ্টি সংহার' বা দেশ ও জনপদ ছিছমার ক'রতে থাকে। এই জুলমতের সময় বৈকুণ্ঠ-(স্বর্গ)বাসী ধর্ম-দেবতা ভক্তদের কাতর মুনাজাৎ কবুল ক'রলেন এবং মায়াতে আঁধার বিছিয়ে দিলেন। অর্থাৎ দুশ্‌মনের জুলুম চরম রূপ নিল। ছিয়াহীতে ঢেকে গেল দেশ। তখন ধর্ম-দেবতা আর থাকতে পারলেন না।

www.pathagar.com

তিনি যবন-(মুছলমান)এর চেহারা নিয়ে কালোটুপী মাথায় প'রে, হাজির হ'লেন। (কালো টুপী এখানে রূপক ব'লে বিবেচ্য। কালো পোষাক, টুপী, আলখেল্লা এক বিশেষ রকম ছূফী ফকীরদের বেশ-ভূষণ। হাতে তাদের ত্রিকচ (=তির্‌কশ) এবং কামান। তাঁরা চমৎকার ঘোড়ছওয়ার, উত্তম অশ্ব-পৃষ্ঠে তারা এল। তাদের দেখলে ত্রিভুবনে ভীতির সঞ্চার হয়। মুখে তাঁদের এক নাম খোদা বা "আল্লাহু আকবর"। যেন নিরাকার নিরঞ্জন দেবতার আকার ধ'রে 'বেহেস্ত' থেকে নাজিল হ'লেন। যেন তিনি অবতার রূপে নেমে এলেন। তাঁর সাথে অপরাপর দেবতারাও এলেন। খুশি মনে সবাই ইজার বা 'পাজামা' প'রলেন; (যা মুছলিম পোষাক)। তখন কেবল 'নিরঞ্জন' নয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও বৈকুণ্ঠে থাকতে পারলেন না; তাঁরাও বেহেশ্‌ত থেকে নেমে এলেন—মুহম্মদ (দ.) এর রূপ ধ'রে। এলেন ব্রহ্মা। বিষ্ণুও যেন এক জন পয়গম্বর হ'য়ে এলেন। আর শিব কায়া ধ'রলেন 'আদম'-(নবী) এর। তখন গণেশ, কার্তিক (শিবের দুই ছেলে) এবং মুনিরা আর বাদ থাকেন কি ক'রে? তাঁরাও এলেন। গণেশ অসি ছেড়ে মসি ধ'রলেন। কার্তিক হ'লেন 'কাজী' বা সুবিচারক। মুনিরা রূপ ধারণ ক'রলেন ফকীর-দরবেশদের। নারদও তার দূতের বেশ ছেড়ে শেখের বা নেতার কাজ হাতে নিলেন। পুরন্দর (যিনি পুর বা জনপদ বিনাশকারী সেই ইন্দ্র) মওলানা বা এলেমদার (পণ্ডিত) হ'লেন এবং তাঁর ধ্বংস-কর্ম থেকে বিরত রইলেন। এমনকি, চন্দ্র দেব, সূর্যদেবও যেন ফৌজি দায়িত্ব নিয়ে পদাতিক রূপে জনসেবায় নিয়োজিত হ'ল। তাছাড়া, দেবী চণ্ডিকাও এসে নাজিল হ'লেন; আদম-পত্নী বিবি হাওয়া রূপে। সাপের দেবী পদ্মা বা মনসা যেন হিংস্রতা ভুলে করুণার দেবী বিবি ফাতিমা-(রা)র কায়া ধ'রে এলেন। তাদের সাথে নিয়ে সব দেব-দেবী এক হ'য়ে দলবদ্ধভাবে জাজপুর ঢুকল। এখানে জাজপুরে বামুনদের অত্যাচার নিবারণের খাতিরে একটা মুছলিম মিলিটারি ইউনিটের প্রবেশের ছবি রূপকের সাহায্যে বয়ান করা হ'য়েছে; তা কবুল না ক'রে উপায় নেই। এ-ইউনিটটি যে, জাজপুরে প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'য়েছিল, তার ইশারা শেষাংশে স্পষ্ট। রামাই পণ্ডিত এই 'বিষম গণ্ডগোলে'র সময় 'ধর্ম-দেবতা'র পায় ধ'রে মিনতি জানিয়ে গানটি গাইলেন।" অর্থাৎ জীবন্ত নিরঞ্জন দেবতার রূপে আগত মুছলিম সেনাপতির শরণ নিলেন। এখানে এই রূপকার্থ গ্রহণেরও কোন বাধা নেই।

যাহোক, দেবকী নন্দনের বর্ণিত ঘটনার সাথে রামাই পণ্ডিতের বয়ানকৃত এ-ঘটনার ধর্মীয় ও সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য পুরোপুরি বিপরীত। দেবকী নন্দন ব্রহ্মা-বিষ্ণুর মিলিত চেষ্টায় বৌদ্ধ দেবতা নিরঞ্জনকে পুড়িয়ে মারার যে-ঘটনা তুলে ধ'রেছেন, রামাই পণ্ডিতের রচনায়ও ব্রহ্মাবিষ্ণুভক্ত বামুনদের সেই জ্বালানো-

পোড়ানোর এক-ই ঘটনার কথা বলা হ'য়েছে। দেবকী নন্দনে ব্রহ্মা-বিষ্ণু পুড়িয়েছেন দেব-নিরঞ্জনকে। আর রামাই-এ ব্রহ্মা-বিষ্ণু ভক্ত বামুনরা পুড়িয়েছে—বৌদ্ধদের। তাছাড়া তারা দল বেঁধে লুঠ, হত্যা, অগ্নি-সংযোগ ইত্যাদি ক'রেও সদ্ধর্মী-(বৌদ্ধ) দের বিনাশ করে। এ-বিনাশ জনমানুষের এবং সেই সাথে, তাদের দেবতা নিরঞ্জনেরও। গৌড়ে যখন এই রকমে নিরঞ্জনভক্তদের সঙ্গে নিরঞ্জনকে পুড়িয়ে মারা হ'চ্ছিল; ঠিক সেই সময় আল্লাহ্ (বৌদ্ধদের দেব নিরঞ্জন) তাঁর না-লায়েক ও মজলুম বান্দাদের হেফাজৎ করার খাতিরে একদল মুছলিম লস্করের হাতে ইছলামের তরবারি ধরিয়ে রোখছুৎ ক'রে দেন। তাঁরা সমাজপতি, জালিম; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্র-চন্দ্র-শিব-দুর্গা রূপী বামুন-নর-নারীকে শায়েস্তা করেন এবং তাদের সবাই বাধ্য হয়, নিজ নিজ ধ্বংসকর্ম ত্যাগ ক'রে, ইছলামিক তজল্লীতে উদ্‌ভাসিত হ'তে। শান্তিতে বসবাস ক'রতে। ধর্ম-বিদ্বেষ ও জন-বিদ্বেষ ছেড়ে দিয়ে তারা কাজী, গাজী, হাজী, মৌলানা (পণ্ডিত) হবার রাস্তায় পা বাড়ায়। জালিম আর মজলুম সবাই খুঁজে পায় রাহে নাজাত। বামুন, বৌদ্ধ, দুর্গা-মনসার (পদ্মার) ভেদ যায় ঘুচে। **সেন-বর্মন আমলের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের যৌথ চেষ্টায় আর্য্য ধর্মের চিতায়; অনৃ-আর্য্য বৌদ্ধ ধর্মের আদি নিরঞ্জন পুড়ে ম'রে ভস্মসাৎ হ'য়েও আবার বেঁচে ওঠেন মুছলিম আমলে। এই মৃতের পুনর্জীবন লাভ-এর স্মৃতি-ই** 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'য় নিহিত; সেই সাথে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ জনগণের রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সামাজিক অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়ে শান্তির সুবাতাস লাভের স্মৃতি রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'য় বিধৃত। **বহু বছরের ব্যবধানে রচিত এই দু'টি চিত্র দুই যুগের দু'খানি অতি মূল্যবান আয়না। একখানি ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিয়াহীর; অপরখানি ইছলামিক তজল্লীর।**

এবার **ন্যায়বিচারের আরও দু'টি চিত্র** পাঠকদের তরফে হাজির করা যেতে পারে। তার **একটা খোদ্ সেন-রাজদরবারের,** অপরটা **ছোলতানী আদালতের।** দু'টোই ইনছাফের বা ন্যায়-বিচারের চিত্র।

পহেলা ঘটনায় বিচার-প্রার্থী রাজ-নর্তকী মাধবী। দোছরা ঘটনার বিচার-প্রার্থী একজন সাধারণ নাগরিক-মহিলা। পহেলা ঘটনার বিবাদী রাজার শ্যালক কুমার দত্ত, আর দোছরা ঘটনার বিবাদী ছোলতান-ই বাঙালাহ্—গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ্। পহেলা ঘটনার নালিশ জানানো হয়—রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাছে। আর দোছরা ঘটনার নালিশ পেশ করা হয়—রাজধানীর প্রধান বিচারক কাজী সিরাজ উদ্দীনের আদালতে। প্রথম ক্ষেত্রে অভিযোগ; রাজার শ্যালক কর্তৃক বণিক-বধু মাধবীর ইজ্জৎ হরণের চেষ্টা; আর দ্বিতীয় ঘটনায় আর্জি হ'ল, ছোলতান শিকার

www.pathagar.com

ক'রতে গিয়ে অসাবধানে তীর নিক্ষেপ করায় একজন বিধবার পুত্র নিহত হয়। ফলে, সেটি একটি 'হত্যা-মামলা'।

বলা দরকার যে, ইতঃপূর্বে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী বা সভাসদ্ হলায়ুধ মিশ্র-লিখিত 'শেখ শুভোদয়া' থেকে মূল ঘটনার বিবরণ 'কোট্' করা হ'য়েছে ব'লে, এখানে তা মোখ্তছর (সংক্ষেপে) ইয়াদ করা হবে। বিস্তারিত জানার তরফে মূল রচনা 'শেখ শুভোদয়া' অথবা আমার "ইতিহাস-কেন্দ্রিক অভিযোগের জবাবে"ও পাওয়া যাবে।

উপরের ঘটনার বিবরণে বলা হ'য়েছে—'একদিন রাজা লক্ষ্মণ সেনের শ্যালক কুমার দত্ত বনিকবধূ মাধবীর ইজ্জৎ হরণের কোশেশ করে। এতে ঐ নর্তকী ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাজদরবারে গিয়ে সভাসদ্ ও মন্ত্রীদের সামনে রাজার কাছে কুমার দত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। খবর শুনে রাজ-মহিষী বল্লভা দরবারে ছুটে আসেন এবং নিজের ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে মাধবীর "কেশাকর্ষণ" ক'রে বা চুল ধরে স্বহস্তে ভূপাতিত ক'রে উত্তম-মধ্যম দেন। তিনি, রাজার কাছে তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য গালাগালিও করেন। এতে সভাসদ্গণ থ ব'নে যান। কারো মুখে রা নেই। রাজাও নীরব। তখন রাজমন্ত্রী গোবধনাচার্য ক্রোধে উঠে দাঁড়ান এবং রাণী বল্লভাকে তিরষ্কার করেন। বলেন—"তুমি রাজার পত্নী—এই গৌরবে ধর্মের মাথায় পদাঘাত করিতেছ। তোমার ভাই ইহাকে ধর্ষণ করিতে গিয়াছিল, তুমি ইহাকে প্রহার করিতেছ। এই রাজ্য শীঘ্রই নষ্ট হইবে। পূর্বকালে রামপাল রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র এক স্ত্রী লোককে ধর্ষণ করিয়াছিল; এই অভিযোগে রামপাল তাকে শূলে দিয়াছিলেন।" এই ব'লে তিনি দরবার ত্যাগ ক'রতে গেলে, রাজা তাঁকে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু **রাজা মাধবীর অভিযোগের কোন বিচার করেননি। বরং রানীর কাছে মাফ্ চেয়ে মাধবীকে বিদায় নিতে হয়।**

এ-বয়ান থেকে কেবল সেন-শাসনামলে গৌড়ের ন্যায়-অন্যায়, নীতি-রুচি, বিচার-অবিচার এবং রাজা ও রাজ-পরিবাররের এগানা-বেগানাদের (আত্মীয়-কুটুমদের), গণ-উৎপীড়ন, ধর্ষণ-নির্যাতনের গভীর ছিয়াহীর-ই প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেই সাথে পাল রাজাদের ন্যায়-বিচারের স্বরূপ সম্পর্কেও জানা যায়।

অপর ঘটনা-চিত্র **এক-ই রাজধানীতে মুছলিম আমলের**। আর তা হ'ল—ছোলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের আমলে। তাঁর-ই বিরুদ্ধে তাঁর-ই নিযুক্ত কাজীর কাছে জনৈক বিধবার আনীত পুত্র-হত্যার অভিযোগ। সমস্ত ঘটনাটি সুখময় মুখোপাধ্যায় মশাহুর ইতিহাস গ্রন্থ—'রিয়াজ-উছ্ ছলাতীন' থেকে হুবহু অনুবাদ ক'রে, যে-ভাষায় উপহার দিয়েছেন, তা মুছলিম প্রকাশ-ভঙ্গি অনুযায়ী এরূপ—

www.pathagar.com

ছোলতান গিয়াস উদ্দীন শিকারে গিয়ে—'একদিন তীর ছোঁড়বার সময় ছোলতানের তীর আকস্মিকভাবে এক বিধবার পুত্রকে আঘাত করে। বিধবা কাজী সিরাজুদ্দীনের কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করে। কাজী চিন্তিত হ'ন। কারণ তিনি যদি রাজার প্রতি পক্ষপাত দেখান, তাহ'লে হাসরের দিন তিনি অপরাধী ব'লে গণ্য হবেন। আর যদি তা না দেখান, তা' হ'লে ছোলতানকে বিচারালয়ে আহ্বান করা কঠিন কাজ হবে। অনেক বিচার-বিবেচনার পরে ছোলতানের কাছে সমন জারী করার জন্য তিনি একজন পেয়াদা পাঠালেন এবং নিজে আদালতে বিচারকের মছনদে ব'সলেন, মছনদের তলায় একটি বেত রেখে দিয়ে। শাহী দরবারে পৌঁছে কাজীর পেয়াদা দেখল ছোলতানের কাছে যাওয়া অসম্ভব, সে তখন চীৎকার করে আজান দিতে শুরু ক'রল। রাজা অসময়ে এই আজানধ্বনি শুনে মুআজ্জিনকে (যে আজান দেয়) তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। যখন শাহী খাদিমরা ঐ পেয়াদাকে ছোলতানের কাছে নিয়ে গেল, তিনি তাকে অসময়ে আজান দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন। সে ব'লল, 'কাজী সিরাজুদ্দীন আমাকে পাঠিয়েছেন, আপনাকে বিচারালয়ে নিয়ে যাবার জন্য। আপনার কাছে আসতে পারা কঠিন ব'লে আমি (এখানে) প্রবেশ লাভের জন্য এই উপায় অবলম্বন ক'রেছি। এখন উঠুন এবং বিচারালয়ে চলুন। আপনি যে বিধবার ছেলেকে তীর মেরে হত্যা ক'রেছেন, সে-ই অভিযোগ করেছে।' ছোলতান তখনি উঠলেন এবং বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকিয়ে দরবার থেকে বেরোলেন। যখন ছোলতান কাজীর সামনে উপস্থিত হ'লেন, কাজী তাঁকে কিছুমাত্র খাতির না ক'রে ব'ললেন, 'এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের হৃদয়কে শান্ত করুন।' ছোলতানের পক্ষে যা সম্ভব ছিল সেই উপায়ে (অর্থাৎ প্রচুর অর্থ দিয়ে) বৃদ্ধাকে শান্ত ক'রে তিনি ব'ললেন, 'তুমি কি ক্ষতিপূরণ পেয়েছ এবং সন্তুষ্ট হ'য়েছ?' স্ত্রীলোকটি ব'লল, 'হ্যাঁ! আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি।' তখন কাজী মহানন্দে উঠে দাঁড়ালেন এবং ছোলতানকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে মছনদে বসালেন। ছোলতান বগল থেকে তলোয়ার বার ক'রে ব'ললেন, 'কাজী! আমি পবিত্র আইনের বিধান পালনে বাধ্য ব'লে তোমার বিচারালয়ে এসেছি। আজ যদি আমি তোমাকে আইনের নির্দেশের প্রতি নিষ্ঠা থেকে এক চুল বিচ্যুত হ'তে দেখতাম, তাহ'লে এই তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলতাম। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ, সমস্তই ঠিকভাবে সম্পন্ন হ'য়েছে।' কাজীও মছনদের তলা থেকে তাঁর বেতখানা বার ক'রে ব'ললেন, 'হুজুর! যদি আপনাকে আজ আমি পবিত্র আইনের বিধান সামান্যমাত্রও লঙ্ঘন ক'রতে দেখতাম—তাহ'লে, আল্লাহ্‌র দোহাই, এই বেত দিয়ে আমি আপনার পিঠ ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিতাম।' (অর্থাৎ, আসামী যদি আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে, তা'হলে, তার প্রাপ্য শাস্তি বেত্রদণ্ড; ছোলতান আদালতের নির্দেশ না

www.pathagar.com

মানলে কাজী তাঁকেও সেই শাস্তি দিতেন; অবশ্য ছোলতানকে বেত্রাঘাত ক'রলে কাজীকে ছোলতান হয়তো বধ ক'রতেন; কিন্তু কাজীর কাছে নিজের জীবনের চেয়েও আইনের মর্যাদা বড় ।) এই ব'লে কাজী ব'ললেন, 'একটি বিপদ এসেছিল, কিন্তু ভালয় ভালয় শেষ হ'য়েছে ।' ছোলতান খুশি হ'য়ে কাজীকে অনেক উপহার ও পারিতোষিক দিয়ে ফিরে এলেন ।'

তারপর সুখময় মুখোপাধায় লিখেছেন—"এই চমৎকার গল্পটি 'রিয়াজ-উছ্-ছলাতীন' ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে এ-পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । তাই এটি কতদূর সত্য, তা বলার কোন উপায় নেই । তবে গল্পটি অত্যন্ত মধুর । এটি যদি সত্য হয়, তাহলে **এরকম ঘটনা আমাদের দেশে অতীত কালে ঘ'টেছিল ব'লে আমরা গর্বিত হ'তে পারি । কাজী সিরাজুদ্দীনের মত বিচারক যে-কোন দেশের-ই গৌরব । ছোলতান গিয়াসুদ্দীনের ন্যায়নিষ্ঠা এই গল্পটিতে অতুলনীয় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে । বিহারের দরবেশ মুজাফ্ফর শামছ বলখি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্কে যে-সমস্ত চিঠি লিখেছিলেন, তাদের অনেকগুলি থেকে জানা যায় যে, গিয়াস উদ্দীন সত্যই ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন । আলোচ্য গল্পটিতে গিয়াস উদ্দীনের চরিত্র যে ভাবে ফুটেছে, সেইটি-ই তাঁর আসল রূপ ব'লে মনে ক'রতে ইচ্ছা যায় ।"**

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ঐ উক্তির সাথে এক মত না হবার কোন কারণ নেই । গৌড়ে এবং বাঙালায় সেন-আমল ও ছোলতানী আমলের ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিয়াহী ও ইছলামিক তজল্লীর মাঝে—এই লড়াই ১২০০ সালে বখ্তিয়ারের গৌড় বিজয়ের সাথে সাথেই শুরু হয় । আর সে-লড়াই চলে, আরও প্রায় দেড়'-দু'শ' বছর, অত্যন্ত তীব্রভাবে । তার-ই নমুনা, রাজা গণেশের উত্থানের পর মুছলমান জনগণ ও পীর-দরবেশদের ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদী জুলুমে পাওয়া যায় ।

মোটের ওপর, যে কোন আমলে, যখন-ই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা, উপমহাদেশের যে-কোন এলাকায় ক্ষমতা দখল ক'রতে পেরেছে, তখন-ই তারা সে এলাকায় রক্ত-নহর বইয়ে দিয়েছে । অব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ্যবাদী জনগণের অস্তিত্বও আর রাখেনি । মুছলিম আমলে বাঙালাদেশেও তা একবার ঘ'টেছে । বাঙালায়—রাজা গণেশের উত্থান ও অত্যাচার থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ।

(আর পাওয়া যায় ২০০৩ সালের গুজরাটে) ।

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়—"গণেশ ছিলেন ইলিয়াছ শাহী বংশের শেষ ছোলতান ছাইফ উদ্দীন হামজা শাহের একজন আমীর বা সভাসদ । তিনি তাঁর

www.pathagar.com

কুলগুরু পদ্মনাভ বা নরসিংহ নাড়িয়াল-এর প্ররোচনা ও কুপরামর্শে নিজ মালিক, ছোলতান হামজা শা'র বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেন। এই চক্রান্তের ফলে হামজা শাহ্‌র একজন ক্রীতদাস, যিনি পরে শিহাব উদ্দীন বায়জিদ শাহ্ নাম ধারণ করেন, তাঁর মালিককে হত্যা ক'রে বাঙালার তখ্‌ত-নশীন হন। এতে গণেশের প্রভাব-প্রতিপত্তি অতিশয় বেড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তা ব'লেছেন—তার (শিহাবুদ্দীনের) তরুণ বয়সের জন্য বুদ্ধি অত্যন্ত কম ছিল। কানূছ নামের একজন বিধর্মী, যিনি এই বংশের (ইলিয়াছ শাহী বংশের) অন্যতম অমাত্য ছিলেন, তিনি এর রাজত্বকালে বিরাট ক্ষমতা ও প্রাধান্য অর্জন করেন এবং রাজ্য ও রাজস্ব—সব কিছুর উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন।" ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারও জানিয়েছেন—"ছাইফুদ্দীন ও শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকালে আমীরদের প্রভাব খুব বেড়ে গিয়েছিল। (ঐ সময়) গণেশ ব্যতীত আর কোন আমীরের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয় না।" এর-ই ফলে, শিহাবুদ্দীন, তাঁর খবরদারী থেকে মুক্ত হবার কোশেশ ক'রলে, গণেশ কৌশলে তাঁকে হত্যা করেন। কিন্তু নিজে ক্ষমতায় না ব'সে শিহাবুদ্দীন-এর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌কে তখ্‌তনশীন করেন। ফলে, গোটা বাঙালার আসল ক্ষমতা কানূছ-এর-ই মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। এই ক্ষমতাবৃদ্ধি গণেশকে মাতাল ক'রে তোলে এবং তিনি তার নিয়োজিত নতুন ছোলতানকেও শীঘ্রই হত্যা ক'রে বাঙালার তখ্‌ত দখল ক'রে নেন। এ-বিষয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের কথা হ'ল—"ছোলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের মৃত্যুর প্রসঙ্গে আমরা রাজা গণেশের প্রথম উল্লেখ পাচ্ছি এবং গিয়াসউদ্দীনের পরবর্তী ছোলতানদের সময়ে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন দেখতে পাচ্ছি। এই ক্ষমতার-ই পরিণতি হ'য়েছিল বাঙ্‌লার সিংহাসন অধিকার করার মধ্যে।"

রাজা গণেশের এই ক্ষমতা প্রাপ্তি কেবল ইলিয়াছ শাহী বংশের প্রতি নিমকহারামি ছিল না; তা ছিল তাঁর পরবর্তী দু'জন ছোলতানের বিশ্বাসের ওপরও চরম বেইমানী। কিন্তু গণেশের এবং তার কুলগুরু পদ্মনাভরা নরসিংহ নাড়িয়ালদের ষড়যন্ত্রের অবর্ণনীয় কুফল আরও বহুদূর অবধি গড়িয়েছিল।

কারণ ১৪১০ থেকে, ১৪১৭-১৮ সালে ক্ষমতা দখল তক পরিচালিত ষড়যন্ত্র—এই সময়কার মুছলিম ছোলতানদের দুর্বল ক'রে ফেলে। সরল চিত্ত ঐ সব ছোলতান ক্রুর ও কূট কৌশলী; হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর বেইমানী, শঠতা ও শত্রুতার গহ্বরে এমনভাবে পতিত হন যে, ইলিয়াছ শাহী উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রীয় নীতি ও শৃঙ্খলা একেবারে মিছমার হয়। গণেশ তখ্‌ত দখল করার সাথে সাথেই—ইনছাফ ভিত্তিক মুছলিম প্রশাসন-ব্যবস্থা রহিত করেন এবং

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ্যবাদী আইন-কানুন আবার চালু করেন। তিনি বাঙালার রাজধানীতে বসবাসকারী সকল মুছলমান আমীর-ওমরাহ্ ও পীর-দরবেশদের ওপর জুলুম শুরু করেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ-ষাট বছরের ইলিয়াছ শাহী সুশাসন বাঙালার সবখানে যে শান্তি ও সমৃদ্ধি গ'ড়ে তোলে, তা একেবারে নষ্ট হয়। প্রজার শান্তি ও নিরাপত্তার সূর্য অস্তমিত হয় এবং সারা দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুছলিম জনগণের ওপর নেমে আসে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, আহাজারি দমন-পীড়নের ছিয়াহী। এই জুলুম চালাবার ক্ষমতা লাভ ক'রে, গণেশ তার নামও ব'দলে ফেলেন। তিনি বৈদিক দেবতা অতুলনীয় ক্ষমতাশালী; হত্যা, লুঠ, ধ্বংস ও অগ্নি-সংযোগকারী 'জানার্দন'-এর মতই নিজ শক্তিমোহে মদমত্ত হ'য়ে নাম নেন 'দনুজমর্দন'। ঋক বেদে, অনার্যদের ওপর ইন্দ্রের ধ্বংসলীলার যে-রকম লোমহর্ষক বর্ণনা আছে, সে-রকম বর্ণনাই গণেশ সম্পর্কে সমসাময়িক ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই ধ্বংস-লীলা চ'লেছিল, মুছলমানদের ওপর।

বলা দরকার যে, 'জনার্দন' শব্দের অর্থ জন-অর্দন বা জন-মর্দন (জনার্দনকারী)। অর্থাৎ জনসাধারণকে হত্যাকারী; এখনকার ভাষায় 'গণহত্যাকারী'। আর 'দনুজ মর্দন' অর্থ দানব-(দনুজ) মর্দনকারী। এখানে 'দানব' বা দনুজ—হ'ল 'মুছলমান'। মুছলিম আমলের হিন্দু কাব্য-কবিতায়, মুছলমানদের পষ্ট ভাষাতেই 'যবন', 'ম্লেচ্ছ', "রাক্ষস", "দানব" ইত্যাদি বলা হ'য়েছে।

রাজা গণেশ ওরফে দনুজমর্দন, তখ্তনশীন হ'য়েই যে-ভীষণ অত্যাচার শুরু করেন, সে-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক দলিল, আবিষ্কার ক'রেছেন, সৈয়দ হাছান আসকারী। দলিলগুলো হ'ল—জৌনপুরের মশহুর অলিয়ে কামেল, দরবেশ হজরৎ আশরাফ ছিমনানীর লেখা তিনটি চিঠি। এগুলো তিনি লেখেন ঐ সময়ের জৌনপুরের মুছলিম ছোলতান বিখ্যাত ইব্রাহীম শর্কীকে। এসব চিঠি লেখার কারণ—রাজা গণেশের জুলুম থেকে বাঙালাকে হেফাজৎ বা উদ্ধার করার জন্য। সে-সময় পাণ্ডুয়ার অপর মশহুর দরবেশ ও অলিয়ে কামেল, হজরৎ নূর কুতবুল আলম, শাহ্-ই বাঙালীয়ান (এটি ছিল তাঁর লকব বা উপাধি) গণেশের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য আরজি পেশ ক'রে জৌনপুরের ঐ ছোলতানকে পত্র লেখেন। সেই পত্র পেয়ে তিনি তাঁর পীর-মোবারক হজরৎ আশ্‌রাফ ছিমনানীর নিকট এ-ব্যাপারে কি করা উচিত, তার পরামর্শ চেয়ে চিঠি লেখেন। হজরৎ আশ্‌রাফ ছিমনানী ঐ শাহীপত্র পেয়ে, ছোলতানকে পরামর্শ দিয়ে যে, চিঠি লেখেন, সুখময় মুখোপাধ্যায় তা তাঁর পূর্বোক্ত 'বাংলার ইতিহাসের দ'শো বছর'-গ্রন্থে তরজমা ক'রে দিয়েছেন। তিনি তাঁর তরজমায় মুছলিম প্রকাশ-ভঙ্গির বদলে হিন্দু

www.pathagar.com

প্রকাশ-ভঙ্গি গ্রহণ করায়, আমি তার পাঠ অনুযায়ী প্রকাশ-ভঙ্গির সঠিক রূপসহ, একে এক দলিলগুলো হাজির ক'রছি।

পহেলা চিঠিটি এরকম—

"কাফের কান্‌ছ-এর জোর ক'রে ক্ষমতা দখল করার বিরুদ্ধে আপনার সাহায্য চেয়ে নূর কুতবুল আলম যে-চিঠি লিখেছেন, তা পেয়ে আপনি আমায় যেটুকু জানিয়েছেন, তার সারমর্ম এই—

প্রায় তিন শ' বছর বাদে ঐছলামিক ভূমি বাঙালা দেশে ইমান মিছমারকারী কাফেরদের কালো ছায়া পড়াতে, দেশে ছিয়াহী নেমে এসেছে। মুছলমানরা বেইজ্জতির মধ্যে প'ড়েছে। দেশের প্রতিটি কোণে ইছলামের প্রকৃত শিক্ষার আলো তার জ্যোতি বিকীরণ ক'রে—তার প্রকৃত পথ প্রদর্শন ক'রত; কান্‌ছ রায় বেইমানীর যে ঝড় বইয়ে দিয়েছে, তাতে তা নিভে গেছে। আপনার বিজয়ী সেনাবাহিনীর আগুন দিয়ে নূরী (স্বয়ং নূর কুতুব) আর হোছেনীর (শেখ হোছেন ধোক্কর পোশ নামে আর একজন দরবেশ) আলোকে জ্বালিয়ে দিন।... **ইছলামের প্রধান এই জমিনের** যখন এ-হাল হ'য়েছে, তখন আপনি কেন শান্ত ও সুখী মনে আপনার তখতে ব'সে র'য়েছেন। উঠুন এবং ইছলামের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। আপনার যখন এত শক্তি র'য়েছে, তখন একাজ করা অবশ্য কর্তব্য। ছাহেবে কিরাণ আমীর তৈমুর কেন দিল্লীর তখ্‌ত জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন? ইছলামী ফতোয়া-ই তার কারণ নয় কি? তিনি দু'তিনটি খারাপ জিনিষ দেখেছিলেন ব'লেই তো দিল্লীর মত এমন একটা জনবহুল শহুর মিছমার ক'রেছিলেন। আপনি নিজে হিন্দের ছাহেবে-কিরান, তবু যে-নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে বাঙালা দেশ নাস্তানাবুদ হ'চ্ছে, তা আপনি সহ্য ক'রছেন! কাফেরীর আগুন সেখানে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লছে, আর আপনি তলোয়ার খাপে ভ'রে রেখেছেন। এরকম ব্যাপার থেকে কোন দোস্ত্ যে, নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন, তা দেখে আমি তাজ্জব হ'য়ে যাচ্ছি। **বাঙালা দেশকে বেহেশ্‌ত বলা হয়।** কিন্তু তা আজ দোজখের লোকদের দোজখের ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। খলিল আগুনের জায়গাকে ভয় পান না। কিন্তু আপনি এরকম **একটা সমৃদ্ধ বাগিচাকে** এড়িয়ে চ'লছেন। প্রত্যেকের উপর এমন ধরনের জুলুম করা হ'চ্ছে যে, লেখায় তা বিস্তারিতভাবে বয়ান করা যায় না। আর এক ঘণ্টাও শাহী তখ্‌ত-এ বিশ্রাম ক'রবেন না। আসুন; এসে কাফেরকে আপনার তলোয়ার মেরে খতম করুন।'

এই হ'ল, অলিয়ে কামেল হজরৎ নূর কুতবুল আলমের চিঠির মর্ম। আপনি

লিখেছেন যে, আপনি আপনার অসংখ্য দ্বিগ্বজয়ী সৈন্যকে বাঙালা আক্রমণের জন্য সমবেত ক'রেছেন এবং **এ-সম্বন্ধে আমার মত চেয়েছেন;**...আপনি জানবেন, পরহেজগার বাদ্‌শাদের তরফে ইছলাম ধর্ম হেফাজতের জন্য সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার চেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছু নেই। **বাঙালা দেশে বড় শহরের তো কথাই নেই, এমন ছোট শহর বা গ্রামও মিলবে না, যেখানে দরবেশরা এসে বসতি করেননি।** অনেক দরবেশ ইন্‌তেকাল ক'রেছেন। কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের সংখ্যাও অল্প হবে না। তাঁদের অলি-আওলাদকে বিশেষ ক'রে, হজরৎ নূর কুতবুল আলমের ছেলেকে এবং পরিবারকে যদি শয়তান কাফেরদের কবল থেকে হেফাজৎ (রক্ষা) করা হয়—তাহ'লে তা খুব-ই ভাল কাজ হবে।'

সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর লেখা থেকে আরও জানা যায়, হজরৎ আশ্‌রাফ সিমনানী ছোলতান ইব্‌রাহীম শর্কীকে ঐ চিঠি লেখার পর বাঙালার মশহুর দরবেশ হজরৎ শেখ হুছাইন ধোক্কর পেশকেও একখানি চিঠি দেন। কেননা, গণেশ হজরৎ শেখ হুছাইনের পুত্রকেও হত্যা ক'রেছিলেন। হয়তো সেকারণে তিনিও আশ্‌রাফ ছিমনানীকে পত্র দিয়ে, ইব্‌রাহীম শর্কীকে বাঙালা দখলের অনুরোধ জানান। তাই মরহুম হজরৎ ছিমনানী, হজরৎ ধোক্কর পোশকে সান্ত্বনা জানিয়ে লেখেন—"আশা করা যাচ্ছে যে, অতীতের ছোহরাওয়ার্দী ও রুহানী তরিকার দরবেশদের রুহের ফয়েজ-এর মহিমায় অচিরেই ইছলামী হুকুমৎ নাফরমান বেঈমানদের হাত থেকে মুক্ত হবে। আপনাদের সাহায্য করার জন্য ছোলতানের সৈন্যবাহিনী এখান থেকে যাচ্ছে।"

এরপর দরবেশ-এ আলো হজরৎ আশ্‌রাফ ছিমনানী তেছরা চিঠি লেখেন খোদ্‌ হজরৎ নূর কুতবুল আলমকে। তাতে লেখা হয়—"কাফের কান্‌ছ-এর সেনাবাহিনী কর্তৃক ইছলামী হুকুমতের খতম এবং বদনছীব কান্‌সরূপ প্রচণ্ড ঝড়ে আল্লাহর বান্দাদের ধনদৌলত ও ঘরবাড়ী মিছমার করা সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন, সে-বিষয়ে সব স্পষ্ট হ'য়েছে। মশহুর আলাইয়া ও খালেদিয়া বংশের লোকেরা যে, **বেইনছাফী আচরণ ও জুলুম সহ্য ক'রছেন**—তা জানলাম। ছোলতানের নিশান ও তাঁর ফৌজ এর মধ্যেই ঐ প্রিয়জনের দেশের দিকে রওনা হ'য়েছে। আশা করা যায় যে, মুছলমানরা কান্‌ছ রায় এবং তার দোসরদের কবল থেকে আজাদী লাভে কামিয়াব হবে।'

এই তিনটি চিঠি ছাড়া খোদ্‌ হজরৎ নূর কুতবুল আলমের লেখা অপর একটি চিঠিও পাওয়া গিয়েছে। সুখময় মুখোপাধ্যায় সে-চিঠি; তাঁর পুত্র শেখ আনোয়ারকে

www.pathagar.com

লেখা ব'লে মনে ক'রেছেন। কিন্তু শেখ আনোয়ার রাজা গণেশ-এর হাতে শহীদ হন। ফলে, ঐ পত্র যার কাছেই লেখা হোক না কেন, বর্তমান প্রসঙ্গে তা খুব জরুরী নয়; পত্রটির বিষয়বস্তুই জরুরী। সে-খাতিরে হজরৎ নূর কুতবুল আলমের ঐ চিঠির দরকারী অংশের বয়ান এখানে 'কোট্' করা হল।

ঐ মহান অলি-আল্লার আত্মস্মৃতিমূলক চিঠি থেকে জানা যায়—ছোলতান ইব্রাহীম শর্কী প্রচুর ধন-দৌলৎ তোহ্ফা পেয়ে, গণেশ-পুত্র যদুকে (জিৎমল) মুছলমান বানিয়ে তখ্তনশীন ক'রে ফিরে যান। তিনি বাঙালা ত্যাগ করার পর পর-ই গণেশ ফিরে এসে পুনরায় তখ্তনশীন হ'য়েই বাঙালার মুছলিম দরবেশদের "কঠোর হস্তে দমন" করা শুরু করেন।

সুখময় মুখোপাধ্যায় 'রিয়াজ-উছ ছলাতীন' নামক ইতিহাস অবলম্বনে এই 'কঠোর হস্তে দমনে'র উল্লেখ ক'রলেও, তার বিস্তৃত বিবরণ দেননি। কারণ তা সভ্য সমাজে কর্তব্য নয়। রাজা গণেশ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ব'সে পুনরায় ভয়ানক অত্যাচার শুরু করেন। পীর-দরবেশদের ওপর হত্যা-নির্যাতন-নির্বাসন তীব্র রূপে চ'লতে থাকে। তখ্ত দখল ক'রেই 'দনুজমর্দন' (মুছলিম-দলনকালী) উপাধিধারী রাজা কান্ছ (গণেশ) বাঙালার যে সব অলিয়ে কামিল, দরবেশ ও তাঁদের পরিবারের ওপর নির্যাতন শুরু করেন; তাঁদের মধ্যে তখনকার শ্রেষ্ঠতম অলি, 'শাহে বাঙালীয়ান' উপাধি প্রাপ্ত হজরৎ নূর কুতবুল আলম ছিলেন অন্যতম। রাজা গণেশ এই পরিবারের ওপর অত্যন্ত জুলুম করেন এবং পীর সাহেবের আওলাদ (পুত্র) শেখ আনোয়ার আলমকে সোনার গাঁয়ে (ঢাকায়) নির্বাসন দেন। রাজা গণেশ রাজধানীর অপর দরবেশ হজরৎ বদ্রুল আলমকে কতল করেন। তিনি আরও হত্যা করেন—হজরৎ শেখ হোছাইন ধোক্কর পোশ-এর পুত্রকে। এভাবে আরও অনেক বড় বড় অলি আল্লার আওলাদদের ওপর অত্যাচার করা হয়। তাঁদের খান্কা, ঘরবাড়ী মাদ্রাছা, মছজিদ পুড়িয়ে দেয়া হয়। একাজ এত ব্যাপক ও লোমহর্ষক ভাবে করা হ'তে থাকে যে, পীর-দরবেশগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হন। রাজা গণেশের জুলুম কেবল মুছলিম পীর-দরবেশানের প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল না। তা রূপ নেয় গণহত্যার, তথা আজকের পরিভাষায়—'জেনো সাইডে'র; 'টোটাল ম্যাসাকার' এর। বিষয়টির পরিধি আঁচ ক'রতে হ'লে, হজরৎ আশ্রাফ ছিমনানীর লেখা পূর্বোক্ত চিঠির একটি বাক্য অনুধাবন করা দরকার। তিনি জৌনপুরের ছোলতানের নিকট লিখিত পত্রে জানিয়েছেন—"**বাঙালা দেশে বড় শহরের তো কথাই নেই, এমন ছোট শহর বা গ্রামও মিলবে না, যেখানে দরবেশরা এসে বসতি করেননি; অনেক দরবেশ পরলোক গমন ক'রেছেন, কিন্তু যাঁরা বেঁচে**

www.pathagar.com

আছেন, তাদের সংখ্যা অল্প হবে না। তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে যদি দুরাত্মা কাফেরদের কবল থেকে হেফাজৎ করা যায়, তাহ'লে ভাল কাজ হবে।" এই পত্র থেকে খুব স্পষ্ট ভাবেই তখনকার বাঙালার জনসমাজে মুছলিম সংখ্যাধিক্য ও পীর-দরবেশদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং খান্‌কা, মছজিদ-মাদরাছার বিপুল অস্তিত্বের কথা জানা যায়। রাজা গণেশের জুলুম ইছলাম ও মুছলিম অস্তিত্বের এই গভীর মূল শিকড় ধ'রেই সজোরে টান দেয়। তার ভয়াবহতার প্রমাণ পাওয়া যায় খোদ্ হজরৎ নূর কুতবুল আলম-এর লিখিত অপর এক পত্রে। তাতে তিনি হতাশ হ'য়ে লিখেছেন—"এই বেচারা অসহায় দীন নূর, সময়ের দুর্ভাগ্যের দ্বারা যন্ত্রণাপ্রাপ্ত, পৃথিবী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আগ্রহবান, কিন্তু ধর্মীয় দুঃখ-দুদর্শায় পীড়িত, নিজের সত্ত্বা ও অস্তিত্বের জন্য বিহ্বল, আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিরত, আধ্যাত্মিক জগতের মালিকের সেবা ক'রতে অসমর্থ হওয়ার দরুণ নত-মস্তক আশীর্বাদ জানাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তেই আমার সেই মালিকের কথা স্মরণ ক'রছে। কিন্তু এই সময়ে মন এত খারাপ এবং বিষাদের ভার এত বেশী যে, আমি দীন ব্যক্তি অত্যন্ত বিব্রত ও বিচলিত বোধ ক'রছি।

[কথিত] নিজের অস্তিত্বের বেদনা আমাকে এত বিকল ক'রে ফেলেছে যে, দুনিয়ার সঙ্গে আমি আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন ক'রেছি।

তিনি-ই (আল্লাহ্) যেন আমার গোনাখাতার উপর কলম চালিয়ে দেন (মার্জনা করেন)। কী বিস্ময়কর আল্লাহ্‌র সময়ের নদীতে এক বিক্ষোভ এসেছে এবং হাজার হাজার ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ এবং দরবেশ ও ভক্ত একজন বিধর্মীর অধীন হ'য়েছে।"*

রাজা গণেশের দ্বিতীয়বার তখ্‌ত দখলের পর-ই এই চিঠি হজরৎ নূর কুতবুল উল আলম তার পুত্রকে লেখেন। চিঠির কোটেশনকৃত ভাষা ও বক্তব্য অনুধাবন ক'রলে সহজেই সে-সময়ের 'জেনোসাইড' বা গণহত্যা ও গণ-নির্যাতনের রূপ, আন্দাজ করা যায়। হজরৎ নূর কুতবুল আলম রহ্‌মাতুল্লা আলাইহের চিঠি থেকে স্পষ্ট ইঁসাদী (সাক্ষ্য)পাওয়া যায় যে, দ্বিতীয় দফায় রাজা হ'য়ে কান্‌ছ ব্যাপক উৎপীড়ন শুরু করেন। তার ফলে, মুছলমানদের জাগতিক অস্তিত্ব ও ধর্মীয় অস্তিত্ব উভয়-ই বিপন্ন হ'য়ে প'ড়ে। সকল ছোটবড় শহর, গ্রামগঞ্জ ও মহল্লায় মুছলমানদের ধর্ম-পালন নিষিদ্ধ করা হয়। আজান দেয়া, নামাজ পড়া, ঈদ-পালন, জুম্মার নামাজ

---

* দেখুন—সুখময় মুখোপাধ্যায়। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২০-১২১। প্রকাশ-ভঙ্গি বা শব্দ-ব্যবহার ঈষৎ পরিবর্তিত। যেমন—"ঈশ্বর" স্থানে "আল্লাহ্"।)

www.pathagar.com

আদায়, কোরবানী ইত্যাদি তো বটেই সেই সঙ্গে ঘরে ব'সে কোরান পড়া এবং নামাজ-রোজা করাও নিষিদ্ধ করা হয়। একজন মুছলিম পীর-দরবেশ যদি নামাজ-রোজা ক'রতে না-পারেন, তাহ'লে তাঁর কী অনুভূতি হয়, সে কথাই হজরৎ নূরের এই আকুতির মধ্যে ফুটে উঠেছে যে, 'আল্লাহ্ তুমি আমার গুণা-খাতার উপর কলম চালিয়ে দিও। অর্থাৎ সেগুলো কেটে দিও'। হিসাবের তালিকা থেকে বাদ দিও।

রাজা গণেশের এই সমূহ-অত্যাচারের ফলে, গৌড়-রাঢ় থেকে যে, দলে দলে মুছলমান নর-নারী তাদের শত শত বছরের ঘরবাড়ী, জমি-জমা ধন-দৌলৎ ফেলে কাঁথা-কম্বল সম্বল ক'রে কিংবা এক কাপড়ে পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙালায় চ'লে আসতে বাধ্য হয়, তা সত্য। এ-বিষয়ে, নলিনীকান্ত ভট্টাশালী "বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন ছোলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম" গ্রন্থে লিখেছেন—"রাজা গণেশ কর্তৃক উত্তর বাঙালা থেকে বিতাড়িত হ'য়ে মুছলমানগণ বায়জিদ শাহের মৃত্যুর পর, তার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নেতৃত্বে দক্ষিণ এবং পূর্ব বাঙালায় অবস্থান নেন এবং সেখানে টিকে থাকার চেষ্টা চালান। কিন্তু খুব শীঘ্রই তারা পরাজিত হন এবং রাজা গণেশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে থেকে যান।" (পৃ. ৮২) শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে থেকে যাওয়া নয়, অতুলনীয় রকম নির্যাতনও তিনি চালাতে থাকেন। সে-নির্যাতন এবার পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙালায় ছড়িয়ে পড়ে। রাজা শিব সিংহের রাজ্য ত্রিহুতেও তার বিস্তৃতি ঘটে। সে-কথা কবি বিদ্যাপতির কবিতা থেকে জানা যায়। গণেশের অত্যাচারকে (প্রথম বারে) সমকালে লিখিত একটি সংস্কৃত কবিতায় অগ্নির রূপকে প্রকাশ করা হ'য়েছে। সেটি ১৪২৮-২৯ সালে এলাহাবাদের জনৈক অমুছলিম কবি লেখেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তক উদ্ধৃত উক্ত কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশের যে-অনুবাদ তিনি দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ—

"এই প্রবীণ (ইব্‌রাহীম) প্রচুর গর্ব সহকারে গর্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও সেনা রূপ মেঘবর্ষণে **সেই অগ্নিকে নিঃশঙ্কে নির্বাপন ক'রেছিলেন, যে অগ্নিতে শকেরা (অর্থাৎ মুছলমানেরা) শলভের মত (পুড়ে ম'রেছিল)** এবং রাজনীতিজ্ঞ তাঁর পুত্রকে তুরস্ক নির্মাণ ক'রে (মুছলমান ক'রে) গৌড়দেশকে আবার শক রাজ্যে (মুছলমান রাজ্য) পরিণত ক'রেছিলেন।" (পৃ. ১১৬)। বলা দরকার যে, এই কবিতার প্রথম যে-অংশে ছোলতান ইব্‌রাহীমের বিপুল প্রশংসা করা হ'য়েছে, সুখময় মুখোপাধ্যায় তার অনুবাদ করেননি। তাছাড়া, তিনি "শলভ" শব্দটিরও কোন অর্থদান করেননি। এ-সংস্কৃত শব্দটির অর্থ, "কীট, পতঙ্গ বা পঙ্গপাল=যা শস্যাদির ক্ষতি করে।" এ থেকে সেকালে বাঙালার বিপুল মুছলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠতা (পঙ্গপাল) ও তাদের ওপর কেয়ামত নাজেল হবার বা আগুন দিয়ে পঙ্গপাল পুড়িয়ে

www.pathagar.com

দেশ (শস্যক্ষেত্র) ছাপ করার লোমহর্ষক ঘটনার-ই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রাজা গণেশের মত এরকম অগ্নিদাহ বা বহ্নুৎসব জৈন, বৌদ্ধ ও মুছলমানদের ওপর—আগেও করা হ'য়েছে; পরেও করা হ'য়েছে। তাই যে-কোন যুগে উপমহাদেশের যে-এলাকায় যখন-ই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ক্ষমতা দখল ক'রতে পেরেছে, তখন-ই তারা অব্রাহ্মণ-পঙ্গপালের অস্তিত্ব আর রাখেনি।

কিন্তু বাঙালায় (গৌড়ে) এই চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায়, মুছলিম শাসনামলে। তারও আর একটা নজীর বিখ্যাত হুছেন শাহের আমলে পাওয়া যায়। তা হ'ল—"রাজা হবার অনেক আগে, ছৈয়দ হোছেন "গৌড় অধিকারী" (বাঙালার রাজধানী গৌড়ের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জাতীয়) সুবুদ্ধি রায়ের অধীন চাকুরী ক'রতেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁকে এক দীঘি কাটানোর কাজে নিয়োগ করেন এবং তার কাজে ত্রুটি হওয়ায় সুবুদ্ধি রায় তাঁকে চাবুক মারেন। পরে ছৈয়দ হোছেন ছোলতান হ'য়ে সুবুদ্ধি রায়ের পদ-মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন।"... সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ-লিখিত চৈতন্য চরিতামৃতের এ-বিবরণকে অথেনটিক ব'লে মনে ক'রেছেন। কাজেই এথেকে আমরা বিস্মিত না হ'য়ে পারিনে যে, ছোলতান আলাউদ্দীন হোছেন শাহ কত বড় ন্যায়পরায়ণ ছোলতান ছিলেন এবং কত বড় ছিল তাঁর অন্তর। বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পায়, যখন জানা যায় যে, তাঁর সামরিক শক্তি ছিল অতুলনীয় এবং তিনি উড়িষ্যা, ত্রিহুত, ত্রিপুরা, বিহার, আসাম ও চট্টগ্রাম জয়ে সমর্থ হন। এমন একজন শাসক মুছলিম ঐতিহ্য ও ইছলামী ইনছাফের ধারাতেই যে সুবুদ্ধি রায়কে—তাঁর শরীরে আঘাত করার জন্য শাস্তি না দিয়ে বরং কর্তব্য পালনে দৃঢ়তার জন্য পুরস্কার দিতেই তাঁর পদ-মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন একথা সত্য। আর এ-ই হ'ল সেই ইছলামিক তজল্লী; যা কমছে কম পাঁচ শ' বছর যাবৎ বাঙালা, বিহার ও উড়িষ্যাকে নূরাণী ক'রে রেখেছিল।

www.pathagar.com

বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা

বৌদ্ধমন্ত্র—'কলিমা জাল্লাল'

(একাদশ শতকের ফারছী-বাঙালায় লিখিত একটি অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল)

১. বাঙালা ভাষার আদি নমুনা

বাঙালীর মূল বাঙালা জবান কবে পয়দা হয়, তা নিয়ে আলিম-মুয়াল্লিমদের মধ্যে মতের মিল নেই। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ব'লেছেন—বাঙালা জবানের জনম সপ্তম শতকে (৬৫০ খৃ.)। তাঁর কথায়—"আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ ৬৫০ খৃ. অ. বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।"[১] তিনি তাঁর দাবীর তরফে মীননাথ নামের একজন নাথ-পন্থী বৌদ্ধ সাধকের রচিত নিচের চার লাইন কবিতা কোট্ ক'রেছেন। লাইন চারটা তিনি পেয়েছেন—এতকাল-পরিচিত তথাকথিত বাঙালা রচনা "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" বা চর্যাপদের—মুনিদত্তের লেখা টীকায়। মুনি দত্ত ২১তম চর্যার টীকায় "তথাচ পরদর্শনে" ব'লে মীননাথের যেটুকু রচনা কোট্ ক'রেছেন, তা হ'ল—

"কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্মকুরঙ্গ সমাধিক পাট॥
কমল বিকসিল কহিহ ণ ভমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা॥"[২]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথকে ৭ম শতকের লোক ব'লে বিবেচনা ক'রেছেন এবং সেই তরফে তাঁর ঐ রচনাকে বাঙালা কবিতা গণ্য ক'রে—তা প্রাচীনতম বাঙালা রচনা ব'লেও বয়ান ক'রেছেন। তিনি লিখেছেন—নানা বিষয় "বিবেচনা করিয়া আমরা মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে স্থাপন করিতে পারি।"[৩] কিন্তু একটু খেয়াল ক'রলেই বোঝা যায়, কোটেশন-ভুক্ত রচনাটির পহেলা দু'লাইন মধ্য যুগীয় কায়দায় লেখা আধুনিক রচনা; আর পরবর্তী দু'লাইন "প্রাকৃত পৈঙ্গল"ধৃত কবিতার মত—'প্রাকৃত রচনা'। এর কোন অংশই সে-কালের বাঙালা রচনা নয়। অকৃত্রিমও নয়। এমন কি, চর্যাপদের ভাষা অপেক্ষা এই ভাষা আধুনিক।

www.pathagar.com

যাহোক, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিমতের সাথে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত মেলে না। কারণ তাঁর মতে—"লুই আদি সিদ্ধাচার্য্য ও তাঁহার সময় ৯৫০ হইতে ১০৫০-এর মধ্যে।"[৪] অন্যদিকে, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধায় বলেন—"The period 950-1200A. C. would thus seem to be a reasonable date to give to these poems; and they are preserved in a post-14th century MS."[৫] ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতে—চর্যাপদ দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে লেখা। আর তা ড. শহীদুল্লাহ্-কথিত—গৌড়ীয় অপভ্রংশ[৬] থেকে নয়—শৌরসেনী অপভ্রংশ[৭] থেকে এসেছে। অতএব, বাঙালীর বাঙালার সাথে তার খুব কম-ই রিশ্‌তা আছে।

চর্যাপদের প্রাচীনত্ব নিয়ে আরও অনেকে, অনেক কথা ব'লেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তি-তথ্য দিয়ে এ- দাবীও ক'রেছেন যে—'চর্যাপদ আধুনিক কালের একখানি জাল সংকলন'।[৮] যাঁরা চর্যাপদকে বাঙালা রচনা নয় ব'লেছেন—বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস লিখতে গিয়ে; তাঁদের সাথে আমি একমত হতে বাধ্য হ'য়েছি। কারণ, চর্যাপদের লিপি ও ভাষা; 'অঙ্গ' এলাকার (বর্তমান ভারতের ভাগলপুর-প্রদেশ) প্রাচীন লিপি ও ভাষা ব'লে প্রমাণ পেয়েছি।[৯]

২. বাঙালা লিপির মত বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নমুনাও কি বৌদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্রে?

এবার, চর্যাপদকে নিয়ে জট-জটিলতা পয়দা হওয়ার কথা বাদ দিয়ে, **প্রাচীন বাঙালা লিপির মত প্রাচীন বাঙালা ভাষার নজীরও বৌদ্ধ জনসমাজ এবং বৌদ্ধ ধর্ম-সাহি'**, 'গম্ভীরা গান', 'ধর্ম মঙ্গলে'র পালা ওগয়রহ র'য়েছে— সেগুলোয় বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের কোন নমুনা-নিশানা পাওয়া যায় কি না—তা খুঁজে দেখা হবে।

৩. রামাই পণ্ডিত ও তার রচনা-পরিচয়

রামাই ঐতিহাসিক ব্যক্তি হ'লেও, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মতই অজ্ঞাত-পরিচয়। রামাই পণ্ডিতের জন্ম কোথায় তা কেউ জানে না। তাই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তাঁর বাসস্থান ছিল—ময়নাপুর বা ময়না দেশে। একে মল্লভূমও বলে। আবার কেউ কেউ ব'লেছেন—"হুগলীর জাজপুরের অধিবাসী" ছিলেন তিনি। তবে, একাধিক চণ্ডীদাসের মত, রামাই পণ্ডিতও একাধিক ছিলেন। সবাই সমকালীনও ছিলেন না—তা সত্য। তাই "আদ্দির রামাই" বা আদি রামাই পণ্ডিতকেই প্রাচীনতম ঐতিহাসিক ব্যক্তি ব'লে মনে করা যায়। তিনি হুগলীর যাজপুরের

www.pathagar.com

অধিবাসী ছিলেন কি না—তা দেখা যেতে পারে।

আগেই বলা হ'য়েছে—তিনি নিম্ন-শ্রেণীর বৌদ্ধদের ধর্মপালনের জন্য অনেক তন্ত্র-মন্ত্র, ছাড়া, কবিতা লিখেছেন। সেগুলো ছিল—তাঁর ছিলছিলার সাগরেদদের (অনুসারীদের) হেফাজতে। আধুনিক কালে, বিশ শতকের পুথি খোঁজাড়ুরা সেগুলো উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ থেকে উদ্ধার করেন। তারপর সেগুলো ঘষা-মাজা ক'রে আধুনিক বিদ্বানগণ "শূন্য পুরাণ" নাম দিয়ে কোলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। বই আকারে লেখাগুলো পয়লা প্রকাশ করেন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু। বইখানি কোলকাতাস্থ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে প্রকাশিত হয়। তারপর 'বসুমতি সাহিত্য-মন্দির' থেকেও এর আর একটি সংস্করণ ছাপা হয়। সেখানি সম্পাদনা করেন—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা লেখেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।[১০]

কপাল ভাল! তাই রামাই-এর আরও কিছু রচনার খোঁজ মিলেছে। আর সেগুলো 'ধর্ম্মপূজা-বিধান'-নামে ছাপা হ'য়েছে। বইখানি পহেলা ছাপা হয়—১৩৩২ সালে। কোলকাতা থেকে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, দীনেশচন্দ্র সেন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেনের মত মশহুর আলেমান—রামাই পণ্ডিত কোন্ কালে পয়দা হন; তাঁর রচনাগুলোই বা কোন্ আমলের—তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা-গবেষণা ক'রেছেন। তাঁরা আলোচনাকালে দেখতে পেয়েছেন—'রচনাগুলো এক-ই রামাই নামে নামাংকিত হ'লেও এক সময়ের রচনা নয়। হয়তো রামাই একজনও নয়। লেখাগুলোর ভাষা প্রাকৃত; চর্যাপদের সাথে মেলে না। হয়তো তার সমকালীন অথবা তা থেকেও পুরাণো। তার মধ্যে তিন-চার পর্যায়ের বা পুরুষের রচনাও আছে। এগুলো একাধিকবার সংস্কারও করা হ'য়েছে। তাঁরা এর রচনাকাল এগারো থেকে চোদ্দ শতকের দরমিয়ানে ব'লে ভেবেছেন।[১১]

এবার 'শূন্য পুরাণে'র পরিচয় ও রচনাকাল সর্ম্পকে বিভিন্ন বিদ্বানের মতামত তুলে ধরা হবে।

৪. শূন্য পুরাণের পরিচয়

অতঃপর দীনেশ চন্দ্র সেন—**শূন্য পুরাণের পরিচয়** দিতে গিয়ে লিখেছেন—"শূন্য পুরাণে একান্নটি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টি পত্তন

www.pathagar.com

সম্বন্ধে। এই সৃষ্টি পত্তন সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিতের মত, অনেকটা মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের পথাবলম্বী। তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে ধর্ম্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জলপ্লাবন, টীকাপাবন, অধিবাস, ধুনাজ্বালা, সন্ধ্যাপাবন, ঢেকিমঙ্গলা, গাম্ভারীমঙ্গলা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে এই পদ্ধতি পরিপূর্ণ। যদিও রামাই পণ্ডিতের রচনার উপরে পরবর্ত্তী অনেক লেখক কারুকার্য্য করিতে ছাড়েন নাই, তথাপি **স্থানে স্থানে যে আদি কবির রচনা অবিকৃত আছে,** তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।......

(এ-সব) **রচনা প্রাচীন ও জটিল এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের দ্বিধা হয় না**। এইরূপ ভাবের রচনা মাঝে মাঝে এই পুস্তকে পাওয়া যায়। স্বয়ং নগেন্দ্রবাবু দুর্ব্বোধ্য বলিয়া সেই সকল রচনার অর্থ ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।"[১২]

আলোচ্য বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বসু মহাশয়ের মতে **রামাই পণ্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন**। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতরূপ—ধর্ম্মপূজার যে একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শূন্য-পুরাণে এবং ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ইঁহাকেই ধর্ম্মপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিতরূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগে ধর্ম্মপূজার চারিটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডা বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। সত্যযুগে শেতাই পণ্ডিত,গতি সংখ্যা ৪০০; দ্বাপরে কংসাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ১২০০; এবং কলিযুগে রামাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ১৬০০। রামাই পণ্ডিত হাকন্দ নামক স্থানে মোক্ষলাভ করেন, উহা চাঁপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যে অবস্থিত। ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে উপবীত ধারণ যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাম্রধারণও তদ্রূপ। রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এই তাম্রদীক্ষার প্রধান পুরোহিত। তাঁহারা ছত্রিশ জাতিকে তাম্রদীক্ষা প্রদানের অধিকারী। রামাই পণ্ডিত ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্ম দাসের চারিপুত্র—মাধব, সনাতন, শ্রীধর ও সুলোচন। ইহাদের বংশধরগণ নানা স্থানে বিদ্যমান আছেন এবং ধর্ম্ম-সেবক সম্প্রদায়ে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি।[১৩]

তাহ'লে, দীনেশ চন্দ্র সেন আর নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে রামাই পণ্ডিত ও তাঁর রচনাকাল একাদশ শতক। তিনি "নিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশটির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন—"কোন ঐতিহাসিক মুছলমান-উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা

www.pathagar.com

রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্ম্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত-দর্শনে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।"[১৪]

অপর দিকে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ব'লেছেন—"নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের মতে রামাই পণ্ডিত দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্ব সময়ে খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগে ও একাদশ শতকের প্রথমভাগে রাঢ় দেশে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় ধর্মপাল দণ্ডভুক্তির রাজা ছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বর ছিলেন না। ধর্মমঙ্গলের ঐতিহ্য অনুযায়ী রামাই পণ্ডিত লাউ সেনের সমসাময়িক। এই লাউ সেনের সময় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে।[১৫]

কিন্তু এক-ই গ্রন্থের পরবর্তী পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন—"রামাই পণ্ডিত যে সুদীর্ঘজীবী ছিলেন, এই জন-প্রবাদ অমূলক না-ও হইতে পারে। তাহা হইলে সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং মুছলমান আক্রমণ দর্শন করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অন্যায় হইবে না।"[১৬]

আরও বিচিত্র এই যে, তিনি পূর্বোক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'শূন্যপুরাণে'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে ব'লেছেন—"অনুমান হয়, লবসেন বা লাউসেন রামপালের পর খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। লাউসেনের নাম বাঙ্গালা পঞ্জিকায় কলিকালের রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে এখনও উল্লিখিত হইয়া থাকে। রামাই পণ্ডিত **এই সময়েই বর্ত্তমান** ছিলেন।[১৭] অপিচ, এ-গ্রন্থের-ই অন্যত্র ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ব'লেছেন—"আমি লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতকে খৃষ্টীয় দশম শতকের লোক বলিয়া মনে করিয়াছি।"[১৮]

দুঃখের বিষয়, এঁরা কেউ-ই রচনাটিকে তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। আর গোটা কবিতা বা ছড়াটির আদি থেকে শেষ তক ভালভাবে চোখ দিয়ে তাকাননি। তার ফলে, **নগেন্দ্রনাথ বসু রচনাটি একাদশ শতকের ব'লে উল্লেখ ক'রলেও এবং তা দীনেশচন্দ্র সেনের সমর্থন পেলেও**—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ব'লেছেন ভিন্ন কথা। ব'লেছেন—'রামাই পণ্ডিত ও তাঁর এ-রচনা তেরো শতকের'। ড. শহীদুল্লাহ্ ধারণা ক'রেছেন—'নিরঞ্জনের রুষ্মা"য় বর্ণিত জাজপুর -অভিযান বখতিয়ার খিলজীর গৌড় জয়ের সাথে যুক্ত। তা থেকে প্রাচীন নয়। হয়তো বখ্‌তিয়ার খিলজীর সৈন্যদলের-ই কোন অংশ জাজপুর গিয়েছিল'। এ-ধারণা কোন কোন ঐতিহাসিকও পোষণ করেন।

www.pathagar.com

৫. সম্পাদনায় কারসাজি

যাহোক, সব বিষয় বিশেষভাবে আলোচনার আগে, বলা দরকার যে, গোটা বাঙালা লিপি, ভাষা ও সাহিত্যের নানা উপাদান নিয়ে ১৮-১৯ ও ২০ শতকে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কোলকাতায় ব'সে যেমন নানা ছল-চাতুরী, ওলট-পালট, কাটাছেঁড়া ক'রেছেন—রামাই আর তার লেখালেখি নিয়েও তাঁরা তা ক'রতে পিছপা হননি। এ-বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—'শূন্য পুরাণ'—"ইহা রামাই পণ্ডিত বিরচিত। কয়েক বৎসর হইল সাহিত্য-পরিষদ্ পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি রায় নামক যে ধর্ম্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন, রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এখনও সেই দেবমন্দিরের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতে রামাই পণ্ডিতের পরিচয় সম্বলিত একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। রামাই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই প্রতিপাদন করা প্রধানতঃ এই কবিতার উদ্দেশ্য। যদিও শূন্য পুরাণে অনেক স্থলে রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় 'দ্বিজ' শব্দ উল্লিখিত দৃষ্ট হয় এবং যদিও সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু এই পরিচয়ে আস্থাবান হইয়াছেন, তথাপি আমাদের নিকট উক্ত বিবরণটি নিতান্তই আবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। এই বিবরণের মধ্যে মধ্যে এরূপ অনেক কথা আছে যাহাতে লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে স্বয়ংই সন্দেহার্হ করিয়াছেন। ধর্ম্ম ঠাকুর অতি সামান্য অপরাধে রামাইকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে, তাঁহার জল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা স্পর্শ করিবেন না। রামাই পণ্ডিত তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাসকে সেই ভাবে আর একটি অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহার বংশধরগণ ডোম পণ্ডিত হইবে। রামাই পণ্ডিতের বংশধর লেখক স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন,—

"ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়।"

কিন্তু নিশ্চয়ই যে প্রভেদ আছে, এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিগ্ধ; এ-সম্বন্ধে লেখকের আগ্রহাতিশয়-ই তাঁহার যুক্তিগুলিকে হতবল করিতেছে।"[১৯] সব কিছুতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের ছাপ লাগাবার চেষ্টার বিশেষ প্রয়াস গ্রন্থ-নামেই স্পষ্ট। বৌদ্ধ রামাই-এর রচনার ওপর হিন্দুত্বের ছাপ লাগাবার তাগিদে সংকলনটির নাম দেওয়া হ'য়েছে "শূন্য পুরাণ"—তাও পরিষ্কার। কারণ সংকলনটির মূল নাম ছিল—"রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি। মতান্তরে "আগম পুরাণ"।[২০]

শুধু তাই নয়, রচনাগুলোর ভাষা-বানান তো যতটা পারা যায় ছাপ-ছফা করা হ'য়েছে; তার সাথে ছেদন, কর্তন, বর্জন, সংযোজনও করা হ'য়েছে অনেক কিছু। নজীর দিতে "শূন্য পুরাণে"র একটি বিশেষ রচনার দিকে পাঠকানের নজর আকর্ষণ

www.pathagar.com

করা যায়। লেখাটির নাম "নিরঞ্জনের রুষ্মা"। কোন কোন আলোচনায় "রুষ্মা" শব্দটি "রুষ্মা" এবং "উষ্মা" রূপেও পাওয়া যায়। এটি সম্পাদক ছাহেবানের শব্দ-বদল। এরকম শব্দবদল অনেক করা হ'য়েছে। আরও বলা জরুরী যে, এই রচনাটির আরও একটি পাঠ রামাই-এর অপর কেতাব "ধর্ম্মপূজা-বিধান"-(আধুনিককালে দেয়া নাম)এও মেলে। দু'টো রচনা মিলিয়ে প'ড়লে পয়লা হোঁচট লাগে—পূর্বোক্ত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'র নামের গোলমাল দেখে। এ-কালে সংশোধিত ও সম্পাদিত "শূন্য পুরাণে' যে-লেখাটির নাম রাখা হ'য়েছে—"নিরঞ্জনের রুষ্মা"; সেটাই-"ধর্ম্মপূজা-বিধানে" আছে অন্য নামে। সে নামটি "কলিমা জাল্লাল"। এটাই রামাই পণ্ডিতের নিজের দেয়া নাম। অথচ ইছলামের কলেমা (কলিমা) ও আরবী শব্দ (জালাল) পশ্চিম মুখে দাঁড়িয়ে রচনাটি (মন্ত্র) পড়ার উল্লেখ এবং প্রচুর আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দ, বাক-ভঙ্গি, প্রভৃতি মুছলিম বিষয়-আশয় থাকায়, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সে-নাম বাদ দিয়ে—নতুন নাম দিয়েছেন—"নিরঞ্জনের রুষ্মা"। আরও অবাক করার কথা; সচেতন পাঠক যদি দু'টো রচনার আউয়াল-আখের চোখ বুলিয়ে দেখেন,তাহ'লে তার নজরে প'ড়বে যে, "ধর্মপূজা-বিধানে"র "কলিমা জাল্লাল"কেই দু'টুকরো ক'রে; এক টুক্‌রো সরিয়ে রাখা হ'য়েছে; আর অন্য টুক্‌রো পছন্দসই নাম দিয়ে "শূন্য-পুরাণে" ঢুকিয়ে দেয়া হ'য়েছে। প্রমাণ স্বরূপ "শূন্য পুরাণ"ধৃত "নিরঞ্জনের রুষ্মা" অংশটি নিচেয় কোট্ করা হ'ল—

৬. 'শূন্য পুরাণ'ধৃত নিরঞ্জনের রুষ্মা

জাজপুর পূরবাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয়, কেবল দুর্জ্জন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভুবন ॥১॥
মালদহে নাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাগ্রিক দিসপাস।
বলিষ্ট হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্মিরে করএ বিনাস॥
বেদ করে উচ্চারণ বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেত পাইআ মম্ম সভে বোলে রাখ ধম্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্তান॥

www.pathagar.com

এইরূপে দ্বিজগণ　　　　করে সৃষ্টি সংহারণ
　　ই বড় হোইল অবিচার॥
বৈকণ্ঠে থাকিয়া ধম্ম　　　মনেত পাইআ মম্ম
　　মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥
ধম্ম হইল্যা জবনরূপী　　　মাথাএত কালটুপি
　　হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয়　　　ত্রিভুবনে লাগে ভয়
　　খোদায় বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার　　　হৈলা ভেস্ত অবতার
　　মুখেত বলেত দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ　　　সভে হয়্যা একমন
　　আনন্দেত পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ　　　বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
　　আদম্ফ হৈলা সুলপানি।
গণেশ হইআ গাজী　　　কাত্তিক হৈল কাজি
　　ফকির হইল্য যত মুনি॥
ত্যজিয়া আপন ভেক　　　নারদ হইলা সেক
　　পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে　　　পদাতীক হয়্যা সেবে
　　সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবি　　　তিহঁ হৈল্যা হায়া বিবি
　　পদ্মাবতী হল্য বিবি নুর।
জতেক দেবতাগণ　　　হয়্যা সবে এক মন
　　প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে　　　কাড়্যাফিড়্যা খায় রঙ্গে
　　পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধম্মের পায়　　　রামাঞি পণ্ডিত গায়
　　ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥"[২১]

বলা দরকার, "ধর্ম্মপূজা-বিধানে এ-রচনার নাম "কলিমা জাল্লাল"। তাই 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' ও 'কলিমা জাল্লাল' রচনা; মূলে দু'টো নয়—একটা। তার আউয়াল-আখের এক ও অভিন্ন।

www.pathagar.com

৭. সম্পাদনায় জাতি-বিদ্বেষ

মূলতঃ **বিশ শতকের ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতদের ইছলাম ও মুছলিম-বিদ্বেষ-ই**—এই কাটাছেঁড়া, গ্রহণ-বর্জনের কারণ। সে-কারণও—দু'টো। পহেলা কারণ, গৃহীত-অংশে আরবী-ফারছী শব্দ কম এবং তার মাঝে কেষ্ট-বিষ্টুর নামও আছে। আছে ভগবান, দেব-দেবী, বেদ, ব্রাহ্মণ, বৈকুণ্ঠ, শিব, গণেশ, কার্তিক, নারদ, পুরন্দর, (ইন্দ্র?), চণ্ডী, পদ্মা, ওগয়রহ; হিন্দু ধর্মীয় শব্দ ও হিন্দু- বৌদ্ধ প্রসঙ্গও আছে। এ-অংশে ইছলাম-মুছলিম-প্রসঙ্গ নেই—তা নয়। তবে তার দিকে বেশী নজর দিলে—কাটছাট ক'রতে গেলে, গোটা রচনাটাই বাদ দিতে হয়। তাই সেদিকে না গিয়ে, এ-অংশটি যতটা পারা যায়, মেজে-ঘ'ষে—রাখা হ'য়েছে। অপিচ, মূল কবিতা "কলিমা জাল্লাল"-এর বাকি অংশ এবং সব থেকে মূল্যবান অংশ ছেঁটে দেয়া হ'য়েছে।—দু'টো কারণে। তার একটা হ'ল—আগেই ব'লেছি, ইছলাম-মুছলমান-প্রসঙ্গ। আর অপরটা হ'ল—প্রচুর আরবী-ফারছী ও উরদু শব্দ এবং মুছলিম সমাজ, ইছলামী ক্রিয়াকর্ম, নির্দিষ্ট একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ও একজন মুছলিম বীর ছোলতানের উল্লেখ। এ-সব বাঙালী-অবাঙালী কোন পাঠক, ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিকের নজরে আসুক—তা সংকলক-সম্পাদকগণ (কেউ সচেতন বা কেউ অসচেতনভাবে) চাননি ব'লেই রচনাটিকে দু'টুকরো করা হ'য়েছে। এক অংশ নেয়া হ'য়েছে। অপর অংশ ফেলে দেয়া হ'য়েছে। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে, অন্যত্র প্রাপ্ত ঐ ফেলে দেয়া অংশে ব্রাহ্মণ্যবাদী হাত পড়েনি। তার ফলে, রামাই পণ্ডিতের "নিরঞ্জনের রুষ্মা" যত ছাফ-ছুতরো হ'য়ে পাবলিসিটি পেয়েছে; বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকানের (পাঠকগণের) নিকট "কলিমা জাল্লাল"—তা পায়নি। রচনাটি প্রায় অজানাই থেকে গেছে। এই ইছলাম ও মুছলিম-বিদ্বেষী নজরদারীর কারণেই ঐ দু'টি রচনায় নিহিত **স্পষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান নিয়েও যথাযথ আলোচনা করা হয়নি। "কলিমা জাল্লাল"-এর মত ঐতিহাসিক উপাদানটির তো গুরুত্বই দেওয়া হয়নি।** 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'ও অনেকের কলমে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে— বিকৃত রূপে। অথচ 'কলিমা জাল্লাল'-এর শিরোনাম থেকে ছাফ বোঝা যায়; এটি একটি ইছলাম-প্রভাবিত লৌকিক রচনা। কিন্তু কবিতাটি যেহেতু রামাই পণ্ডিত নামক একজন অমুছলিমের ভণিতাযুক্ত, সে-কারণে একে, এক বাক্যে ইছলামী রচনা বলা চলে না। রামাই পণ্ডিত হিন্দু কি বৌদ্ধ ছিলেন, তা নিয়েও বাহাছ আছে। কারণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের একটা জেনারেল প্রবণতা হ'ল; যা কিছু ভাল, যা-কিছু পুরানো—তা-ই হিন্দুর তৈরী, হিন্দুর ধন, হিন্দু গৌরব-মণ্ডিত ব'লে মনে করা। তাই অতীতের সব কিছুর ওপর হিন্দু সইমোহর (Seal) লাগানো তাঁদের খাছলত।

www.pathagar.com

এ-বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের ছাপ কথা ইয়াদ করা যেতে পারে। তিনি ঐ বিশেষ হিন্দু কর্ম-প্রবণতা সম্পর্কে লিখেছেন—"এই ভাবে দৃষ্ট হয়, হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্ম শুধু নষ্ট করিয়া ছাড়েন নাই, তাঁহারা দুহাতে বৌদ্ধ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের উপর নিজ নিজ নামাঙ্কের ছাপ দিয়া উহা সর্ব্বতোভাবে নিজস্ব করিয়াছেন। হিন্দুর পরবর্ত্তী ন্যায়-দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই লুণ্ঠনের পরিচয় আছে—কোথাও ঋণ-স্বীকার নাই। এইভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের বিলোপ সাধন করিয়াছেন।"[২২] হিন্দুরা অতীতে কেবল বৌদ্ধদের নয়, জৈনদেরও সব কিছু ধ্বংস ও আত্মসাৎ ক'রেছে[২৮]। আর এখন ক'রছে—মুছলমানদের সবকিছু। তার-ই নজীর বাবরী মছজিদ মিছমার; কুতুব মিনার, তাজমহল—হিন্দু স্থাপত্য-কীর্তি ব'লে দাবী এবং দিল্লীর নিকটস্থ আরামবাগ উদ্যানকে "রামবাগ" বানানো। তাছাড়া, বর্তমান ভারতের অসংখ্য মছজিদকে মন্দির বানানো তো আছেই। এর-বিশ শতকীয় ধারাবাহিকতা হ'ল—"শূন্যপুরাণ" সম্পাদনাকালে "কলিমা জাল্লাল"-এর সব থেকে মূল্যবান অংশ বাদ দেয়া।

এরকম কাম-কাজ যে, বাঙালা ভাষার প্রাচীনতম নানা নমুনা নিয়ে করা হ'য়েছে—তা সত্য। তবে রামাই পণ্ডিত হিন্দু না বৌদ্ধ তা ঠিক করার অন্য পথও আছে। অন্য বক্তব্য আছে। তাহ'ল—রামাইকে নিয়ে আলোচনাকালে ড. শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন—"শূন্যপুরাণে অথ যম পুরাণ" শীর্ষক ছড়ায় দেখা যায় যে, মনুষ্য রূপে "হিন্দুর ভূত" নগরে প্রবেশ করিতেছে। এমন সময় পণ্ডিত রাম ধর্ম্মপূজায় বাহির হইয়াছেন। তিনি ভূতের কপালে ধর্মের টীকা দিলেন। দুই ভূত রামাইকে আচ্ছা করিয়া বাঁধিয়া যম-ধর্ম্মরাজের নিকট লইয়া গেল। রামাইর উপর তিন বার কঠোর শাস্তির আজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু তিন বার-ই রামাই 'করতার' স্মরণ করিয়া রক্ষা পান। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, ধর্ম্মপূজা-প্রচার হেতু রামাই ণ্ডিত হিন্দু রাজা কর্তৃক অত্যাচারিত হন। আমরা দেখিব, পরে তাঁহার অনুবর্তীগণের উপরও অনেক অত্যাচার হইয়াছিল।"[২৩] বলা আবশ্যক, এ-বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনও, সহদেব চক্রবর্তী সম্পর্কে আলোচনাকালে লিখেছেন— "হরিশচন্দ্র, লুই চন্দ্র, ভূমিচন্দ্র, জাজপুর-নিবাসী ব্রাহ্মণগণের 'ধর্ম্মদ্বেষ' প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ সূচীত হইবে; এই পুস্তকে রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির (ধর্ম্মপূজা-বিধান/শূন্যপুরাণ) জাতির নির্য্যাতন ও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত করা যায়।"[২৪]

তাহলে, রামাই যে একজন নির্যাতিত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক ও পণ্ডিত তা কবুল না ক'রে উপায় নেই। সেই সূত্রে এও কবুল করা জরুরী যে, রচনাটি "বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ" যুক্ত।

www.pathagar.com

৮. 'ধর্মপূজা-বিধান'ধৃত
কলিমা জাল্লাল-এর পরিচয়

এবার রামাই পণ্ডিতের অপর রচনা 'ধর্মপূজা-বিধানে' মুদ্রিত 'কলিমা জাল্লাল'-এর পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যদিও রচনা-দুটো ইতোপুর্বে এ-গ্রন্থের পহেলা খণ্ডে প্রকাশ করা হ'য়েছে তথাপি পুনরায় কবিতাটির ঐতিহাসিক দেহরূপ এক নজরে দেখার জন্য নিচে 'ধর্ম্মপূজা-বিধান' থেকে পুরো রচনা কোট্ করা হ'ল—

কলিমা জাল্লাল

হংশ অথবা কবতরং নিত্বা পশ্চিমাভিমুখং কিত্বা পঠেৎ।

"জাজপুর পুরবাদি সোল সয় ঘর বেদি
বেদি লয় কেবোল দুর্জ্জন।
দক্ষিণা মাগিতে জান জার ঘরে নাঞি পান
সাঁপ দিয়া পুড়ান ভুবন।
বেদে করি উচ্চারণ মাল মাত্তা অগনন
জলের জাম্বুক অধিকার।
কৈলাস তেজিয়া ধর্ম্ম অন্তরে জানিঞা মর্ম্ম
মায়ারূপে হইলা খনকার॥
হইয়া জবনরূপি সিরে লিল কাল টুপি
হাথে শোভে ত্রিকচ কামান্।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভূবনে নাগে ভয়
খোদায় হইল একনাম॥
বিষ্ণু হল্যা পয়গম্বর ব্রক্ষা হল্যা পেকাম্বর
মহেশ হইল বাবা আম।
কার্ত্তিক হইলা কাজি গনেশ হইল গাজি
ফকির হইল মুনিগন্॥
ছাড়িয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
ব্রক্ষা বিষ্ণু আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সভে
উচ্চশ্বরে বাজায় বাজনা॥
দেখিয়া চণ্ডিকা দেবি তিহোঁ হৈলা হাওা বিবি
পদ্মা হইলা বিবি নূর।

www.pathagar.com

জতেক দেবতাগন করিল দারুন পন্
প্রবেশ করিলা জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফেড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল ।
সেবিয়া ধর্ম্মের পায় শ্রীরাম পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥

ওলন্তের মাল পড়িছে বিহান ।
কাটিছেন্ খনকার তির কামান ॥
সুরৎ ঘোড়াকা পিঠে জিন পালান ।
বার দিয়া বসিলেন খোদায় পরমান ॥
উচ্চালন্তি কাগজ বিচারন্তি পোথা ।
আদি জনম খনকার হইল কোথা ॥
মারিয়া দুশমনকা সির ।
বাদশা দিলেন মহামূদ বির ॥
কে হিদু কে মছলমান ।
হিন্দু পুজন্তি কাষ্ঠ পাশান্ ॥
মুছলমান পুজন্তি খোদায় ।
পুর্ন্ন রূপরেক নাই ॥
হিজলবর্দ্দ খোজ খুজিতে গেল খোজা ।
তাহা পাইল বত্তিষঠো রজা ॥
হাকাস মল্বা রূশুন দিয়া ।
তুবঃ খনকার কোন কাম কিয়া ॥
কোন্ কোন্ গাই গাই বকরি জিনি লিয়া ।
সাঙলি ধবলি খইরি খোশারি ।
হাঁস জভে কে মুরূগ জভে গো বকরাবকরি গাই ।
মুরূগকা পেট মোজোবঅদাথা (?)
উনকো জাবাই কোন ঠাঞি॥
তবঃ খন্কার কোন কাম কিয়া ।
নূর বিবি কো মাঙ্গায় লিয়া॥
লেয় লেয় নুর বিবি পান সুপারি খায় ।
বৰ্ত্তিসঠো হেড়া জোগান করায় ॥

www.pathagar.com

কোন্ কোন্ হেড়া কোন্ কোন্ নাই॥
আসবুক পাসবুক সিসির ভাঙ্গা।
বামচি করদা কমর দণ্ডা॥
আল্লা বিশমল্বা রোশন দিয়া ॥
পান ষুপারি খায়ে বিবি।
খানা পাতাকে মাঙ্গে ডিবি॥
ছোটতাই বড়তাই হালনকা ডিবি।
বড় বড় হাণ্ডা মাঙ্গে বিবি ॥
ছোটতাই বড়তাই হালনকা ডিবি।
সানিকি করয়া বারকশ চেরাক চোরক॥
তবঃ খনকার কোন কাম কিয়া ।
মনপাল কুমার কো মাঙ্গায় লিয়া॥
লেয় লেয় মনপাল কুমার পান ষুপারি খায়।
বত্তিশঠো হেড়া কা হাণ্ডি জোগান করায়॥
মন কে লড়ি মন কে চাক।
দিল মো মাঝে দ্বিজে (দিছে?) পাক॥
পাকে জাকে বনায়ে ডিবি।
পুড়িয়া ঝুড়িয়া করিল খুবি।
সরকশ দণ্ডা হাল্ কা ডিবি ॥
সানকী করয়া বারকশ চেরাক চোরাক ॥
পান্ শোঁপারি খায়ে বিবি।
খানা পাকালে চড়ায়ে ডিবি॥
আছমান পর খোদায় খাড়া।
হুজুর কী যে তাম মহেড়া॥
এ ষব খানা খায়েনা হোয়ে ।
খোদায় খনকারে হুকম কিয়ে॥
গাই হাম্বা বকরা ডাকে।
মুরূগা মুরূগি ফুকুরে বাঙ্গ॥
মচলি চল্ গেয়ে পখুরি গাঙ্গ॥
এ জাল্লালি জো না জানা ।
উনকে গাজন দ্বার কি আঅনে মানা ॥
উনকা মুখ দেখেনে বুরা।

www.pathagar.com

উনক তাম্বা হুজুর না মেরা ॥
মারহ্ টান্যা করহ্ দুর ।
কেউ আও এ নিরঞ্জন কা পুর ॥
রামাই কহে বাবি আন্ ।
হারাম কো উপর হালল কো থান্ ॥
জেতা লোক বৈঠ কহ্ রামকা নাম ॥
আদ্দিকা পণ্ডিত রামাই কহে ।
এ বাত জুদা নহে ।"[২৫]

৯. মন্ত্রটির প্রয়োগ-বিধি ও তাৎপর্য

'কলিমা জাল্লাল'-এর শিরোনামের নিচের বাক্যটি প'ড়লেই বোঝা যায়—এটি একটি মন্ত্র। এবার এ-মন্ত্রটির প্রয়োগ-তরতিব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নজর ক'রলে দেখা যায়—আলোচ্য মন্ত্রটি বৌদ্ধ গাজন-উৎসবে হাঁস অথবা কবতুর-উৎসর্গের (জবাই করার) সময় পাঠ করা হ'ত। সে-কথা রচনাটির পয়লা লাইনেই লেখা র'য়েছে। বলা হ'য়েছে—'হাঁস অথবা কবুতর নিয়ে ("হংশ অথবা কবতরং নিত্ত্বা") পশ্চিমমুখো (পশ্চিমমাভিমুখং) দাঁড়িয়ে (কিত্ত্বা—করিয়া। এখানে হইয়া বা দাঁড়াইয়া) প'ড়তে (পঠেৎ) হবে।'

বলা দরকার যে, পশ্চিমমুখো দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া—চিরাচরিত মুছলিম রীতি। আবার পশ্চিম দিকে মুখ রেখে, পশু-পাখী জবাই করা বা কোরবানী করাও মুছলিম-রীতি। কিন্তু মুছলমানদের এ-আচার-আচরণ বৌদ্ধদের মধ্যে কেন? আরও কথা হ'ল—ঐ মন্ত্রের আখেরী অংশে হালাল-হারামের কথা বলা হ'য়েছে। বলা হ'য়েছে—হারামের ওপর হালালের স্থান। এই হালাল-হারাম বিচার—সুস্পষ্ট মুছলিম ধর্মীয় আইন। ইছলাম অনুযায়ী আল্লাহ্‌র কালাম প'ড়ে নির্দিষ্ট নিয়মে জবাই না ক'রলে কোরবানী (উৎসর্গ) কবুল হয় না; জবাই জায়েজ হয় না। তেমন পশু-পাখীর গোশ্‌ত খাওয়া মুছলমানদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ)। সে-জন্যই "জবাই" জরুরী। আর তার জন্য কালাম পাঠ (মন্ত্র পাঠ) পশ্চিম মুখো (দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে) ক'রে , পশু-পাখীর কণ্ঠনালী ছেদন, জরুরী। এ-সব-ই জবাই করা প্রাণীটি হালাল হবার দাবী।

কিন্তু মুছলমানদের হালাল-হারাম,. কোরবানী ইত্যাদি আচার-আচরণ বৌদ্ধদের অনুসরণীয় হ'ল কেন—সে-ছওয়াল স্বাভাবিক।

তার জওয়াব এই যে, রচনাটি এমন সময়ে ও এমন এক সামাজিক পরিবেশে

www.pathagar.com

লিখিত; যখন বৌদ্ধরা মুছলিম সমাজে প্রায় মিশে গিয়েছিল। ফলে, মুছলমানদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, হালাল-হারাম, জবাই-কোরবানীর সাথে তারা (নিম্ন শ্রেণীর বৌদ্ধরা) প্রায় একাত্ম হ'য়ে প'ড়েছিল। 'শূন্য পুরাণ', 'ধর্ম্মপূজা -বিধান', 'ধর্মমঙ্গল' এবং 'গম্ভীরা গানে'র মধ্যে এরকম আরও মুছলিম উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। দেখানো যায়; ঐ সময়ে ও পরে, বৌদ্ধ নিম্নশ্রেণীর জনগণ তাদের ইমান-আকিদা নিয়ে মুছলিম সমাজে মিশে যাচ্ছে এবং ইছলামের গভীরমূল অনেক আহকাম আরকানের সাথে পরিচিতি হ'য়েছে। সেগুলো তারা গ্রহণ ক'রেছে। কাজেই এ-রচনার তাৎপর্য যে, বাঙালার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা এবং আচার-আচরণ তথা সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—তা বেশক বলা যায়।

১০. মন্ত্রটিতে নিহিত ধর্মীয় ও অন্যান্য উপাদন-বৈচিত্র্য এবং তার তাৎপর্য

এবার 'কলিমা জাল্লালে' নিহিত ধর্মীয়, সামরিক-রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও অন্যান্য উপাদান এবং তার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

ক. 'কলিমা জাল্লালে' নিহিত ধর্মীয় উপাদান

বিষয়	হিন্দু	বৌদ্ধ	মুছলিম
১. জাতি	হিন্দু		মছলমান,যবন
২. উপাস্য-নাম	ভগবান	নিরঞ্জন, ধর্ম	আল্লাহ, খোদা
৩. দেবদেবতা-১	ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ (মহেশ্বর বা শিব)		আদম, হাওয়া মোহাম্মদ (দ.)
৪. দেব-দেবতা-২	পুরন্দর (ইন্দ্র), গণেশ, কার্তিক, ও অন্য সব দেবতা		
৫. দেব-দেবতা-৩	চণ্ডিকা, পদ্মা (সর্প-দেবতা)		বিবি নূর (ফাতিমা-রা.)
৬. মুনি-ঋষি	নারদ	বাসাই	পয়গম্বর (হজরৎ মোহাম্মদ -দ.)
৭. ধর্মীয় গ্রন্থ	বেদ		
৮. ধর্ম-স্থান		দেউল- (দেবমন্দির) দেহারা, গাজন(-স্থান)	

www.pathagar.com

৯. তীর্থস্থান	কৈলাস		
১০. পরলোক	স্বর্গ	নিরঞ্জনপুর	ভেস্ত (বেহেশ্‌ত)
১১. ধর্মীয় উপাদান	কাঠ, পাথর	তাম্র(ধারণ)	
১২. উপাসনার বাণী		মন্ত্রপাঠ (জালালী কালেমা)	বিছমিল্লাহ্‌
১৩. উপাসনা-কর্ম	পূজা	উৎসর্গ (হাঁস-কবুতর)	কলেমা পাঠ জালালী-খতম (কলেমার)
১৪. ধর্মীয় বিধি-নিষেধ	হাঁস-কবুতর উৎসর্গের সময় পশ্চিম মুখো দাঁড়িয়ে জালালী কলেমা (মন্ত্র-পাঠ		পশ্চিম মুখো (দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া) পশ্চিমমুখো মুখ রেখে পশু-পক্ষী জবাই করা। হালাল (খাদ্য)খাওয়া হারাম (খাদ্য) না খাওয়া।
১৫. ধর্মীয় পোশাক			কালো টুপি (মাথায়) ইজার (পাজামা)

খ. সামরিক-রাজনৈতিক উপাদান

১. রাজ-নাম			মাহমুদ বীর
২. রাজকার্য	যুদ্ধ, করারোপ শান্তি-স্থাপন		বার দিয়ে বসা
৩. শাসকের উপাধি	রাজা		বাদ্‌শাহ্‌
৪. সামরিক উপাধি			গাজী
৫. যুদ্ধস্থান	জাজপুর	ওলন্ত (ওদন্ত পুর)	মালদহ
৬. যুদ্ধোপকরণ	তীর		কামান, ঘোড়া ঘোড়ার জিন্‌
৭. যোদ্ধাশ্রেণী			তীরন্দাজ, পদাতিক অশ্বারোহী ও কামানধারী বাহিনী

www.pathagar.com

গ. সামাজিক অর্থনৈতিক উপাদান

১. ব্যক্তি-নাম	মনপাল (কুমোর) আকাশ মল্লা	নূর বিবি
২. সামাজিক পদবী	কুমোর, ব্রাহ্মণ	গাজী, খনকার (খোন্দকার), কাজী, মওলানা, শেখ ও ফকীর।
৩. সামাজিক কর্মোপকরণ	লাঠি, চাক্ম পুথি	কাগজ
৪. সামাজিক উৎসব	গাজন-উৎসব	রোশন(-বাতি) বা আলোকোৎসব ভোজনোৎসব (মেজবানী)
৫. অত্যাচারী শ্রেণী	ব্রাহ্মণ	
৬. অত্যাচারিত জনকওম		বৌদ্ধ
৭. শান্তি-স্থাপনকারী		মুছলমান
৮. অত্যাচারের ধরণ	অগ্নিদান, দক্ষিণা লুটপাট, ভাঙচুর, অভিশাপ)	

ঘ. পারিবারিক উপাদান

১. পারিবারিক কাজকর্ম		খানাপাকানো (খাদ্য প্রস্তুত করা), ভাজাপোড়া (করা), ছোট ও বড় ডিব্বা বা বাটিতে ছালুন রাখা, বড় বড় হাঁড়িতে বা ডেগে) রান্না (পাক) করা, হাঁস, কবুতর, মোরগ, মুরগী, খাসি, বকরী, গরু–জবাই করা। পান-সুপারি খাওয়া।

www.pathagar.com

২. পারিবারিক তৈজসপত্র	সানকি, করয়া, হাঁড়ি।	বারকোশ, চেরাক, ডিব্বা (বাঁটি) ডেগ (বড় হাঁড়ি)

ঙ. বিবিধ

১. রহস্যময় উক্তি	বত্রিশ রাজা	
	বত্রিশ ছোঁড়া (হেড়া)	
	গরুর হাম্বা ডাক	আকাশ মল্বা
	খাসির ডাক	
	মোরগ-মুরগির	
	বাগ (ডাক)	

এ-তালিকা থেকে ছাফ দেখা যায়—'কলিমা জাল্লালে'—হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুছলিম; এ-তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপাদানের মধ্যে মুছলিম উপাদান-ই সর্বাধিক। অথচ এ-রচনায় মুছলিম উপাদান আদৌ প্রত্যাশিত নয়। বরং তার পুরো গরহাজিরী-ই হ'ত স্বাভাবিক। আরও স্বভাবিক হ'ত—যদি এ-রচনায় বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাদান সব থেকে বেশী থাকত। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হ'ল—আলোচ্য রচনায় বৌদ্ধ উপাদান সব চেয়ে কম। এমনকি, হিন্দু-বৌদ্ধ উপাদান মিলিয়েও মুছলিম উপাদানের কমতি ঘটে না। এ-নজীর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়; নিম্ন শ্রেণীর বৌদ্ধ জনকওম—এ-সময় মুছলিম সমাজে বিলীন হওয়ার উপক্রম হ'য়েছিল। সত্যি সত্যি এদেশে ইছলামী ইমান-আকিদা ও আখলাক-খাছলত বৌদ্ধদের তখন ভীষণভাবে আকর্ষণ ক'রেছিল ব'লেই যে, তাঁরা মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খিলজীর গৌড়-বিজয়ের বহু আগে দলে দলে ইছলাম কবুল ক'রেছিল এবং মুছলমান হ'য়ে মুছলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি ক'রেছিল—তা সত্য।

১১. ধর্মপূজার তাত্ত্বিক অবকাঠামো ও প্রসঙ্গ

এ-বিষয়ে আলোচনাকালে—গোপাল হালদার লিখেছেন—"পণ্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তিনি হ'লেন বুদ্ধের-ই শেষ পরিণতি—বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) মধ্যে ধর্ম এভাবে টিকে আছে। বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ স্মৃতি বহন ক'রছেন এই ধর্মঠাকুর, ধর্মপূজা ও তাঁর অব্রাহ্মণ পূজারীরা, এই মত গ্রহণ ক'রে বিলুপ্ত বৌদ্ধধর্মের এই চিহ্নান্বেষণের একটা উৎসাহ জাগে—তারপর পণ্ডিত মহলে। তাই ধর্মমঙ্গলের ধর্মপূজা-পদ্ধতির নানা পুঁথির অংশকে 'শূন্যপুরাণ' নাম দিয়ে **একেবারে বৌদ্ধযুগের বাঙ্লা সাহিত্য রূপে পর্যন্ত ঘোষণা** করা হয় [বঙ্গীয়

www.pathagar.com

সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক ১৩১৪ সালে প্রকাশিত 'শূন্যপুরাণে''' এ চেষ্টাই দেখা যায়। তাতেই তখনকার দিনে **শূন্য পুরাণকে বলা হ'ত—প্রাচীনতম বাঙ্লা সাহিত্য–১১শ-১২শ শতকের** (?)]। অবশ্য তখন-ই দেখা গিয়েছিল ধর্মঠাকুর কোথাও শিব, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও বা দুয়ের সংমিশ্রিত এক দেবতাও হ'য়ে উঠেছেন। তা আর আশ্চর্যের বিষয় কি? ঐ পরিণাম তো বৌদ্ধ দেবদেবীর পরবর্তীকালে ঘটেই। পরে আরও একটু লক্ষ্য ক'রে দেখা গেল—ধর্ম যেন সূর্য-দেবতারও প্রতীক। কিন্তু সূর্যও শুধু হিন্দু বা পারসিকের দেবতা নন। দ্রাবিড়-অস্ট্রিক গোষ্ঠীর নানা আদিবাসীরাও বাঙ্লার চারদিকে সূয-দেবতার উপাসনা ক'রছেন—বাঙ্লার মেয়েদের ব্রতকথায় তো সূর্য মস্ত বড় দেবতা। আদিবাসীদের সূর্য-দেবতাকে গ্রহণ ক'রে, সূর্য-দেবতা ধর্মও তার মধ্যে মিশেছেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি? এর পরে দেখা গেল—শুধু তাই নয়, ধর্মরায় রাজাও, ধর্মমঙ্গল গানে শ্বেত-অশ্ব আরোহী সিপাহী রূপেও এই ধর্মরায়ের পরিকল্পনা করা হ'য়েছে। এদিকে 'ঘর-ভরা'র কাহিনীর গাজনের শেষে 'ঘর-ভাঙা' নামে একটি অনুষ্ঠানও আছে, তাতেই 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' ও জাজপুর ধ্বংসের কথা পাওয়া যায়। এর নাম জালালি কলমা। তাতে মুছলমান বিজয়ের ও ধ্বংসের কথা দেখা যায়। অর্থাৎ মনে হয় ডোমের মতো দেশীয় যোদ্ধৃজাতির এই যুদ্ধ-দেবতা ধর্ম, তুর্ক-বিজয়ের দিনে ভক্তদের চোখে বিজয়ী তুর্ক-সিপাহীও হ'য়ে উঠেছেন, এবং শ্বেত-অশ্বারূঢ় সূর্যের সঙ্গে এই সিপাহী পরিকল্পনাও এসে মিশেছে। এখানেও তবু শেষ হয় নি ধর্মঠাকুরের ঠিকুজী। কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ড কেন তাঁর প্রতীক হ'ল? অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা এবার বৌদ্ধযুগ ও ডোমদের বনদেবতাকে ছাড়িয়ে আরও পিছনে গিয়ে ব'ললেন—আসলে এ হচ্ছে কূর্মদেবতা। এ দেশের আদিম (অস্ট্রিক?) অধিবাসীদের তা টোটেম কিংবা বিগ্রহ,—যার সঙ্গে হিন্দু কূর্মাবতারেরও সম্পর্ক র'য়েছে। আর 'ধর্ম' নামটি আসলে 'ধর্ম' নয়, অস্ট্রিক 'ধুম্' (=কুর্ম), কচ্ছপ অর্থে ধুন্ শব্দ পূর্ব বাঙ্লায় সুপ্রচলিত। অবশ্য এই 'কূর্মবাদের' বিরুদ্ধে তর্ক আছে (শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস', ২য় সং, পৃ. ৪৬৯-৫১০)। সে সব বিশদরূপে আলোচিত হ'য়েছে। কিন্তু তর্ক চলুক, ততক্ষণ ড. সুকুমার সেনের মতো সাধারণ বুদ্ধিতে আমরাও মেনে নিতে পারি—এ বর্ণনায় দুটি পৃথক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; একটি প্রস্তর পূজা ও কূর্ম পূজা, আর দ্বিতীয়টি সূর্য পূজা, যার সঙ্গে মিশেছিল মুছলমান যোদ্ধৃ-শক্তির পূজা। কিন্তু মৌলিক না হ'লেও এই মিশ্রিত দেবতার মধ্যে লৌকিক বৌদ্ধ ধর্মের ও লৌকিক হিন্দু ধর্মের (শিবের) ছাপও কি মুছলমান আমলের পূর্বেই প'ড়তে আরম্ভ করেনি? তা-ও প'ড়তে আরম্ভ ক'রেছিল। ধর্ম-

www.pathagar.com

কাহিনীর সেই শিবটি হচ্ছেন বাঙালী চাষী শিব,—শিবায়নে তিনি-ই ক্রমে স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠতে থাকেন।

ধর্ম ঠাকুরের গানে কি আছে?—ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ও পূজা আশ্রয় ক'রে ধর্মঠাকুরের ছড়া ও গান। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা চলে প্রধানতঃ লাউসেনের আখ্যান অবলম্বন ক'রে, সেই অংশকেই বলা চলে খাঁটি ধর্মমঙ্গল। কিন্তু ঠাকুরের পূজা ও শাস্ত্রের সঙ্গে আরও নানা কাহিনী এসে জমেছে। সে সব পূজার সময় গাওয়া হ'ত। এ সবের নাম দেওয়া যায় (ড. সুকুমার সেনের মতে) 'ধর্মপুরাণ'। ধর্মের এসব গানে ছড়ায় প্রথম থাকে 'শূন্যশাস্ত্র' বা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কথা। এই সৃষ্টি-কাহিনীর মূল অনেক দূরে, হিন্দু পুরাণাদির সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ এ নয়। 'শূন্যপুরাণ' ব'লতে এই সৃষ্টি খণ্ডই বিশেষ ক'রে বোঝায়।[২৬]

মার্কসবাদী গোপাল হালদারের এ-আলোচনা থেকে দেখা যায়—তিনি রামাই পণ্ডিতের কোন রচনাই বৌদ্ধ রচনা বা বৌদ্ধ ধর্মের সাথে যুক্ত ব'লে কবুল ক'রতে রাজী নন। তাঁর মতে,—'এ হ'ল হিন্দুর রচনা। হিন্দু ধর্মের কথা। বিশেষ ক'রে শৈব-রচনা'।

তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখের ওপর বড্ড নাখোশ। তার কারণ তাঁরা একে বৌদ্ধ যুগের বৌদ্ধ রচনা ব'লেছেন। তাই গোপাল হালদার বাবুর ক্ষোভ—'একে একেবারে বৌদ্ধ যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য রূপে পর্যন্ত প্রাচীনতম বাঙ্‌লা সাহিত্যে ১১শ-১২শ শতকের'—বলা হ'য়েছে। তবে, এর মধ্যে যে, "মুছলমান যোদ্ধৃশক্তির পূজা মিশে আছে"; সেটুকু তিনি কবুল ক'রেছেন বটে।

ইছলাম-মুছলমান ও বৌদ্ধদের প্রসঙ্গে বিরক্তিবোধ গোপাল হালদার বাবুর লেখার অন্যত্রও প্রকট।

১২. কলিমা জাল্লাল-এর ভাষা ও ভাষা-তত্ত্ব

এখন এই রচনার ভাষার দিকে নজর দিলে দেখা যায়; 'শূন্য পুরাণে'র প্রায় সকল রচনার ভাষাই প্রাচীন কালের গৌড় এলাকার লৌকিক ভাষা বা 'প্রাকৃত' ভাষা। এই কালেকশনের মধ্যে পদ্যের সঙ্গে 'খানিকটা গদ্য-রচনা'রও মোলাকাৎ হয়। তাছাড়া, লৌকিক ভাষার ভিত্তিতে এই রচনাগুলোর দেহ-নির্মাণ বিধায় এতে সমকালীন সমাজে চালু—আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দও র'য়েছে।

এরকম আরবী, ফারছী, উরদু শব্দ, ভাষা ও বাক্-ভঙ্গি যুক্ত রচনা 'শূন্য পুরাণে' ও বিশেষতঃ 'ধর্মপূজা-বিধানে'— আরও আছে। তবে, এটা খুব-ই অবাক

www.pathagar.com

করা ব্যাপার যে, রামাই পণ্ডিত বৌদ্ধ হ'য়েও আরবী, ফারছী ও উরদু মিলিয়ে এমন সব কবিতা লিখে গেছেন, যার সাথে হিন্দু-বৌদ্ধ অপেক্ষা ইছলাম-মুছলমানের সম্পর্ক খুব-ই ঘনিষ্ঠ। তা রচনাটির প্রথম সংস্কৃত বাক্যটি ভাঙলেই বোঝা যায়। এ-বাক্যে বলা হ'য়েছে—গাজন শুরুর আগে— হাঁস বা কবুতর হাতে নিয়ে জবাই (হিন্দু পরিভাষায় উৎসর্গ) করার আগে পশ্চিম দিকে মুখ রেখে পঠনীয়'। মুছলমানরা এভাবেই পশ্চিম দিকে মুখ রেখে পশুপাখী জবাই করেন। দু'জন লোক উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়িয়ে। (জবাইয়ের পশু বা পাখী, মোরগ, মুরগী, হাঁস, কবুতর ইত্যাদির মাথা থাকে দক্ষিণ দিকে)।

এই জাতীয় শব্দ ও বাক-ভঙ্গি সব চেয়ে বেশী র'য়েছে 'কলিমা জাল্লালে'র পুরো চেহারায়।

এছাড়া কেবল শব্দ রূপে নয়; রচনাটির পদ-গঠন পদ্ধতি ও বাক-রীতিও লক্ষ্য ক'রলে দেখা যায়—ব্যাপক আরবী, ফারছী ও উরদুর প্রভাব। নজীর হিসেবে নিচের পদ ও বাক্-ভঙ্গির দিকে নজর দান করা চলে। যথা—

১. ঘোড়া কা — ঘোড়ার।
২. দুশ্‌মন কা সির — দুশ্‌মনের মাথা।
৩. কাম কিয়া — কাজ ক'রল।
৪. হাঁস জভে কে —হাঁস জবাই ক'রতে।
৫. মুরূগ জভে কে — মোরগ জবাই।
৬. মুরূগ কা পেট — মোরগের পেট
৭. উন কো জবাই — তাঁকে জবাই।
৮. নূর বিবি কো — নূর বিবিকে।
৯. খায়ে বিবি — খেয়ে বিবি।
১০. খানা পাকাতে — খানা পাক ক'রতে।
১১. হালন কা ডিবি — ছালুনের ডিব্বা।
১২. মাঙ্গে বিবি — বিবি চায়।
১৩. মনপাল কুমার কো— মনপাল কুমারকে।
১৪. মন কে লড়ি — মনের লাঠি।
১৫. মন কে চাক — মনের চাকা।
১৬. দিল মে মাঝে — অন্তরের মধ্যে
১৭. ফুকুরে বাঙ্গ — বাক ফুকারে।
১৮. চল্ গেয়ে — চ'লে গেছে।

www.pathagar.com

১৯. উনকে — তাঁকে।
২০. গাজন্ দ্বার কি — গাজনের দরোজায়।
২১. আঅনে মানা — আসতে নিষেধ।
২২. উন ক (কো) মুখ — তাঁহগার মুখ
২৩. দেখেনে — দেখলে।
২৪. নিরঞ্জন কা পুর — নিরঞ্জনের স্থানে।
২৫. হারাম কো — হারামের।
২৬. হালাল কো — হালালের।
২৭. রাম কা নাম — রামের নাম।
২৮. আদ্দি কা পণ্ডিত — আদ্যের পণ্ডিত।

তাহ'লে, স্পষ্টতঃই 'কলিমা জাল্লা'ল যে, বৌদ্ধ কলমে লেখা প্রাচীনতম ফারছী-বাঙালার নমুনা; তা বেশক বলা যায়। আর তাই তাৎপর্যার্থে এ-রচনাকে বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষা বা ফারছী বাঙালার আজ তক আবিষ্কৃত আদি নমুনা বলে গণ্য করা যায়।

১৩. 'কলিমা জাল্লালে' সমাজচিত্র ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য

এবার এই রচনার সমাজচিত্র বা সামাজিক ভিত্তি কি এবং আরবী-ফারছী উরদু শব্দ, পদগঠন-পদ্ধতি ও বাক্-রীতির প্রাধান্যের কারণ কি, তা আলোচনা করা যেতে পারে। সমকালীন সামাজিক কারণেই আরবী-ফারছী ও উরদু শব্দ এবং বাক্-ভঙ্গির এরূপ প্রাধান্য ঘ'টেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, আলোচ্য রচনার আরবী-ফারছী ও উরদু শব্দের প্রাচুর্য এবং পদ-গঠন ও বাক-রীতিতে ঐ সব ভাষার আছর যে, বিশেষ প্রশ্ন ও তাৎপর্যের জন্ম দেয়—তা হ'ল, এ-কবিতা, একাদশ শতকে জাজপুর-উড়িষ্যার মুছলিম সমাজ ও তাদের সামাজিক ভাষা রূপ। ঐ সময় বাঙালা-উড়িষ্যায় মুছলিম সমাজ বা মুছলিম জনকওম গ'ড়ে উঠেছিল এবং তাঁদের লৌকিক সমাজ-ভাষা রূপ—'বাঙালা' ছিল। তার কারণ এই যে, বাঙালা-উড়িষ্যা পাশাপাশি দেশ-বিধায় তখন উভয় এলাকায় যে, মোটামুটি এক-ই রকম জনভাষা চালু ছিল, সে-বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিকগণ মোটামুটি একমত। তাঁরা একমত যে, এ-সময়ের আসাম, বাঙালা ও উড়িষ্যার ভাষা ছিল এক। আর তা বাঙালা। আমার মতে, সে-সময় 'বাঙালা' এলাকা ছিল 'লোয়ার বেঙ্গল' বা 'বঙ্গাল'। আর 'আপার বেঙ্গল' ছিল—গৌড় নামে নামাংকিত। 'উড়িষ্যা'র নাম ছিল 'উৎকল' বা 'কলিঙ্গ'। কাজেই তখনকার অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ বা আপার বেঙ্গল ও উড়িষ্যায় যে-

www.pathagar.com

সব আঞ্চলিক ভাষারূপ চালু ছিল, একাদশ শতকে সেই সব ভাষারূপের আলাদা আলাদা কি নাম ছিল, তা আমাদের জানা নেই। আজ আমরা বাঙালা নামে যে-ভাষাকে চিনি, তার আদি রূপ তখন বঙ্গালেই সীমাবদ্ধ ছিল। গৌড়-কলিঙ্গের ভাষার তখন কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল না। তাই ঐ সময়ের গৌড় ভূমির নানা এলাকার নানা ভাষারূপকে দীনেশ চন্দ্র সেন "গৌড়ীয় ভাষাসমূহ" ব'লেছেন। ঐ সব এলাকার ভাষার নির্দিষ্ট—বাঙালা, উড়িয়া, 'আসামী ইত্যাদি অনেক পরবর্তীকালে দেয়া নাম। তাই গৌড়-উৎকল-আসামের ভাষার এক নাম; বাঙালা-বিহার ও উড়িষ্যা-আসাম এক রাষ্ট্রের অধীনে এক দেশে পরিণত হবার পর-ই পায়। সে-ঘটনা চোদ্দ শতকের মধ্যবর্তী কালের (১৩৫১ খৃ.)। কাজেই তার তিন শ' বছর আগে বাঙালায় মুছলিম জনবসতির হাল-হকিকৎ কেমন ছিল, তা জানা জরুরী।

অনেকেই মনে করেন, বাঙালায় মুছলিম জনবসতি ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠে ১২০০ খৃষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজীর গৌড়-বিজয়ের পর থেকে। তার আগে লক্ষ্মণ সেনের দরবারে শেখ জালাল উদ্দীন তাবরেজীর মত দু'চারজন পীর-দরবেশ দেশের বিভিন্ন স্থানে এসে বসবাস এবং ধর্মান্তর করা শুরু ক'রলেও, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। তাই ব্রাহ্মণদের গ্রামের মত মুছলমান-গ্রাম গ'ড়ে ওঠার তেমন কোন সম্ভাবনা মুছলিম হুকুমৎ কায়েম হবার আগ অবধি সম্ভব নয়। বাঙালায় মুছলিম জনবসতির সেই আদি ইতিহাস নিয়ে খুব বেশী গবেষণা হয়নি। এজন্য গবেষকদের উদ্ধৃতি দিয়ে নয়; আমি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের মশহুর অলিয়ে কামেল হজরৎ নূর কুতুব উল্ আলম শাহে বাঙ্গালীয়ান-এর একটি পত্রের বক্তব্য কোট্ ক'রেই বিষয়টি ফয়ছালার কোশেশ ক'রব। হজরৎ নূর কুতুবুল আলম জৌনপুরের ছোলতান ইব্‌রাহীম শর্‌কীকে লিখিত তাঁর এক চিঠিতে গণেশ-অধিকৃত বাঙালা আক্রমণ করার জন্য আকুল আবেদন জানান। ঐ পত্রে বলা হয়—"**প্রায় তিন শ' বছর বাদে ঐছলামিক ভূমি বাঙালা দেশে ইছলাম**-ধ্বংসকারী কাফেরদের কালো ছায়া পড়াতে দেশ অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে। .....বাঙালা দেশকে বেহেশ্‌ত বলা হয়। কিন্তু তা আজ দোজখী লোকদের দোজখী ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছে।.....এই হ'চ্ছে—হজরৎ নূরের চিঠির মর্ম; যে-চিঠি আপনি পেয়েছেন।....আপনি জানবেন, ধার্মিক রাজাদের পক্ষে ইছলাম ধর্ম রক্ষার জন্যে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার চেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছুই নেই।....বাংলা দেশে বড় শহরের তো কথাই নেই। এমন ছোট শহর বা গ্রামও মিলবে না, যেখানে দরবেশরা এসে বসতি করেননি। অনেক দরবেশ পরলোক

www.pathagar.com

গমন ক'রেছেন। কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের সংখ্যাও অল্প হবে না।"[২৭]......ইত্যাদি।

এই কোটেশনের মধ্যে বাঙলাদেশের মুছলিম জনবসতি এবং শাসন সম্পর্কে দু'টি তথ্য পাওয়া যায়—যা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তার একটি হ'ল—বাঙালায় মুছলিম শাসনের অতীত বয়স তখন—'প্রায় তিন শ' বছর।' এ-উল্লেখ জৌনপুরের ছোলতানের নিকট লেখা হজরৎ নূর কুতুবুল আলমের। তিনি বাঙালার-ই খানদান। **তিনি তিন শ' বছর ধ'রে বাঙালার পরিচয় "ঐছলামিক ভূমি" ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। এ-উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ**। হজরৎ নূর কুতুবুল আলম-এর জন্ম ১৪০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে—তের শতকে। তাহ'লে, তাঁর তিনশ' বছর আগের থেকে বাঙালাদেশ "ইছলামী ভূমি"তে পরিণত হ'য়ে থাকলে, গৌড়ে মুছলিম শাসনের সূচনা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দেয়। মুছলিম জনবসতির ব্যাপকতার সূচনা যে, দশম-একাদশ শতক থেকে—তা না-কবুল করা যায় না। তাহ'লে ঐ ব্যাপক মুছলিম জনবসতির আরও পূর্ব সূচনা যে, আরও পঞ্চাশ এক শ' বছর আগে—তাও অস্বীকার করা যায় কিভাবে?

এরপর দোছরা যে-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—তা হ'ল ঐ সময় (হজরৎ নূর কুতবুল আলমের সময়), বাঙালায় মুছলিম জনবসতির সামাজিক বিস্তার বা বসবাসের ব্যাপকতা। এ-বিষয়ে 'কলিমা জাল্লালে'র আখেরী অংশের দিকে তাকালে দেখা যায়, দরবেশ আশরাফ সিমনানী ছোলতান ইব্রাহীম শর্কীকে বাঙালা দেশের মুছলিম জনবসতির ঘনত্ব সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, 'বাঙালা দেশে'র বড় শহরের তো কথাই নেই, এমন ছোট শহর বা গ্রামও মিলবেনা (অর্থাৎ একটাও মিলবে না), যেখানে দরবেশরা এসে বসতি স্থাপন করেননি।' তাহ'লে, ১৩/১৪ শতকে বাঙালা দেশের মুছলিম জনবসতি কত ব্যাপক হ'য়ে থাকলে, প্রতি গ্রামে দু'চারজন দরবেশ বসবাস ক'রতেন, তা বুঝতে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না। অতএব, বখতিয়ার খিলজীর গৌড় বিজয়ের বহু আগে সেই দশম-একাদশ শতকেই যে, গৌড়-রাঢ়, কলিঙ্গ-উৎকলে মুছলিম গ্রাম-সমাজ, ইছলামী ভাষা, ইমান-আকিদা ও জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, তা বেশক বলা যায়।

পরবর্তীকালে এক-ই ব্যক্তি হজরৎ নূর কুতুবুল আলমের অপর একটা খৎ থেকেও জানা যায়—রাজা গণেশের অত্যাচারে—"হাজার হাজার অলি ও 'কারেন' (ধার্মিক শ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ) দরবেশ ও ভক্ত বিধর্মীর অধীন হ'য়েছে"।[২৮]

তাহ'লে, একথা মেনে নেওয়া অযৌক্তিক নয় যে, দশম-একাদশ শতকে

www.pathagar.com

বাঙালা, বিহার ও উড়িষ্যায় মুছলিম জনবসতি কম ছিল না। ফলে, সে-সব জনবসতিতে যাঁরা বাস ক'রতেন, তাঁদের সমাজ ছিল, সাহিত্য ছিল, লৌকিক ও উচ্চ শ্রেণীর ভাষাও ছিল। ছিল—এলেম-তালিমের আনজাম । নইলে রাজা লক্ষ্মণ সেনের দরবারে একজন মুছলিম দরবেশের সভাসদপদ লাভের কোন সুযোগ-ই ছিল না। সম্ভবতঃ রাজা লক্ষ্মণ সেন বিপুল সংখ্যক মুছলমান প্রজাদের খুশী রাখতে শেখ জালাল উদ্দীন তাবরেজীকে তাঁর সভাসদ বানিয়েছিলেন। রাজার ওপর তাঁর বেশ প্রভাবও ছিল।

একথা সত্য হ'লে, এটাও সত্য যে, বিদেশী; বিশেষ ক'রে—ইরানী-আরবী, তুরকী—ছুফী দরবেশান—সাথে আল্ কোরআন আর তলোয়ার ছাড়া জাগতিক মাল-ছামানা তেমন কিছু আনতেন না। তাঁরা দুশ্‌মনকে প্রতিহত করার জন্য তলোয়ার চালনা আর আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কাম প্রচারের জন্য কোরআন শিক্ষা দিতেন। সেজন্য যে গাঁয়ে, যে-শহরেই তাঁরা আস্তানা কায়েম ক'রেছেন—সে-গ্রাম বা সে-এলাকাতেই গ'ড়ে তুলেছেন দু'টো জিনিস—খানকাহ্ ও মছজিদ। তাঁদের এই খানকাগুলোই পরে মকতব-মাদরাছায় রূপ নেয়। বাঙালায় মুছলিম হুকুমত কায়েম হবার পর, এগুলো সরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। ফলে, জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। আর সেই সুবাদে গ'ড়ে ওঠে ইছলামী মূল্যবোধ, মুছলিম সমাজ, মুছলিম সামাজিক রীতি-রেওয়াজ এবং আরবী-ফারছী-উরদু ও দেশীয় ভাষার মিশেলে নতুন ভাষা—নতুন জবান—যা ছিল বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার আদি নিউক্লিয়াস। তার-ই নমুনা পূর্বোক্ত "কলিমা জাল্লাল।"

একথা সত্য যে, মুছলিম জনবসতির সূচনা থেকেই নির্যাতিত বৌদ্ধ জনকওম মুছলমানদের কাছে আদর-কদর ও সমানাধিকার পেয়ে মুগ্ধ হ'য়েছিল। তারা এই নতুন জনকওম ও ধর্মাচারের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল—তাঁদের-ই পূর্বতন হারানো সাম্যবাদ। বৌদ্ধ জনকওম ও আচার-আচারণের নিয়ম-নীতি। তাই হিন্দুদের অত্যাচার-নির্যাতন হিংসা-নিন্দা, ঘৃণা-অবহেলার বিপরীতে মুছলমানদের আদর-কদরে তাঁদের সঙ্গে লৌকিক, সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে, তাঁরা ইছলামী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হবে—এটাই স্বাভাবিক। আর সেই স্বাভাবিকতার কারণে মুছলমানদের নিকট শিক্ষা পেয়ে, ছোহ্‌বৎ পেয়ে; তাদের কলমা-কালাম-আল্লাহ-খোদা, নবী-রছুল, আদম-হাওয়া, বিবি ফাতিমা, গাজী, মোল্যা, পীর, দরবেশ, খোন্দকার, গরু-মোরগ-মুরগী-বক্‌রী জবাই, হালাল হারামের ফারাক, রান্নার কায়দা, পান-সুপুরী খাওয়া, মেজবানী (গণ-ভোজন) করা ওগয়রহ সম্পর্কে—ভাল ভাবে ওয়াকেফহাল থাকবে—তাও বেশক বলা যায়। এ-সব জানতে গেলে যে-আরবী,

www.pathagar.com

ফারছী, উরদু জবান শেখা মুছলমানদের সাথে সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্রে গভীরভাবে মেশামেশি থাকা দরকার—তা সত্য। রামাই পণ্ডিতের সে-ভাবেই ইছলাম ও মুছলিম ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি, ব্যক্তি, সমাজ ও পারিবারিক আচার-আচরণ জানা ছিল—তা সত্য। 'কলিমা জাল্লাল' বা 'জালালী কলেমা'র আখেরী অংশে তার ভাল নজীর পাওয়া যায়। হিন্দু ভারতচন্দ্র যেমন আরবী-ফারছী-উরদু জানতেন, বৌদ্ধ রামাই পণ্ডিতও তেমনি জানতেন, আরবী, ফারছী, উরদু। হয়তো খানিকটা সংস্কৃতও। কারণ বৌদ্ধ সংস্কৃত তখনও একেবারে মিলিয়ে যায়নি। আর তাই তার পক্ষে লৌকিক মুছলমানী ভাষায় বৌদ্ধ তত্ত্বীয় ধর্ম বিষয়ক গাজনের ছড়া লিখতে গিয়ে তিনি নিজের-ই অজ্ঞাতে আদি বাঙালা ভাষার নজীর রেখে গিয়েছেন। রামাই পণ্ডিতের ক্ষেত্রে এ-বিষয়টি আরও সহজ ও স্বাভাবিক ছিল।

এবার রচনাটির পহেলা অংশ আলোচনা করা দরকার।

'কলিমা জাল্লাল'—আউয়াল-আখেরে একটি ঐতিহাসিক সমাজ-ঘনিষ্ঠ ধর্ম-তাত্ত্বিক গীতিকা (Ballad) জাতীয় রচনা। একে ছড়াও বলা চলে। এই রচনাটি তখনকার বৌদ্ধ ধর্মের লৌকিক রূপ—গাজন-উৎসবের সাথে জড়িত। কবিতাটির পহেলা অংশে বৌদ্ধদের ওপর ব্রাহ্মণদের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নির্যাতনের কথা বলা হ'য়েছে। আর বলা হ'য়েছে—তা থেকে মুছলমান সৈন্য-সেনাপতিরা কিভাবে ফেরেশ্‌তার মত এসে, দেব-দেবীর রূপ ধ'রে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে তাদের উদ্ধার ক'রল। সেই "গণ্ডগোলের বছরে"র স্মৃতিকথা লেখার পর, কোন্ সমাজের কোন্ বীর এ-রহমতের কাজ করেন, তার কথা বলা হ'য়েছে—পরবর্তী অংশে। গীতিকাটির পহেলা অংশ ত্রিপদীতে লিখে, পরবর্তী, পরিপ্রেক্ষিত-অংশ লেখা হ'য়েছে পয়ার-এ। এ-অংশ ছবির পেছনের ক্যানভাস বা ব্যাক গ্রাউণ্ডের মতই চিত্রিত। ছবির বক্তব্য হ'ল—'জাজপুর একটি ব্রাহ্মণের গ্রাম। এখানে ষোল শ' ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণের বসবাস। তারা যজমান-সাধারণের কাছে দক্ষিণা নিতে যায়। কেউ তাদের দাবী মেটাতে না পারলে, শাপ দিয়ে তার ক্ষতি করে। জীবন নাশ করে। এ-সময় মালদহে (গৌড়ে) নতুন রাজশক্তি নতুন কর বসায়। আপন-পর ভেদ না ক'রে নানা অছিলায় প্রজাদের ওপর অত্যাচার ক'রে কর আদায় চালাতে থাকে। তখন শক্তিমানের দাপট দেখা দেয়। এরকম ক্ষমতাবান দশ-বিশ জন সরকারী পদাধিকারী ব্রাহ্মণ সদ্ধর্মী-(বৌদ্ধ)দের বিনাশ ক'রতে উদ্যত হয়। তাঁরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ঘন ঘন লোকের ঘরে আগুন দেয়। এ-রকম আগুন দিয়ে বৌদ্ধদের পোড়ানোর কথা অন্য সূত্র থেকেও জানা যায়। ইতোপূর্বে তা আলোচনা করা

www.pathagar.com

হ'য়েছে। তারা অত্যাচার দেখে ভয়ে কাঁপে। তখন সবাই মনে মনে ধর্মের দেবতাকে চিন্তা ক'রে—তার কাছে নাজাৎ চাইল। ব্রাহ্মণ-(দ্বিজ)দের এ-রকম অবিচার-অত্যাচারে সৃষ্টি বিনাশ পাবার উপক্রম হ'ল। বৈকুণ্ঠবাসী ধর্ম-দেবতা বৌদ্ধদের ডাকের মর্ম বুঝতে পেরে মায়াজাল বিস্তার ক'রলেন। সব কিছু আঁধার হ'য়ে গেল। অত্যাচার চরম রূপ নিল। তখন ধর্ম দেবতা "জবন"—মুছলমানের চেহারা ধারণ ক'রে বৈকুণ্ঠ থেকে জাজপুর এসে হাজির হ'লেন। তাঁর মাথায় (কলন্দরিয়া তরিকার মুছলমানদের) কালো টুপি এবং হাতে তীর-তলোয়ার। সাথে কামান। খোদার নাম নিয়ে উত্তম ঘোড়ায় চ'ড়ে (আরবী অশ্ব?) ভয়ংকর বেশে হ'ল তাঁর আবির্ভাব। এযেন বেহেশ্ত থেকে নিরাকার নিরঞ্জন মুখে দম মাদার উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে এলেন। তাঁকে দেখে হিন্দুর দেবতারাও খুশী হ'য়ে উঠল। কবির ভাষায়—"এল, তারা এল পাহাড়ের অরণ্যের প্রান্তরের একা বিবাদী মিছিল"। দেখা গেল, দেবতাদের বাহিনী 'ইজার' (পাজামা) পরা মুছলিম ফৌজ। কবির কাছে মনে হ'ল—এই বাহিনীতে আছেন— 'মোহাম্মদ' (দ.)-এর রূপ ধরে ব্রহ্মা, পয়গম্বর রূপ ধ'রে বিষ্ণু। আর আদম রূপ ধ'রে এসেছেন শূলপাণি বা শিব। আরও দেখা গেল—গাজীর বেশে গণেশকে, কাজীর বেশে কার্তিককে; আর ফকীর বেশী মুনিদের। আরও দেখা গেল—নিজ ভেক বা বেশ ফেলে দিয়ে নারদ শেখ হ'য়েছেন; পুরন্দর ইন্দ্র হ'য়েছেন মওলানা। এমনকি, আকাশের আফতাব্-মাহতাব (চন্দ্র-সূর্য) তক এই বাহিনীর পদাতিকের কাজ ক'রছে। এখানেই শেষ নয়। কবি দেখছেন—হিন্দুর চণ্ডী দেবী পর্যন্ত কৃতজ্ঞতায় আত্মবিসর্জন দিয়ে হাওয়া বিবির রূপধারণ ক'রেছেন। সর্পদেবী পদ্মাবতীও এ-মিছিলে সামিল। তিনি বিবি নূর {ফাতেমা (রা) কি?} রূপ ধ'রে মিছিলের পূর্ণতা দিয়েছেন। বাদ নেই কেউ। এই ভাবে স্বর্গের সমস্ত দেব-দেবী ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে একসঙ্গে জাজপুর ঢুকল। ঢুকল সুসজ্জিত একটা গোটা মুছলিম ইমানদার ফৌজ।

তারা এসে চিরাচরিত নিয়মে যেখানেই বাধা পেল, সেখানেই দেবদেবীর মূর্তি ভাঙল। লুটপাট ক'রল। পাকড়াও পাকড়াও ব'লে বন্দী ক'রল দুশ্‌মনদের। ইমানদার রামাই পণ্ডিত ধর্মদেবতার চরণ-বন্দনা ক'রে এই 'বিষম গণ্ডগোল' ত্রিপদীতে রূপ দিলেন।

বলা দরকার 'কলিমা জাল্লাল'-এর দোছরা অংশ একটি সামাজিক ধর্মীয় তত্ত্ব-গীতিকা। তা আগেই বলা হ'য়েছে। এ-গীতিকাটি হয়তো মুছলিম সমাজের আদর-কদর পাবার আশায় 'গাজন' উৎসবের সময় গাওয়া হ'ত। তার ইসাদ কবিতাটির আখেরি অংশে পষ্ট। এর কারণ বুঝতে হ'লে, মনে রাখতে হবে যে, বাঙালার ও

www.pathagar.com

গৌড়ের মুছলিম সমাজে আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দ এবং বাক্-ভঙ্গীর আদর-কদর আজকে যা আছে; তা থেকে অনেক বেশী ছিল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনে। তাঁর যৌবনকালে রচিত ইছলামী গান ও মুছলিম নবী, রছুল খলিফা, পীর-মীর-গাজী-দরবেশ, ছিপাহ্ছালার প্রমুখকে নিয়ে লেখা কবিতা; আর কিশোর বয়সের লেখা লেটো গানের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। এ-সময় মুছলিম সমাজে ও সাহিত্যে (লোক-সাহিত্যেও) কি রকম আরবী-ফারছী, উরদু শব্দ ও বাক্-ভঙ্গি চালু ছিল, তারও বিশাল নজীর মুছলিম পুথি-কেতাব ও লোক-সংগীতে দেখা যায়। এ-তরফে লালন শাহের ইছলামী ধারায় রচিত গানগুলোর কথা মনে করা যায়। এই ভাষা ও বাক-রীতি যে-হিন্দু লোক-কবিরাও অনায়াসে ব্যবহার ক'রে, সাহিত্য-রচনা ক'রেছেন—তার নজীর ভারতীয় বাঙালার 'কর্তাভজা' কওমের গুরু—লাল শশীর গানে উজ্জ্বল। এই ধারাতেই যে, সেই একাদশ শতকে বৌদ্ধ কলমে ইছলামী বাঙালা বা ফারছী-বাঙালা লিখিত হবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ, সে-সময় মুছলিম সমাজের আছর-নজরে, আদর-অপ্যায়নে অভিভূত হ'য়েই রামাই পণ্ডিত বৌদ্ধ হ'য়েও ইছলাম-মুছলমান-প্রসঙ্গে মুছলমানী বাঙালা ব্যবহার ক'রতে দ্বিধা করেননি। যেমন দ্বিধা করেননি—ইছলাম-মুছলমান-প্রসঙ্গ বয়ান ক'রতে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এবং প্যারিচাঁদ মিত্র।

কবিতার এই অংশের পহেলা 'ওলন্ত' ব'লে যে-শব্দটি আছে, সেটি সম্ভবতঃ 'ওদন্ত' হবে। এই 'ওদন্ত' হয়তো 'ওদন্তপুরী' । অনেকেই জানেন—'ওদন্তপুর', মগধের রাজধানী ছিল। মগধ বা বর্তমান উত্তর বিহার (?) একাদশ শতকে মুছলিম রাজশক্তির কবলে পড়ে। তবে কেউ কেউ ব'লেছেন—দ্বাদশ শতকে ঐ আক্রমণ পরিচালিত হয় এবং মগধ মুছলমানগণ দখল করেন। তাহ'লে আলোচ্য কবিতার এই দ্বিতীয় অংশের প্রথম আট লাইনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়—ওদন্তপুর থেকে বীর বাদশাহ্ ছোলতান মাহমুদ অভিযান চালিয়ে যাজপুর দখল করার পর হাতি-ঘোড়া, তীর-তলোয়ার-কামান রেখে শাহী তখতে বার দিলেন (উপবেশন ক'রলেন)। তিনি দলিলাদি কেতাবপত্র দেখে অর্থাৎ বিশেষ বিচার-বিবেচনা ক'রে জাজপুরের জন্য একজন খন্দকার (অর্থ—লেখক) নিয়োগ করেন। এরপর মুছলমানদের পরিচয় দেয়া হ'য়েছে। বলা হ'য়েছে—কে হিন্দু, কে মুছলমান; তার পরিচয় হ'ল—হিন্দুরা কাঠ-পাথরের পুজো করে; আর মুছলমানরা করে আল্লাহর (ইবাদৎ)—যার কোন রূপরেখা নেই।....আকাশ মোল্লা, (পেঁয়াজ-) রসুন দিয়ে গাই-বকরীর ব্যবস্থা ক'রল। (গাই—এখানে গরু)। আর তা শ্যামল, ধবল, খয়েরী

www.pathagar.com

এবং খোশারী (চিত্র-বিচিত্র?) রঙের। এছাড়া, জবেহ্ করা হ'ল—হাঁস, মোরগ, খাসি, বকরী বা ছাগল। তারপর, খোন্দকার নূর বিবিকে ডেকে আনলেন। নূর বিবি পান-সুপুরি খায়। বত্রিশ হেড়া (ছোঁড়া?) তা জোগান দেয়।.....আল্লা-বিছমিল্লাহ্ ব'লে বিবি নূর পান-সুপুরি খেয়ে খানা পাকাতে যায়। খানা পাকাতে ডিবি (ডিব্বা?) চায়। ছোট বড় ছালুনের (হালন কা) ভাঁড় (ডিবি)। বিবি বড় বড় হাঁড়ি (হাণ্ডা) চায়। ছালুনের ছোট বড় ভাঁড় (বাটি), সানকি (ভাত খাবার থালা), বারকোশ (বড় কাঁসার থালা), চেরাগ যোগাড় হয়। তখন (মোল্লা) খোনকার মনপাল কুমোরকে ডেকে আনেন। মনপাল কুমোর পান-সুপুরি খায়। বত্রিশ ছোঁড়া হাঁড়ির জোগান দেয়। মনের লাঠি, মনের চাকা। দিল্-এর মাঝে পাক দিচ্ছে (দ্বিজে-দিচ্ছে)। উত্তম রূপে ভেজেপুড়ে পাক- শাক ক'রে ছালুনের ভাঁড় ভর্তি ক'রল। তারপর সানকি, বারকোশ, চেরাগ সাজিয়ে বিবি পান-সুপারি খেল। ডিব্বা উনুনে দিয়ে খানা পাকানো হ'ল। আল্লাহ্ আছমানে দাঁড়িয়ে। আর হুজুরের হাতে তামার বালা (মহেড়া)। এসব খাদ্য খাওয়ার জন্য হুজুর হুকুম দিলেন। গণভোজ বা মেজবানী শুরু হ'ল। গাই হাম্বা ডাকছে। বকরী ডাকছে। মোরগ-মুরগী সজোরে 'বাগ'(ডাক) দিচ্ছে। মাছ পুকুরের গাঙে চ'লে গেল। এ-জালালি কথা (ভেদের কথা) যে না জানে, তার গাজনের দরজায় আসা নিষেধ। তার মুখ দেখা অকল্যাণকর। আমার কাছে তার তামা দেবার কিছু নাই। তাকে টেনে ধ'রে, মেরে দূর কর'। এস তারপর নিরঞ্জনপুর। রামাই বলেন বাবি (আব-ই=আবি>বাবি?) আন। হারামের ওপর হালালের স্থান। জীবিত লোক ব'সে থাক। রাম নাম (রামাইয়ের) লও। আদি রামাই পণ্ডিত বলে। একথা পৃথক নয়। অসত্য নয়।'

১৫. 'কলিমা জাল্লালে' প্রাচীন গৌড়-বঙ্গের সামরিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান

বলা জরুরী যে, 'কলিমা জাল্লাল'-এর গোটা অবয়বে বর্তমান ভারতীয় বাঙালা ও উড়িষ্যার সামরিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক উপাদান আছে। নিচেয় সেগুলো একে একে আলোচনা করা হ'ল—

ক. জাজপুর

আলোচ্য কবিতায় তিনটি পষ্ট স্থান-নাম পাওয়া যায়। তার পয়লাটির নাম—জাজপুর বা যাজপুর। এ- জাজপুর কোথায়, সে-বিষয়ে সবাই এক মত নন। 'শূন্য পুরাণে'র সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"রামাই পণ্ডিতের জন্মভূমি যাজপুর যে কোথায়, তাহাও জানা যায় নাই। কারণ বঙ্গ ও উৎকলে যাজপুর নামক গ্রাম অনেক

www.pathagar.com

আছে।"[২৯] লেখক হুগলী জেলায়ও এক যাজপুর আছে ব'লেছেন। তবে তাঁর ধারণা ময়নাপুর / ময়না দেশ/ মল্লভূম-এর জাজপুরেই রামাই পণ্ডিতের ঠিকানা।[৩০] আমার ধারণা এ-জাজপুর উৎকল বা উড়িষ্যায় অবস্থিত। এখানে চৈতন্যদেবের পূর্ব পুরুষদের বসবাস ছিল। দশম-একাদশ শতকের জাজপুর—উড়িষ্যার রাজধানী ছিল ব'লে মনে হয়।

খ. ওলন্ত(পুর) বা ওদন্তপুর

'ওলন্ত' শব্দটি ওদন্ত-(পুর) এর বিকৃতি ব'লে মনে হয়। এটি বিহার শরীফের নিকটস্থ বিখ্যাত ওদন্তপুর, যা এক সময়ে—মগধের রাজধানী ছিল। এ-স্থানে ধর্মপাল একটি বিহার স্থাপন করেন। ইতিহাসে তা ওদন্তপুরী মহাবিহার নামে পরিচিত।

গ. মালদহ

মালদহ নাম বর্তমানেও র'য়েছে। মালদহ জেলা এখন ভারতীয় বাঙালার অন্তর্গত এলাকা। এক সময় এখানে গৌড়-বঙ্গের রাজধানী ছিল। এ-রাজধানী বার বার আক্রান্ত ও হাত-বদল হ'য়েছে। সুবিখ্যাত পাল রাজত্বের এই প্রাণ-কেন্দ্রে বহিরাগত কম্বোজ, সেন, বর্মন ও মুছলিম অভিযানের ঢেউ বার বার আছড়ে প'ড়েছে। এ-এলাকাই বিখ্যাত কৈবর্ত-বিদ্রোহও প্রত্যক্ষ করে।

'কলিমা জাল্লাল'-এ কয়েকটি ব্যক্তিনামও নজরে পড়ে। সেগুলোর কোনটি স্পষ্ট, কোনটি অস্পষ্ট; কোনটি ঐতিহাসিক, কোনটি অনৈতিহাসিক, কাল্পনিক বা রূপক। এগুলোর মধ্যে স্পষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি—

ঘ. বাদশাহ্ মাহ্মুদ বির (বীর)

ইনি যে বিখ্যাত বীর ছোলতান মাহ্মুদ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছোলতান মাহমুদ সাতাশ বছর বয়সে তখ্তনশীন হবার পর (৯৯৮ খৃ) পহেলা ভারত-অভিযান চালান ১০০১ সালে। আর শেষ অভিযান চালান ১০২৬-এ। তিনি ১০০১ সালে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং জয় পালকে জয় করেন। তারপর ১০০৮ সালে ৪০ দিন লড়াইয়ের পর জয় করেন—জয়পাল-তনয় আনন্দ পালকে। ১০২৫ সালে তিনি দক্ষিণাত্যের কাথিওবাড় আক্রমণ করেন। এখানে আরব সাগরের কূলেই ছিল সেই বিখ্যাত পুরীর সোমনাথ মন্দির। গুজরাটের দক্ষিণ উপকূলের এ-স্থান তখন উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত। মন্দির দখল ক'রে তিনি ও তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড়

www.pathagar.com

সোমনাথ মন্দির ধুলোয় মিশিয়ে দেন। তারপর তারা দু'বছর থাকেন ভারতে।[২৫] এই সময় মাহ্‌মুদ পূর্ব ভারতের নানা এলাকায় ছোট-খাট অভিযান চালিয়ে নানা জায়গা দখল করেন। এরকম-ই একটি অভিযান চালিয়েছিলেন, উড়িষ্যায়। পূর্ব-কথিত জাজপুরে।

ঙ. রামাই পণ্ডিত

রামাই পণ্ডিতের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হ'য়েছে।

চ. মনপাল কুমোর

অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি অথবা মানব-মনের রূপক।

ছ. আকাশ মোল্লা

অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি অথবা 'গায়েবী জন' (আল্লাহ্)।

জ. নূর বিবি

অজ্ঞাত-পরিচয় গ্রাম্য মহিলা। রন্ধন-বিশেষজ্ঞ।

ঝ. বিবি হাওয়া

হজরৎ আদম-(আ.) এর পত্নী।

ঞ. বিবি নূর

হজরৎ আলী (রা.)র পত্নী। রূপকার্থে উল্লিখিত।

এছাড়া, এ-কবিতায় কিছু উপাধির উল্লেখ আছে। সেগুলো হ'ল—

ট. কাজী

সে-আমলে বিচারপতিদের উপাধি ছিল কাজী। মুছলমান ছাড়া কেউ কাজী হ'তে পারতেন না।

ঠ. গাজী

সৈনিক রূপে যুদ্ধে অংশ নিয়ে যিনি জীবিতভাবে ফিরে আসতেন, তাকেই গাজী বলা হ'ত। হজ ক'রে ফিরে এলে, তাঁকে যেমন হাজী বলা হয়।

দক্ষিণ বঙ্গ ও সুন্দর বন-বিজয়ী গাজী নামে পরিচিত ব্যক্তির কথাও ইতিহাসে র'য়েছে। ইনি পূর্বোক্ত ছোলতান মাহমুদের একজন আত্মীয় ছিলেন।

ঢ. শেখ

এ-শব্দটির শুদ্ধ রূপ 'শয়খ' বা "শায়খ'। অর্থ—প্রধান (ব্যক্তি)।

ন. "খনকার;' বা খোন্দকার

মুছলিম রাজ-দরবারের লেখক-পাঠকের উপাধি ছিল খোন্দকার।

www.pathagar.com

ত. ফকীর

ভিক্ষাজীবী মুছলিম অভিজাত খান্দানের উত্তরপুরুষ। অবশ্য এ-কালে অভিজাত-অনভিজাতের ফারাক নেই।

এ-কবিতায়, ঐ সব ছাড়া কিছু সামরিক-রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথাও আছে। সেগুলো হ'ল—

উত্তম আশ্বারোহী সৈনিক, পদাতিক সৈনিক, রণবাদ্য; নানা রকম নির্যাতনমূলক করারোপ এবং বৌদ্ধদের ওপর ব্রাহ্মণদের নানা ধরনের নির্যাতন।

আর আছে—একটি মুছলিম-সেনাবাহিনীর বিজয়-বাদ্য বাজিয়ে জাজপুরে সানন্দ প্রবেশের কথা।

১৬. 'কলিমা জাল্লাল'-এর আলোকে জাজপুরের ঠিকানা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

'কলিমা জাল্লালে'র পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ থেকে, এ-কবিতার মধ্যে যে-ক'টি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়, তা হ'ল—

ক. একটি মুছলিম সেনাবাহিনীর জাজপুর দখলৎ

খ. তার পূর্বেই মালদহে বা গৌড়ে নতুন শাসকদের নানা রকম নতুন কর আরোপ।

গ. করারোপকারীদের পূর্বে যারা গৌড় শাসন ক'রত তাদের ক্ষমতাচ্যুতি।

এই তিনটি ঘটনা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিন্যাস ক'রলে দেখা যায়—এ-সব ঘটনা ঘটে, পাল-রাজ প্রথম মহীপাল-(৯৮৮ থেকে ১০৩৮ খৃ. অ) এর সময়ে। তাঁর-ই রাজত্বকালে। তাঁর মূল রাজধানী ছিল 'অঙ্গ'-এ।

প্রথম মহীপাল সম্পর্কে আর. সি. মজুমদার লিখেছেন—"When Mahipala-I succeeded his father Vigrahapala-II about 988 A.D., the prospect of his family was undoubtedly gloomy in the extreme. It reflects no small credit upon him that by heroic efforts he succeeded in restoring the fortunes of his family, at least to a considerable extent."[৩১] মহীপাল তখ্তনশীন হওয়ার পর, তাঁকে তিনটি বড় বড় আক্রমণের মুখোমুখী হ'তে হয়। তা হ'ল—তাঁর রাজত্বের ৩য়

বছরে (৯৯১ খৃ. অব্দে), ৯ম বছরে (১০০৭-এ) ও শেষ ভাগে ১০২৬-এ)।

মহীপালের রাজত্বের ৩য় বছরে কম্বোরাজের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং কম্বোজরাজ গৌড় দখল করেন (মতান্তরে বরেন্দ্র), ৯ম বছরে আক্রান্ত হন চোলরাজ—রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক। আর শেষভাগ (১০২৬) আক্রান্ত হন—কলচুরি-রাজ কর্তৃক। আর. সি. মজুমদারের ভাষায়—"Towards the close of his reign Mahipala came into conflict with the powrerful Kalachuri ruler Gangeyadeva. The Kalchuri records claim that the latter defeated the ruler of Anga which can only denote Mahipala".[৩২]

পরস্পর-বিরোধী নানা তথ্য ছেঁকে প্রথম মহীপালের রাজত্বকাল সম্পর্কে বলা যায় যে, পিতা বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর মহীপাল রাজ্য লাভ ক'রলে, বহিরাগত কম্বোজরা তাঁর রাজত্বের (গৌড়ের) একাংশ দখল ক'রে নেয়। এ-অংশ সম্ভবতঃ উত্তর ও মধ্য বঙ্গ। তাঁর রাজত্বের তেছরা বছরে হয়তো তিনি এর একাংশ (বরেন্দ্র ভূমি বা উত্তর বঙ্গ) উদ্ধার করেন। তারপর ১০০৭ সালে চোলরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে রাজধানীসহ উত্তর ও মধ্য বঙ্গ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এ-সময় উড়িষ্যাও তাঁর হাত ছাড়া হয়। তারপর ১০২৬ সালে কলচুরিদের আক্রমণে তিনি আরও নাকাল হ'য়ে পড়েন এবং তাঁর রাজ্য সীমা আরও সংকুচিত হয়।

অথচ এই ইতিহাস ব্রাহ্মণ্যবাদী ইঙ্গ-হিন্দু ও তাদের অনুসারীরা ঘুরিয়ে লিখেছেন। তাঁদের কথা অনুযায়ী পাল রাজত্বের পতন-বিপর্যয় দেখা দেয়—প্রথম মহীপালের পুত্র ন্যায় পাল-(১০৩৮-১০৫৫ খৃ. অ. রাজত্বকাল) এর সময় থেকে। প্রচলিত ইতিহাসে প্রথম মহীপালকে মহা পরাক্রমশালী ও সফল শাসক, "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ:" ব'লে চিত্রণ করা হ'য়েছে। আর তাঁর রাজ্যসীমা 'বেনারস থেকে পূর্ববঙ্গ' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলা হ'য়েছে। এ-বিষয়ে আর সি. মজুমদারের কথা—"It reflects the greatest credit upon his ability and military genius that he succeeded in re-establishing his authority over a great part of Bengal, and probably also extended his conquests up to Benares."[৩৩]

অথচ এক-ই লেখক জানিয়েছেন—"Mahipala has been criticised by some writers for not having joined the Hindu confederacy organised by the Shahi kings of the Punjab against Sultan

www.pathagar.com

Mahmud of Ghazni. Some have attributed his inactivity to asceticism, ond others to intolerance of Hinduism and jealousy to other Hindu kings."[৩৪]

কিন্তু ড. মজুমদারের মতে—"It is difficult to subscribe to these views. When Mahipala ascended the throne, the Pala power had sunk to the lowest depths, and the Pala kings had no footing in their own homeland."[৩৫]

সে-সময় উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা ক'রে ড. মজুমদার ব'লেছেন—....."the disastrous and repeated invasions of Sultan Mahmud , which exhausted the strength and resources of the great powers, and diverted there attention to the west, It would have been highly impolitic, if not sheer madness, on the part of Mahipala to fritter away his energy and strength in a distant expedition to the west, when his own kingdom was exposed to the threat of disruption from within and invasion from abroad."[৩৬]

এ-সময় মহীপাল পশ্চিমে কোন্ দেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রত ছিলেন, তা ড. মজুমদার বলেননি। আসলে তিনি তখন রাজ্যহারা বা অতি দুর্বল-সময় অতিক্রম ক'রছিলেন। ফলে, ড. মজুমদারের উক্ত ঐতিহাসিক মূল্যায়নের মধ্যে যে ফাঁক ও স্ববিরোধ আছে—তা' স্পষ্ট।

কারণ, এটা ইতিহাস স্বীকার করে যে, গৌড়ে কম্বোজ-অধিকার স্থাপিত হ'য়েছিল দশম শতকের শেষ দিকে আর তা টিকে ছিল—একাদশ শতকেরও কিছুকাল। এরাই গৌড়ের পাল-রাজত্বের অন্তিম দশা ঘনিয়ে তুলেছিল। সেন-বর্মনরা গৌড় দখল ক'রেছিল কর্ণাটক থেকে এসে। সেনেদের আগে কম্বোজরা এসেছিল ক্যাম্বে উপসাগর এলাকা থেকে; বৃটিশ আমলে যে-এলাকা ছিল—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত।

তারপর, দশম শতক যেতে না যেতেই ১০০১ খৃ. অব্দ থেকে শুরু হয়—ছোলতান মাহ্মুদের হিন্দুস্তান-অভিযান। ১০০১ সালে তিনি পাঞ্জাব দখল করেন। আর ১০২৫ সালে দাক্ষিণাত্যের কাথিওয়াবাড় আক্রমণ করে সোমনাথ দখল করেন। গৌড় ও সোমনাথ (উড়িষ্যা) তখন কম্বোজ অধিকারে। আগে তা ছিল—গৌড়ের পালদের দখলে।

www.pathagar.com

মোটের ওপর, ১০০১ সাল থেকে ১০২৫ সাল তক ছোলতান মাহ্মুদ ১৭ বার ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলো তছনছ ক'রে দিয়ে যখন সেগুলো দখলে নেন; খ্যাতিমান গৌড় রাজ্য তখন তাঁর অভিযানের বাইরে ছিল না। ছোলতান মাহ্মুদ যখন গৌড় আক্রমণ করেন তখন গৌড়-সিংহাসনে প্রথম মহীপাল ছিলেন না। গৌড়-উড়িষ্যা তখন চোল-রাজ কর্তৃক অধিকৃত। মহীপালের রাজত্ব তখন রাঢ় অঞ্চলে ও পশ্চিম বঙ্গেই সীমিত ছিল। তিনিও তখন হ'য়ে প'ড়েছিলেন দুর্বল। ছোলতান মাহ্মুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অসমর্থ। এ-কারণেই তিনি তথাকথিত 'মহাশক্তিমান নরপতি' হওয়া সত্ত্বেও ছোলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে একা এগিয়ে যাওয়া বা অন্য কারো সাথে হাত মিলিয়ে প্রতিরোধে অংশ নেয়া সম্ভব হয় নি। ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা এ সত্য জেনে বা না জেনে চেপে যেতে চান। আর সে-কারণে 'কলিমা জাল্লালে'র সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যায় তাঁরা এগিয়ে আসেননি।

কিন্তু মুছলিম বাহিনী জাজপুর পৌছবার আগে মালদহে (গৌড়ে) নানা রকম নতুন করা কারা বসায়, তা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

ড. মজুমদার ব'লেছেন—চোলদের উত্তরাভিমুখী অভিযান ঘটে ১০২১ থেকে ১০২৩ খৃ. অব্দ তক। এ-সময়েই তারা উড়িষ্যাসহ উত্তর বঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ দখল করেন। এর পরে ১০২৫-সালেই সম্ভবতঃ ছোলতান মাহ্মুদের শেষ ও চূড়ান্ত অভিযান পরিচালিত হয়। যদিও প্রফেসর এস. কে. আয়াঙ্গার মনে করেন—তখন উড়িষ্যার রাজা ছিলেন মহীপাল, তথাপি আমাদের ধারণা এ-সময় এ-সব এলাকা চোলরাজা রাজেন্দ্র চোলের-ই দখলে ছিল। দখলে ছিল—গৌড়-মালদহও। তাই মালদহে নতুন করও আরোপ ক'রেছিলেন এই বহিরাগত চোল রাজাই। এ-ঘটনা ছোলতান মাহমুদের উড়িষ্যা দখলের পূর্ববর্তী। তাই নয়া রাজাদের নতুন কর বসাবার অল্পকাল পরেই ১৯২৫-'২৬ সালে ছোলতান মাহমুদের অভিযানের মুখে গৌড়-উড়িষ্যার পতন ও জাজপুর দখল হওয়ায় জনগণ মুছলিম শাসকদের দয়ায় চোলদের ধার্য সেই কর দান থেকে বেঁচে যায়। অতএব, জাজপুর-জয় একাদশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্য ভাগের ঘটনা।

এ-ঘটনার যে-চিত্র "কলিমা জাল্লালে" আছে; রামাই পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা লব্ধ বা স্বচক্ষে দেখা সে-ঘটনার কাব্য রূপ দান যে ঐ সময়েই ঘটে—তা স্বীকার্য। আর সেই সাথে এও স্বীকার্য যে, রামাই পণ্ডিত উড়িষ্যার জাজপুরেই পয়দা হন; হুগ্লীর জাজপুর নয়।

www.pathagar.com

১৭. 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'য় নিহিত ধ্বংসকর্মের ব্যাখ্যা

এবার আলোচ্য কবিতাংশে কোথাকার ধ্বংসকর্মের কথা বলা হ'য়েছে—তা আলোচনা করা হবে।

রামাই পণ্ডিতের রচনায় পূর্বোক্ত 'কলিমা জাল্লাল' বা 'জালালী কলেমা'র পয়লা অংশে তথাকথিত "নিরঞ্জনের রুষ্মা"য়— কোন্ স্থানে, কোন্ জাতির, কার বাহিনীর ধ্বংসকর্মের চিত্র আঁকা হ'য়েছে; সে-আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কারণ বিষয়টি সম্পর্কে আধুনিক বিদ্বানরা এক মত নন। এ-বিষয়ে মার্কসবাদী আলেম গোপাল হালদার তাঁর 'বাঙ্লা সাহিত্যের রূপ-রেখা'-১ম খণ্ডে বয়ান ক'রেছেন—"তুর্ক আক্রমণের ধ্বংস-চিত্র হিসাবে বাঙ্লা ভাষায় একটি নমুনা প্রায়-ই উল্লেখিত হয়; সেটি 'শূন্য পুরাণে'র অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক একটি কবিতা-অংশ। সে অংশটুকু বেশ কৌতুককর। অনুমান করা হয়, এ হ'চ্ছে চতুর্দশ শতকে ওড়িষ্যার কোণারক নগর ধ্বংসের কথা। বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার করাতে নিরঞ্জন রুষ্ট হ'য়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দেবতাদের যুদ্ধে নিয়োজিত ক'রলেন,—দেবতারা এলেন মুছলমান-রূপে,—এই হ'ল সেই অংশের বক্তব্য।"[৩৭]

বলা দরকার যে, একজন মার্কসবাদী হিন্দু লেখক যে, মুছলিম-বিদ্বেষী হিন্দুবাদের ওপরে কখনও উঠতে পারেন না; অথবা উঠতে পারলেও তা খুব সামান্যই—তা 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'র গোপাল হালদারকৃত ঐ ব্যাখ্যা প্রমাণ করে। এ-বিষয়ে বরং অমার্কসবাদী হিন্দু লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন-আদির বক্তব্য অনেক বেশী যুক্তিগ্রাহ্য এবং তথ্য-সম্মত—তা সত্য। আলোচ্য বিষয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"উহা (ঐ কবিতা) হইতে জানা যায়—সদ্ধর্মী বা সধ্ধর্মী বৌদ্ধেরা মুছলমান-বিজেতার সাহায্যে হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ দিয়া কথঞ্চিত শান্তি লাভ করিয়াছিল।"[৩৮] দোছরা কথা হ'ল—আলোচ্য কবিতাংশে চৌদ্দ শতকে ছোলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলকের কোনারক মন্দির ধ্বংসের কথা আছে—না একাদশ শতকের অন্য কোন স্থান দখলের ঘটনা আছে; তা—মূল কবিতার মধ্যেই বলা হ'য়েছে। সে-বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

১৮. কলিমা জাল্লাল-এর রচনাকাল

পূর্বেই বলা হ'য়েছে—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'শূন্য পুরাণে'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে ব'লেছেন—"আমি লাউ সেন ও

রামাই পণ্ডিতকে খৃষ্টীয় দশম শতকের লোক বলিয়া মনে করি।" তিনি রামাইয়ের জীবৎকাল একবার দশম শতক, একবার দ্বাদশ শতক ও একবার ত্রয়োদশ শতক ব'লেছেন। তাহ'লে, তাঁর নানা মতের মধ্যে যে-স্ববিরোধ তার ব্যাখ্যা কি? আর তাঁর শেষের মত (দশম শতক) যদি সত্য হয়; তবে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'র মুছলিম-অভিযানের ব্যাখ্যা কি? সংগতি-ই বা কোথায়? দশম শতকে কি বাঙালায় বা তার আশে-পাশে কোথাও মুছলিম অভিযান হ'য়েছিল?

বলা দরকার যে, "কলিমা জাল্লাল"-এর পহেলা অংশে জাজপুরে যে-অভিযানের বয়ান করা হ'য়েছে—তা হুগলীর জাজপুর ব'লে মনে করা হ'য়েছে। এ-বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"ব্রাহ্মণেরা দুর্দ্দিনে তাহাদের উপর যে-অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার আভাষ শূন্যপুরাণের "নিরঞ্জনের উষ্মা" শীর্ষক অধ্যায়ে পাওয়া যায়। হুগ্‌লী জেলার জাজপুর গ্রামে এই অত্যাচারের চূড়ান্ত হইয়াছিল।"[৩৯] আসলে "কলিমা জাল্লাল" বা 'নিরঞ্জনের রুষ্মা"-ধৃত জাজপুর—হুগলীর নয়; উড়িষ্যার। উড়িষ্যার এই জাজপুরে চৈতন্য দেবের পূর্ব পুরুষের বসবাস ছিল। তাঁরা মুছলিম অভিযানের সময় সেখান থেকে ছিলেটে চ'লে আসেন এবং তারপর ছিলেট থেকে তাঁরা যান—নদীয়ায়। কাজেই উড়িষ্যার জাজপুরে, কেউ কখনও অভিযান চালিয়েছেন কি না, তা খোঁজা জরুরী। এ-বিষয়ে "কলিমা জাল্লাল"-এর দিকে তাকালে দেখা যায়; রচনাটির এক জায়গায় বলা হ'য়েছে—

"মারিয়া দুশমন কা সির।
বাদশা দিলেন মাহমুদ বির॥"

এই 'বীর মাহমুদ' কে? ইনি যে, গজনীর ছোলতান ইয়ামিন্ আল্ দৌলা আবুল কাছেম মাহমুদ ইবনে সবুক্তগীন—তা নিশ্চিত রূপেই বলা যায়। কারণ, ছোলতান মাহমুদের সতের বার ভারত-আক্রমণের কথা ইতিহাস-পাঠকানের অজানা নয়। ছোলতান মাহমুদের জন্ম ৯৭১ ইছায়ীর ৩০ শে এপ্রিল; আর তাঁর ইন্‌তেকাল ১০৩০ ইছায়ীতে। গজনীতে। তিনি গজনীর তখ্‌ত তাউসে বসেন—৯৯৮ ইছায়ীতে। আর হুকুমৎ পরিচালনা করেন মৃত্যুকাল তক।[৪০]

তাহ'লে, 'কলিমা জাল্লাল'-এর "মাহমুদ বির" যে, বেশক ছোলতান মাহমুদ এবং তিনি-ই জাজপুর-অভিযান ক'রেছিলেন—তা কবুল না ক'রে উপায় নেই।

এ-প্রসঙ্গে আর বলা দরকার যে, বিখ্যাত 'গাজীকালু চাম্পাবতী'-কাহিনীর নায়ক গাজী শাহ্ অনৈতিহাসিক ব্যক্তি নন। তিনি যে, ছোলতান মাহমুদের ই একজন আত্মীয় ছিলেন—তা বৃটিশ বিদ্বানরা উল্লেখ ক'রেছেন। একাদশ শতকের প্রথম

www.pathagar.com

ভাগে ছোলতান মাহ্মুদ গৌড়-উড়িষ্যা দখলের পর তাঁর এই আত্মীয় গাজী শাহ্-ই দক্ষিণ বঙ্গ ও সুন্দরবন এলাকা দখল করেন। তারপর উড়িষ্যায় বাহ্রাইচে এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।[৬১] সেখানেই তিনি শুয়ে আছেন।

আরও বলা দরকার যে, 'ধর্ম্মপূজা-বিধানে'র অন্যত্রও এই বীর মাহমুদের একাধিক বার উল্লেখ আছে। যথা—

ক. "পশ্চিম মুখে খোনকার করন্তি সেবা॥
কেহ পূজে আল্লা কেহ পূজে আলি
কেহ পূজে মামুদা সাই।"
খ. "সাজরে ভাই মামুদা সাই মুছলমান।
মারিতে হিন্দুর বোত করিল পয়ান॥"[৬২]

এই তথ্য মাফিক এখন ছাফ বলা যায়—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র আগের অভিমত-ই সত্য; পরেরগুলো নয়। কাজেই প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-কথিত রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাব ও রচনাকাল একাদশ শতকের গোড়ার দিকে। আমাদের ধারণা সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের পরেই, এ-অভিযান পরিচালিত হয়। কবিতাটি লেখা হয় তার পরে পরেই। তাহ'লে 'কলিমা জাল্লালে'র রচনাকাল দাঁড়ায় ১০২৫ সাল।

উপরের আলোচনা অনুযায়ী—'কলিমা জাল্লাল' বেশক একাদশ শতকের ফারছী-বাঙালায় লেখা বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের একটি জেনুইন নমুনা। আর তার ফলে বলা চলে, চর্যাপদ নয়; 'কলিমা জাল্লাল'ই বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার আদি নমুনা। আর তা একাদশ শতকের ফারছী-বাঙালায় রচিত।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ । বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, (ঢাকা-১৯৯৮), পৃ.-১৬ ।
২. দেখুন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । বৌদ্ধ গান ও দোহা, (কলি.-১৩৬৬), পৃষ্ঠা-৪১ । মুনিদত্তের টীকা ।
৩. দেখুন—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা-১ম খণ্ড, (ঢাকা-১৩৭৫), পৃষ্ঠা-৭ ।
৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । পূর্বোক্ত, পৃ.-২৩ ।
৫. See—S.K. Chatterji. The Origin And Development of The Bengali Language. (Rupa Ed. Cal.-1985), P. 123.
৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ । বা. সা. ই. বৃ., পূর্বোক্ত, পৃ.-৩০ ও ৪১ ।
৭. S.K. Chatterji. P. 114.
৮. দেখুন—আনিসুল হক চৌধুরী । বাংলার মূল, (ঢাকা-১৯৯৮) ।
৯. দেখুন—এস. এম. লুৎফর রহ্মান । বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯০৫), পৃ. ১৮১-'৮৫ ।
১০. দেখুন—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । শূন্য পুরাণ (কলি.১৩৩৬) ।
১১. দেখুন—
    ক. দীনেশ চন্দ্র সেন । বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, পূর্বোক্ত পৃ.-৩২ ।
    খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ । শূন্য পুরাণ, ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ.-৩৬ ।
    গ. ঐ, বা. সা. ক., পূর্বোক্ত, পৃ.-১২৫ ।
১২. দীনেশচন্দ্র সেন । বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, (৮ম সং, কলি-১৩৫৬), পৃ.-৩২ ।
১৩. দীনেশচন্দ্র সেন । বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য. পূর্বোক্ত, পৃ.-৩১-৩২ ।
১৪. ঐ, পৃ.-৩৩ ।
১৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ । বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, পূর্বোক্ত, পৃ.-১১ ।
১৬. ঐ, পৃ.-১২ ।
১৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ । শূন্যপুরাণ, ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ.-(৩৬) ।
১৮. ঐ, পৃ.-(৬০) ।
১৯. দীনেশচন্দ্র সেন । বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১ ।
২০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ । বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫ ।
২১. দেখুন—শূন্য পুরাণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩২-'৩৬ ।
২২. দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ-৮ ।

www.pathagar.com

২৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ । পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ.-(৩৪)-(৩৫) ।
২৪. দীনেশ চন্দ্র সেন । বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১ ।
২৫. দেখুন—রামাই পণ্ডিত । ধর্ম্মপূজা-বিধান, (কলি–১৩৩২), পৃ.
২৬. গোপাল হালদার । বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা-১ম খণ্ড, (৩য় সং. কলি-১৩৭০), পৃ.-১২৭ ।
২৭. দেখুন—সুখময় মুখোপাধ্যায় । বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর/স্বাধীন সুলতানদের আমল (কলি.-১৯৯৬), পৃ.-১০৯-'১১ ।
২৮. দেখুন—ঐ, পৃ.-১২১ ।
২৯. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । পূর্বোক্ত, পৃ.-৭৩ ।
৩০. ঐ, পৃ.-৭৪ ।
৩১. A. C. Majumdar. The History of Bengal , (D. U. 2nd Ed.1963), P. 136.
৩২. Ibid P. 141.
৩৩. Op. cit P. 141.
৩৪. Op cit. P. 141.
৩৫. Op Cit. P. 141.
৩৬. Ibid P. 142.
৩৭. গোপাল হালদার । পূর্বোক্ত, পৃ.-৪০ ।
৩৮. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।পূর্বোক্ত, পৃ.-১২৬ ।
৩৯. দীনেশচন্দ্র সেন । বৃহৎ বঙ্গ-১ম খণ্ড, (কলি.-১৩৪১), পৃ.-৩৩২ ।
৪০. See—Encyclopeadia Britanica, Vol. 7. 15 edition-1997, P.-702.
৪১. See—Willam Cook. The Ethnology, Languages, Literature And Religions of India (Delli-1975), Cl. III, P. 134.
৪২. উদ্ধৃত—হরিদাস পালিত । আদ্যের গম্ভীরা, (মালদহ-১৩১৯) পৃ.- ১১৯-'২০ ।

www.pathagar.com

তুর্‌কী ও ছোলতানী আমলে
বাঙালা দেশের ও বাঙালা ভাষার
সামাজিক পরিবেশ

বাঙালার রাষ্ট্রীয় জীবনে তুর্‌কী আমলের সূচনা ৬০১ হিজরী বনাম ১২০০ ঈছায়ীতে। কিন্তু বঙাল-গৌড়-মগধে (বিহার) ইছলাম ও মুছলিম জনকওমের বসবাস ৭ম-৮ম শতক থেকেই। যতদূর জানা যায়, হজরৎ মুহম্মদ (দ.) বেঁচে থাকতেই তাঁর একজন চাচা ইছলাম গ্রহণ ক'রে নোয়াখালীতে এসে বসবাস করা শুরু করেন। সেখানেই নাকি তাঁর নির্মিত একটি মছজিদ আজও র'য়েছে।

তথাপি বলা দরকার যে, বাঙ্‌লাদেশে ইছলাম-আগমন ও মুছলিম জনবসতির অতিশয় ঘনত্ব সম্পর্কে এদেশের মানুষের কোন ঠিকঠাক ধারণা নেই। তাঁদের কারো কারো মতে—"মধ্য যুগে সেন্সাস ছিল না। ফলে বাঙ্‌লাদেশে মুসলিম সমাজের উদ্ভব, গঠন, প্রকৃতি, বিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা সম্ভব নয়। তের শতকের গোড়ায় তুর্কি বিজয়ের ফলে বাঙালায় মুছলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়, তা ঐতিহাসিক সত্য। বিভিন্ন দেশের বহিরাগত এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুছলমান দ্বারা এ-সমাজ গঠিত হয়, তা-ও ধ্রুব সত্য। কিন্তু বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত মানুষের সংখ্যা ও অনুপাত বৃদ্ধি কি রূপে হয়, সামাজিক শক্তি হিসাবে কখন তা আত্মপ্রকাশ করে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন।"[১]

মধ্য যুগে সেন্সাস বা আদম শুমারী ছিল না; একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে, তখনকার আদম শুমারীর কোন বিবরণ আজও খোঁজা হয়নি—পাওয়া যায়নি—এটা সত্য। তাই,—"তের শতকের গোড়ায় তুর্কী বিজয়ের ফলে বাঙালায় মুছলিম সমাজের গোড়া পত্তন হয়"—একথা সত্য নয়। তা পূর্বের আলোচনায় প্রমাণিত হ'য়েছে। এজন্য এখন সে-প্রশ্নে আলোচনার দরকার নেই। এখন আলোচনার বিষয় হ'ল—এগারো শতক থেকে পনের-ষোল শতক (১২০১-১৫৭৫ খৃ. অব্দ) তক সময়ে—তুর্‌কী ও ছোলতানী আমলের আজাদ বাঙালায়—বাঙালা ও অপরাপর ভাষার পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন ছিল—তার ইতিহাস।

www.pathagar.com

বলা দরকার যে, বাঙালায়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে আসার আগেই মুছলিম নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল পীর-দরবেশানের হাতে। সে-ক্ষমতা—মছজিদ-মাদ্রাছা-খানকাবাসী ইরান-আরব ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত ছুফীরাই পরিচালনা ক'রতেন। এ-সব ছুফীর যে সামরিক প্রতিভাও ছিল, তা সুখময় মুখোপাধ্যায় কবুল ক'রেছেন। তার প্রমাণ এখনও এদেশের নানা লোক-কথায়, স্মৃতিকথায়, কিংবদন্তীতে এবং পুথি-কেতাবে ছড়িয়ে আছে। তাই বাঙালার সারা এলাকার মুছলিম-অধ্যুষিত জনবসতির যে-চিত্র চোদ্দ শতকের দ্বিতীয় দশকে হজরৎ নূর কুতবুল আলম দিয়ে গিয়েছেন, তার ভিত্তিতে, রাষ্ট্র-ক্ষমতা স্থাপনের আগেকার ছুফীদের ক্ষমতা ও শক্তি-বিস্তারের খবর নিতে হবে। আর সেই সাথে ঐ সব ছুফী কোন্ কোন্ দেশ থেকে বাঙালায় এসেছেন তার হদিছ নেয়া জরুরী। কারণ সেই সূত্রেই পাওয়া যাবে—বাঙালার প্রকৃত জনসাধারণের, বিশেষ করে মুছলিম জনকওমের মুখের ও কাজের ভাষার খবর।

এ-বিষয়ে, বিশেষ ক'রে—বাঙালার নানা এলাকায় ছুফী পীর-দরবেশানের আগমন সম্পর্কে আলোচনা ক'রতে গিয়ে, ড. এম. এ. রহিম জানিয়েছেন—"দু'টি প্রধান সম্প্রদায়—কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ অধিবাসী ও জৈন ছাড়াও বাঙালাতে কিছু সংখ্যক পারসিকও ছিল। ষোড়শ শতকে আরও দু'টি নতুন সম্প্রদায় প্রদেশের জনসংখ্যায় যুক্ত হয়। এরা ছিল পর্তুগীজ ও আর্মেনীয়।

বাঙালার মুছলিম জনসংখ্যা বহিরাগত ও ধর্মান্তরিক এই উভয় প্রকার মুছলমানদের দ্বারা গঠিত হ'য়েছিল। বহিরাগত মুছলমানগণ প্রধানতঃ তুর্কী, আফগান, মুগল, ইরানী ও আরব ছিল। অবশ্য কিছু সংখ্যক ওসমানীয় তুর্কী, হাবশী এবং অন্যান্য বিদেশী মুছলমানও ছিল। মুছলিম জনসংখ্যার বিভিন্ন অধিবাসী তাদের বিশিষ্ট গুণাবলীতে বিভূষিত ছিল। তেজস্বী ও দুঃসাহসী তুর্কীরা সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী ছিল। শক্তিশালী, সাহসী ও সামরিক জাতি হিসাবে আফগানদের খ্যাতি ছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাদের খুব প্রিয়। বলিষ্ঠ ও উদ্যমশীল মুগলদের খ্যাতি ছিল সাংগঠনিক দক্ষতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। অসি-চালনায় এবং শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইরানীদের সমান পারদর্শিতা ছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যিক গুণাবলী, মার্জিত আচার-ব্যবহার এবং সুভাষণ ও সুকথনের জন্য তাদের খ্যাতি ছিল। ধর্মের আদর্শের প্রতি যেমন, তেমনি সুমদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রতি আরবদের অনুরক্তি ছিল অসাধারণ। ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণাবলীর জন্যে আবিসিনীয়দের খ্যাতি ছিল। বিভিন্ন দেশাগত মুছলমান অধিবাসীরা এভাবে বাঙ্লাদেশে এক নতুন শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করে।

www.pathagar.com

এর ফলে নিস্তেজ বাঙ্গালী সমাজ দেহে এক নবীন প্রাণের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং একে উন্নতির পথে অনুপ্রাণিত করে।"[২]

ড. রহিম এরপর বাঙালায় প্রথম আরবদের বসতি সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন। তারপর লিখেছেন—"জনশ্রুতি অনুসারে, কিছুসংখ্যক মুছলমান সাধু-দরবেশ, যাদের বেশীর ভাগ-ই ছিলেন আরব ও ইরানীয়, তারা বাঙালায় বসতি স্থাপন করেন এবং হিন্দু রাজাদের আমলে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইছলাম প্রচার করেন। এই সমস্ত সাধু পুরুষরা হলেন বাবা আদম শহীদ (ঢাকা জেলার বিক্রমপুর), শাহ সুলতান রুমী (ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমা), শাহ সুলতান মাহীসওয়ার (বগুড়া জেলা), মখদুম শাহ্‌দৌলা শহীদ (পাবনা জেলা), মখ্‌দুম শাহ্ গজনবী (বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট) ও আরও অনেকে। বাঙালার প্রথম যুগের এই সাধু-দরবেশদের আগমনের কাল সম্বন্ধে স্থানীয় কিংবদন্তীগুলোর বিশ্বস্ততা নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। যাহোক, এ সমস্ত ঘটনাবলী আমাদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে, মুছলিম-বিজয়ের পূর্বে কিছু সংখ্যক ছুফী-দরবেশ বাঙালায় আগমন ক'রে থাকবেন। **মিনহাজ লিখেছেন যে, মুহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজী বাঙ্‌লাদেশে অনেকগুলো খানকাহ্ নির্মাণ করেন।** এতে অনুমিত হয় যে, বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বঙ্গ-(আসলে 'গৌড়') বিজয়ের পূর্বেই কতিপয় মুছলিম সাধুপুরুষ এদেশে তাদের ধর্মীয় প্রচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং এজন্য 'খানকাহ্' নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।"[৩]

ড. রহিম মুছলিম-বিজয়ের পরবর্তীকালে মুছলিম বসতি ও ছুফী-দরবেশদের আগমন নিয়ে লিখেছেন—"**বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে অনেক পরিবার আরব দেশীয়** সাধক ও বাসিন্দাদের বংশধর। বাঙ্‌লাদেশে চিশ্‌তিয়া সম্প্রদায়ের বিখ্যাত সাধক শেখ আখি সিরাজউদ্দিন উছমান ছিলেন **কোরেশ বংশীয় একজন আরব**। খ্যাতনামা দরবেশ শেখ আলাওল হক ও হযরত নূর কুতবুল আলমের বিখ্যাত পরিবারও **আরব দেশীয়** ছিলেন। **সমসাময়িক বাঙালা সাহিত্য থেকে আরবীয় গোত্রের দাবীদার বহু ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়**। একজন প্রাচীন মুছলমান কবি মুহাম্মদ খান (১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত) নিজেকে চট্টগ্রামের বিখ্যাত সাধুপুরুষ বদর শাহের সমসাময়িক মাহীছওয়ার নামক বহিরাগত **আরব ছুফীর বংশধর** ব'লে দাবী করেন। এই বদর শাহ্‌কে সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের একজন সেনাপতি ও চট্টগ্রামের প্রথম মুছলিম বিজেতা কাদল খান গজনবী অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। মাহী ছওয়ার চট্টগামে একজন **ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে** করেন এবং এরই গর্ভে হাতেম নামে তার এক পুত্র সন্তান জন্মে। হাতেমের পুত্র ছিলেন ছাদিক এবং

www.pathagar.com

এই ছাদিকের পুত্র রাস্তি খান ছিলেন সুলতান বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৪৭ খৃ.) অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা, যিনি 'আলাওল মছজিদে'র (অনুশাসন লিপি, ৮৭৪ হিজরী/১৪৭৩ খৃ.) নির্মাতা ছিলেন। রাস্তি খানের পুত্র পরাগল্ খান নামে পরিচিত মিনা খান সুলতান হোসেন শাহের শাসনামলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। মিনা খানের পুত্র গাবুর খাঁকে ত্রিপুরা ও আসাম বিজয়ী হোসেন শাহের বিখ্যাত সেনাপতি ছুটি খানের সঙ্গে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করা হয়। গাবুর খানের পুত্র হামজা খান ছিলেন পর্তুগীজদের বর্ণিত আমিরজা খান, যিনি **সুলতান মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রামের শানকর্তা ছিলেন**। কবি মুহাম্মদ খানের পিতা মুবারিজ খান ছিলেন হামজা খানের প্রপৌত্র। **বাঙালার বিভিন্ন অঞ্চলে এমন বহু পরিবার আছে, যারা আরবদেশীয়** সাধক, **বণিক ও অন্যান্যদের থেকে তাদের বংশের উৎস সন্ধান করেন**। যদিও অনেকের দাবির সারবত্তা নির্ণয় করা কঠিন, তথাপি এ-থেকে একটি সাধারণ ধারণা জন্মে যে মুছলিম বিজয়ের পরে বেশ কিছু সংখ্যক আরব এদেশে তাদের বসবাস স্থাপন করেন।"[৪]

অতঃপর **ইরান থেকে আগত ছুফী পীর-দরবেশানের উল্লেখ** করা আবশ্যক। এ-বিষয়ে ড. এম. এ রহিম লিখেছেন—"আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে **পারস্য দেশীয় যারা আরবী ভাষা বলতেন ও আরবী সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব ক'রতেন** তারাও ছিলেন, আরবদের মতোই সমুদ্রচারী ও ব্যবসায়ী। প্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে তারা ব্যবসা চালাতেন। সুতরাং এটা ধারণা করা খুব-ই যুক্তিসঙ্গত যে, **চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস স্থাপনকারী মুছলমানদের মধ্যে আরবী ভাষাভাষী কিছু সংখ্যক ইরানী** ছিলেন। মুছলমানদের বাঙালা জয়ের পরে, প্রচুর সংখ্যক ইরানী ব্যবসায়ী, সাধক, ধর্ম-প্রচারক, শিক্ষক, ভাগ্যান্বেষণকারী বাঙালায় আগমন করেন এবং বসতি স্থাপন করেন। ভারতের প্রথম মুছলিম ঐতিহাসিক **মিনহাজের বর্ণনায় ইরানী বণিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়**। মিনহাজ লিখেছেন, আলাউদ্দীন আলী মর্দান খলজীর সময়ে লক্ষ্মণাবতীর একজন ইস্পাহানী ব্যবসায়ী তার সমস্ত কিছু হরিয়ে ফেলেন। বিপন্ন অবস্থায় এই ব্যবসায়ী বাঙালার খলজী শাসনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুছলিম শাসনের সূচনাকাল থেকে বাঙালার শহরগুলোতে ইরানী বণিকরা বর্তমান ছিলেন। বিদেশী পর্যটনকারী বারথেমা, বারবোসা প্রমুখ ব্যক্তির বর্ণনা থেকে অনুমান হয় যে, **বিপুল সংখ্যক ইরানী বণিক বাঙালার সমুদ্র-বন্দর ও শহরগুলোতে বসবাস ক'রতেন**।

পারস্য ছিল ছুফীবাদের আদি আবাসভূমি। বেশির ভাগ ছুফী বা

www.pathagar.com

মরমীবাদী যারা বাঙালা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে আগমন ক'রেছিলেন, তাঁরা ছিলেন ইরানী। বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ শেখ জালালউদ্দিন তবরিজীও ইরানী ছিলেন। ইনি মুছলমান বিজয়ের অব্যাহিত পরেই উত্তর বঙ্গে ইছলাম প্রচার করেন। হযরত মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর একটি পত্র থেকে জানা যায় যে, শেখ জালাল উদ্দীন তবরিজ ও শেখ সিহাব উদ্দীন ছোহারাওয়ার্দীর বহু শিষ্য তাঁদের পূণ্য পদস্পর্শে বাঙালাকে ধন্য ক'রেছিলেন। হযরত শরফ্উদ্দীন আবু তাওয়ামা ছিলেন একজন বিখ্যাত ইরানী ছুফী ও পণ্ডিত। তিনি সপরিবারে তাঁর ভ্রাতাসহ সোনারগাঁয়ে বসতি স্থাপন করেন।

মুছলিম শাসনের শুরু থেকে বহু ইরানী রাজকর্মচারী এখানে ছিলেন। মিনহাজের মতে, মুহাম্মদ বিন-বখতিয়ার খলজির সময়ে ইস্পাহানের বাবা কোতোয়াল ছিলেন লখনৌতির নগর কোতোয়াল। মোঙ্গলদের পারস্য আক্রমণের ফলে, বহু পারস্যবাসী হিন্দুস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে ও তাদের কিছুসংখ্যক বাঙ্লাদেশে আগমন করে। শাহ্ সুজা যখন বাঙালার সুবাদার ছিলেন, তখন বহু ইরানী তার অধীনে রাজকর্মচারী, সেনাপতি ও সৈনিক হিসেবে কাজ করে। মীর জুমলা ও শায়েস্তা খান কয়েক বছর এই প্রদেশ শাসন ক'রেছিলেন, তারাও ইরানী ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবরা নিজেরা ইরানী ছিলেন। সেজন্য তারা স্বদেশীয় লোকদের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করেন। ফলে সরকারী কর্মচারী, সেনাপতি, সাধারণ সৈনিক, শিক্ষক ও চিকিৎসকরূপে বহু ইরানী নদীর স্রোতের মতো বাঙালায় আগমন করে। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ এবং এর ফলে হাঙ্গামা, গৃহযুদ্ধ ও বিভ্রান্তি-বিশৃঙ্খলার দরুণ যখন সমগ্র উত্তর ভারত বিপর্যস্ত তখনও বহু ইরানী পরিবারকে বাধ্য হ'য়ে ইরানীয় নবাবদের শাসনাধীন বাঙালায় আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। নাদির শাহের মৃত্যুর পর পুনরায় পারস্যে বিশৃংখলার ফলে বহু ইরানী দেশত্যাগী হ'য়ে বাঙালায় আগমন করে। সমসাময়িক ইতিহাসগুলো থেকে আমরা বাঙালায় আগত বহু খ্যাত নামা ইরানী মুহাজিরের উল্লেখ পাই। 'তারিখ-ই-মনছুরী'র লেখক আলী-বিন-তুফায়েল আলী খান স্বয়ং ইরানী ছিলেন; তিনি লিখেছেন যে, নবাব সুজাউদ্দীন ইরানী বহিরাগতদেরকে নানা ভাবে অনুগ্রহ ক'রেছিলেন। হাকিম মীর মুহাম্মদ হাদী নামক নবাব সুজাউদ্দীনের সভা-চিকিৎসক একজন ইরানী ছিলেন। তিনি মুর্শীদাবাদে একটি বিখ্যাত চিকিৎসক ও শাসক পরিবার রেখে যান। গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ নবাব আলী বর্দী খানের রাজদরবারের ইরানী চিকিৎসক, পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের একটি দীর্ঘ তালিকা

www.pathagar.com

দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়; যেমন, মুহাম্মদ আল-মোদোবেদ আলী, শাহ্ মুহাম্মদ হাছান, ছৈয়দ মুহাম্মদ আলী, হাজী বদিউদ্দীন, মীর মুহাম্মদ আলী ফজল, নকী আলী খান, মীর মুহাম্মদ আলীম, মৌলবী মুহাম্মদ আরিফ, মীর রুস্তম আলী, শাহ মুহাম্মদ আমীন, শাহ্ আদম, হায়বৎ বেগ, শাহ খিজর, ছৈয়দ মীর মুহাম্মদ ছাজ্জাদ, ছৈয়দ আলীম উল্লাহ, শাহ্ হায়দরী, মীর মুহাম্মদ আলী, জায়ের হোছেন খান, তকী কুলী খান, হাজী আবদুল্লাহ, আলী ইব্রাহীম ও হাজী ইব্রাহীম মুহম্মদ খান।

ইতিহাস লেখক ইউছুফ আলী, গোলাম হোছেন তাবাতাবাঈ, করম আলী ও অন্যান্য **আরও অনেকে ইরানী ছিলেন**। এর ফলে দেখা যায় যে **নবাবী আমলে যে সকল ইরানী বাঙালায় বসতি স্থাপন ক'রেছিলেন তাদের সংখ্যা নগণ্য ছিল না**।"[৫]

এরপর **তুর্কী মুছলমানদের উল্লেখ** করা আবশ্যক। বাঙালায় তুর্কীদের জনবসতি-বিষয়ে আলোচনাকালে ড. রহিম বলেন—"**তুর্কি মুছলমানরা অবশ্যই প্রচুর সংখ্যায়** বাঙালায় আগমন ক'রেছে। শক্তিশালী হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনের হাত থেকে বাঙালা জয়ের অভিযানে মুহাম্মদ-বিন-বখ্তিয়ার খলজী অবশ্যই একটি বড় সৈন্যদল সঙ্গে এনেছিলেন। মিনহাজ বলেন যে, মুহাম্মদ-বিন-বখ্তিয়ার খলজী তার তিব্বত অভিযানে দশ হাজার সৈন্যের একটি আশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনা করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের নতুন অধিকৃত এলাকার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে এবং জাজনগর ইত্যাদি অঞ্চলগুলো জয়ের জন্যে তিনি তার সেনাপতিদের অধীনে বেশকিছু সৈন্য রেখে গিয়ে থাকবেন। অধিকন্তু; **খলজী-তুর্কীরা, যারা বিজেতা, সৈনিক ও ভাগ্যান্বেষণকারীরূপে বাঙালায় আসে, তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সমভিব্যাহারে আগমন ক'রেছিল**। মিনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, **বহু তুর্কী সৈনিক তিব্বত অভিযানে নিহত হ'য়েছিল**। এই নিহত সৈন্যদের স্ত্রী-পরিজনরা মুহাম্মদ-বিন-বখ্তিয়ার খলজীকে তাদের স্বামীহারা ও পুত্রহীন করার জন্যে দায়ী ক'রে তিরস্কার করে। তাবাকত-ই-নাছিরী থেকেও জানা যায় যে, গিয়াস উদ্দীন আওয়াজ খলজী (প্রথম হুশামুদ্দিন আওয়াজ) নামে মুহাম্মদ-বিন-**বখ্তিয়ার খলজীর একজন সহকারী তার পরিবার-পরিজন নিয়ে এদেশে আগমন ক'রেছিলেন**।

প্রত্যেক নতুন শাসনকর্তা ও সেনাপতির সঙ্গে **তুর্কী মুছলমানরা বাঙালায় আসতে থাকে**। বেশ কিছু সংখ্যক **ইলবারী তুর্কী**ও বলবনের শাসনকর্তা মুগিস

www.pathagar.com

উদ্দীন তুগ্রিলের সঙ্গে এদেশে আগমন করে। ক্ষমতাচ্যুত খলজী মালিকদের বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। বিদ্রোহী শাসনকর্তা তুগ্রিলের বিরুদ্ধে অভিযানকালে সৈন্যদল, তাঁবু-তদারককারী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতির তিন লাখের একটি বিরাট বাহিনী সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন সঙ্গে এনেছিলেন। তুগ্রিলকে দমন করার পর সুলতান তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নাছির বুগরা খানকে বাঙালার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বুগরা খানের নিজের-ই বেশ কিছু সৈন্য ছিল এবং তাঁর পিতাও অবশ্যই তাঁকে একটি শক্তিশালী সৈন্যদল প্রদেশে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সরবরাহ ক'রে থাকবেন। দিল্লীতে বলবনের রাজবংশ খলজীদের দ্বারা অপসারিত হওয়ার পর আরও বহু ইলবারী তুর্‌কী নাছিরউদ্দিন বুগরা খানের অধীনে আশ্রয় ও চাকুরির সন্ধানে বাঙালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এদের সহায়তায় বুগরা খান তাঁর শাসিত প্রদেশে একটি স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। দিল্লীর তুগলক সুলতানদের সময়ে, একদল করোনা তুর্‌কী তাদের শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের সঙ্গে বঙালায় আগমন করে। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্, যিনি পূর্ব বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন এবং হাজী শামসুদ্দীন ইলয়াছ শাহ্, যিনি বাঙালায় স্বাধীন সুলতানাতের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন, দিল্লীর কর্তৃত্বের বিরোধিতা ক'রে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য তাঁদের নিজস্ব সেনাবাহিনী অত্যাবশ্যক ছিল।

দৌলতাবাদ থেকে দিল্লীতে রাজধানী পুনরায় স্থানান্তরের পর, সুলতান মুহাম্মদ তুগলক শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ দুর্ভিক্ষ-কবলিত দেখতে পান। লোকদের দুর্দশা মোচনের অভিপ্রায়ে সুলতান একদল নাগরিক প্রদেশসমূহে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। সে সময় বহু লোককে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও অনুচরবর্গসহ বাঙালায় পাঠিয়ে দেয়া হয়, কারণ বাঙালায় তখন খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য ছিল।"

এবার হাবশীদের আগমন নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। বাঙালা দেশে হাব্‌শী জনকওম কখন কিভাবে আসে এবং কিভাবে স্থানীয় জনকওমের সাথে মিশে যায়, সে-বিষয়ে ড. রহিম বলেন—"এদেশে হাব্‌শীদের আবির্ভাব হয় প্রধানতঃ ক্রীতদাসরূপে। জানা যায় যে, এক সময়ে উত্তম আশ্বারোহী ও অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত আট হাজার হাব্‌শী ক্রীতদাস বারবক শাহের কার্যে নিযুক্ত হয়। এদের বিশ্বস্ততা ও অনুরক্তিতে সন্তুষ্ট হ'য়ে সুলতান তাদের কয়েক জনকে উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্যে নিয়োগ করেন। ইছলাম প্রভু ও ক্রীতদাসের মধ্যে

www.pathagar.com

কোনো পার্থক্য স্বীকার করে না। সুতরাং প্রতিভার বলে আবিসিনীয় ক্রীতদাসগণ রাজদরবারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বেড়ে যায় যে, তারা একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা ক'রতে সমর্থ হয় এবং কয়েক বছর বাঙালার শাসনদণ্ড পরিচালনা করে। পরবর্তীকালে এই আবিসিনীয়দের অনেকেই তাদের উদ্ধত ব্যবহারের জন্যে সুলতান হোসেন শাহ্ কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়। কিন্তু **তাদের কিছু সংখ্যক বাঙালায় বসতি স্থাপন করে এবং তারা এদেশের অন্যান্য মুছলমান অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়।**"[৭]

বলা দরকার যে, এই জনকওমের কোন অলি-দরবেশের নাম পাওয়া যায় না।

বাঙালায় আগত বিদেশী জনধারার মধ্যে আফগানদেরও উল্লেখ ক'রতে হয়। ড. রহিমের কথা অনুযায়ী— "আফগানরা তুর্কী সেনাপতি ও শাসনকর্তাদের সৈন্যবাহিনীতে বেতনভুক কর্মচারীরূপে বাঙালায় আগমন করে। **হাবশী সুলতান মোজাফ্ফর শাহের সৈন্যবাহিনীতে কয়েক সহস্র আফগান ছিল। সুলতান হোছেন শাহের রাজত্বকালে একদল আফগান সৈন্য তাঁর অধীনে কর্মরত ছিল**। সুলতান ইব্রাহীম লোদীর ভ্রাতা মাহ্মুদ লোদী এবং তার পরিবার ও অনুসারীগণ হোছেন শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান নুছরৎ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নুছরৎ শাহের অনুগ্রহে তাঁরা জায়গীর ও ভাতা পান এবং বাঙালায় বসতি স্থাপন করেন। নুছরৎ শাহও সুলতান ইব্রাহীম লোদীর এক কন্যাকে বিয়ে করেন। উত্তর ভারত হারাবার পর এবং বাঙালা ও বিহারে কর্রানী শাসন ও উড়িষ্যাতে লোহানী রাজত্বের অবসান হওয়ায়, **আফগানরা বাঙালায় আশ্রয় লয় এবং এখানে বসতি স্থাপন করে**। কথিত আছে যে, শেষ কর্রানী আফগান-শাসক দাউদ খানের ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ১৪,০০০ পদাতিক, ৩৬০০ হস্তী, ২০,০০০ কামান ও কয়েক শত রণতরী ছিল। এতে বুঝা যায় যে, **এই প্রদেশে বহু সংখ্যক আফগান ছিল**।

বাঙালায় **আর একটি শরণার্থী রাজ-পরিবারের উল্লেখ** পাওয়া যায়। সুলতান সিকান্দর লোদী কর্তৃক জৌনপুর থেকে বিতাড়িত হ'য়ে **সুলতান হোছেন শর্কী বাঙালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন**। বাঙ্গালী সুলতান আলাউদ্দিন হোছেন শাহ রাজ্যহারা শর্কী সুলতানকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং আশ্রয় দান করেন। তিনি শর্কী সুলতানের পরিবারের ও তাঁর অনুরবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন।"[৮]

www.pathagar.com

যাহোক, বাঙালার বিশেষতঃ বঙাল-গৌড়ের স্থানীয় জনধারার সাথে ঐ সব জনকওম মিলে মিশে বাঙালার যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তার পরিপেক্ষিতে ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদির দিকে নজর দিলে জানা যায়— আরব, ইরান, আফগানিস্তান-মধ্য এশিয়া কিবা ভারত থেকে যে-সব মুছলমান পীর-দরবেশ, আলেম-ফাজেল, ছেপাই, ছিপাহ্‌ছালার, উজীর-নাজির , শরীফ-শেরীফ, পলাতক-বিতাড়ক এদেশে আসেন, তাঁরা কেউ জাহেল (মূর্খ) ছিলেন না। তা তাঁরা ছোলতান-ছেপাই যেই হোন না কেন। ঐ সবের মধ্যে যাঁরা পীর-মুরীদ, সঙ্গী-সাথি ছিলেন, তাঁরাও ছিলেন না অশিক্ষিত। আর এঁরা সবাই আরবী ও ফারছী—উভয় ভাষাই ভাল ভাবে জানতেন। আরবী ছিল তাঁদের পারিবারিক ভাষা।

সেজন্য সারা জাহানে আরব-ইরান-খোরাসান, আফগানিস্তান, তুর্‌কীস্তান, মেসোপটেমিয়া, ইরাক-সিরিয়া থেকে যাঁরাই আল্লার নাম প্রচার করার জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়েছেন; তাদের যাঁরা বাঙালায় এসেছেন—তাঁরাই আস্তানা স্থাপনের পর খান্‌কা ও মছজিদ তৈরী ক'রেছেন এবং আরবী-ফারছী ভাষা শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন— কোরান পাঠ, হাদিছ পাঠ ও অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো। কারণ, মূলকাজ ধর্ম প্রচারের জন্য কোরান—হাদিছ, এজমা, কেয়াছ, ফতোয়া, হিদায়া স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুছলমানসহ নবাগত মুছলমানদের সন্তান-সন্ততিদের আরবী ভাষা শেখানো অপরিহার্য ছিল; সেই সময় দেশীয় (আঞ্চলিক) ভাষা শেখা-শেখানোর মৌখিক কোশেশ ছিল বটে; কিন্তু কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস ছিল বলে মনে করা যায় না। সে-রকম কোন সম্ভাবনা ছিল না। আর নিজেদের ও স্থানীয়দের সন্তান-সন্ততিকে আরবী, ফারছী ভাষা শেখাবার যে-কাজ বহিরাগত পীর-দরবেশান চালু করেন—তা আরও ব্যাপকতা লাভ করে বাঙালায় মুছলিম রাষ্ট্র-শক্তি কায়েমের পর। কয়েক শ' বছর এভাবে চলার ফলে, আরবী ও ফারছী ভাষা-চর্চার পাশাপাশি সেগুলোর সাথে লৌকিক উচ্চারণ ও লৌকিক শব্দাবলীর মিশেলে গ'ড়ে ওঠে উরদু। তারপর বাঙালা, উড়িয়া, আসামী, রেখ্‌তা ইত্যাদি।

এভাবে সৃজ্যমান ভাষা-পরিস্থিতির চরমোৎকর্ষের সম্ভাবনাকালেই গৌড় তথা লখ্‌নৌতিতে মুছলিম রাষ্ট্র-শক্তি কায়েম হয়। তবে আমার ধারণা ইতোপূর্বে উক্ত হজরৎ নূর কুতবুল আলমের বক্তব্য তিন শ' বছরের ইছলামী বাঙালা কথা টা যদি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা হয় তাহলে, একাদশ শতক থেকেই যে বাঙলায় মুছলিম হুকুমৎ কোন-না-কোন রকমে কায়েম হয়—তা কবুল ক'রতে হবে। যদিও তার কোন প্রমাণ নেই। তবু এ-রকম ভাবার কারণ, জনসংখ্যার আধিক্য দিয়ে নয়;

www.pathagar.com

দেশের শাসন-ক্ষমতার অধিকারী কারা, তা দিয়েই একটি দেশ,—মুছলিম-দেশ, না হিন্দু-দেশ, না ইহুদী-দেশ, খৃষ্টান-দেশ—তা নির্দেশিত হয়। যার জন্য এক-ই বাঙালার পশ্চিম খণ্ড (পশ্চিম বঙ্গ) আজ হিন্দু-শাসনাধীনে একটি হিন্দু-রাষ্ট্র, অন্যদিকে 'পূর্ব বঙ্গ' বা বর্তমান বাঙ্লাদেশ মুছলিম-শাসনাধীনে একটি মুছলিম-রাষ্ট্র। আমি মনে করি, দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত গৌড়-বাঙালার ঐ সময়ের লেখা প্রকৃত ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদি সে-ইতিহাস কখনও খুঁজে পাওয়া যায়, তখন ঐ তিন শ' বছরের যে-ইতিহাস আমাদের সামনে আছে, তা হয়তো সে-দিন মিথ্যা প্রমাণিত হ'তেও পারে। ইতিহাস হয়তো ব'লতে পারে, ওরা আদৌ রাজা-মহারাজা ছিল না, ছিল ছোটখাট জমিদার বা ভূস্বামী।

সে যাই হোক, ভবিষ্যতের কথা—ভবিষ্যতের জন্য রেখে এটুকু বলা যায় যে, বাঙালায় পীর-দরবেশরাই প্রথম আরবী-ফারছী মূলক উন্নত ভাষা, গণমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সবার জন্য এক-ই ভাবে ব্যবহার্য গণভাষার সৃষ্টি করে। এর ফলে, গৌড়-বাঙালায় তখন চার রকম ভাষা-চর্চার পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরী হয়। সেগুলো হ'ল—

১. আরবী ভাষা,
২. ফারছী ভাষা;
৩. উরদু ভাষা ও
৪. স্থানীয় লোক-ভাষা।

এই শেষোক্ত ভাষা সহজবোধ্য কারণেই আরবী, ফারছী ও উরদুর মিশেলে নতুন কথ্য-ভাষারূপ গ্রহণ ক'রতে থাকে। আর তার ফলে, বাঙালার পশ্চিম-উত্তরাংশে উরদু, রেখ্‌তা এবং পূর্ব-দক্ষিণাংশে বাঙালা ভাষা পয়দা হয়।

একটি ভাষা কিভাবে পয়দা হয়, সে-বিষয়ে এস. এম. জাফর উরদুর উৎপত্তি সম্পর্কে যা ব'লেছেন—'বাঙালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধেও তা-ই বলা, যেতে পারে। তিনি বলেছেন—"In fact, of course, there cannot be such date, for the formation of a language takes a long course. It is equally difficult to say when the first foundation-stone was Iaid.....

In order to avoid controversy, I may roughly say that the soil was prepared and the seeds were sown during the early Muslim period and that the harvest was reaped during the Mughal Rule and the British Raj.

www.pathagar.com

As to what gave rise to the new language, it is not difficult to say. Forces such as the System of Instruction,—Hindus and Muslims studying together in the same schools without any restrictions of race, rank or religion; compulsory educatin in Persian; translation of Sanskrit and Hindi books into Persian; mutual exchange, adoption and incorporation of words, thoughts and ideas; Hindu-Muslim social intercourse,—combined and collectively created Bengali (Urdu), which, in course of time, superseded its parents—Persian and Hindi—and became the *lingua franca* of Bengal and Assam (Northern India)."[১]

বলা দরকার যে, ১৪ শতকের মাঝামাঝির পরে ছাড়া আগে বাঙালা ভাষা নামের উৎপত্তি ঘটেনি। তাই তার আগেকার লোক-ভাষা প্রাকৃত-অপভ্রংশ ব'লে উল্লেখ করা হয়। তার দু'টো ধারার একটা ধারায় 'কলিমা জাল্লালে'র ভাষার মত লোক-সাহিত্যের আদি বাঙালা ভাষা রূপ (Proto-Bengli) গ'ড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তখনও সে 'বাঙালা' জবান নাম পায়নি। তাই চর্যাপদকে জেনুইন ধ'রলেও; আর তাতে "বঙ্গাল দেশ" ও "বঙ্গালী"র উল্লেখ থাকলেও "বঙ্গালা" ভাষা বা জবানের কোন উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই—সমকালীন রচনা "সদুক্তি কর্ণামৃত", "প্রাকৃত পৈঙ্গল", "মানোসোল্লাস" প্রভৃতি সংকলনেও।

অতএব, ঐ সময়ের কয়েক শ' বছরে বাঙালায় আরবী, ফারছীর চর্চাই ব্যাপকভাবে হ'তে থাকে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তা না হ'লে, ইখ্তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজি গৌড় জয় ক'রেই সেখানে এবং বিজিত অঞ্চলসমূহে মছজিদ, মাদ্রাছা, খানকা স্থাপন ক'রতে যেতেন না।

এ-বিষয়ে আলোচনাকালে ড. এম. এ. রহিম বলেন—"বাঙালার মুছলিম বিজয়ের সময় থেকে, গৌড় নামে সুপরিচিত লক্ষ্মণাবতী বঙ্গ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে উন্নীত হয়। তাবাকত্-ই-নাছিরী প্রণেতা মিনহাজ থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মদ বিন-বখ্তিয়ার খলজী একটি মাদ্রাছা স্থাপন করেন এবং তিনি শেখ ও উলেমাকে সাধ্যমত সাহায্য করেন। তাঁর এই মহান দৃষ্টান্ত প্রদেশের পরবর্তী শাসনকর্তাদের দ্বারা অনুসৃত হয়। কয়েকটি মাদ্রাছা-ভবনের ধ্বংসাবশেষ মুছলিম বাঙালার প্রথম যুগের রাজধানী শহরে আবিষ্কৃত হ'য়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, গিয়াস উদ্দীন আওয়াজ খলজী (১২১২-২৭ খৃ.) লক্ষ্মণাবতীতে একটি

www.pathagar.com

সুন্দর মছজিদ, একটি মহাবিদ্যালয় এবং একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। তিনি শিক্ষায় উৎসাহ দেন এবং বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে প্রচুর পরিমাণ বৃত্তিদান করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক জরিপের ফলে, গৌড় অঞ্চলে ওমরপুর গ্রামের সন্নিকটে 'দরাছবাড়ী' নামক স্থানে একটি মাদ্‌রাছার নিদর্শন পাওয়া গেছে। 'দরাছবাড়ী' নামের অর্থ পাঠশালা। তাছাড়া দালানটির পরিকল্পনা দৃষ্টে মনে হয়, এটি মুছলমান আমলের একটি মাদ্‌রাছা ছিল। একই অঞ্চলে 'দরাছবাড়ী' মছজিদ নামে পরিচিত একটি মছজিদও বিদ্যমান। বড় ও ভারী ওজনের একটি উৎকীর্ণ শিলালিপি (১১´-৩´´X২´-১´´) ঐ স্থানে পাওয়া গেছে। এতে ৮৮৪ হিজরী (১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে) সুলতান শামছউদ্দিন ইউছুফ শাহ কর্তৃক একটি 'জাম-ই-মছজিদ' নির্মাণের উল্লেখ আছে। এই মছজিদ জনসাধারণ্যে 'দরাছবাড়ী মছজিদ' অর্থাৎ মাদ্‌রাছা-মছজিদ নামে পরিচিত। ফলে, সেখানে যে একটি মাদ্‌রাছা ছিল তার সমর্থন পাওয়া যায়। এই মছজিদটি, মাদ্‌রাছার বহু সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষকদের জুমার নামাজ পড়ার জন্যে নির্মাণ করা হ'য়েছিল।

গৌড়ের ছোট-সাগর-দীঘির পার্শ্বে একটি বড় দালানের ধ্বংসাবশেষ থেকে মুছলমান শাসনকর্তাদের রাজধানী শহরে আর একটি মছজিদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্থানীয় একটি জনশ্রুতি অনুসারে দালানটি 'বেলবাড়ী মাদ্‌রাছা' নামে পরিচিত একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গৃহ ছিল। মাদ্‌রাছাসমূহ কেবলমাত্র রাজধানী শহরেই গ'ড়ে ওঠে নি; এর নিকটবর্তী প্রধান প্রধান স্থান এবং শহরের উপকণ্ঠেও যে, মাদ্‌রাছা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হ'য়েছিল, তার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। মালদহের আধুনিক 'ইংলিশ বাজারে'র একটি মছজিদের গায়ে ৯০৭ হিরী/১৫০২ খৃষ্টাব্দের একটি উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে , **"ধর্মবিজ্ঞান শিক্ষাদান এবং যা' সত্য কেবল সেই মতবাদ অনুসরণের উপদেশ দান"** **করার উদ্দেশ্যে** আলাউদ্দিন হোছেন শাহ একটি চমৎকার মাদ্‌রাছা নির্মাণ করেন।

মুছলিম বিজযের প্রারম্ভকাল থেকে কয়েকটি মাদ্‌রাছা স্থাপন, একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন অভিজাত শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং বহু উলেমা, পীর দরবেশ, ধর্ম-প্রচারক ও শিক্ষকদের সমাগম ইত্যাদির ফলে স্বভাবতঃই লক্ষণাবতীতে শিক্ষাদীক্ষার উদ্দীপনা সৃষ্টি হ'য়েছিল এবং এই রাজধানী-শহর মুছলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে উন্নীত হ'য়েছিল। এমনকি, মুছলিম শাসনের প্রথম পর্যায়েও শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে এর খ্যাতি কামরূপের হিন্দু রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং এটা হিন্দু জ্ঞানান্বেষণকারীদের আকৃষ্ট ক'রেছিল। ঐ ভাবেই হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদী ও বেদান্ত দার্শনিকগণ এখানে আসেন; এঁদের মধ্যে

www.pathagar.com

ছিলেন ভোজের ব্রাহ্মণ অনক্ষনাথ। প্রথম জন আলী মর্দন খলজীর রাজত্বকালে আগমন করেন এবং এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে মুছলমান পণ্ডিত কাজী রুকনউদ্দীন সমরকন্দীর ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনা হয়। ফলে, তিনি ইছলামের উচ্চতর ভাবধারা অনুধাবন ক'রে মুছলমান হ'য়ে যান। বেদান্ত-ব্রাহ্মণ অম্ভনাথের বেলায়ও এক-ই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভোজের ব্রাহ্মণের সাহায্যে মুছলিম পণ্ডিতগণ সংস্কৃত থেকে হিন্দু দর্শন ও অতীন্দ্রিয়বাদের উপর লিখিত "অমৃত কাণ্ডের" অনুবাদ করেন আরবী ও ফারছী ভাষায়। এ-ধরনের ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনা এবং হিন্দু অতীন্দ্রিয় বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ ইত্যাদি বাঙালার মুছলিম রাজধানীর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি সুদূর-প্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর দ্বারা লক্ষ্মণাবতীতে মুছলমানদের উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় বিধৃত হ'য়েছে। এতে অন্যান্য জাতির জ্ঞান সম্বন্ধেও বাঙালার মুছলমান পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পেয়েছে।"

কেবল শাসক শ্রেণী নয়, "এমন কি খ্যাতনামা আলেমগণও মাদ্‌রাছা এবং শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত ছুফী-পণ্ডিতদের কয়েকটি 'খানকাহ্' শিক্ষার এক একটি উজ্জ্বল কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এটা উল্লেখযোগ্য যে কয়েকটি 'খানকাহ্' উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এ ব্যাপারে বাঙলাদেশে কিংবা এ-উপমহাদেশে মুছলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মতাত্ত্বিক উলেমা এবং মরমীবাদী ছুফীদের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। উভয় শ্রেণীর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্ব আলোপ ক'রতেন। হযরত নিজামউদ্দীন আওলিয়া ও শেখ আখি সিরাজউদ্দীন উছমানের দৃষ্টান্ত থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য এটা বলা সঙ্গত নয় যে, ঐ সময়ের ছুফীরা 'শরিয়ত' সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ ক'রেছেন এবং নিজেদেরকে সর্বতোভাবে 'মারিফাতে' সমর্পণ ক'রে দিয়েছেন। প্রায় সকল সুপরিচিত ছুফী, যেমন খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, শেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া, মাওলানা শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামা, মখদুম শরফউদ্দীন এহিয়া মানেরী, শেখ আলাউল হক ও হযরত নূর কুতবুল আলম পারিবারিক জীবন যাপন ক'রেছেন এবং রাষ্ট্রে ও সমাজে যাতে কোরআন ও ছুন্নাহ্‌র বিধি-নিষেধগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়, সেদিকে তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এজন্য শাসনের উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগের বিরুদ্ধে শেখ আলাউল হক সিকান্দর শাহের নিকট প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হযরত মুজাফ্‌ফর শাম বলখীও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতি অনুসরণের জন্য উপদেশ দিয়েছেন এবং শাসনের দায়িত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

কাজে অমুছলমানদেরকে বিশ্বাস ক'রতে নিষেধ ক'রেছেন। অবশ্য এটাও উল্লেখযোগ্য যে, বিখ্যাত ছুফীদের অনেকেই ঐ যুগের প্রসিদ্ধ আলেমও ছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের বিদ্যাবত্তার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। অধিকন্তু, যখন তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতির জন্যে নিয়োজিত থাকতেন, তখন এক-ই সময়ে আবার তাঁরা লোকদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতেন। পরবর্তী আলোচনায় এ-সত্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে, বাঙালা তথা ভারতের অন্যান্য অংশে ছুফী ও উলেমার মধ্যকার ব্যাপক পার্থক্য আরও পরবর্তীকালের সৃষ্টি। এটা ষোড়শ শতকে শুরু হয়—যখন ছুফীবাদ হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনের প্রভাবে পতিত হয় এবং বহু অশিক্ষিত ব্যক্তি বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন রকম ভাবধারা আমদানি ক'রে তা' ছুফীতত্ত্ব ব'লে চালিয়ে দিতে শুরু করে। বাঙালার বাউলরা পথভ্রষ্ট ছুফীদের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বহন ক'রছে। বাস্তবিক-ই প্রথম যুগের ছুফীগণ, যাদের অধিকাংশই উলেমা ছিলেন, তাঁরা বাঙলাদেশে শিক্ষার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে শাসনকর্তা, উলেমা, পীর-দরবেশ, এবং অভিজাত ও অবস্থাপন্ন মুছলমানদের আগ্রহ ও উৎসাহের ফলে বহু সংখ্যক মাদ্রাছা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গ'ড়ে উঠেছিল। এসব প্রতিষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"[১১]

শুধু গৌড় নয়, মহিসুন, সোনার গাঁও (ঢাকা), সাতগাঁও, নাগোর, মান্দারণ, পাণ্ডুয়া, বাঘা (রাজশাহী), রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকায়ও মুছলিম শিক্ষা-কেন্দ্র ও মছজিদ-মাদ্রাছা-খানকার নেটওয়ার্ক গ'ড়ে উঠেছিল। আর এই সমস্ত শিক্ষা-কেন্দ্রে **প্রধান ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবী ও তারপর শাসক শ্রেণীর কাজকর্মের ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ফারছী শেখা ফরজ হ'য়ে দাঁড়ায়।**

এ-সময় মুছলিম জাহানের অপরাপর এলাকার মত বাঙালাতেও আরবী-ফারছীর চর্চা ও ব্যবহারিক গুরুত্ব অতিশয় বৃদ্ধি পায়। সে-কথা যে কাল্পনিক নয়—তা বুঝতে হ'লে, একথা জানতে হবে যে,—

কেবল বাঙালায় ও ভারতীয় উপমহাদেশে নয়—এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের যে-সব এলাকা, দীর্ঘকাল মুছলিম শাসনে ও আরবী ভাষার আছর-নজরে ছিল—সে-সব এলাকায়—এই ধারাতেই ইছলাম ধর্ম ও আরবী ভাষার ভিত্তিতে বহু নতুন ভাষা পয়দা হ'য়েছে। তাই মর্টন ক্লাস ও হল হেলম্যান ব'লেছেন—"After all, people learn new languages, which then replaces the old. Arabic has crowded out older languages thıought the territories of Islam, but we know that the

www.pathagar.com

present speakers of Arabic are not all descended from the original Arabian conquerers, who brought with them both a new religion and a new language and passed both on to many other peoples."[১২]

বাঙালায় প্রাপ্ত শিলালিপির ইসাদী থেকেও বলা যায় যে, **তুরকী ও ছোলতানী আমলে বাঙালায় ফারছীর চেয়ে সরকারী ভাবে আরবী ভাষার আদর-কদর-ই বেশী ছিল। এ-সময় মুদ্রাংকনে ও শিলালিপি রচনায়, এমনকি হিন্দুদের দার্শনিক গ্রন্থ তরজমায় ফারছীর চেয়ে আরবীর ভূমিকাই বেশী দেখা যায়।** নজীর দিতে বলা যায় যে, মোগল-পূর্ব আমলের ভাষা-ব্যবহারের তারতম্য নিয়ে আলোকপাত ক'রতে ড. ওয়াকিল আহ্মদ লিখেছেন—"সময়ের দিক থেকে আরবী ও ফারছী ভাষার ব্যবহারে তারতম্য আছে। পাঠান-আমলে আরবী এবং মুঘল-আমলে ফারছী ভাষার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আইয়াজউদ্দীন তুঘরীল তুঘান খান থেকে সোলায়মান কররানির সময় পর্যন্ত ১৭৩টি শিলালিপির মধ্যে মাত্র পাঁচটি ফারছি এবং ১৫টিতে আরবী-ফারছী মিশ্রিত ভাষা এবং বাকি ১৫৩টিতে ফারছীর ব্যবহার আাছে। মুঘলরা ফারছী ভাষার অধিক অনুরাগী ছিলেন।"[১৩]

এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তখনকার ইরান-তুরানে অভিজাত ও শাসকমহলে এবং পীর-দরবেশানের মাঝে আরবী লিপি, আরবী ভাষা, আরবী সাহিত্য-ব্যাকরণের-ই বেশী আদর-কদর ছিল। আর ফারছী ছিল তাদের নিজেদের দেশীয় ভাষা হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। তখনও বাঙালা সৃজ্যমান। নির্দিষ্ট একটা রূপ যদি পেয়েও থাকে, তবে তাঁর তার নমুনা-নিশানা পূর্বোক্ত "কলিমা জাল্লাল" ছাড়া আর যা পাওয়া যায়–তা নিচেয় তুলে ধরা হ'ল—ফলে, সে-কালের ভাষা-পরিবেশে প্রধান ভূমিকা ছিল আরবীর। আর তার পরের স্থান ছিল ফারছীর। বাঙালা ছিল—সৃজ্যমান—অংকুর উদ্‌গম পর্যায়ে।

অতএব, এ-পরিস্থিতিতে বাঙালা ভাষা পয়দা হ'য়েছিল; আরবী, ফারছী ও উরদুর মিশেলে; আর তা হওয়াই ছিল ন্যাচারাল। সময়টা ছিল নতুন ভাষা—নয়া জবান পয়দায়েশের অনুকূল। সে-কথা বেশক বলা যায়।

কলিমা জাল্লাল-ই একমাত্র নজীর নয়

বলা দরকার যে, একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের রচনা-সংকলন—'শূন্য পুরাণ' ও 'ধর্ম্মপূজা-বিধান-এ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' বা 'কলিমা জাল্লাল' ছাড়া আরবী, ফারছী, উরদু মেশানো তখনকার প্রোটো-বাঙালা লৌকিক কবিতার আরও কিছু

www.pathagar.com

নমুনা পাওয়া যায়।

সে-বিষয়ে আলোচনাকালে বলা দরকার যে, পূর্বোক্ত 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি'-অনুযায়ী গাজন-উৎসবের শেষ তিন দিনের শেষ দিনে " দেহারা ভঙ্গ" নামে একটা অনুষ্ঠানের কথা আছে। "আদ্যের গম্ভীরা" সম্পর্কে আলোচনাকালে হরিদাস পালিত এ-অনুষ্ঠানে পঠিত দু'টো মন্ত্রের ব্যবহার-বিধির পরিচয় দিতে লিখেছেন—" এই দেহারা ভঙ্গের দুইটি মন্ত্রাংশ আছে, একটির নাম ছোট জানানি ও অন্যটির নাম বড় জানানি।

ছোট জানানি (ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পুঁথি হইতে):—

"পশ্চিম মুখে খোনকার করন্তি সেবা।
কেহ পূজে আল্লা কেহ পূজে আলি,
কেহ পূজে মামুদা সাঁই
* * *
উচ্চরন্তি কাক বিচারন্তি ধর্ম্ম,
কোন খানে হৈলো খোদার আদি জন্ম।
* * *
কালিদাকাদেবী আসি তথা চাকন্দার হৈল।
আগুসণরি বিষদা বিবি বাটন্তি ঝাল।**
জগন্নাথ আসি আগুলি বসিল।
সুরা চুরি কর্য্যাছিল হাত কাটা গেল। ইত্যাদি।"[১৪]

বলা দরকার যে, উপরের কোটেশনে "বড় জানানি" ও "ছোট জানানি" ব'লে যে দু'টো কথা আছে—তার আসল রূপ—"বড় জালালি' ও "ছোট জালালি।" এই আরবী শব্দটিকে পালিত মশাই যবন-স্পর্শ-দোষ-মুক্ত রাখতে 'ল'কে 'ন' দিয়ে বদলে ফেলেছেন। এমন কাজ অন্যখানেও করা হ'য়েছে।

এ-তরফে মনে রাখা দরকার যে, মুছলমানরা দু'রকম কলেমা খতম দেন। তার একটি হ'ল—মূল কলেমা। (লা-ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ্) সওয়া লাখ বার তছবিহ্ গুণে পড়া। একে "খতমে তাহ্লীল'ও বলে। আর একটি খতম আছে—তাকে বলে—'জালালী খতম'। এ-খতমের পরিচয় দিতে বলা হ'য়েছে—

"খতমে জালালী

নদীর ভাঙ্গন বা ঐ রকম কোন কঠিন বিপদ হ'তে মুক্তি লাভের জন্য 'আল্লাহু'

নাম এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার জাফরান কালি দ্বারা কাগজে লিখবে। এরপর এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ময়দা বা আটার গুলি তৈরী ক'রবে। গুলি তৈরী করার সময়ও মুখে আল্লাহু নাম ব'লতে হবে। এরপর আল্লাহু নাম লিখিত কাগজগুলোর মধ্যে একটি ক'রে গুলি ভ'রবে। যে-ব্যক্তি গুলি তৈরী ক'রবে সে সেই গুলিগুলো কাগজে ভ'রবে। অতঃপর গুলিগুলো নদী বা যে পুকুরে মাছ আছে সে পুকুরে ফেলবে। এ-খতমে যারা অংশ নিবে অবশ্যই সকলে পাক পবিত্র অবস্থায় এ-কাজ ক'রতে হবে। তা না হলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আল্লাহ্ তায়ালার নামসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। জালালী বা তেজস্বী। জ্বামালী বা সৌন্দর্য বিষয়ক। আল্লাহ্ নাম জ্বালালীর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ-খতমকে 'খতমে জ্বালালী' বলা হ'য়ে থাকে।

খতমে-জালালীর আমল দ্বারা নেক উদ্দেশ্য সফল হয় এবং বিভিন্ন রকম বিপদ দূর হয়।"[১৮]

অতএব, বৌদ্ধদের 'দেহারা-ভঙ্গ'-অনুষ্ঠানে পহেলা পাঠ করা হ'ত—ছোট জালালী 'মন্ত্র' আর শেষ ভাগে পাঠ করা হত—'বড় জালালী' মন্ত্র'। সেটি এরূপ—

"বড় জানানি।"

"পশ্চিম মুখে খোনকার করন্তি সেবা।
দুই পায়ে কলু খোনকারের হাতে চোক দাই।
হাথে তাল করিয়া গুজারে নেমাজ॥
আহি দিন সাহি দিন কুতুব দিন ভাই।
বাবু দিন মোল্লা বলে তথা হেতার হিসাব চাই ॥
বাবু দিন মোল্লা হেতা জেকিয়া ধরে সিরে।
সোন বর্ণের হেতা জায় খোদার বরাবরে ॥

প্রথ(ম) হেতা বিচ্ মোল্লা দূজে হেতা আকু আকুন্দি উকুন্দি হেতত্ত আরদ মগজা যোট চোটনে গুত হেতা আর জিবনা ফলপা আতড়ি মোতুরি আরদ মগজ আতুড়ি যোতুড়ি আর কানাকুনি পাজর কোকসা নিয়া সোল খানি ধরি ॥

লয় মা মঙ্গল চণ্ডি তথা যাত্রা করি।
কালিকা দেবী আসি তথা চাকন্দার হৈল।

www.pathagar.com

আস্ত সারি বিসদা বিবি বাটন্তি ঝাল।
খোদার সাদ কায় হেথায় লাগে জাল।
জগন্নাথ আসি আগুলি বসিল।
সুরা চুরি কর্য্যাছিল হাত কাটা গেল।
এক ব্রাহ্মণ ভাই পলাইয়া জায়।
ধরিয়া আনিয়া তারে নেবাজ করায়।
আর ব্রাহ্মণ পালায় গুড়ি গুড়ি।
মাথায় তুলিয়া দিল হেড়ার চুবড়ি॥
মাথায় হেড়ার চুবুড়ি হাতে নিল কবা।
নরবু নরবু জায় দেখ দামাদের পাড়া ॥
সোন বর্ণের হেড়া খোদার ভাল রাখ কর।
উপরে খোদায় আল্লা দিবেন্তি বর॥
সিরের উপরে দয়া করুন পির পেকাম্বর।
উপজিল শক্রু পড়্যা মরুক কুতুবের কহর॥
গাইল পণ্ডিত রাম জালালি মাত্র সার।
নাএকেরে বর দিবেন ঠাকুর করতার ॥"[১৬]

এখানেও শেষ নয়। গাজন উৎসবের শেষ দিনে "চারি দ্বার"-ভঙ্গের যে-বিধান আছে; তাতেও ছড়া বা মন্ত্র পাঠ করা হ'ত। রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্মপূজা-বিধানে' এই দ্বার-ভঙ্গের যে-ছড়া আছে, তা নিচেয় কোট করা হ'ল—

"পশ্চিম মুখে খোনকার করন্তি সেবা।
কেহ পূজে আল্লা কেহ পূজে আলি
কেহ পূজে মামুদা সাই।
জিয়াও না মারে মুদ্দার নাই খায়।
মিন পাগে মিয়া খানা চড়াই॥
মারিবোরে নব দান।
হিন্দুর ঘরে মোছলমান।
বার দিয়া বসিল খোদায় রহমান॥
উচ্চরন্তি কাক বিচারন্তি ধর্ম্ম।
কন খানে হৈল খোদার আদি জর্ম্ম॥
থুক দিয়া ব্রাহ্মণের নিলেন্ত জাতি।
জাজপুরে হাসোন হুসন হইব পরা দাসী ॥

www.pathagar.com

হংসরাজ ঘোড়া জার হিসারি পালনে।
পগড়ি রান্ধেন দেখান চন্দ্র সোমনে॥
তির তর গছ ধরিয়া হাথে।
মারিতে হিন্দুর বোত চলিলেন পথে।
সাজরে ভাই মামুদা সাই মুছলমান।
মারিতে হিন্দুর বোত করিল পয়ান॥
পশ্চিম মুখেতে খোনকার করিল সয়ান।
সোনার দেউল বেড়িয়া বসিল জতেক মুছলমান॥
সোনার গড় ভাঙ্গিতে দিলেন কারিকর।
ভাঙ্গিয়া জে নাবিল সোনার সহিঘর॥
সোনার গড় ধরিয়া দিলেন হুড়ুক টান।
সোনার গড় ভাঙ্গিয়া করিল খান খান॥
সোনার গড় ভাঙ্গিয়া দিলেন মসিদ।
গাই জবাই করেক ইদা-বকরিদ॥"[১৭]

এভাবে, আগে পশ্চিম দিকে সোনার গড়, পরে দক্ষিণ দিকে রূপোর গড়, তার পর পূর্ব দিকে তামার গড় ও সব শেষে উত্তর মুখে মাটির গড় ভেঙ্গে ফেলে। তারপর, গড় ভাঙ্গা শেষে—

"ভাঙ্গিতে নারিল মৃত্তিকার সহিঘর।
স্থান বেড়িয়া জে বসিল পেকাম্বর।
কাজি মোল্লা জেবা ছিল থরে-থর।
কাজি মোল্লা কিতাব পড়ে বসি।
তা দেখ্যা আল্লা-খোদার মোন খুসি।
তুমি ত আল্লা-খোদা আমিত জান।
কিছু মোরে সুনাইবে কোরান॥
আল্লা রূপে নিরঞ্জন দেবন্তি বর।
আমিনের শিরে পড়ুক কুতুবের কহর॥"

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, একাদশ শতকে অমুছলিম সমাজে জেঁকে বসা এই ইছলাম-মুছলিম-ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন-ব্যবস্থার ধারা ১২ থেকে ১৫ শতক তক অব্যাহত ছিল। তাই এ-ধারায় তুরকী ও ছোলতানী আমলে বাঙালায় যে-ভাষা পরিবেশ ও গণমানসিকতা বিরাজ ক'রছিল, তা ছিল বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের আনুক্রমিক সমৃদ্ধির একান্ত অনুকূল। এ-অনুকূল পরিস্থিতিতেই

www.pathagar.com

বাঙালা ভাষা ধীরে ধীরে মুছলিম-অমুছলিম নির্বিশেষে বাঙালা দেশের জনসমাজে 'অঙ্কুর' উদ্‌গম ক'রছিল। একে 'চারা' যদি নাও বলা হয়, অঙ্কুর ব'লতেই হবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তথ্যপঞ্জী

১. ড. ওয়াকিল আহমদ। বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, (৩য় সংস্করণ, ঢাকা-২০০২), পৃ.১০৯।

২. ড. এম. এ. রহিম। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, (পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা,-১৯৯৫), পৃ. ৩১।

৩. ঐ, পৃ. ৩৯।

৪. ঐ, পৃ ৪০।

৫. ঐ, পৃ. ৪১-৪২।

৬. ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪।

৭. ঐ, পৃ. ৪২।

৮. ঐ, পৃ. ৪৪।

৯. S. M. Jafar, Education in Muslim India, (Reprint, Delhi-1972), P. 216-'17.

১০. ড. এম এ. রহিম। পূর্বোক্ত, পৃ, ১৬২-'৬৩।

১১. ঐ, পৃ. ১৬১-'৬২।

১২. দেখুন—উদ্ধৃত, ড. এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান। বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস-২য় খণ্ড (ঢাকা-২০০৫), পৃ. ১১। দ্বিতীয় 'খণ্ডের দিবাচা।

১৩. ড. ওয়াকিল আহমদ। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০।

১৪. দেখুন—হরিদাস পালিত। আদ্যের গম্ভীরা, (মালদহ-১৩১৯) পৃ. ৮২।

১৫. দেখুন—মাওলানা মো. মোশাররফ হোসেন ও মাওলানা মো. ইউসুফ-সম্পাদিত। নিয়ামুল কোরআন, (৩য় প্রকাশ, ঢাকা-২০০৫), পৃ. ২২৯-'৩০।

১৬. দেখুন—উদ্ধৃত, পালিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১-'২২।

১৭. ঐ, পৃ. ১১৯-'২০।

১৮. ঐ, পৃ. ১২০।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের ফারছী-বাঙালায় লেখা
পরিচিত পুথির—অপরিচিত মূল্যায়ন

বাঙ্লাদেশ ও ভারতীয় বাঙালার শিক্ষিত জন-সমাজের অনেকের কাছেই 'পুথি' শব্দটি পরিচিত। তবে পুথি-শব্দে যে বিশাল সাহিত্য-সম্ভারের কথা বলা হয়—সে-সব সাহিত্যের সাথে এ-কালের কতজন শিক্ষিত মানুষের প্রকৃত পরিচয় আছে,—তা বলা কঠিন। কারণ এক সময় 'ভারতীয় বাঙালা'য় ও 'বাঙ্লাদেশে' পুথি-কেতাবের যে-বিশাল চাহিদা ও ব্যাপক পাঠক ছিল,—এখন আর তা নেই। কেন নেই, তা জানতে চাইলে, একথা জানা দরকার যে, বাঙালা ভাষা ও বাঙালা সাহিত্য গত দু'শ বছর হ'ল—দু'টি প্রধান ধারায় বিভক্ত হ'য়ে গেছে। তার একটি হ'ল—'ফারছী-বাঙালা'; আর অন্যটি হ'ল—'সংস্কৃত-বাঙালা'। পুথি-সাহিত্য পয়দা হয়—ফারছী-বাঙালায় মুছলিম কলমে। মুছলমানী আখলাকে। আর সংস্কৃত-বাঙালায় পয়দা হয়—গ্রন্থ-পুস্তক ইত্যাদি। আগেই বলা হ'য়েছে—১৮০১ সাল থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কলমে, এই দুই ধারায় বাঙালা ভাষা ও সাহিত্য-ভাগের সূচনা। কাজেই বাঙালা ভাষা ও বাঙালা সাহিত্যের এই দু'ধারায় বিভক্তি খুব বেশী দিনের না হ'লেও—আধুনিক শিক্ষা, এই বিভক্তিকে এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে, পুথির ভাষার সাথে আমাদের পরিচয় একেবারে ঘুচে গেছে। আমরা এ-ভাষাকে এখন আর দেখেও চিনতে পারিনে। অথচ এক সময়—মাত্র ষাট-সত্তর বছর আগেও—এ-ভাষাই ছিল আমাদের 'দিন-রাত্রির ভাষা', 'ঘর-গেরস্তালীর ভাষা', 'মা-বাবার ভাষা', 'গান-গল্পের ভাষা', 'বাসর-ঘরের ভাষা'। মুছলিম অমুছলিম-নির্বিশেষে আম-জনতার ভাষা। আর পুথি-সাহিত্যই ছিল তখন জনগণের সাহিত্য বা 'জন-সাহিত্য'।

অনেকেই কবুল ক'রবেন যে, এখনও আমাদের বয়স্ক বাপ-দাদা, নানা-নানী পুথি-সাহিত্য সুর ক'রে পড়েন, বোঝেন এবং তার রসপান ক'রে হাসেন-কাঁদেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা আমাদের এমনি এলেম-তালিম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ও দিচ্ছে যে, তাঁরা ও তাঁদের বাপ-দাদারা অল্প লেখা-পড়া জেনে যা প'ড়তে ও বুঝতে

www.pathagar.com

পারতেন; আমরা চার-পাঁচটা বড় বড় পরীক্ষায় পাশ ক'রেও, তা প'ড়তে ও বুঝতে পারিনে। আমাদের বুড়ো দাদা-দাদীদেরও বোঝাতে পারিনে। কাজেই তার সঠিক মূল্যায়ন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বাপ-দাদার এই মানস-সম্পত্তি তাদের অলি-আওলাদদের কাছে এমন অজানা ও অচেনা, পর হ'ল কেমন ক'রে; চিরচেনা পুথি একেবারে অচেনা হ'ল কেমন ক'রে—এবার সে-বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

পুথি-পরিচয়

বলা দরকার যে, এদেশে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুছলিম-শাসনামলে যত গ্রন্থ-পুস্তক লেখা হ'য়েছে—তা সব-ই পুথি নামে পরিচিত। ওগুলোর কোন কোনটিকে যে—গ্রন্থ, পুস্তক, পোথা, কেতাব বলা হয়নি; তাও নয়। তবে মুছলিম কিংবা অমুছলিম লেখকের প্রাক-আধুনিক যুগে লিখিত সব রচনাই পুথি। কয়েকটি নজীর নিচেয় হাজির করা হ'ল। যথা—

১. **লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল'**-এ বলা হ'য়েছে—

ক) " না চাহি সম্পদ বর মুঞি অতিপামর
নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হউ **পুথি** ॥

—পৃ. ৫।

খ) " দামোদর পণ্ডিত পুছিল সব তারে।
আদ্য অন্ত জত কথা কহিল অন্তরে ॥
শো-াক বন্ধে হৈল **পুথি** গৌরাঙ্গ চরিত।
দামোদর সম্বাদ মুরারি মুখোদিত ॥

—পৃ. ৬।

২. **কৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর** সুখ্যাত সুবৃহৎ **'চৈতন্য চারিতামৃত'**-কেও পুষ্পিকায় পুথি ব'লে উলে-খ করা হ'য়েছে। এ-গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় লেখা হ'য়েছে—"---বৃন্দাবনের মধ্যে এই **পুথি** (লেখা) সম্পূর্ণ হ'ল।" (—পৃ. ৫৬৯)।

অপরদিকে , মুছলিম লেখক বা কবিগণও যে, তাঁদের ছোট-বড় সব রচনাকেই পুথি ব'লতেন, তার নজীর এরকম—

১. 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র চেয়ে বিশাল গ্রন্থ **"আমীর হামজা"**। এ-বই উরদু থেকে একাধিক কবি অনুবাদ ক'রেছেন। কবিরা সেই **বিপুলায়তন গ্রন্থকেও পুথি ব'লেছেন**। যথা,—

www.pathagar.com

ক) "ঋতু নিধি অব্দ আদি হিজরী রইল।
আমীর হামজার **পুথি** সমাপ্ত হৈল ॥
—আবদুন নবী।

খ) "বার শত এক সাল বাঙ্গলার শেষে।
কিতাব মিলিল মুঝে বহুৎ কোশেশে ॥
করিনু শায়েরী **পুথি** আখেরী কেচ্ছার।
লেখা গেল শাহাদাৎ আমীর হামজার ॥
—সৈয়দ হামজা।

২. এক-ই ভাবে মহাকবি আলাওলও তাঁর **'সয়ফল মুলুক-বদিউজ্জামাল'**-গ্রন্থকে পুথি ব'লে লিখেছেন—

"সমাপ্ত না হৈতে **পুথি** তিনি* পরলোক।
কতকাল মনেতে আছিল মহা শোক ॥ "

এ-রকম আরও নজীর দেয়া যায়। এসব তথ্য থেকে দেখা যায়,—সেকালে মুছলমান–অমুছলমান-নির্বিশেষে সব কবি-ই তাঁদের রচনাকে 'পুথি' বলে পরিচয় দিতেন।

এছাড়া, হাতে লেখা পুস্তক-পুস্তিকাকেও পুথি বলা হ'ত। কারণ কোলকাতায় বৃটিশ আমলে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা না হওয়া তক—সকল পুথি-ই হাতে লেখা হ'ত; নকল ক'রে এক জনের পুথি অন্য জনে নিয়ে যেত। সেকালে পুথি-নকলকারীদের ইজ্জৎও ছিল। পুথি-নকল, চালু হবার পর, ঐ সব পুথি যখন ছাপা শুরু হ'ল—তখন তাঁরা কেবল পাণ্ডুলিপি বা হাতে লেখা পুস্তক-পুস্তিকাকেই পুথি ব'লত না; ছাপা বইকেও পুথি ব'লত। তবে, মুছলিম সমাজে বহুকাল থেকে পুথির বদলে 'কেতাব' বা 'কিতাব' শব্দটি চালু ছিল। আর হিন্দু সমাজে পুথির বদল ঘটে—পুস্তক ও গ্রন্থে। ছোট হ'লে—পুস্তক-পুস্তিকা। বড় হ'লে—গ্রন্থ। অন্যদিকে, মুছলমানদের কেতাব আজও 'কেতাব'-ই আছে। উচ্চ শিক্ষিত মুছলমানরা ঐ সব কিতাবকে সেই পুরানো পুথি নামেই ডাকেন। কেতাব বা গ্রন্থ নামে নয়।

বটতলার পুথি

মুছলিম আমল, বৃটিশ আমল, পাকিস্তানী আমল ও বাঙ্লাদেশী আমলে দেশীয় ট্র্যাডিশনাল ধারায় শিক্ষিত জনগণ, যাকে "কেতাব" বা "শায়েরী কেতাব" ব'লতেন; তা-ই ১৯-২০ শতকের নতুন শিক্ষিতরা "বটতলার পুথি" নামে ডাকতে

পাদটীকা ঃ তিনি কবির পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর।

www.pathagar.com

থাকেন। সে-ধারা আজ তক অব্যাহত থাকায়—"পুথি-সাহিত্যে"র পরিচয় দাঁড়িয়েছে—"বটতলার-সাহিত্য" বা "বটতলার-পুথি"। পুথির সাথে পরিচয়হীন আধুনিক পাঠকরা অবশ্য জানেন না, কেন একে "বটতলার পুথি" বলা হয়। একালের বাঙালায় এম. এ. পাশ শিক্ষিতরাও যে, 'বটতলার পুথি' বা শায়েরী কেতাব চেনে না, তা তাঁদের সাথে আলাপ ক'রলে জানা যায়।

বলা দরকার যে, 'বটতলা' কোলকাতার একটি জায়গার নাম। আমাদের ঢাকায় যেমন "কলাবাগান", "কাঁঠাল বাগান", "শ্যাওড়াপাড়া", "গাবতলা" বা 'গাবতলী" আছে; তেমনি কোলকাতায়ও আছে—"বটতলা", "বেলতলা" ইত্যাদি। সেই—"বটতলা"-এলাকাটি উত্তর কোলকাতায়। এ-জায়গার ভৌগোলিক পরিচয় দিতে গিয়ে বিনয় ঘোষ লিখেছেন—"শোনা যায়, বৌবাজারের এক অশ্বত্থগাছের তলা ছিল চার্নক সাহেব ও অন্যান্য বণিকদের বিশ্রাম নেবার বৈঠকখানা। বাজারের কাছে, শিয়ালদহ-বৌবাজারের মোড়ের মাথায় এই অশ্বত্থের ছায়ায় ব'সে জব-চার্নক কয়েকটি গ্রামকে কলকাতা শহরে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই অশ্বত্থ গাছটা আজ নেই, কিন্তু বৈঠকখানা নামটা র'য়েছে এবং তার সঙ্গে অক্ষুণ্ন র'য়েছে এই অঞ্চলের সেই ঐতিহাসিক বাণিজ্য-ধারা।

বৌবাজারের এই অশ্বত্থগাছের মতন সেকালের কলকাতায় আর একটি বিখ্যাত বটগাছ ছিল শোভা-বাজারে। বাঙ্‌লাদেশের অনেক দীর্ঘায়ু বটগাছের মতন, শোভাবাজারের বটগাছেরও একটা বাঁধানো চাতাল ছিল। সেই বাঁধানো বটতলায় কবি-গানের আসর জমত প্রায়-ই। নিধু বাবুর টপ্পা সুরে বটতলার পরিপার্শ্ব সরগরম হ'য়ে উঠত। শুধু তাই নয়, ছাপার অক্ষরে নব যুগের বাঙালীর সাহিত্য-সাধনার উদ্বোধনও হয়—এই বটতলার আশেপাশের ছাপাখানায়।" বিনয় ঘোষ বটতলার পরিচয় দিতে গিয়ে আরও লিখেছেন—"নির্দিষ্ট সীমারেখায় ঘেরা বটতলার কোন মানচিত্র নেই, কোন ইতিহাস বা গেজেটিয়ারও নেই। বাঙালীর সংস্কৃতি-জীবনের এক ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণের অন্যতম লীলাকেন্দ্র বটতলা; চিরদিন-ই শিক্ষিতের উপেক্ষিতা। নির্বিচার অবজ্ঞার বাণবিদ্ধ বটতলা, সাহিত্যের আবর্জনা-স্তূপে সমাধিস্থ। কে তাকে খুঁজে বের ক'রবে? চিৎপুরের আশেপাশের অলিতে-গলিতে, আহিরিটোলায়, দর্জিপাড়ায়, জোড়া-সাঁকোয়, গরানহাটায়, জোড়-বাগানে, চোরবাগানে, বড় বাজারে, শোভাবাজারে। শুধু তাই কেন? শিয়ালদহ, মীর্জাপুর, কলুটোলা, কসাইটোলা, বৌবাজার, জানবাজার, ঠিক বটতলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে না প'ড়লেও, সাহিত্যিক সীমানার মধ্যে নিশ্চয় পড়ে। মির্জাপুরের "সম্বাদ তিমির নাশক প্রেস" ও মুন্‌শী হেদাতল্লার (হেদায়েৎ

www.pathagar.com

উল্লাহ্—বর্তমান লেখক।) প্রেস এবং শিয়ালদহের পীতাম্বর সেনের "সিদ্ধযন্ত্র" থেকেই বটতলার যুগের সূচনা হয়নি কি? সুতরাং বটতলা শুধু তার ভৌগোলিক সীমারেখাতেই আবদ্ধ ছিল না, চিৎপুর রোড থেকে সার্কুলার রোড এবং আরও অনেক দূর পর্যন্ত তার বিস্তার ছিল।"

সাম্প্রতিক কালে, "বটতলা" নামক বইয়ে 'বটতলা'র পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীপান্থ লিখেছেন—"বটতলা এখন উত্তর কলাকাতার একটি থানার নাম। আর নির্বাচনী পরবের সময় একটি বিধান সভা-কেন্দ্রের। অথচ নিমতলায় যেমন একটি নিমগাছ ছিল, তেমন-ই শোভা-বাজার-চিৎপুর এলাকায় এক দিন সত্য সত্যই ছিল এক বিশাল বট গাছ। বটতলার বেসাতি নিয়ে একালে যাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহভরে সন্ধান ক'রেছেন, ভেবেছেন, লিখেছেন, তাঁদের অগ্রগণ্য সুকুমার সেন।"

ড. সুকুমার সেন-এর রচনা থেকে বটতলার যে-সব খুঁটিনাটি উলে-খ শ্রীপান্থ ক'রেছেন—তা থেকে জানা যায়—"বটতলা" শোভাবাজারে। বটগাছটির গোড়া শান-বাঁধানো ছিল। সে-কথা কবি আজাহার আলীর "দেলবর গোলে রওশন" থেকেও জানা যায়। কবি ঐ কেতাবে লিখেছেন—

"মধু রস কথা ভাই জানিবে তাহাতে।
বান্ধা বটতলায় তারে দিয়েছি ছাপিতে ॥"

মুছলিম মুছান্নেফ (লেখক) ও শায়ের-(কবি)দের একাধিক কেতাবে এই বটগাছটির 'তলা' যে, চিৎপুর রোডের পাশে ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভৌগোলিক 'বটতলা' ও
সাহিত্যের 'বটতলা'

এছাড়া, বলা আবশ্যক 'ভৌগোলিক বটতলা' আর 'সাহিত্যের বটতলা'র যে-বিশেষ পরিচয় বিনয় ঘোষ উলে-খ ক'রেছেন, তাতে তিনি গোটা কোলকাতা শহরকেই সেকালের 'সাহিত্যিক বটতলা'র আওতাভুক্ত ক'রেছেন। এ-ব্যাপারে আরও বাড়িয়ে শ্রীপান্থ ব'লেছেন—"বস্তুতঃ শুধু কলকাতা কেন, মনে হয় বটতলা-রসে বুঝি সমগ্র বাংলা মুলুক প-াবিত। ঢাকা ছাপাখানার মুখ দেখে কলকাতার অনেক পরে, ১৮৬০ সালে।...শুধু ঢাকায় নয়, ছাপাখানা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্রও।....কলকাতার বাইরে ছাপাখানা ব'লতে (তখন) বর্ধমান, হুগলি আর হাওড়ার ক'টি; আর পূর্ব-বঙ্গে সবে ধন রংপুরের 'বার্তাবহ-যন্ত্রালয়'। বর্ধমানের তিন-তিনটি ছাপাখানায় অবশ্য তখন বটতলার হাওয়া লাগেনি। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমে পাল্টে যায়—। (এখান থেকে) একাধিক কাব্য রচিত হ'য়েছে বিদ্যাসুন্দরের

www.pathagar.com

ছায়া-অনুসরণে। তাছাড়া 'হাতেম তাই', 'চাহার দরবেশ'ও ছিল। তাছাড়া, উনিশ শতকের মাঝামাঝি বটতলার অন্যতম জনপ্রিয় বই 'যোজন-গন্ধা'র লেখক বনয়ারী লাল রায় ছিলেন বর্ধমান-রাজ মাহতাব চন্দ বাহাদুরের আশ্রিত।....আবদুস সামাদ যে আখ্যাপত্র উদ্ধার ক'রেছেন তা থেকে বোঝা যায় 'যোজন-গন্ধা' সর্বার্থে বটতলার-ই বই।"

বটগাছের উত্তরপাশে ছিল—চিৎপুর রোড। নিকটেই ছিল—রাজা নবকৃষ্ণের রাজবাড়ী। বটগাছের দক্ষিণের এলাকায় কেবল বই-কিতাব ছাপা হ'ত না; বিকিকিনিও হ'ত। তার মানে, এখানে ছাপাখানা আর বই কেনাবেচার দোকান—দুই-ই ছিল।

অতএব, সেকালের চিৎপুর রোডের পাশে দাঁড়ানো শোভাবাজারের এই শান বাঁধা বটগাছের আশে-পাশের প্রেসে বড় বড় হরফে ছাপা চিকণ-মোটা নানা কিছিমের বাঙালা বই-কেতাবকেই বলা হ'ত—পুথি। সে-**পুথি ছিল দু'রকমের**। **মুছলিম-পুথি** ও **হিন্দু-পুথি**। মুছলিম-পুথিকে মুছলমানরা ব'লতেন—"কিতাব" বা "শায়েরী কিতাব"। মুছলিম কবিরা 'পুথি' নামেও নিজেদের রচনার পরিচয় দিতেন। হিন্দুরাও তাঁদের পুথিকে ব'লতেন—"পুথি", "পোথা" ইত্যাদি। পরে এই 'পুথি-পোথা'—'গ্রন্থ' ও 'পুস্তক-পুস্তিকা' নামে পরিচিত হয়। কিন্তু মুছলিম কিতাব-পুথি—পুথি-ই থেকে যায়।

আধুনিক কালে অনেকে 'পুথি' ব'লতে ছোটখাট কিতাবকেই বুঝে থাকেন। যেমন—'জৈগুনের পুথি', 'সোনাভানের পুথি', 'হাসেম কাজীর পুথি' ওগয়রহ। কিন্তু বটতলার মুছলিম লেখকান কেবল চটি পুথি-কিতাব-ই লিখতেন না। তাঁরা দেড়-দু'হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থ-কিতাবও লিখেছেন এবং ছেপেছেন। সে-সব কিতাবের কোন কোনটা পঞ্চাশ বালাম-(খণ্ড) এও লেখা এবং ছাপা হ'য়েছে। এরকম সব কিতাব, আধুনিক পরিভাষায় অনায়াসে "গ্রন্থ" নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু সেই সমাদর মুছলিম কাব্য-মহাকাব্যগুলোক দেয়া হয়নি। সুকুমার সেন, বিনয় ঘোষ, শ্রীপান্থ—বটতলার পুথি-কিতাবের আলোচনা ক'রতে দু'চারখানা মুছলিম পুথির নাম উলে-খ ক'রেছেন ঠিক-ই; কিন্তু যে-সব বিশাল বিশাল মুছলিম পুথি-কিতাবের দেখা আজও পাওয়া যায়, তার কোনটার-ই নাম-পরিচয়ের বিবরণ দেননি। আমাদের দেশের পুথি-গবেষকগণও ঐ সব পুথির গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা কিংবা মূল্যায়ন করেননি। যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা নিয়ে এর ব্যতিক্রম কেবল দু'জন। একজন মরহুম ড. কাজী আবদুল মান্নান এবং অপর জন ড. আনিসুজ্জামান। ড.

www.pathagar.com

কাজী আবদুল মান্নান-এর ইংরেজীতে লেখা 'দি ইমার্জেন্স অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অব্ বেঙ্গলি দোভাষী লিটারেচার' এবং ড. আনিসুজ্জামান-এর 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্যে'—'সেনাভানের পুথি', 'জৈগুণের পুথি'র পাশাপাশি 'সাহানামা', 'আমীর হামজা', 'কাছাছোল আম্বিয়া' জাতীয় ঢাউস পুথি-কিতাবেরও উলে-খ র'য়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোন আদর-কদর করা হয়নি। ফলে আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ তক মুছলিম কবিদের বিশাল সৃষ্টি-সম্ভার জনগণের নিকট সুপঠিত ও সুপরিচিত হ'লেও, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিকট অপরিচিতই থেকে গেছে। তাই 'বটতলার পুথি'র পরিচয় দিতে গিয়ে আজকের পাঠককে ব'লতে হয়—ছোট-বড় মিলিয়ে মুছলিম-অমুছলিম সকল জনকওমের শায়ের-মুছান্নেফ-(কবি-লেখক)দের লেখা ঐ সব পুথি-কিতাব-গ্রন্থই—'বটতলার পুথি'। কিন্তু এ-পরিচয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের বেশীর ভাগের নিকট অপষ্ট।

বটতলার 'সাহিত্য'

বলা দরকার যে, বটতলার 'পুথি' বা বটতলার 'সাহিত্য' ব'লতে আজ আর শুধু কোলকাতার শোভা বাজারের ঐ বটতলার কাছে-কোলে বসানো প্রেসে ছাপা বই-কিতাবকে বোঝায় না। হালে ভারতীয় বাঙালার অমুছলিম লেখকগণ এর তাৎপর্যগত বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। এ-বিষয়ে বিনয় ঘোষ কোলকাতা-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"বটতলা তার ভৌগোলিক সীমারেখাতেই আবদ্ধ ছিল না; চিৎপুর রোড থেকে সার্কুলার রোড এবং আরও অনেক দূর পর্যন্ত তার বিস্তার ছিল।" এই বিস্তৃতির আরও প্রসার ঘ'টিয়ে তিনি লিখেছেন—"নির্দিষ্ট সীমারেখায় ঘেরা বটতলার কোন মানচিত্র নেই, কোন ইতিহাস বা গেজেটিয়ারও নেই। বাঙালীর সংস্কৃতি-জীবনের এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম লীলাকেন্দ্র বটতলা চিরদিন-ই শিক্ষিতের উপেক্ষিতা। নির্বিচার অবজ্ঞার বাণবিদ্ধ বটতলা সাহিত্যের আবর্জনা-স্তূপে সমাধিস্থ। কে তাকে খুঁজে বার ক'রবে? চিৎপুরের আশপাশের অলিগলিতে, আহিরিটোলায়, দর্জিপাড়ায়, জোড়াসাঁকোয়, গরানহাটায়, জোড়াবাগানে, চোরবাগানে, বড়বাজারে, শোভাবাজারে। শুধু তাই কেন? শিয়ালদহ, মীর্জাপুর, কলুটোলা, কসাইটোলা, বৌবাজার, জানবাজার, ঠিক বটতলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে না প'ড়লেও, সাহিত্যিক সীমানার মধ্যে নিশ্চয় পড়ে।" এ-কথা সত্য।

'দো-ভাষী' পুথির তাৎপর্য

যা হোক, এবার দেখা যাক, যাঁরা পুঁথির ভাষাকে বাঙালা না ব'লে, "দো-

www.pathagar.com

ভাষা" ব'লে উলে-খ ক'রেছেন; তাঁরা একথা কেন ব'লেছেন? একথা বলার মূলে তাঁদের যুক্তি কি; ব্যাখ্যা কি।

এ-বিষয়ে আলোচনাকালে বলা দরকার যে, ইতোপূর্বে শ্রীপান্থ বাবুর যে 'কোটেশন' হাজির করা হ'য়েছে; তাতে দেখা যায়—ড. আহ্‌মদ শরীফের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুছলমানী পুথিগুলো দু'টি ভাষায় লেখা; তার একটি হ'ল "বাঙালা" অপরটি—"হিন্দুস্তানী"। এই উভয় ভাষার মিশ্রণে পুথির ভাষার সৃষ্টি। আর সেজন্যেই তা "দো-ভাষা"য় রচিত। অন্যদিকে, ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন—"ইদানীং এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য স্মরণ ক'রে একে দোভাষী পুঁথি ব'লে আখ্যায়িত করা হ'চ্ছে। কিন্তু এই ভাষায় তো দু'টি ভাষার নয়, বহু ভাষার (বাংলা, হিন্দী, ফারছী, আরবী ও তুর্‌কী শব্দ এসে মিলেছে। যেখানে **বাঙালী মুসলমান পরিবারে কথোপকথনের ক্ষেত্রে শতকরা পনের ভাগের বেশী আরবী-ফারছী শব্দের ব্যবহার হয় না; সেখানে গরীবুল-হ্‌র 'আমীর হামজা'য় শতকরা প্রায় বত্রিশ ভাগ বিদেশী শব্দ প্রয়োগ করা হ'য়েছে**। সুতরাং বিদেশী শব্দ-বাহুল্যের কথা বিবেচনা ক'রে, একে মিশ্র ভাষা বলা অসংগত নয় এবং তার অনুসরণে এই কাব্য-ধারাকেও **মিশ্রভাষা-রীতির কাব্য** ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে।"

বলা দরকার যে, ব্যাকরণবিদ্ ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ একটি ভাষাকে কেবল "শব্দ-সম্পদ" দিয়ে বিচার করেন না। প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণগত ভিন্নতাই—তাঁদের মতে, এক ভাষার সাথে অন্য ভাষার ভিন্নতা। এ-ভিন্নতার মধ্যে তিনটি বিষয় নির্ধারক উপাদান রূপে বিবেচিত হয়। তার একটি হ'ল—শব্দ-সম্পদ বা 'শব্দকোষ' (Vocabulary), অপরটি পদগঠন-পদ্ধতি (Morphology) আর তৃতীয় বিষয় হ'ল—বাক্-রীতি বা বাক্য গঠন-পদ্ধতি (Syntax)। এই তিন ক্ষেত্রেই যে, পুথির ভাষার শত শত বছরের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ধারা আছে—ড. আনিসুজ্জামান সম্ভবতঃ তা খেয়াল করেননি।

তাছাড়া, ড. আনিসুজ্জামান জানেন যে, উরদু ভাষার-ই অপর নাম 'হিন্দুস্তানী' বা "হিন্দী"। এ-ভাষায়ও বাঙালা, হিন্দী, সংস্কৃত, আরবী, ফারছী ও তুর্‌কী এবং ইদানীং ইংরেজী শব্দও মিশছে। তবু একে যদি 'হিন্দুস্তানী' বা 'হিন্দী'-ই বলা হয়; তাহ'লে নানা ভাষা থেকে আহরিত বিপুল শব্দ-সম্পদের জন্য পুথির ভাষাকে "বাঙ্গালা" বলা হবে না কেন; তা বোঝা কষ্টকর বইকি। এর দ্বিতীয় নজীর হিসেবে 'উরদু' থেকে নির্গত আধুনিক "হিন্দী" ভাষাতেও তো র'য়েছে—আরবী, ফারছী, উরদু, হিন্দী, বাঙালা, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার বিপুল

www.pathagar.com

শব্দরাজি। আজকের যে-কোন হিন্দী ছবির 'ডায়ালগ' শুনলেই তা বোঝা যাবে। তা সত্ত্বেও যদি ঐ ভাষাকে 'হিন্দী' ব'লে কবুল করা যায়; তবে এক-ই বৈশিষ্ট্যের জন্য পুথির বাঙালা ভাষাকে বাঙালা ব'লে গণ্য না করার বিশেষ কোন হেতু থাকতে পারে না। অথচ শব্দসম্পদ, পদগঠন-রীতি ও বাক-রীতি-বিচারে উরদু ও হিন্দীর মধ্যে যে ফারাক; তার চেয়ে অনেক বেশী ফারাক র'য়েছে—ফারছী-বাঙালা ও সংস্কৃত-বাঙালার মধ্যে।

ড. আনিসুজ্জামান—মুছলমান-পরিবারে কথোপকথনকালে শতকরা পনেরটির বেশী আরবী-ফারছী শব্দ ব্যবহৃত হয় না ব'লে যে-যুক্তি দিয়েছেন—সে-বিষয়ে বলা দরকার যে, তিনি বিশ শতকের মধ্য ভাগের মুছলমান-পরিবারের কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষার সাথে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ বা মধ্যভাগের মুছলিম পরিবারের ভাষার মিল খুঁজে পেতে পারেন না। এই কাল-ব্যবধানে এদেশে মুছলমানদের কেবল পারিবারিক ভাষাই বদলায়নি; পুথির ভাষাও কি রকম ব'দলে গিয়েছে; তা ১৮৫৭ সালে ঢাকার চক বাজার থেকে ছাপা পুথির ভাষার সাথে, ১৯৪৭ সালে ঐ এক-ই স্থান থেকে ছাপা পুথির তুলনা ক'রলেই তিনি বুঝতে পারবেন।

ড. আনিসুজ্জামান যে-সব শব্দকে "বিদেশী শব্দ" ব'লেছেন—সেগুলোকে আদৌ "বিদেশী শব্দ" বলা উচিত নয়। কারণ শব্দ পণ্য দ্রব্যের মত নয়। তা জাহাজ বোঝাই ক'রে বিদেশ থেকে আনা যায় না। গত দেড়-দু'শ বছর আগে আরবী-ফারছী-উরদু শব্দকে কেউ "বিদেশী" শব্দ ব'লতেন না। কেননা, গত–দেড় হাজার বছর ধ'রে বাঙালা দেশে আরবী, তুরকী, ইরানী জনসমষ্টি এবং তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতির যে-প্রবাহ ব'য়ে গেছে—সেই ধারায় আগত লোকেরা প্রথম দিকে যা তাঁদের জন্মভূমি থেকে শিখে এসেছেন, নিয়ে এসেছেন; তা-ই তাঁরা এদেশে পুরুষানুক্রমিক ভাবে চর্চা ক'রেছেন। তা তাঁদের আওলাদ এবং পাড়া- প্রতিবেশী মুছলিম-অমুছলিম-নির্বিশেষে সবাইকে শিখিয়েছেন। আর এমনি ভাবেই তা ঐতিহাসিক ভাবে প্রবহমান দেশীয় ভাষার—এমনকি মুর্খ বাঙালী নর-নারীরও মুখের ভাষার স্থান দখল ক'রেছে। সে-ভাষা তারা কেবল গ্রহণ-ই করেনি; সেই ভাষায় তাঁরা বই-কিতাব, পুথি-পত্তরও লিখেছেন। রচনা ক'রেছেন গ্রাম্য গানও। আর তা কেবল মুছলমান লোক-কবিরাই নয়; হিন্দু লোক লোক-কবিরাও ক'রেছেন। নজীর হিসেবে ড. সুকুমার সেন, তাঁর 'ইছলামি বাংলা সাহিত্যে' কর্তাভজাদের গান থেকে যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার উলে-খ করা যায়। যেমন—

www.pathagar.com

"ভাই আমার আহ্ওয়াল কিছু শুন সব লোকে;
কমিনে আর এমন তো নাই এ মুলুকে।
এক দফাতে ফাঁপর হ'য়েছি—
তোফা এক খেপার সাথে পিরীত ক'রেছি।
আর সুখেতে ফারখতি মাত্র আনহুত বদনামি।"

একজন অশিক্ষিত অমুছলিম কবির মৌখিক রচনায় এই ভাষার শব্দ-চয়নে কোথাও কি কোন দোষ, ভুল, গল্তি, অসংগতি বা ছন্দ-পতন আছে?

তা না থাকলে, এ-ভাষা যে, মুছলিম-অমুছলিম নির্বিশেষে বাঙালা দেশের বাঙালীর-ই নিজস্ব ভাষা, জাতীয় ভাষা বা উচ্চ থেকে নি-পর্যায়ের বাঙালীর গণভাষা—তা বলা অসংগত নয়; বিশেষে ক'রে ১৮ শতকের প্রথমভাগ-এর বিবেচনায়।

আরবী-ফারছী-প্রধান এই বাঙালা ভাষাই যে, মোগল-বৃটিশ আমলে গোটা বাঙালার-প্রশাসনেরও ভাষা ছিল, তা একাধিক সূত্রে আগেই জানানো হ'য়েছে। ড. আনিসুজ্জামান যদি তাঁর "আঠারো শতকের বাংলা চিঠি"-তে সংকলিত, ইংরেজদের নিযুক্ত বাঙালী হিন্দু কুঠিয়ালদের লেখাগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্য উপলব্ধির প্রয়াস পেতেন, তা'হলে তিনি বুঝতে পারতেন;—**আরবী-ফারছী-উরদু শব্দপূর্ণ পুথির ভাষা কৃত্রিম কোন হঠাৎ গজানো ভাষা নয়; ঐ ভাষাই আসল বাঙালা ভাষা।**

তবু ঐ ভাষাকে 'বিদেশী' শব্দে আকীর্ণ বলার অন্যতম কারণ 'ব্রাহ্মণ্যবাদী' ভাষা-বিদ্বেষী মনোভাব। ১৮০১-সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙালা বিভাগের মাধ্যমে ইছলাম ও মুছলিম-বিদ্বেষী এবং বিরোধী যে-ইঙ্গ-বঙ্গীয় কালচারাল পলিটিক্স শুরু হয়; সেই ধারাতে ভারতীয়-বঙ্গীয় এক শ্রেণীর হিন্দু শিক্ষক-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী মুছলমানদের বিদেশী ব'লে প্রচার ক'রতে থাকে। আলোচ্য ধারাতেই তাঁরা ব'লতে থাকে— 'মুছলমানরা বিদেশী। অতএব তাঁদের ভাষাও বিদেশী।'—এই অর্থেই বাঙালা ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত আরবী, ফারছী, উরদু শব্দই—"বিদেশী" ব'লে ছাপ্পা মারা হ'তে থাকে। অন্যদিকে,—আসল বিদেশী সংস্কৃত শব্দ, বাগ্ধারা, বাক্-রীতি সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। তাঁর ফলে, বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-সাহিত্যিকরা বুঝতেই পারেননি যে, তাঁরা, যে-সব শব্দকে বাঙালা ব'লে ভাবছেন—আসলে সেগুলো বাঙালা নয় 'চুল-দাঁড়ি-গোঁফ কেটে ফেলা' সংস্কৃত মাত্র। আর তা আরবী, ফারছী,

www.pathagar.com

উরদুর চেয়েও বিদেশী এবং বিকৃত। বাঙালীর অশিক্ষিত জনসমাজে ঐ সব-শব্দের এখনও তাড়িপাতা সম্ভব হয়নি।

সর্বশেষে বলা দরকার, বাঙালা ভাষায় আরবী, ফারছী, উরদু শব্দ যদি "বিদেশী"-ই হয়, তাহ'লে—'বাঙালা ভাষা' বিদেশ থেকেই এ-দেশে এসেছে—ব'লতে হবে। কারণ "বাঙ্গালা" বা 'বাঙালা'—এ ভাষা-নামটি-ই "বিদেশী"। এই শব্দটি যে ফারছী—তা ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অকপটে কবুল ক'রেছেন।

ফলে, যে যা-ই বলুন; নতুন প্রাপ্ত তথ্য ও যুক্তিতর্কের আলোকে পুথির ভাষাকে 'মিশ্রভাষা' বা 'দো-ভাষা' বলা যায় না। এ-ভাষা অরিজিনাল বাঙালা ভাষাই। এ-ভাষায় আরবী, ফারছী, উরদু, হিন্দী কোন শব্দই "বিদেশী" নয়। তাই শ্রীপান্থ বাবু ঠিক-ই ব'লেছেন—"যে আখ্যাতেই ভূষিত করা হোক না কেন, এ-সব বইও অবশ্যই বাঙালি পাঠকদের জন্য লেখা বাংলা বই।" তাহ'লে—ভাষাটাও কি অবশ্যই বাঙালা নয়?

'মুছলমানী বাঙালা'ই প্রকৃত 'বাঙালা'

এবার বলা দরকার, পুথির ভাষা যদি দো-ভাষা, দো-আঁসলা ভাষা, মিশ্র-ভাষা বা জগাখিচুড়ি ভাষা হয়, তাহ'লে এ-ভাষায় যাঁরা কথা ব'লতেন, লিখতেন, বইয়ের বিজ্ঞাপন দিতেন; তাঁরা একে কোন্ নামে ডাকতেন, কোন্ নামে এ-ভাষার পরিচয় দিতেন—তা ভালভাবে জানা দরকার। আর এ-ভাষার নাম "মুছলমানী বাঙালা", "ইছলামি বাঙালা"ই বা হ'ল কখন থেকে—তাও আলোচনা করা দরকার।

'ভাষা-নাম' সম্পর্কে
বটতলার কবিদের বক্তব্য

পুথি-সাহিত্য বা 'বটতলার সাহিত্যে'র প্রায় সমস্ত মুছলিম কবি-মুছান্নেফ-ই তাঁদের কিতাবের ভাষাকে "বাঙ্গালা" ভাষা, "বাঙ্গালার বাঙ্গলা" ভাষা, "বাঙ্গালীদের বাঙ্গালা" ভাষা, "চলিত বাঙ্গালা" ভাষা বা "ছলিছ বাঙ্গালা" ভাষা ব'লেছেন : যথা—

১. আনুমানিক ১৫৫০ থেকে ১৬১৫ সালের মধ্যে জীবিত শেখ পরাণ-এর 'নছিহত নামা' থেকে উদ্ধৃতি—

"ফারছি ভাষে সেই কথা আছিল লেখন।
বাঙ্গালা ভাষায় কৈলুঁ বুঝিতে কারণ॥"

www.pathagar.com

২. ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে রচিত শেখ মুত্তালিব-এর 'কায়দানী কিতাব' থেকে উদ্ধৃত—

"হীন মুত্তালিব কহে আল-াকে ভাবিয়া।
কহিমু কায়দানী কিতাব **বাঙ্গালা** করিয়া ॥

৩. ১৬৯৫-১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জীবিত চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবি আলী রাজা ওরফে কানু ফকীরের "ছিরাজ কুলুব" থেকে উদ্ধৃত—

"ছিরাজ কুলুপ নামে আছিল কেতাব।
উত্তম মছলা তাতে সুন্দর পরস্তাব॥
গুরুমুখে এসবের হদিছ পাইলু।
সভানে বুঝিতে **ভাল বাঙ্গালা** করিলু॥"

৪. ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে লেখা কাজী শেখ মনছুর-এর "ছির্নামা" থেকে উদ্ধৃত—

"আছিল আরবী ভাষে কিতাব প্রধান।
আলিম চতুরে কৈল ফারছি বাখান॥
আনিয়া ফারছি ভাস **বাঙ্গালা** করিলু।
তার মধ্যে দোস গোনা এক না চাহিলু॥"

৫. ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে রচিত হেয়াৎ মাহ্মুদ-এর 'চিত্ত উত্থান' বা 'সর্বভেদ বাণী' থেকে উদ্ধৃত—

"রাখিল কেতাবের নাম অতি বড় অনুপাম
মফ্রেহুল-কুলুব যে নামে।
আমি সে কিতাব দেখি **বাঙ্গালাতে** সাইর লিখি
পুস্তক রচিনু বহু শ্রমে॥"

৬. ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রচিত শাকের মাহ্মুদ-এর রচিত 'মধুমালতী" থেকে উদ্ধৃত—

"আনন্দ উৎসব মন ঈদের দিবসে।
সপ্তম আশ্বিন মাস তৃতীয়া আকাশে ॥
একাদশ শত সাল ঊন অষ্ট আশী।
ফারছি-বাঙ্গালা ভাষা হৃদয়ে প্রকাশি॥"

৭. ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ নূর উদ্দীন-রচিত "দাকায়েকুল হাকায়েক" থেকে উদ্ধৃত—

www.pathagar.com

"এগারশ' সাতানব্বই সাল হৈল যবে।
পুস্তক **বাঙ্গালা** কৈলুঁ শুন নর সবে॥"

৮. ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত কবির রচিত 'হিতোপদেশ' বা 'বুরহানুল আরেফিন' থেকে উদ্ধৃত—

"বারশ' তিন সনে পুস্তক লিখা যায়।
পড়িলে শুনিলে জ্ঞান জন্মিবে সবায়॥
বোরহানুল আরেফিন কিতাব দেখিয়া।
কহি হিত উপদেশ **বাঙ্গালা** রচিয়া॥"

৯. চট্টগ্রামের অধিবাসী আলী রজার মুরীদ, বালক ফকীর-রচিত "ফাএদুল মুক্তাদি" থেকে উদ্ধৃত—

"ফাএদুল মোপ্তাদি এই কিতাবের নাম।
বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে লেখিলুঁ উপাম ॥"

১০. ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রচিত কবি মালে মোহাম্মদের "ছয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল' কেতাব থেকে উদ্ধৃত—

"এই পুথির সায়ের, ছিল আগু জামানার।
সংস্কৃতে সাধু ভাষা হৈল তৈয়ার॥
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কেছেল-া।
তে কারণে অধিন রচে **ছলিছ বাঙ্গালা** ॥"

খেয়াল করা দরকার যে, মালে মোহাম্মদ তাঁর পুথির ভাষাকে "ছলিছ বাঙ্গালা" বা "বিশুদ্ধ বাঙ্গালা" ব'লেছেন এবং সমকালে (১৮০১ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে) সংস্কৃত ভাষা-ভিত্তিক যে-সাধু ভাষা কৃত্রিমভাবে তৈরী হয়; তারও উলে-খ ক'রেছেন। তিনি পষ্ট ভাষায় আগের আমলের **পুথির ভাষাকে প্রকৃত বাঙ্গালা** ভাষা এবং **সমকালীন** ভিন্ন ধারার **নতুন 'বাঙালা ভাষা'কে সংস্কৃত থেকে তৈরী "সাধু ভাষা"** ব'লে বয়ান ক'রেছেন। এর সমর্থন কোন কোন হিন্দু লেখকের লেখাতেও পাওয়া যায়।

কোন কোন লেখক-গবেষক-কবি ঐ "ছলিছ" শব্দটিকে "চলিত" রূপে সংশোধন ক'রে নিয়েছেন। তাঁরা হয়তো শব্দটি অর্থহীন ভেবেছেন। আসলে তা নয়। এটি একটি আরবী শব্দ । অর্থ—ছহী, সরল, বিশুদ্ধ।

বলা দরকার, এই "ছলিছ" শব্দটি ১২৮৭ সালে (১৮৮০খৃষ্টাব্দ) লিখিত মুন্সী রবিউল-হ্‌র "চৌদ্দ উজীর" নামক পুথিতেও পাওয়া যায়। উক্ত পুথিতে বলা

www.pathagar.com

হ'য়েছে—

"ফারছি জবানে কিচ্ছা আছিল তাহার।
আওয়াম লোকেতে নাহি পারে বুঝিবার॥
তেকারণে **বাঙ্গালাতে** রচিয়া পয়ার।
ছলিছ* করিয়া দিনু কারণে সবার॥"

১১. ১৮৪৯ সালে রচিত বাকের আলী চৌধুরীর 'মনুচেহের মাছুমা পরী' কাব্য থেকে উদ্ধৃত—

"মনুচেহের কেচ্ছাবাণী ফারছি জবান।
কেতাবেতে লিখা আছে তাহার বয়ান॥
বাঙ্গালার ভাষে তাকে করিনু পদবন্ধ।
সকলে জানিতে হেতু পয়ার সুছন্দ।"

১২. ১৯ শতকের মধ্যভাগে মোহাম্মদ দানেশ-রচিত 'চাহার দরবেশ'-কেতাব থেকে উদ্ধৃত—

"কেতাব করিল মর্দ্দ ফারছি জবানে।
ফারছি-লোক যারা তারা খুসি হালে শোনে॥
বাঙ্গালার লোক সবে নাহি জানে ভেদ।
যে কেহ শুনিল তার দেলে করে খেদ॥...
এখাতেরে ফকিরে হইল সওক।
আফছোছ না করে যেন বাঙ্গালার লোক॥...
(তাই) **চলিত বাঙ্গালায়** কেচ্ছা করিনু তৈয়ার।
সকলে বুঝিবে ভাই কারণে ইহার॥"

উক্ত বারোটি কোটেশনের মত আরও অসংখ্য কোটেশন হাজির ক'রে দেখানো যায়—পুথির ভাষাকে পুথির কবিরা অসংকোচে 'সহজ বাঙালা', 'সরল বাঙালা' বা "ছলিছ বাঙালা" ব'লেছেন। তাঁরা একে "চলিত" বাঙ্গালাও ব'লেছেন। আর তা ব'লেছেন—কেবল 'কোলকাতার বটতলা'র কবিরা নন; উড়িষ্যার বালেশ্বর-নিবাসী কবি আবদুল মজিদ খাঁ ভুঞা থেকে চট্টগ্রামের কবি হামিদুল্লাহ খান অবধি এবং পনের-ষোল শতক থেকে শুরু ক'রে বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক পর্যন্ত। তাঁদের রচনায় আরও বলা হ'য়েছে এই "ছলিছ" বাঙালাই সারা বাঙালা দেশের 'বাঙালীর বাঙালা'—'চলিত বাঙালা'। বাঙালার আম জনকওম যে-ভাষা বোঝে—সে, এই ভাষা।

www.pathagar.com

'চলিত বাঙালা' ও 'আসল বাঙালা' কথার তাৎপর্য কি

পাঠক নিশ্চয়-ই লক্ষ্য ক'রেছেন যে,—১৮২৮ সালে রচিত 'ছয়ফল মুলুক ও বদিউজ্জামাল' কাব্যে মুন্‌সী মালে মোহাম্মদ লিখেছেন—'আদি জামানার ছলিছ বাঙ্গালা লোকে বুঝতে পারে; কিন্তু হাল জামানার সংস্কৃত-বাঙালাকে তাঁরা বুঝতে পারে না ব'লে; তিনি সেই 'আগু জামানা'র বাঙালায় কাব্য রচনা ক'রছেন।'

কিন্তু ত্রিশ বছর পর কবি মোহাম্মদ দানেশ তাঁর পূর্বোক্ত বক্তব্যে জানিয়েছেন—"আসল বাঙালা" লোকে বুঝতে পারে না ব'লে; তিনি 'চলিত বাঙালা'য় কেচ্ছা তৈরী ক'রছেন।" তাঁর অর্থ এই যে, এই ত্রিশ বছর এবং এর আগের ২৫ / ২৬ বছর—একুনে ৫৬ / ৫৭ তথা ৫০ / ৬০ বছরে 'বাঙালা ভাষা'র দু'টি পরস্পর-বিরোধী ধারার মধ্যে—পুথির 'ফারছি–বাঙালা' বা 'মুছলমানী–বাঙালা'র পতন হ'য়েছে। বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষা হেরে গিয়েছে। স'রে গিয়েছে। এক-ই ভাষার দুই ধারার সংঘাতে শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিপুল উদ্যম ও কর্মায়োজনের মধ্যে 'চাপিয়ে দেয়া ভাষা'র কারণে,"সহজ বাঙালা" তখন 'কঠিন' এবং 'কঠিন বাঙালা' সহজ হ'য়ে উঠেছে। তাই মোহাম্মদ দানেশ তখনকার "আসল বঙালা" লোকে বোঝে না ব'লে, তিনি পুথির প্রচলিত বাঙালাতেই চাহার দরবেশ লেখেন। এ-থেকে **ছাফ ছাফ বোঝা যায়—১৮৫৭-'৫৮ সাল নাগাদ 'নতুন ধারায় শিক্ষিত শ্রেণী'র নিকট বাঙালা ভাষার এক রূপ, আর 'চলমান ধারায় শিক্ষিত শ্রেণী'র নিকট বাঙালা ভাষার অন্য রূপ আলাদা আলাদা চেহারায় দাঁড়িয়ে গেছে। বাঙালা ভাষার এই দু'রূপের আখলাক-খাছিয়ৎও হ'য়ে প'ড়েছে—দু'রকম। 'সাধু' ও 'অসাধু' (চলিত)। নতুন বানানো 'সাধু ভাষা'ই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তখন "আসল বাঙালা"; আর আসলটা**—অকুলীন। অপরিচিত।

কিন্তু সমাজের উঁচু স্তরে ইঙ্গ-বঙ্গীয় শিক্ষিত হিন্দু-প্রধান সমাজে যা-ই হোক না কেন; কোলকাতার বটতলাসহ সারা বাঙালার 'সাহিত্য-বটতলা'র কবি-মুছান্নেফগণ তাঁদের ভাষা-নামের দাবী তাঁরা কখনও ছেড়ে দেননি। কখনও অস্পষ্ট রাখেননি। তার ফলে—১৮৬১ সালে প্রকাশিত কবি রেজাউল-হ্ "কাছাছোল আম্বিয়া-"রচনাকালে লিখেছেন—

"কহু কিছু কেচ্ছা আর কালাম এয়ছাই।
শুনিতে সওক করে সওকিন সবাই ॥

www.pathagar.com

তাহাতে ফায়দা হয় লোগের খাতের।
দিলে দোওা ভাল তেরা হইবে আখের॥
মনের খাহেসে তাহা আছিনু তল-াসে।
করি কোন কেচ্ছা আমি **বাঙ্গলার ভাষে** ॥
কহিলেন পরে মুঝে বহুত লোকেতে।
কাছাছল আম্বিয়া কর রচনা **বাঙ্গলাতে** ॥
জরুরি করিয়া তিনি কহিল আমায়।
আম্বিয়া লোকের কেচ্ছা কর **বাঙ্গালায়** ॥
হইলে **বাঙ্গালা** ভাষে **বাঙ্গালার লোক**।
পড়িলে বুঝিতে পারে কেচ্ছার সওক ॥"

এক-ই ভাবে ১৯ শতকের শেষ কিবা বিশ শতকের প্রথম দিকের কবি হাফেজ ছুফি আবদুল করিম লেখেন—

"দরুদ কিবরিয়া নামে রেছালা উরদুতে।
তালিব তছনিফ করিলেন খুবি সাতে ॥
সে কেতাব হৈতে আমি **বাঙ্গলা জবানে**।
রচনা করিনু ঠিক তরজমার মানে ॥"

পরিশেষে, বিশ শতকের প্রথম দিকে রচিত 'শিরী-ফরহাদ" কিতাবের কবি মুন্শী আবদুল গণির বক্তব্যে নজর দেয়া যেতে পারে। যথা—

ক. "উরদু জবানেতে কেচ্ছা নাহি বুঝে লোকে।
ইহার খাতেরে করি **বাঙ্গালা** তাহাকে ॥"
খ. "উরদুর জবান না হয় দেলের মতন।
তাহাকে **বাঙ্গালা** (করি) লিখিব এখন ॥"

অতএব বাঙালীর মূল বাঙালা (ফারছী-বাঙালা) ভাষা বিভক্ত হবার পরও যে, মুছলমানরা ঐ ভাষা ত্যাগ করেননি এবং পুথির ঐ ভাষাকেই তাঁরা 'আপন ভাষা' বা 'বাঙালার নিজস্ব ভাষা' ব'লে জেনেছে, মেনেছে এবং "বাঙ্গালা" নামে অবিতর্কিত ভাবে লিখেছে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ সেই ভাষাকে 'দো-ভাষা', 'মিশ্রভাষা' ব'লে পরিচয়হীন করা হ'য়েছে। এর মূল কারণ—১৮০১ সাল থেকে ১৮৫৭-সালের মধ্যে বাঙালা ভাষা যে, ভাগ ক'রে 'হিন্দু বাঙালা' (সাধু ভাষা,. বঙ্গভাষা ইত্যাদি) ও 'মুছলমানী বঙালা'—'ইছলামী বাঙালা'য় রূপান্তর করা হ'য়েছে, আর প্রকৃত বাঙালা ভাষাকে এক পাশে সরিয়ে দেয়া হয়েছে—সে কথা না-জানা।

www.pathagar.com

'বাঙালা'—কবে হ'ল
'মুছলমানী বাঙালা'

সারা বাঙালার চিরপরিচিত অভিন্ন 'বাঙালা ভাষা'—'ইছলামী বাঙালা' বা 'মুছলমানী বাঙালা', 'জবানে মুছলমানী' ব'লে কেন ও কিভাবে পরিচিত হ'ল—এবার সে-সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

যতদূর জানা যায়, পুথির বাঙালা ভাষাকে "মুছলমানী বাঙালা" ব'লে প্রথম চিহ্নায়ন করেন—রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্। তিনি ১৮৫৭ সালে বাঙালার ছাপাখানা ও সেগুলোতে মুদ্রিত বই-কেতাবের যে-তালিকা (Catalogue) তৈরী করেন,—তাতেই **প্রথম "মুছলমানী বাংলা"-র উলে-খ** ক'রেন। এ-বিষয়ে তাঁর আলোচনা নিম্নে কোট্ করা হ'ল—

"মুছলমানী বাংলা-বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ২৪,৬০০ কপি

মুছলমানদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোক-ই ইংরেজী স্কুলে পড়াশোনা ক'রতে ইচ্ছুক। তারা স্যাক্সন জাতীয় লোকদের অনুকরণ করাও পছন্দ করে না। তা হ'লেও **তাদের বেশ বুদ্ধি আছে** এবং তারা প্রাচ্যদেশীয় বিষয়সমূহ অধ্যয়ন ক'রতে ভালবাসে। **তাদের যে মানসিক মৃত্যু হ'য়েছে তা নয়,** তারা স্বপ্নগ্রস্ত মাত্র। তাদের জন্য রুচিসম্মত পুস্তক প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। **মুছলমানেরা বাংলা ভাষায়-ই কথা বলে** কিন্তু **তাতে প্রচুর ফারছী ও উরদু শব্দের মিশেল থাকে।**

মুছলমানী বাংলা নামে অভিহিত পুস্তকগুলি এই কাঠামোতেই রচিত। ভাষা বাংলা হ'লেও **বাগ্ধারা** ও বিশিষ্টার্থক শব্দসমূহ ফারছী। বস্তুতঃ, **এ হ'লো ফারছী ও বাংলার মধ্যে একটা অপোষরফা, যেমন ফারছী ও হিন্দীর মধ্যে আপোষরফার ফল ছিল উরদু ভাষা।** তবে বাংলা আদালতের ভাষা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায়, এই **উপভাষা** সম্ভবতঃ ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে বাঙালী ভদ্রলোকেরা স্বদেশীয় ব্যাপারে সর্বদা ফারছীতেই পড়ালেখা ক'রত। **এসব পুথি** প্রধানতঃ **নৌকার মাঝিরা** (ভেনিসের গণ্ডোলা চালকদের মতই এরাও সঙ্গীতপ্রিয়), **মুছলমান ভৃত্য ও দোকানদার শ্রেণীর লোকেরাই পাঠ করে।** নিম্নে এ-শ্রেণীর পুস্তকের একটি তালিকা দেওয়া হ'লো। এগুলি ফি-বছর প্রকাশিত এবং ব্যাপক হারে বিক্রি হয়।"

www.pathagar.com

নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা	বিবরণ
আবু শামা	২৭	খলিফা ওমরের পুত্রের জীবনী।
আজাবুল কবর	৬৪	কবরের আজাব-সংক্রান্ত।
আমির হামজা	৪৪৪	[হজরত] মুহম্মদের চাচার হত্যা-বিষয়ক।
বাহার দানেশ	২০৬	স্ত্রীলোকদের ব্যঙ্গ ক'রে হাস্যরসের গল্প।
বৌমালা	৪৮	X
বেদারুল গাফেলীন	১৬৭	বে-খেয়ালদের সতর্কীকরণ সম্পর্কে।
ভাবলাভ স্রোত	১৯২	সঙ্গীতাদি।
চাহার দরবেশ	২৮৮	চার দরবেশের কাহিনী।
গোলেবকাওলি	২৮৮	প্রণয়-কাহিনী।
হজরতের তোয়াল-াদ	২৫	[হজরত] মুহম্মদের জন্ম।
হাজার মছলা	১০৮	ধর্ম-বিষয়ে এক হাজার প্রবাদ।
হাতেম তা'য়ী	২৯৯	প্রখ্যাত আরব-নেতার জীবন-চরিত।
ইবলিছ নামা	৭২	শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে।
ইছলাম জাতি	১০০	মুছলমানদের আচরণ সম্পর্কে।
ঈমান চুরি	৩১	বে-ঈমানদের সম্পর্কে।
জয়গুণ	২৬২	জনৈকা মহিলা যোদ্ধার জীবন-চরিত।
কাজী হয়রান	৯২	কিংকর্তব্যবিমূঢ় হাকিম।
কুঞ্জ বিহারী	২৮	গল্প।
কেয়ামত নামা	১৮৮	শেষ-বিচার-দিনের বিষয়ে।
লালমোন কেচ্ছা	২০	রাজকন্যার গল্প
মৌলুদ আদম	৮৬	আদম-জীবনী।
মুক্তাল হোছেন	২৭৬	হোছেনের মৃত্যু।
মেফ্তাহুল জান্নাত	X	বেহেশ্তের চাবি।
মেয়রাজ নামা	৬৪	[হজরত] মুহম্মদের বেহেশ্তে উত্তরণ।
মোছা রায়বর	১৫	মুছার ইতিবৃত্ত।
মুর্শিদ নামা	২৩	গুরু-ভক্তি
ইনজামুল ইছলাম	৫২	ইসলামের বিধিবিধান।
নুরল ঈমান	৯৯	ভক্তি সম্পর্কে।
ওফাত নামা	২৪	[হজরত] মুহম্মদের মৃত্যু।
রদ্দে মনকেরা	১০	অবিশ্বাসীদের যুক্তি খণ্ডন।
সাহানামা	৩০৪	পারশ্য-সম্রাটের ইতিবৃত্ত।

www.pathagar.com

গুর্জ উজাল	৪০	নারী-যোদ্ধাদের বিবরণ।
ছিফাত ছালাত	৪৭	প্রার্থনা-বিষয়ক।
মাফয়াতুল মোমেনিন	১৪৪	মোমিনদের পরিত্রাণ-বিষয়ক।
সোনাভান	৩৯	নারী-যোদ্ধার বিবরণ।
তজবিজ একফিন	১১২	দাফন-সম্পর্কিত।
তমবিহুল জাহেলিন	১০২	পাষণ্ড-দমন বিষয়ক।
তোতা ইতিহাস	১৩০	উপাখ্যান।
তুমবিহুল গাফেলিন	X	অজ্ঞ লোকের শাস্তি-সম্পর্কিত।
ইউছুফ জোলেখা	১২৬	জোসেফ ও জুলেখার প্রণয়-কাহিনী।

'বাইবেল সোসাইটি' এই উপভাষায় (মুছলমানী বাংলায়) লিউক-এর সুসমাচার (গসপেল অব লিউক) এবং ধর্মগ্রন্থসমূহের বিভিন্ন অংশ মুদ্রণ ক'রেছে। **ট্রাস্ট সোসাইটিও এই উপভাষায় অনেকগুলি ধর্ম-পুস্তক প্রকাশ ক'রেছে।"**

উপরের কোটেশনটি মনোযোগ দিয়ে প'ড়লে দেখা যায়, জেমস্ লঙ্ "মুছলমানরা বাঙালা ভাষায়-ই কথা বলে" ব'লে কবুল ক'রেছেন; তবে তাতে "প্রচুর ফারছী ও উরদু শব্দের মিশ্রণ" থাকে ব'লে জানিয়েছেন।

এর পর তিনি লিখেছেন—"মুছলমানী বঙালা" নামে অভিহিত পুস্তকগুলো ঐ কাঠামোতেই রচিত। তার অর্থ, ঐ বাঙালা ভাষাতেই লিখিত। তারপর তিনি একে কেন "উপভাষা" ব'ললেন; তা কারও বোধগম্য হবার কথা নয়। বলা দরকার যে, তিনি যে-বাঙালাকে "আদালতের ভাষা" ও "বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম" রূপে উলে-খ ক'রেছেন—সেই দু'স্থানের দুই বাঙালা এক 'বাঙালা' ছিল না। ঐ সময়ে; **'আদালতে'র বাঙালা ছিল 'ফারছী-বাঙালা'** আর **'বিদ্যালয়ের 'বাঙালা' ছিল—"সংস্কৃত-বাঙালা'**। শিশুদের এ-সময় থেকেই ব্যাপকভাবে বিদ্যাসাগরের "বর্ণ-পরিচয়" প্রথম ভাগ ও 'দ্বিতীয় ভাগ' পড়ানো হ'তে থাকে। ফলে, অফিস-আদালত, (বিশেষ ক'রে রেজিস্ট্রী অফিস), ব্যক্তিগত চিঠি ও দলিল-দস্তাবেজে তখনও ফারছী-বাঙালা বহাল র'য়েছে; কিন্তু সংস্কৃত-বাঙালা ফোর্ট উইলিয়মের অভ্যন্তরে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে; হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে নেমে এসেছে—সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু-কলেজ মাড়িয়ে পাঠশালা পর্যন্ত। তবে হিন্দুদের 'টোলে' তখনও ঐ সংস্কৃত-বাঙালার স্থান হয়নি। শুধু বিদ্যাসাগর কর্তৃক বৃটিশ সরকারের অর্থ-সাহায্যে নতুন প্রতিষ্ঠিত শ' খানেক পাঠশালা-স্কুলে সংস্কৃত-বাঙালা পড়ানো হ'ত । গোটা বাঙালার বাকি শত শত মক্তব-মাদ্‌রাছায় তখনও পড়ানো হ'ত—ফারছী-বাঙালা। তাই দেখা যায়—১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ-বের ঘোর অস্থিরতার কালেও

www.pathagar.com

কোলকাতায় যে-সব বই ছাপা হয়—তাঁর মধ্যে 'মুছলমানী বাঙালা' বা 'ফারছী-বাঙালা'য় ছাপা হ'য়েছে—২৩খানি বই; আর সংস্কৃত-বাঙালায় ছাপা হ'য়েছে—১৪ খানি। লঙ্ জানিয়েছেন—সংস্কৃত-বাঙালায় ঐ ১৪ খানি বই মোট **পনের হাজার** কপি ছাপা হয়; আর ফারছী-বাঙালায় (তাঁর ভাষায় 'মুছলমানী বাঙালা') ছাপা হয়—**চব্বিশ হাজার ছ'শ'**।

কিন্তু এই হিসাব-ই সব নয়। কারণ জেমস্ লঙ্ ঐ বছর মুছলিম প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে, সরাসরি তাঁদের নিকট থেকে, তাঁদের প্রকাশিত বই-কেতাবের কোন তালিকা যোগাড় ক'রতে পারেননি। কারণ তিনি মুছলমানদের আর মুছলমানরা তাঁকে, বিশ্বাস ক'রতে পারেননি। অতএব, যদি ১৮৫৬-তে তিনি তথ্য-কালেকশন ক'রতেন; তাহ'লে, 'ফারছী-বাঙালা'য় লেখা মাত্র ২৩ খানি পুথি-কেতাবের ২৪ হাজার ৬ শ' কপি নয় আরও অনেক বেশী পুথি-কেতাব পেতেন, তা বেশক বলা যায়। কিন্তু হিন্দুদের নিকট থেকে তথ্য-কালেকশনে লঙ্-এর কোন বাধার সৃষ্টি না হওয়ায়—পষ্ট ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, **তখন কেন; হয়তো আরও পঁচিশ বছর পর্যন্ত ফারছী-বাঙালায় রচিত সাহিত্যই ছিল বাঙালার প্রধান ধারার সাহিত্য; শক্তিশালী সাহিত্য।**

এজন্য জেমস্ লঙ্ যে-ভাষাকে উপভাষা ব'লে মনে ক'রেছেন; তা যে—তাঁর জ্ঞানের অভাববশতঃ ভেবেছেন—তা সত্য। আর এই ভাষা—"মুছলমানী বাঙালা নামে অভিহিত"—সে-তথ্য তিনি নিশ্চয়-ই হিন্দু লেখক-প্রকাশক এবং নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট পেয়েছেন—তা বোঝা কষ্টকর নয়। যেহেতু তখন দু'টো ভাষা-রীতি বা ভাষা-ধারার সৃষ্টি হ'য়েছে এবং তার মধ্যে হিন্দুধারার সংস্কৃত-বাঙালা—প্রচারের জোরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে; সেহেতু মুছলমানদের আঁকড়ে থাকা চলমান 'ফারছী-বাঙালা'র ধারা—"মুছলমানী বাঙালা" নামে হ'য়েছে চিহ্নিত। তাই এ-কথা না-কবুল করার জো নেই যে, "মুছলমানী বাঙালা", "ইছলামী বাঙালা"—এসব নাম ইঙ্গ-হিন্দুদের-ই দেওয়া।

পরে মুছলমানরা বাঙালা ভাষার এই বিদ্বেষমূলক নাম কবুল ক'রে নিয়েছে। নিজেদের রচনায় তা ব্যবহারও ক'রেছে। তার নজীর দিতে বলা যায়—১৮৫৭ সালে কবি মুন্সী দানেশ তাঁর "কেচ্ছা গোল বাছনওয়ার"-এ লিখেছেন—"(এ-বই) লোকের ফয়দার জন্ন্য ফাজেল লোক হেন্দি করিয়া ছাপাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই বাঙ্গলা দেসে, বহুত আওাম লোকে হেন্দি ভাল রূপে বুজিতে না পারায় বাঙ্গলায় খায়েস করেন।... **(তাই) মোছলমানী বাঙ্গলা ভাসায় ঠীক কেতাব**

মাফিক তরজমা করানো হ'ল।"

এরপর কাজী সাহা ভিক-রচিত 'বাহার দানেশ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনের কথা বলা যায়। ঐ বিজ্ঞাপনে বলা হ'য়েছে—"কাজী সফীওদ্দীন ঐ পুস্তক পারসী ও উরদু হইতে বাঙালা মোছলমানী ভাষায় ঠিক তরজমা করায় অনেকানেক হিন্দুগণ **মোছলমানি ভাষা** ভাল রূপে বুঝিতে না পারায় ও হিন্দু লোকদিগের খাহেস দেখিয়া দ্বারিকা নাথ রায় পণ্ডিত মহাশয় যিনি হিন্দু কলেজের মাস্টার ছিলেন তাঁহার দ্বারায় বাঙালা পদ্য ছন্দে **"সাধু ভাষা"য়** রচনা করাইয়াছিলেন।"

১৯শতকের শেষ পর্বে কোলকাতার শেখ আমীর উদ্দীন, তাঁর 'মনছুর হাল-াজ' নামক কেতাবে লেখেন—

"মাসাএখ মনছুরের কেচ্ছা ফারছিতে।
লিখিয়াছিলেন কোন ফাজেল লোকেতে॥
সেই তো রেছালা ফের উরদু জবানেতে।
হইল তরজমা কলিকাতা সহরেতে॥
আবদুল খালেক নাম মৌলবি ছাহেব।
লিখিয়াছিলেন নজমেতে বেআয়েব॥
সেইতো রেছালা ফের **এছলামি বাঙ্গালায়**।
লিখিতে এরাদা হৈল খাহেস আমায় ॥...
বাঙ্গালা লোকের কেচ্ছা শুনিতে খাহেস।
তেকারণে **বাঙ্গালা**তে করিনু ফাহেস॥"

কবি **'ইছলামী' বাঙালাই যে, আসল বাঙালা, তা জানতেন** ব'লে, শেষ বাক্যে "এছলামি বাঙ্গালা" না ব'লে—ব'লেছেন "বাঙ্গালা"। বাঙ্গাল-লোকে ('বাঙ্গলা দেশের লোকে' বা 'বাঙ্গালী লোকে';) যে-বাঙালা বোঝে, সেই 'বাঙালা'।

উড়িষ্যা থেকে আগত ও কোলকাতায় বসবাসরত কবি "মওলবী হাজী আবদুল মজীদ ভূঞা উৎকল সিতারা"—তাঁর "দাস্তানে আমীর হামজা"য় ঐ বাঙ্গালাকে "ইছলামী জবান"ও ব'লেছেন। তাঁর ভাষায়—

"বাঙ্গালায় এসে আমি ইছলামী জবান।
প'ড়ে শুনে লিখিলাম ওহে মেহেরবান ॥"

এরকম আরও কোটেশন দাখিল করা যায়।

www.pathagar.com

এ-বিষয়ে মনে রাখা উচিত যে, এক বিশেষ শ্রেণীর বিদ্বেষ-পরায়ণ বামুন; জৈন, বৌদ্ধ ও মুছলমানদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য ও জাতি-পরিচয় নিয়ে, এ-রকম আরও অনেক ছাপ্পা মারা শব্দ-বাক্য চাউর ক'রেছে; ও ক'রছে; তার কোন প্রতিবাদ কেউ করেনি। বরং ঐ সব 'ছাপ্পা মারা' শব্দ-বাক্য দোছরা তরফ হিসেবে তারা কবুল ক'রে নিয়েছে ও নিচ্ছে। তার নজীর রূপে হাল-আমলে এদেশের মুছলমানরা 'একত্ববাদী' হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের-ই একাংশের প্রচার-প্রচারণায় যেমন তাঁরা নিজেদের "মৌলবাদী" ব'লে কবুল ক'রে নিচ্ছে; তেমনি মোগল-বৃটিশ আমলেও যখন তাঁদের "ম্লেচ্ছ" বলা হ'য়েছে, তখনও তাঁরা তা কবুল ক'রেই নিয়েছে। বাদ-বিতণ্ডা তোলেনি। 'পুথি সাহিত্যে' তারও নজীর আছে। সেই এক-ই ধারায় পুথির কবিরা কেউ কেউ যদি ঐ খাছ বাঙালাকে "ইছলামী বাঙালা" বা 'মুছলমানী বাঙালা' ব'লে থাকেন; তবে তা অমুছলমানদের ঐ ভাষার প্রতি বিদ্বেষের-ই ফল ব'লে গণ্য না ক'রে বিভ্রান্ত হওয়া অনুচিত।

আরও বলা দরকার যে, "ফারছী-বাঙালা" বা "ইছলামী" অথবা 'মুছলমানী বাঙালা' কেবল মুছলমানদের মধ্যে ইছলামী সাহিত্য-চর্চায় সীমিত ছিল না। তা ছড়িয়ে ছিল হিন্দু সমাজে তো বটেই; সেই সঙ্গে খৃষ্টান পাদ্‌রী সমাজে ও সংগঠনেও। **অথচ বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের এক পেশে লেখার কারণে সে-কথা চেপে যাওয়া হ'য়েছে।** তাঁরা কেবল শ্রীরামপুর মিশনের খৃষ্টান মিশনারীরা যে, নব নির্মিত সংস্কৃত-বাঙালার **চর্চা ক'রেছেন—ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কেবল তার-ই গুণগান ক'রেছেন। অথচ এক-ই সময়ে অন্যদিকে, খৃষ্টানদের অপর সংগঠন "ব্যাপ্টিস্ট মিশন" এবং "ট্রাস্টি সোসাইট" যে ফারছী-বাঙালায় বাইবেল অনুবাদ ও খৃষ্ট ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে—তার খবর রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ সামান্য উল্লেখ ক'রেছেন। অন্য কোন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক সে-বিষয়ে টু-শব্দটি করেননি। মার্কসবাদী সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা তক একেবারে খামোশ**। অতএব, পুথির ভাষাকে আজ যতই বেগানা মনে হোক, তা যে কেবল আত্মবিরোধী, ইছলাম ও মুছলিম বিরোধী একপেশে শিক্ষা ও একপেশে লেখা—সাহিত্য-পাঠের ফল—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের আত্ম-সচেতনতার ও আত্ম-পরিচয় খুঁজে দেখার নিষ্ঠার অভাব-ই; আমাদের চার পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা, নিজেদের ঘরের চালের বাতায় গুঁজে রাখা অথবা বাক্স-পেঁটারায়, পোট্‌লা-পুটুলিতে, থলিতে ঝুলিয়ে রাখা; পুরুষানুক্রমে পরিচিত পুথির অপরিচিতি মুল্যায়নে উৎসাহ দিয়েছে। ফলে, আমাদের শ্রদ্ধেয় পুথি-বিশারদ ও গবেষকগণ যে, কেবল এর ভাষাকে চিনতে পারেননি তা নয়; সেই

www.pathagar.com

সাথে ঐ ভাষার উৎপত্তিস্থলও নির্ণয় ক'রতে সমর্থ হননি। ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহ-র মত বহু ভাষাবিদ্ও ব'লেছেন—"মুছলমানী বাংলা ইংরেজ আমলের সৃষ্টি।" অন্যদিকে আজাহার ইসলাম লিখেছেন—"মুঘল যুগের শেষ এবং বৃটিশ যুগের শুরু—এই দুই যুগের সঙ্গম স্থলে দোভাষী পুথির অবস্থান।" এসব কথা যে কবুল করা যায় না, তা পূর্ব-আলোচনায় পষ্ট। জেমস্ লঙ্ এবং তাঁকে অনুসরণ ক'রে, যাঁরা ব'লেছেন—পুথির ফারছী-বাঙালা বা 'মুছলমানী বাঙালা' বাঙালা দেশের "প্রধানত; নৌকার মাঝিরা, মুছলমান ভৃত্য ও দোকানদার শ্রেণীর লোকেরাই পাঠ করে"—তাঁরা একবারও ভেবে দেখেননি—ঐ সব পুথি-কেতাবে যে-বিপুল পরিমাণ আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দ র'য়েছে—অশিক্ষিত মাঝিমাল-া, চাকর-বাকর, দোকানদারা তা শিখল কি ভাবে? তবে কি তারা আরবী, ফারছী, উরদু ভাষায় আলিম, ফাজিল পাশ করা কামেল লোক ছিল? না, আরব-ইরান থেকে এদেশে এসে মুটেগিরি, মাঝিগিরি ক'রত?

সাহিত্যে বটতলার অবদান

বাঙালা সাহিত্যে 'বটতলা'র কোন অবদান আছে ব'লে কেউ মনে করেন না। 'আধুনিক সাহিত্যে'র ওপর নজর দিলে 'বটতলা'য় ছাপা কেতাব-পুথির কোন উলে-খ দেখা যায় না। এ-কালের শিক্ষা এবং গবেষণা-ক্ষেত্রে 'বটতলা-সাহিত্যে'র কোন স্থান নেই। এ-যুগের সাহিত্য-বিচার, কাব্যবিচার, ছন্দ ও অলংকার-বিচার কিংবা মহাকাব্য-বিচারে, কেবল কোলকাতার 'বটতলা' নয়; গোটা বাঙালার 'সাহিত্যিক বটতলা'ই উপেক্ষিত, অনাদৃত, অবহেলিত। বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক সমালোচকগণ তাই এদেশের পথে-ঘাটে ছড়িয়ে থাকা ভিখারীর গান-এর বা লোক-সাহিত্যের যেটুকু আদর-কদর করেন ও মূল্য দেন—মূল্যায়ন করেন; বটতলার পুথি-সাহিত্যের সেটুকুও করেন না। তাঁদের কাছে—এ-হ'ল এক বর্ণ-গন্ধহীন মৌসুমী বুনো ফুল। কিন্তু পুথি-সাহিত্য ওরফে 'বটতলার বই'—'বুনোফুল' নয়; মৌসুমী ফুলও নয়; তা এক সযত্ন-রচিত, বিচিত্র বর্ণ-গন্ধ-সমারোহপূর্ণ রসের গুলবাগ। সে-গুলবাগের ভ্রমর-বুলবুলের কণ্ঠস্বর যাঁরা শোনেন নি, তাঁদের গানের সাথে যাঁরা বিশেষ পরিচিত নন; সে-সব সাহিত্য-সমঝদারদের 'বটতলা'র অবদান বোঝা কঠিন বই কি! আর তাঁদের কলমে তার মূল্যায়নও যে হবে—অপরিচিতির মূল্যায়ন—তা বেশক বলা যায়।

বটতলা বনাম বেলতলা—
চিৎপুর রোড বনাম কলেজ স্ট্রীট

তুলনাটি ক'রেছেন—বিনয় ঘোষ। তিনি তাঁর "কলকাতা কালচার" বইয়ে,

www.pathagar.com

বটতলার অবদান আর বেলতলার অবদানের মধ্যে তুলনা-কালে লিখেছেন—"কলেজ স্ট্রীট্ ও আজকের বটতলার মধ্যে আসলে ক্রস্-কাজিনের সম্পর্ক থাকলেও, তাদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি নেই। বিশ্ববিদ্যালয়াশ্রিত কলেজ স্ট্রীট্ অঞ্চলের কাল্চার-অভিযান আজ সমুদ্যত। তার কাছে বটতলা আজ অবজ্ঞাত। যে-কোন কুৎসিত সাহিত্য ও কদর্য ছাপা গ্রন্থকে আজ কলেজ স্ট্রীটের কালচার-বাগীশরা "বটতলার সাহিত্য" ব'লে বিদ্রূপ ক'রে থাকেন। কিন্তু কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলের হরেক রকমের যৌন-সাহিত্য ও পত্রিকাদির দিকে চেয়ে বটতলা শুধু মুচকি হাসে, বোবার মতন চুপ ক'রে থাকে, কোন উত্তর দেয় না। কলেজ স্ট্রীট থেকে বটতলা বেশী দূর নয়, কিন্তু মানসিক দূরত্বটা আজ অনেক বেশী। কলকাতার মধ্যবিত্ত কালচারের স্তরে স্তরে অনেক পলেস্তারা জ'মেছে, তার-ই তলার স্তরে বটতলা, উপরের স্তরে বর্তমান কলেজ স্ট্রীট। কলেজ স্ট্রীট যে বটতলার-ই বংশধর। আজও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বটতলা তাই শুধু বিদ্রূপের পাত্র নয়, তার একটা ইতিহাস আছে এবং একটা বিশেষ কালের সাহিত্যের ইতিহাসে তার একটা ভূমিকাও আছে। বিদ্রূপ করবার আগে কলেজ স্ট্রীটের "কালচার্ড"দের সেটা জানা উচিত নয় কি?"

তারপর বিনয় ঘোষ লিখেছেন—"এ-কালের বেলতলা আর সেকালের বটতলার মধ্যে লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক স্থাপনে পার্থক্য এইখানে যে, বেলতলার প্রকাশকদের কথা লেখকরা নেহাৎ অন্নের দায়ে ভদ্রতার খাতিরে উলে-খ করেন, কিন্তু বটতলার লেখকরা শুধু সেই কারণে ক'রতেন না। বটতলার লেখক ও প্রকাশকদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যেও একটা মানবিক সম্পর্ক ছিল, আজকের বেলতলার প্রকাশকদের সে-কথা মধ্যে মধ্যে মনে করা উচিত।"

বিনয় ঘোষ আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে—"বাংলাদেশের ইতিহাসে বটতলার ছাপাখানা একটা রোমান্টিক অধ্যায় জুড়ে আছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বটতলার (সাহিত্যের-) অভিযান শুরু হ'য়েছে বলা চলে"। বিনয় ঘোষ স্থানান্তরে ব'লেছেন—"মীর্জাপুরের "সম্বাদতিমিরনাশক প্রেস" ও মুন্শী হেদাতুল-ার (হেদায়েৎ উল-াহর) প্রেস" এবং শিয়ালদহের পীতাম্বর সেনের "সিন্ধুযন্ত্র" থেকেই বটতলার যুগের সূচনা হয়নি কি?" তা যে হ'য়েছে—সে-বিষয়ে একমত না হ'য়ে উপায় নেই।

বিনয় ঘোষ আরও জানিয়েছেন, ১৮১৮ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে বটতলায় অন্ততঃ চারটি প্রেস চালু ছিল। সেগুলো হ'ল—"হিন্দুস্তানী প্রেস", "বাঙ্গালী প্রেস,"

www.pathagar.com

"সংস্কৃত প্রেস" ও "বিশ্বনাথের প্রেস"। এসব প্রেসে প্রথম পঞ্চাশ বা ষাট বছরে মোট কত কিছিমের কত পুথি ফি-বছর ছাপা হ'য়েছে, তা আজ আর জানার উপায় নেই।

তাই সে-বিষয়ে কল্পনাজাল না বিছিয়ে বটতলার প্রকাশকদের যে-সব অবদানের কথা বিনয় ঘোষ আলোচনা ক'রেছেন—তার উলে-খ করা যেতে পারে। তিনি বটতলার ছাপাখানার কথা ব'লতে গিয়ে লিখেছেন—"বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে বটতলার প্রকাশকদের একটা অবিস্মরণীয় দান আছে।" তা হ'ল—"এই প্রকাশকদের চেষ্টাতেই বাংলা ছাপা বইয়ের দাম ক্রমে আশাতীত পরিমাণে ক'মে যায়, মাত্র পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে। প্রথমে বই ছাপা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল, ছাপতে খরচ পড়ত যথেষ্ট এবং দামও ছিল বেশী। পরে বটতলার প্রকাশকদের অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলা ছাপা বইয়ের দাম অনেক ক'মে যায় এবং তা বাংলার ঘরে ঘরে হাজার হাজার বাঙালী পাঠক-পাঠিকার হাতে পৌঁছয়। কয়েকটা তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল কাব্য" বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে যখন ছাপা হয় ১৮২৩ সালে, তখন তার দাম ছিল ছয় টাকা, পরে ১৮৫৬ সালে যখন কমলালয় প্রেসে ছাপা হয় তখন দাম হয় মাত্র এক টাকা। কালিদাস কবিরাজের "বেতালপঞ্চবিংশতি" সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে ছাপা (১৮৩১ সালে) দাম দু'টাকা, পরে সুধাসিন্ধু প্রেসে ছাপা (১৮৫৬ সালে) দাম চার আনা মাত্র। কৃত্তিবাসের "আদিপর্ব" রামকৃষ্ণ মলি-কের প্রেসে ছাপা (১৮৩১ সালে) তিন টাকা, সুধাসিন্ধু প্রেসে ছাপা (১৮৫৬ সালে) মাত্র দুই আনা। পরবর্তীকালে অন্যান্য গাছতলার অনেক প্রকাশক প্রথমে সুলভে বই ছাপার কৃতিত্ব অর্জন ক'রেছেন, কিন্তু বটতলার প্রকাশকরা সবার আগে সকলের পথপ্রদর্শক। এইদিক দিয়ে বিচার করলে বটতলার প্রকাশকদের-ই বাংলাদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রকাশক বলা চলে। বটতলার দৌলতেই বাংলা সাহিত্য প্রথম বাঙালীর কাছে লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে।"

দাম কমানোর এরকম আরও নজীর দিয়েছেন—শ্রীপান্থ।

বটতলার প্রকাশকরা ছাপা বইয়ের দাম কমানো ছাড়াও, তাঁরা সারা দেশে বই ছড়িয়ে দেবার কোশেশও ক'রেছিলেন। তাঁরা একাজে বই কেনাবেচার একটা সহজ উপায় বের করেন। তাহ'ল—বই কেনাবেচা কেবল **দোকান-কেন্দ্রিক** না-ক'রে; তাঁরা বই **ফেরীওয়ালা-দল** তৈরী করেন। ঐ সব বই ফেরীওয়ালা কেবল শহরেই নয়; গ্রামীণ এলাকায়ও বই-কেতাব বহন ক'রে নিয়ে যেত। ফলে, শুধু শহরের লোকে নয়; গ্রামের লোকের কাছেও বটতলার পুথি-কেতাব সহজ প্রাপ্য ছিল।

www.pathagar.com

তারা মেলায় মেলায় ঘুরেও পুথি বিক্রি ক'রত। এ-বিষয়ে বিনয় ঘোষ লিখেছেন—"এছাড়া বটতলার প্রকাশকদের ভ্রাম্যমাণ সেলস্‌মান বা ক্যানভাসারও ছিল। আধুনিক বিজ্ঞাপনের কায়দা-কানুন তাঁরা জানতেন না, সামান্য যে দু'চারখানা পত্রিকা ছিল তার পাঠকসংখ্যাও এত অল্প ছিল যে, তাতে বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ কাজও হ'ত না। তাই বটতলার প্রকাশকরা ক্যানভাসারের উপরেই নির্ভর ক'রতেন বেশী। বইয়ের বোঁচকা কাঁধে ক'রে ক্যানভাসাররা শহরে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। গ্রাম্য মেলাগুলিরও তখন আজকের মতন অবনতি হয়নি। বটতলার পুস্তক-ক্যানভাসাররা এই গ্রাম্য মেলায় ঘুরে ঘুরে বই বিক্রী ও প্রচার ক'রতেন। তাঁদের রোজগারও নেহাৎ কম ছিল না। লঙ্‌ সাহেব একজন ক্যানভাসারের কথা ব'লেছেন—যাঁর রোজগার ছিল মাসে প্রায় শতাধিক টাকা।"

এ-তরফে বিনয় ঘোষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-কথাটি ব'লেছেন, তাহ'ল—"আজকের বাসন-কোসনের ফেরীওয়ালাদের মত সে-কালের পুথি-কেতাবের ফেরী-ওয়ালারাও গ্রামে গ্রামে বই-কেতাব—"ফিরি করবার সময় এই ক্যানভাসাররা সস্তা দামে এবং নতুন বইয়ের বিনিময়ে অনেক মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, যা অনেক অনুসন্ধানী স্কলাররাও পরবর্তীকালে ক'রতে পারেননি। বটতলার প্রকাশকরা না থাকলে তাঁদের ক্যানভাসারদের মাধ্যমে এতবড় মূল্যবান কাজটা হয়ত কোনদিন-ই করা হ'ত না এবং অনেক পুঁথি চালের বাতায় গোঁজা থেকে নষ্ট হ'য়ে যেত। বাংলা সাহিত্যের প্রতি বটতলার প্রকাশক ও ক্যানভাসারদের এই যে আন্তরিক দরদ ছিল, কলেজ স্ট্রীটে আজ তা ক'জনের আছে?"

এ-বিষয়েও কলেজ স্ট্রীটের চেয়ে চিৎপুর রোড, তথা বেলতলার চেয়ে বটতলার অবদান-ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহ্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষার সেতুবন্ধ হিসেব বটতলার অবদান সাহিত্যের ইতিহাসে কতখানি, তা বোঝাতে গিয়ে শ্রীপান্থও লিখেছেন—"বটতলার সরস্বতীকে আহ্বান ক'রে একটু বিদ্রূপ করার পর থেকে অনেক সাহিত্য ঘোড়ছওয়ার বটতলার নামে নাক সিঁটকে থাকেন। বলি, ও ঠাকুর! কোথায় থাকত তোমার বাঙ্গালা বিদ্যা, বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা গদ্য-পদ্য যদি না চোদ্দ আনায় বিকুত বটতলার বাঙ্গালা মহাভারত, বাঙ্গালা রামায়ণ?"—প্রশ্ন তুলেছিলেন অমৃত লাল বসু। প্রশ্নটি অবশ্যই তুচ্ছ করার মত নয়।" তার অর্থ—ওঁদের মতে—বটতলার সাহিত্য, আধুনিক বাঙালা বিদ্যা, বাঙালা ভাষা, বাঙালা সাহিত্য ও বাঙালা গদ্য-পদ্যের ভিত্তি রচনা ক'রেছে। সেই ভিত্তির ওপর-

ই দাঁড়িয়ে আছে—নতুন রঙে, নতুন রূপে, নতুন রসে 'আধুনিক' নামধেয় বাঙালা ভাষা ও সাহিত্য।

বলা দরকার, বটতলা থেকে কেবল ঐতিহ্যের অঙ্গীকার রূপে 'রামায়ণ-মহাভারত'-ই ছাপা হয়নি। তার সাথে "তাজকেরাতুল আউলিয়া", "কাছাছোল আম্বিয়া", "দাস্তানে আমীর হামজা", "সাহা নামা" ওগয়রহের মত মহা মহা মহাকাব্যগুলোও ছাপা হ'য়েছে। কিন্তু সে-সব বইয়ের উলে-খ কোন অমুছলিম আলোচক-গবেষক, পুথির আলোচনায় একবারও করেননি। বিনয় ঘোষও নয়। তার মানে, **তাঁরা হিন্দুদের তরফ থেকে 'বটতলার অবদান' বিচার ক'রেছেন। মুছলমানদের কথা মনে আনেননি।**

বিনয় বাবু বটতলার লেখক-প্রকাশকদের আরও যে-দু'একটি অবদানের উলে-খ ক'রেছেন—তা হ'ল—'এ আমলের কবি-লেখকরা প্রকাশকদের আন্তরিক তারিফ ক'রতেন।' বটতলার প্রকাশকদের অনেক ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য ক'রে বই প্রকাশ ক'রতে হ'ত। এ-তরফে প্রকাশকরা যে, কেবল প্রকাশক-ই ছিলেন তা নয়; তাঁরা বিশেষ ক'রে মুছলমান-প্রকাশকরা কবিদের বিশেষ বিশেষ কেতাব তরজমার ভার দিয়ে—তা করিয়ে নিতেন; সে-কথা বিনয় ঘোষ বলেননি। অথচ এই ঘটনাটি খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মুছলিম রাজসভার সভাকবিদের যেমন ছোলতান-নবাব, মন্ত্রী-ছিপাহছালাররা তাকিদ দিয়ে কিতাব লেখাতেন; বটতলার প্রকাশকরাও তেমনি তাকিদ দিয়ে, বই যোগাড় ক'রে দিয়ে—জনগণের রুচি ও খায়েশ অনুযায়ী কিতাব লেখাতেন। তরজমা করাতেন। এভাবে, সে-কালে তাঁরাই ছিলেন বটতলার "সাংস্কৃতিক রাজধানী"র রাজদরবারের "মাগন ঠাকুর।"

বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন যে, এই সব মাগন ঠাকুরের প্রতি লেখকরা শ্রদ্ধাপ-ুত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের রচনায় আত্মপরিচয় দানকালে ঐ রকম পেট্রনদের পরিচয় এবং বিজ্ঞাপনে "প্রাপ্তিস্থানে"র পরিচয় ছাড়াও বইয়ের বিষয়বস্তুরও পরিচয় দিয়েছেন। আজকের দিনে বইয়ের জ্যাকেট-কভারে 'লেখক-পরিচিতি' ও যে-'গ্রন্থ- পরিচিতি' দেয়া হয়—সে কাজটি-ই বটতলার বই-প্রকাশকরা সে-কালে তাঁদের মত ক'রে ক'রতেন। লিখতেন গদ্যে অথবা পদ্যে।

বিনয় ঘোষ তাঁর পূর্বোক্ত রচনায় এর কিছু নমুনা দিয়েছেন।

কিন্তু কি ধরনের বই ছাপা হ'ত বটতলায়—সে-তথ্য জানাতে শ্রীপান্থ, রেভারেণ্ড জেমস্ লঙের ক্যাটালগের ভিত্তিতে লিখেছেন—"কী দিয়েছিলেন বটতলার লেখক এবং প্রকাশকরা বাঙালীকে, সে-প্রশ্ন অবশ্যই জরুরী। তবে তার

www.pathagar.com

আগে ভূগোলের মতোই একবার তাকানো দরকার বটতলার 'ভূ-প্রকৃতি'র দিকে। দি গ্রাব স্ট্রীট জার্নাল নামে বটতলার হাতে কোনও দলিল নেই। তার ভাগ্যে জোটেনি কোনও পোপ কিংবা সুইফ্‌ট। আমাদের কাছে বটতলার একমাত্র বার্তাবহ রেভারেণ্ড জেমস লঙ্‌। উনিশের শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত ব'লতে গেলে তিনি-ই বটতলা তথা বাংলা বইপত্রের প্রধান খতিয়ান লেখক। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থতালিকা উপহার দিয়েছেন আমাদের। শুরু ১৮৫২ সালে শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত 'গ্রন্থাবলী।/অর্থাৎ/ লং সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত বঙ্গভাষার/পুস্তক সকলের/নাম' দিয়ে, শেষ ১৮৬৭ সালে প্যারিসে বিশ্ব-প্রদর্শনী উপলক্ষে পাঠানো একটি তালিকা দিয়ে। প্রথম তালিকাটি কিছুকাল আগে নতুন ক'রে সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শেষোক্ত মহাদেব প্রসাদ সাহার সম্পাদনায় প্রথমে পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৬৫ সালে এবং পরে আবার ঢাকার 'সাহিত্য পত্রিকায়' শীত সংখ্যায় (১৩৭১)। যতীন্দ্রমোহন-সম্পাদিত লঙ্‌-এর প্রথম পুস্তক-তালিকাটির নাম দেওয়া হ'য়েছে—'বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা-১ম খণ্ড। সেটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। এই দুই তালিকার মধ্যে লঙ্‌ বাংলা পত্রপত্রিকার অন্ত তঃ আরও তিনটি তালিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন। এক, A Descriptive Catalogue of Bengali Works, 1400 Bengali Books and Pamphlets, 1855. দ্বিতীয় A Return of the Names and Writings of 515 Persons. connected with Bengali Literature etc, 1855; এবং তৃতীয়, Publications in the Bengali Language in 1857,1859. বটতলার অবদানকে জানতে গেলে লঙ্‌-এর সব কয়টি তালিকাই অতিশয় জরুরী। তবে বটতলার জীবনের পক্ষে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত তালিকাটি। এটা ঠিক যে লঙ্‌ সাহেবের তালিকা নির্ভুল নয়, সম্পূর্ণ তো নয়-ই। ১৪০০ বইয়ের তালিকা লিখতে ব'সে তিনি সে কথা জানিয়েও দিয়েছেন। ব'লেছেন, দীর্ঘতর তালিকা তৈরী হ'চ্ছে। তাছাড়া একথাও ব'লেছেন যে, যে-সব বই ছাপা নেই, অথবা (ওঁর বিচারে) সাধারণে যেগুলোর প্রচার করার যোগ্য নয়, সেগুলোকে তিনি ক্রমিক নম্বর দিয়ে তলিকাবদ্ধ ক'রতে সম্মত নন। কারণ, তার সবই 'প্রেম কাহিনী' (লাভ টেলস্‌)। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই সমকালের খ্রিষ্টীয় পাপ-পুণ্য ও শ্‌্লীলতা-অশ্‌্লীলতা প্রশ্নে ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের ধারণায় পুষ্ট এই পরিশ্রমী যাজকের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া পুরানো বাংলা বইয়ের জগতে প্রবেশ করা কার্যতঃ প্রায় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াত। সত্য ব'লতে কী, ১৮৫৯ সালের তালিকাটি ছিল ব'লেই আজও আমাদের কাছে জীবন্ত—বটতলার ছাপাখানা, লেখক, প্রকাশক এবং বই বিক্রেতার দল।

www.pathagar.com

লঙ্ আমাদের হাত ধ'রে বটতলার ছাপা হরফের হাটে পৌঁছে দিয়েছেন বটে, কিন্তু বটতলার সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁর যথাযথ জানা ছিল না।" এ-কথা ঠিক। আরও ঠিক কথা এই যে, লঙ্ বটতলার হিন্দু লেখকদের বই-কেতাবের যে-তালিকা রেখে গিয়েছেন, তা পূর্ণাঙ্গ না হ'লেও, যতটা বিশদ বিবরণ দিতে পেরেছেন; মুছলিম লেখকদের বই-কেতাবের তালিকা তার একদশমাংশ ও দিতে পারেন নি।

ক. আসামী বটতলা

এত বিপুল অবদান মাথায় নিয়েও 'বটতলা' আজ 'আসামী' কেন, সে-কথা বলা দরকার। নইলে "বাঙালী সংস্কৃতির রাজধানী বটতলা"র "ওপেন ইউনিভার্সিটি"র অখ্যাতির কারণ বোঝা যাবে না।

বটতলার বইয়ের নামে নাক-সিঁটকাবার **দু'টো কারণ** আছে। তার একটা কারণ বেশী প্রচারিত হ'য়েছে। আর অন্য কারণ চেপে যাওয়া হ'য়েছে। এখানে অধিক প্রচারিত **পহেলা কারণটি** আলোচনা করা হবে। তা হ'ল—**বটতলার বইয়ের অশ্লীলতা**। এই অপকালচারের—উৎস থেকে মোহনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিনয় ঘোষ ঠিক-ই লিখেছেন—"বটতলার কালচার ও বাবু-কালচার যেমন এক বৃন্তের দুই ফুল, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর নদীয়ার বৈষ্ণব-কালচার-ই হ'ল কলকাতার বাবু-কালচারের মূল। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বাঙালীর কালচার শেষ পর্যন্ত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে যে-অবনতির কোন্ চরম সীমায় পৌঁছেছিল, তা কল্পনা করা যায় না। বৈষ্ণবরা তখন শতাধিক দল-উপদলে ভাগ হ'য়ে গেছেন—নেড়ানেড়ীর দল, আউলের দল, বাউল দল, সাহেবধনী, সহুজে সম্প্রদায়, বলরাম-ভজা, কর্তাভজা, অবধূত, কিশোর-ভজনী, চূড়াধারী, তিলকদাসী, রাধাবল্লভী, হরিবোলা, সখীভাবক ইত্যাদি নানারকমের দল বিচিত্র পদ্ধতিতে ভজনা ক'রতেন। সাধন-ভজনের মধ্যে আদিরসের বাঁধভাঙা স্রোত ব'য়ে চ'লত। পূতিগন্ধ পাঁকের মধ্যে বাঙালীর কালচার তখন হাবুডুবু খাচ্ছিল। পাঁকের মধ্যেও অবশ্য পদ্মফুল ফোটে এবং পাঁকাল মাছ থাকে। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের মতন কবি, অথবা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতন পণ্ডিত, হয়ত সেই ধরনের পদ্মফুল ও পাঁকাল মাছ। কিন্তু পাঁকের পরিচয় পদ্মে নয়, তার পঙ্কিলতায় ও পূঁতিগন্ধে। পাঁক যদি বজবজিয়ে ওঠে, পদ্মের গায়েও পাঁক লাগে। তার প্রমাণ ভারতচন্দ্র নিজে, তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'রসমঞ্জরী' কাব্য। রাজ-দরবারের কৃত্রিমতা ও কুরুচিপ্রবণতায় পরিপূর্ণ। শুধু রাজদরবারের নয়, বাইরের লোক-সমাজেরও। বিদ্যা যখন সুন্দরকে কিছুদিন পতিগৃহে থাকবার জন্য লোভ দেখাচ্ছে এই ব'লে—

ন'দে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব
নূতন নূতন ঠাঁঠে খেঁড়ু শুনাইব—

তখন বোঝা যায়, ন'দে-শান্তিপুরের লোকরুচি খেঁড়ু বা খেউড় শোনার দিকে ঝুঁকেছে। পদাবলী কীর্তন থেকে খেউড়। কীর্তনের মধ্যেই নানারকমের ঠাঁট ঢুকেছে এবং তার সঙ্গে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার গীতভঙ্গীও ব'দলেছে। আখড়ায় আখড়ায় কবিগান, পাঁচালি গান, আখড়াই গান, তরজা গান, ঝুমুর গান পুরোদমে শুরু হ'য়েছে। **আদিরস-ই তার প্রধান উপজীব্য।**

আমাদের কালচারের যখন এই অবস্থা তখন তার কেন্দ্রস্থল ক্রমে স্থানান্তরিত হ'তে থাকল শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ থেকে হুগলী-চুঁচুড়া-শ্রীরামপুর হ'য়ে কলকাতার দিকে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কালচারের ইতিহাস-প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। হঠাৎ কলকাতা শহরে বৃটিশ যুগে কোন একটা নতুন কালচার গজিয়ে ওঠেনি। বাঙালীর সংস্কৃতি-ভাগীরথীর ভাঁটার স্রোত নালা-নর্দমার ভিতর দিয়ে সূতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর ছাড়িয়ে একেবারে টালির নালা পর্যন্ত পৌঁছল। তখন ভগীরথ হ'ল টাকা ও বাণিজ্য এবং তার লেনদেনের মালিকরা। অর্থাৎ এই নতুন কৃষ্টিগঙ্গার ভগীরথ হলেন পর্তুগীজ, ফরাসী, ডাচ্ ও বৃটিশ বণিকরা এবং তাঁদের বাঙালী দালাল, গোমস্তা, দেওয়ান, বেনিয়ান ও মুনশীরা। এঁরাই খাল কেটে কেটে যেন বাঙালীর কৃষ্টিগঙ্গার পঙ্কিল ধারাকে ন'দে-শান্তিপুর থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। এই পঙ্কিল ধারার সঙ্গে এল বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম, কৃষ্ণলীলার বিকৃত গীতভঙ্গী, কবিগান, পাঁচালি গান, ঝুমুর গান, তরজা গান—**কুরুচিপ্রবণ ও আদিরসাত্মক যা কিছু বিকৃতকলা আছে সব।** অবশেষে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাজা নবকৃষ্ণ যেন এক যুগসন্ধিক্ষণে হাত মেলালেন কলকাতায়। ন'দে-শান্তিপুরের সঙ্গে সূতানুটি তালুক ও অষ্টাদশ শতাব্দীর লণ্ডনের কালচারের মহামিলন হ'ল কলকাতা শহরে। সুতরাং **বটতলাও বজবজিয়ে উঠলো।**

বটতলার সাহিত্যিকদের যেন গুরু হ'য়ে উঠলেন ভারতচন্দ্র এবং প্রেরণার অফুরন্ত নির্ঝর হ'ল 'বিদ্যাসুন্দর' ও ''রসমঞ্জরী'। কলকাতার সূতানুটির কবি কালীপ্রসাদের 'চন্দ্রকান্ত' কাব্য এবং 'কামিনীকুমার', 'রহস্যবিলাস', 'সুকুমার বিলাস', 'জীবন যামিনী', 'মধুমালতী', 'সতীত্ব-সুধাসিন্ধু', 'প্রেমোপদেশ নাটক', 'স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ', 'কমলদত্তা-হরণ', 'প্রেমোল্লাস', 'রসিক তরঙ্গিণী' প্রভৃতি বটতলার সাহিত্য মূলতঃ বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর ধারা বহন ক'রে চ'লল। এই ধারায় ভেসে গিয়ে যদি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতন সিরিয়াস্ পণ্ডিতও বিশ বছর

বয়সে "বাসবদত্তা" কাব্যে লিখতে পারেন—

শুন হে প্রাণ বঁধু
যে সব মধু মধু
হাসিয়া মৃদু মৃদু জানালে .....

ইত্যাদি ছন্দ-চাতুর্য দেখিয়ে (ভারতচন্দ্রের ভঙ্গীতে) এবং অক্ষয়কুমার দত্তের মতন কড়া গদ্য ও পাঠ্যপুস্তক লেখকও যদি 'অনঙ্গমোহন' কাব্য লেখার লোভ না সংবরণ ক'রতে পারেন, তাহ'লে কড়েয়া, মেছুয়াবাজার, ভবানীপুর ও সূতানুটির বটতলার কবিদের আর অপরাধ কি?

বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর স্রোতধারা শুধু যে মদনমোহন ও অক্ষয়কুমারের মতন পণ্ডিত ও গদ্যভাবাপন্নদের-ই প্রভাবিত ক'রেছিল তা নয়, ইংরেজরাও তার দ্বারা রীতিমত ঘায়েল হ'য়ে গিয়েছিলেন। "ক্যালকাটা গেজেট" ও অন্যান্য পত্রিকায় এই সব আদি রসাত্মক কবিতার ইংরেজী অনুবাদও তাঁরা প্রকাশ ক'রতেন। একটির নমুনা দিচ্ছি:—

My Veedya's beauty fills my head
—I study nought beside;
My Veedya's name I dwell upon
from morn till even-tide;

She only is my every hope.
my wish, my aim, my end;
My orisons to Veedya,
and to her alone ascend.

বিদ্যাসুন্দর কতদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল, এই ইংরেজী অনুবাদ তার প্রমাণ। কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর থেকে যদি লণ্ডনকেও তা স্পর্শ ক'রে থাকে, তাহ'লে বটতলা রেহাই পাবে কেন? এদেশের নানাস্থানের নানা গাছের তলা দিয়ে বাঙালী সংস্কৃতির একটি বিকৃত ধারা কলকাতা শহরের বটতলায় প্রবাহিত হ'য়ে এসেছিল। কলকাতায় নব্য বাবুরা তাকে আরও বিকৃত ক'রেছিলেন।"

বটতলার বইয়ের অশ্লীলতার বিষয়ে শ্রীপান্থও লিখেছেন—"অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়, ব'লতে গেলে বটতলার বইয়ের আদি পর্ব থেকেই। লঙ্ সাহেবের খতিয়ান অনুযায়ী ১৮২০ সালে প্রকাশিত ১৯ খানি বাংলা কাব্য-নিবন্ধের মধ্যে ৪ খানি ছিল আদি রসাত্মক। সেগুলি হ'চ্ছে—আদিরস, রতিমঞ্জরী, রতিবিলাস ও

www.pathagar.com

রসমঞ্জরী। ১৮৫৫ সালে তিনি ১৪০০ বাংলা বই ও পত্রপত্রিকার তালিকা তৈরি করেন; তাতে বেশ কিছু আদি রসাত্মক বইয়ের নাম ক'রেছেন। যথা: 'কামশাস্ত্র', 'লক্ষ্মী-জনার্দ্দন-বিলাস', 'প্রেম অষ্টক', 'প্রেমবিলাস', 'প্রেমনাটক', 'প্রেমতরঙ্গ' 'প্রেমরহস্য', 'বেশ্যারহস্য', 'সম্ভোগ-রত্নাকর', 'রমণীরঞ্জন', 'রসতরঙ্গিণী', 'শৃঙ্গার রস' ইত্যাদি। তাঁর ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত বইয়ের তালিকাতেও তিনি ১৩ খানি বইকে চিহ্নিত ক'রেছেন আদিরসাত্মক বা 'ইরোটিক' ব'লে। ১৮৫৫-র বইগুলো সম্পর্কে তাঁর পাইকারি মন্তব্য, "দিজ ওয়ার্কস আর বিস্টলি, ইকুয়াল টু দ্য ওয়ার্স্ট অব দ্য ফ্রেঞ্চ স্কুল!" বলা বাহুল্য, এসব বইয়ের কিছু কিছু অন্ততঃ যাঁরা দেখার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা জানেন, 'পর্ণোগ্রাফ' ব'লতে যা বোঝায়, এসব বই মোটেই তা নয়। আসলে এগুলি রকমারি সংস্কৃত কামশাস্ত্রের-ই রকমফের। আর, বিদেশী যাজক না জানলেও এসব বইয়ের লেখক এবং প্রকাশকরা জানেন **কাম ধর্মাচারের-ই অংশ। চতুর্বর্গের এক বর্গ। নব রসের আদি ব'লে গণ্য এই কামরস।** স্মরণযোগ্য 'দূতীবিলাস'-এর (১৮২৫) ভূমিকায় ভবানীচরণের বক্তব্য,—"মুদ্রাক্ষরে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হইল॥ কিন্তু আদিরস কাব্য দেখিতে না পাইল ॥/যা দেখি ভারতকৃত নব্য কিছু নাই।".. সুতরাং যিনি 'হিন্দুমতে' শাস্ত্রগ্রন্থ ছেপেছেন, রক্ষণশীলদের গোষ্ঠী ধর্মসভার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন; তিনি-ই অবলীলায় লিখলেন, 'দূতী বিলাস'!"

বলা দরকার যে, শ্রীপান্থ রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ ক'রে, অশ্লীল বইগুলোকে পর্নোগ্রাফি না ব'লে, সংস্কৃত কামশাস্ত্রের নানা রকম রূপায়ণ ব'লে লিখেছেন—"সেই "কামশাস্ত্র"ই কি শ্লীল বই? তাই শ্রীপান্থ বাবু যাই বলুন, সে-সময়ের কোলকাত্তাই সমাজের একাংশ এবং ইংরেজ ধর্মাযাজক লঙ্-এর মত লোকেরা বটতলার অসহনীয় কুরুচিময় 'সাহিত্যে'র আবহাওয়াকে সহ্য ক'রতে না পেরে সরকারের স্মরণ নেন। তাঁদের চেষ্টা-তদ্‌বিরে ইংরেজ সরকার ১৮৪০ সালে 'বিশ আইন' পাশ ক'রে, কুরুচিপূর্ণ বই প্রকাশ রোখার কোশেশ করেন। তাতেও না-কুলালে জারী হয়—"চোদ্দ আইন"। কিন্তু এ-আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও ঐ বছর-ই ছাপা হয়—এরকম চারটি বই। নাম—"বেশ্যা গাইড্", "বেশ্যা-বিবরণ" এবং "বদ্‌মাশ্ জব্দ"। তারপর ১৮৭১ সাল থেকে শোভাবাজারের রাজবাড়ী হ'তে সপ্তাহে সপ্তাহে "আমার গুপ্ত কথা" নামে যে ক্লেদপূর্ণ রচনা ছাপা হ'য়ে শহরে পাঠকদের হাতে হাতে ছড়াতে থাকে; তা রীতিমত ছিল সেকালের "প্লেবয়।"

শ্রীপান্থ এই সব অশ্লীল বইয়ের পক্ষে নানা রকমে, নানা যুক্তিতে পক্ষ নেওয়া

www.pathagar.com

সত্ত্বেও, তিনি-ই লিখেছেন—"এ-সম্পর্কে রাজ্য সরকারী মহাফেজখানায় কিছু কাগজপত্র র'য়েছে। (১৮৫৫। জুডিসিয়াল। ২০.৯.৫৫-৫৮) তাতে দেখা যায়—রেভারেণ্ড লঙ্ তৎপর হ'য়েছিলেন আগেই। তখন বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব। লঙ্ তাঁকে জানাচ্ছেন, প্রকাশ্য রাস্তায় বই ছাড়াও অশ-ীল ছবি (বাংলা, ইংরেজি ও ফরাসি) বিক্রি হ'চ্ছে। হকাররা তা ফিরি ক'রে বেড়াচ্ছে, অথচ এসব দমন করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট আইন নেই। এ-বিষয়ে বছর দেড়েক আগে তিনি দু'-দু'বার কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেট এবং উচ্চতম কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। সুতরাং, প্রয়োজন আইনের। হয়তো আইন ক'রে এসব বইয়ের প্রচার পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হবে না, কিন্তু প্রকাশ্যে সে-সব বিক্রি হ্রাস পাবে। তাতে যুবকরা অল্পবয়সে বিপথগামী হ'তে পারবে না। তাঁর এই আবেদন যে সম্পূর্ণ মনগড়া নয়, তার প্রমাণ হিসাবে লঙ্ চিঠির সঙ্গে একখানা 'অশ্লীল' বইও পেশ করেন। চার আনা দামের এই বইটি ছাপা হয়েছিল ৯ নং আহিরিটোলা স্ট্রীটের একটি ছাপাখানায়। লঙ্ জানাচ্ছেন বইটি বছরে আট হাজার কপি ক'রে বিক্রি হয়। তাতে নয়টি আদিরসাত্মক ছবিও র'য়েছে।

সরকারের তরফে সাড়া দেন চীফ ম্যাজিস্ট্রেট ককবার্ণ। তিনি স্বীকার করেন—বিষয়টা অবহেলাযোগ্য নয়। তবে তাঁর পূর্বসূরীরা এ-ব্যাপারে কিছুই করেননি, এটা ঠিক নয়। ককবার্ণ ১৮৫৩ সালে বিভিন্ন সরকারী কর্তাব্যক্তি এ-সম্পর্কে যে সব সুপারিশ ক'রেছেন সংক্ষেপে তা উলে-খ ক'রে বোঝাতে চেয়েছেন, সরকার ঘুমিয়ে নেই। এই সব নথি থেকে জানা যায়, ইতোমধ্যে ১৮৩৫ সালের প্রেস-আইন এবং ১৬ নম্বর আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী অশ-ীল বই বিক্রির দায়ে তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হ'য়েছিল। তাঁদের মধ্যে বিশ্বম্ভর এবং মহেশ নামে দুই জনের দণ্ডও হ'য়েছিল। একজনের অপরাধ অশ্লীল বই বিক্রি। অন্য জনের বিনা লাইসেন্সে ছাপাখানা চালানো। এঁদের ৫০ টাকা ক'রে জরিমানা হয়।

তৃতীয় অপরাধী মধুসূদন শীলের অপরাধ ছিল—এক-ই সঙ্গে অশ-ীল বই বিক্রি এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের নাম ছাড়া বই প্রকাশ করা। প্রথম অপরাধের জন্য তাঁর ১০০ টাকা জরিমানা হয়। দ্বিতীয় অভিযোগের আদৌ নাকি কোনও বিচার করা সম্ভব হয়নি। কারণ, সেক্ষেত্রে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় সুপ্রিম কোর্টের রীতি। ওই রাজপুরুষ প্রসঙ্গতঃ জানান, মামলার ফলে অনেকেই ভয় পেয়েছেন। একজন নাকি ব'লেছেন—গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি নিজেই তাঁর ঘরে জমিয়ে রাখা শত শত অশ্লীল বই পুড়িয়ে ফেলেন।

www.pathagar.com

ভারতীয় আইনসভায় অশ্লীলতা বিরোধী আইন রচিত হ'ল। সেটি গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে ১৮৫৬ সালের ২১শে জানুয়ারী। সে-বছর সেটাই এক নম্বর আইন। আইন মোতাবেক অশ্লীল বই, ছবি বিক্রয় তো নিষিদ্ধই, প্রকাশ্যে 'অশ্লীল' নাচ, গান, পাঁচালি পারিবেশন ইত্যাদিও দণ্ডনীয় অপরাধ। আইন অমান্য ক'রলে শাস্তি ১০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড।

সরকারী কাগজপত্র এবং লঙ্ সাহেবের ১৮৫৯ সালের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে আইন পাস হওয়ার আগেই বটতলার বেশ কিছু প্রকাশক দণ্ডিত হ'য়েছিলেন। তিন জনের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। লঙ্-এর আবেদনের পর ককবার্ণ আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার ক'রে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। লঙ্ জানাচ্ছেন—সুপ্রিম কোর্টের বিচারে চার আনা দামের তিনটি অশ-ীল বই বিক্রির দায়ে তিন জনের সাজা হ'য়েছিল। মাথাপিছু ১০০ টাকা ক'রে। জরিমানা গুণে দেওয়া ছাড়াও মামলার খরচ তাদের দিতে হ'য়েছিল ১৩০০ টাকা! ককবার্ন কি এঁদের-ই গ্রেপ্তার ক'রেছিলেন? হয়তো।

শুধু রেভারেণ্ড লঙ্ নন, সেদিন বটতলার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আরও অনেকের মুখেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেখি রীতিমতো অশ্লীলতা-বিরোধী আন্দোলন শুরু হ'য়ে গেছে শহরে। কলকাতায় বইতে শুরু ক'রেছে ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের নৈতিকতার পরিশোধিত সু-পবন। আজ আর কারও জানতে বাকি নেই, সেদিনের ইংল্যাণ্ড পবিত্রতা আর উচ্চমানের নৈতিকতার যে সুবাসিত প্রস্ফুটিত গোলাপটি বিশ্বাসীর চোখের সামনে তুলে ধ'রেছিল তা ঠিক এতখানি পবিত্র ছিল না, কুসুমে কিলবিল ক'রছিল কীট! তবু একদিকে পাদ্রি এবং রাজপুরুষ, আর তাঁদের সহযোগী হিসাবে ইংরেজী শিক্ষিত নব্য নীতিবাগীশ লেখক, বুদ্ধিজীবী, সুরুচি ও সভ্য আচারের পতাকাধারীর দল ছাড়াও যোগ দিয়েছেন রাজানুগ্রহ লোভী বশংবদ কিছু সমাজপতি। সেদিন স্বদেশী শিল্প-সাহিত্য এবং সাধারণের আমোদ-প্রমোদ ও জীবনরীতির বিরুদ্ধে এরা এক ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ। কেননা, যা—বিদেশী যাজক, বিদেশী শাসক এবং সুসংস্কৃত ইংরেজ-সমাজ অনুমোদিত নয়, তা-ই অসভ্যতা।

সুতরাং ১৮৭৩ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা ৪ ঘটিকায় টাউন হলে মহতী জনসভা। সেখানে সমবেত বিশিষ্ট হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুছলমান সংস্কারক এবং সমাজপতিরা। সঙ্গে যথারীতি খৃষ্টান যাজক এবং রাজপুরুষরা তো আছেন-ই।

www.pathagar.com

সংগঠিত হ'ল নতুন হিতকরী সভা—'দি সোসাইটি ফর দি সাপ্রেশন অব অবসিনিটি ইন ইণ্ডিয়া'। দেশে ইতোমধ্যে অশ্লীলতা-বিরোধী আইন চালু হ'য়েছে (১৮৫৬)। তাছাড়া, আগে থেকে প্রেস-আইন, পুলিশ-আইন ছিল। ১৮৫৭ সালে সংবাদপত্র সম্পর্কিত নতুন আইনে অশ্লীলতা দমনের জন্য বিশেষ ধারা যুক্ত হ'য়েছে। ১৮৬২ সালের পেনাল কোডেও স্পষ্ট নির্দেশ আছে এ-ব্যাপারে। (সেকশন ২৯২-'৯৪)। তবু শহরের গণ্যমান্যরা এমন ক'রে তৎপর কেন, তা বোঝা যায় তাঁদের বক্তৃতা শুনলে। তাঁরা অগৌণে আইনের ব্যাপক প্রয়োগ চান। আর, অশ্‌লীলতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ার জন্য চান অশ্‌লীলতা-বিরোধী আন্দোলনের জন্য একটি সংগঠন। তাঁদের বক্তব্য শুনলে মনে হয়—শহরের বাঙালী সমাজে বুঝিবা 'ভদ্রলোক', 'ছোটলোক' বা 'ইতরজনে'র মধ্যে এক সাংস্কৃতিক যুদ্ধ ঘোষিত হ'ল। তথাকথিত উচ্চবর্গের সংস্কৃতি আর নিম্নবর্গের সংস্কৃতির মধ্যে কিছুটা দ্বন্দ্ব বরাবর-ই ছিল। এবার তা আরও প্রকট হ'য়ে উঠল।"...

এখানে বটতলার যে-সব বই এবং সংস্কৃতির কথা বলা হ'চ্ছে; সেগুলো আদৌ নিম্নবর্গের বই এবং সংস্কৃতি ছিল না। সেগুলো সব-ই ছিল "বাবু কালচারের অংশ; তথা উচ্চবর্গের-ই বই এবং সংস্কৃতি। তা সে "আমার গুপ্তকথা"-ই হোক আর "বেশ্যা গাইড", "বেশ্যা রহস্য"ই হোক। তবে সেদিনের কোলকাতার উচ্চবিত্ত সামন্তপুরোহিত হিন্দু-সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছিল। একটি 'রক্ষণশীল'-বিভাগ; অপরটি 'নব বাবু-বিলাস-লীলা'-বিভাগ। শেষোক্ত বাবু-বিবিরা যা ক'রতেন, সে-বিষয়ে ভারতীয় বাঙালার লেখক গোলাম আহমাদ মোর্তজা লিখেছেন—"সেই সময় নাচে গানে পটু বেশ্যাদের একটা সম্মানীয় নাম ছিল—বাঈজী। ঐ সুন্দরী বেশ্যা-বাঈজীর মধ্যে যারা ছিল খুব খ্যাতনামা তাদের নাম নিকি, সুপন, বক্‌না পিয়ারী, হিঙ্গুল প্রভৃতি। ঐ বাবু ও জমিদারেরা এদের ভাড়া ক'রে আনতেন। নাচ, গান, বাজনা আর খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে বাজী পোড়ানো এবং আরও কুৎসিত আমোদ-প্রমোদের উৎসব চ'লতো ঢালাওভাবে। বাড়ির এই উৎসবে ইংরেজ মনিবদের নেমতন্ন করা হ'ত।

এ-সম্পর্কে অধ্যাপক ডক্টর বিনয় ঘোষের একটি মন্তব্য বেশ উপভোগ্য—"সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত; কোন স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুত্রাপি কোন বাবুর কদাচারের সাক্ষী স্বরূপ অশ্বায়ন তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যাদ্বারে স্থাপিত হইয়াছে; কোন কোন বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্ত লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। কুত্রাপি গণিকার অধিকারের জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ-কলহ-

www.pathagar.com

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে।"

ডক্টর কুমুদ ভট্টাচার্য লিখেছেন,—"বুলবুল পাখির লড়াই, খেউড় গান, বাঈ নাচ ও বেশ্যাগমন—এই ছিল নগর কলকতার নাগরিক জীবনের একমাত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়। 'আত্মীয়সভা', 'ধর্মসভা'র গোষ্ঠীভুক্ত রাজা রামমোহনের বাড়িতে, প্রিন্স দ্বারকানাথের বাগান বাড়িতে, রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়িতে, রাজা গোপীমোহন দেবের বাড়িতে, বেনিয়ান বারানসী ঘোষের বাড়িতে, নাচ-গান মদ-বাঈজী ও আতসবাজী পোড়ানোর বল্গাহীন কুৎসিত আমোদ-প্রমোদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চ'লতো।"...

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অতুল সুর তাঁর '৩০০ বছরে কলকাতা, পটভূমি ও ইতিকথা' বইতে 'বাবু'দের জন্য 'কলিকাতা কমলালয়' থেকে কোট্ ক'রে লিখেছেন—"এরা বনিয়াদী বড় মানুষ নয়, ঠিকাদারী, জুয়াচুরি, পোদ্দারী, পরকীয়া রমণী-সংগঠন ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন ক'রে বড়লোক হ'য়েছে।" এরপরেই ড. অতুল সুর লিখেছেন,—"ভবানীচরণ এদের—'বনিয়াদী বড় মানুষ নয়' ব'ললেও, এরাই কলকাতা শহরের বনিয়াদী পরিবার সমূহের প্রতিষ্ঠাতা হ'য়ে দাঁড়ায়।"

এই 'বাবু'রা কেমন ক'রে 'বাবু' হবার পাট নিতেন—সে-কথা জানাতে ডক্টর সুর তাঁর বইতে লিখেছেনঃ—"যেহেতু 'নববাবু বিলাস' হ'চ্ছে সমসাময়িক কালের বাবু কালচারের একখানা বিশ্বস্ত দর্পণ, সেজন্য এতে বাবুর যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা হ'চ্ছে। বাবুর মোসাহেবরা বাবুকে উপদেশ দিচ্ছে—"শুন, বাবু টাকা থাকিলেই হয় না। ইহার সকল ধারা আছে। আমি অনেক বাবুগিরি করিয়াছি। বাবুগিরি, জারিজুরি করিয়াছি। অনেক বাবুর সহিত ফিরিয়াছি—রাজা গুরুদাস, রাজা ইন্দুনাথ, রাজা লোকনাথ, তনুবাবু, রামহরিবাবু, বেণীমাধববাবু প্রভৃতি। ইঁহাদিগের মজলিস শিখাইয়াছি এবং যেরূপে বাবুগিরি করিতে হয় তাহাও জানাইয়াছি। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত, তথাপি ইচ্ছা হয়—তুমি যেরূপে উত্তম বাবু হও, এমত শিক্ষা দিই।

প্রথম উপদেশ। যে সকল ভট্টাচার্যরা আসিয়া সর্বদা টাকা দাও, টাকা দাও এই কথা বই আর অন্য কথা বলে না, তাহাদের কথায় কান দিবে না। আমার পিতার শ্রাদ্ধের সময় উহারা যখন কহিল, বাবু শ্রাদ্ধের কি করিব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, শ্রাদ্ধের ফল কি? উহারা বলিল, পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। আমি বলিলাম, কোনকালে শুনি নাই যে, মরা গরুতে ঘাস-জল খাইয়া থাকে। ভট্টাচার্য

www.pathagar.com

শেষে কহিল বাবুজী আর কিছু কর না কর, পিণ্ডদানটা করা আবশ্যক। তাহাতে আমি কহিলাম, আজ **আমি উত্তম** বুদ্ধিমতী, পরম ধার্মিকা বক্‌না পিয়ারীর ['বেশ্যাপ্রধানা'] নিকট যাইব। তাহারা যেরূপ পরামর্শ দিবে সেরূপ করিব। বক্‌না পিয়ারী আমাকে কহিল, 'তুমি এক কর্ম কর—এক ব্রাহ্মণকে ফুরাইয়া দাও, শ্রাদ্ধ-দশপিণ্ড, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি যত কর্ম সেই করিবেক'। আমিও তাবত কর্ম ফুরাইয়া দিলাম। অতএব নির্বোধ ভট্টাচার্যেরা আগমন করিলে কদাচ আসিতে আজ্ঞা হয়—বসিতে আজ্ঞা হয়—এরূপ বাক্য বলিবে না, যদ্যপি কিঞ্চিৎ দিতে হয়, তবে কহিবা সময়ানুসারে আসিবে। এইরূপ মাসেক কি দুই মাস প্রতারণা করিয়া কিঞ্চিত দিবা।

দ্বিতীয় উপদেশ। গাওনা-বাজনা কিছু শিক্ষা কর, যাহাতে জিউ খুশী থাকিবে এবং যত বারাঙ্গনা আছে তাহাদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া ঐ বারাঙ্গনাদিগের সর্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবে, কিন্তু **যবনী বারাঙ্গনা সম্ভোগ করিবে; কারণ তাহারা পেঁয়াজ, রসুন আহার করে; সেই হেতু তাহাদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবে, এরূপ অন্য কোন রাঁড়েই পাইবে না। যদি বল যবনী-বেশ্যা গমন করিলে পাপ হইবে তাহা কদাচ মনে করিবে না।** যাহাদের পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা থাকে তাহারই উত্তম স্ত্রী-সম্ভোগ করে। যদি বেশ্যা-গমনে পাপ থাকিত, তবে কি উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বেশ্যার সৃষ্টি হইত? তারপর পয়ার ছন্দে ব'ললেন—'কর গিয়া বেশ্যাবাজি, যদি বল কর্ম পাজি, মন শুচি হলে পাপ নয়। যাহার যাহাতে রুচি, সেই দ্রব্য তারে শুচি, তার তাতে হয় সুখোদয়। অন্য অন্য সুখের সৃষ্টি, করি বিধি পরে মিষ্টি, করিলেন সুখের সৃজন। বেশ্যাকুচ বিমর্দন, যতনেতে আলিঙ্গন, আর তার শ্রীমুখ চুম্বন। বেশ্যার আলয়ে বসি এইরূপ দিবানিশি, তুমি বাবু কর আচরণ। ইহাতে অন্যথা কভু, মনে না ভাবিবে বাবু, হইবেক দুঃখ বিমোচন।

তৃতীয় উপদেশ। প্রতি রবিবারে বাগানে যাইবা, মৎস্য ধরিবা, সখের যাত্রা শুনিবা, নামজাদা বেশ্যা ও বাঈ ইয়ারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা। বহুমূল্য বস্ত্র, হার, হীরাকাঙ্গুরীয় ইত্যাদি দিয়া তুষ্ট করিবা। দেখিবে কি মজা হয়।

চতুর্থ উপদেশ। যাহার চারি 'প' পরিপূর্ণ হইবে তিনি হাফ বাবু হইবেন। চারি 'প' হইতেছে পাশা, পায়রা, পরদার ও পোষাক। ইহার সহিত যাহার চারি 'খ' পরিপূর্ণ হইবে, তিনি পুরা বাবু হইবেন। চারি 'খ' হইতেছে, খুশী, খানকী, খানা, খয়রাত [পৃষ্ঠা-৩৩-৩৫]।" উনিশ শতকের বটতলার হিন্দু শরীকানা ছিল—এই বাবুদের-ই দখলে। আর তার রূপ-চেহারা ছিল—এরকম-ই।

www.pathagar.com

অতএব, বটতলা, শোভাবাজার তথা তখনকার শহর-কোলকাতা ও তার আশে-পাশের এলাকার হিন্দু উচ্চবিত্ত শ্রেণীর "বাবু কালচার"-এর বেহায়াপনা-বেলেল-াপনা-অশ্‌লীলতার সাথে নিবর্গের কোন সম্পর্কই ছিল না। একদিন যে-সব মানুষ ইংরেজ সাহেবদের চাকর-বাকর, দালাল, লাঠিয়াল ছিলেন; যৌবনে তাঁরাই ইংরেজ-আনুকূল্যে জমিদার ও অর্থবান হ'য়ে বাবু সেজেছিলেন। বাবুগিরি ক'রতে গিয়ে তারা যা শেখেন এবং শেখান, করেন এবং করান—তার, উপরে-লিখিত-বিবরণের বাইরেও বহু অকহতব্য বিবরণ আছে।

মুছলমান নবাব এবং বনেদী জমিদারদের পতনের পর, এই নিশ্রেণীর নিরুচির স্বল্পশিক্ষিত হিন্দু বেহায়া-বেলেল-াদের লোভ-লালসা,"ধর্মীয় চতুর্বর্গের এক বর্গ"—"নব রসের আদি রস—কামরস," কামকেলি, মদ্যপান-চরিতার্থতায়ও—বটতলার হিন্দু লেখক-প্রকাশকরাই এগিয়ে আসেন। আর তাদের অনুসরণীয় সাহিত্য হ'য়ে দাঁড়ায় বাৎস্যায়নের "কামসূত্র", ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" প্রভৃতি। **এর সঙ্গে বটতলার মুছলিম লেখক-প্রকাশক ও ইছলামী সাহিত্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। সম্পর্ক ছিল না—সে-কালের মুছলিম পাঠক সমাজেরও**। তা বিশেষভাবে ইয়াদযোগ্য।

খ. বটতলার দণ্ড

বলা দরকার যে, মহারাজ নন্দকুমার ইংরেজ-সহযোগী হ'লেও ইংরেজরা-ই বিচার ক'রে যেমন তাকে ফাঁসি দিয়েছিল; তেমনি বটতলাও যাদের মনোরঞ্জনের জন্য 'সুরুচির পসরা' মেলে ধ'রেছিল; তারাই তাকে দণ্ডও দিয়েছিল। এ-বিষয়ে বিনয় ঘোষ লিখেছেন—

"কলকাতার কমিশনাররা বটতলার আড্ডাটি উঠিয়ে দিলেন, আটচালাটিও ভেঙে দিলেন। পুরনো বটতলার 'রুইন' মাত্র প'ড়ে রইল, পক্ষীর দলের বাবুদের অশরীরী আত্মা তার মধ্যেই ডানা ঝাপটাতে ও বোল ঝাড়তে লাগল। কিন্তু পক্ষীবাবুরা মনমরা হয়ে, ঝুমুর শুনে বেড়ালেও, বাবু-কালচারের ধারা শুকিয়ে গেল না। দমনের ফলে, অবদমিত বাবু-কালচার যেন শেষবারের মতন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে বটতলার এক আনা ও ছ'পয়সা সিরিজের পুস্তিকাবলীর মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশেষে গভর্নমেন্ট আইন ক'রে এই সব বইয়ের প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিলেন। লঙ্‌ সাহেব লিখেছেন যে, আইন করবার আগের বছর এই ধরনের একখানা পুস্তিকা ত্রিশ হাজার কপি বিক্রী হ'য়েছিল। ছাপার জন্য তিনজন প্রকাশককেও

অভিযক্ত করা হ'য়েছিল এবং সুপ্রীম কোর্টে তাঁদের জরিমানা হ'য়েছিল তেরশ' টাকা। বটতলার লেখক-প্রকাশকরা তারপর থেকেই ভয় পেয়ে সাবধান হ'য়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বটতলার অস্তিত্ব কি তারপরে একেবারে শেষ হ'য়ে গেছে? আজ কি তার কোন চিহ্ন নেই?

কলকাতার কমিশনাররা ও বাংলা সরকার 'বটতলার সাহিত্য'-প্রকাশ আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে হ'য়তো ভালই ক'রেছিলেন। কিন্তু বটতলার প্রকাশক ও লেখকরা তো তাঁদের সমর্থনে গ্যেটের মতন ব'লতে পারেন—

What were I without thee
O my friend, the public?"

আলোচ্য বিষয়ে অশ্লীলতার সপক্ষে অনেক যুক্তি দিয়ে শ্রীপান্থ যে-বিশদ আলোচনা ক'রেছেন—তা নিম্নরূপ—

"প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৮৭৬ সালের অশ্লীলতা নিবারক আইনের বিশেষ উপলক্ষ যেমন বটতলার পুথিপত্র, ১৮৭৬ সালের অশ্লীলতা নিবারক আইনের বিশেষ উপলক্ষও ছিল একটি প্রহসন। হয়তো বটতলায় ছাপা নয়, কিন্তু প্রহসনটির বিষয়বস্তু (ইংরাজ যুবরাজের জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে সাদর অভ্যর্থনা) এবং ঘটনাবলী থেকে অনুমান ক'রতে অসুবিধা নেই সেটির ঘরানা বটতলার-ই।

আইন হ'ল। আন্দোলনও হ'ল। কিন্তু অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অভিযান উঁচু আর নিচুতলার সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের চেহারা নিতে পারল না। বটতলা ওরফে নাগরিক লোক-সংস্কৃতির সমর্থনে সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন বাবুদের একাংশ।...

সমসাময়িক নানা কাগজে এই ধর্মযুদ্ধের বিবরণ ছড়িয়ে র'য়েছে। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সাময়িকপত্র 'বসন্তক' দুটি ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ করে। একটিতে দেখা যায়, সাহেবি পোশাক পরা একজন বাঁদর-নাচিয়ে, বাঁদর নাচ দেখাচ্ছেন। সঙ্গে একটি ছাগলও র'য়েছে। বাঁদর এবং ছাগল দুই-ই পোষাক পরা। নীচে চিত্র-পরিচিতি—'এক্ষণে টুপিওয়ালা বেদেরা অনেক পেন্টুলুন-পরা বাঁদরকে এইরূপ নাচাচ্ছে।' আর একটি ছবিতে দেখা যায়, শাড়ি-ব্লাউজে সেজে কালী ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন; পেন্টুলুন-পরা মহাদেবের বুকে। চিত্রপরিচিতি: 'অশ্লীলতা নিবারণী-সভা'র একজন সভ্যের বাটীর কালী।'

'বসন্তক' সেদিন একাধিক রচনায় অশ্লীলতা নিবারণী সভার পাণ্ডাদের

ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত ক'রেছে। একটি রচনায় দেখি, বাবু অফিস থেকে ফেরার পথে কোকিলের ডাক শুনে খুব-ই বিরক্ত। এদিকে তাঁর হাতে, সেক্ষপীরের 'ভেনাস এণ্ড এডোনিস' বহি। পুত্রবধূ গর্ভবতী, এই সংবাদ শুনে তিনি ভেঙে পড়েন,—'হা পরমাত্মজ আমার ঘরে এই ! কাল আমি ভারতচন্দ্রের বহিওলা বেটাকে জেলে দিয়ে এসেছি, আজ আমার ঘরে এই অশ্লীলতা! হাঃ বিধাতা!' বঙ্কিমচন্দ্র–ভারতচন্দ্র তো বটেই, এমন কি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধেও অশ্লীলতার অভিযোগ তুলেছিলেন। বসন্তক বিদ্যাসাগরকে বিশালদেহী বৃষ এবং বঙ্কিমকে ব্যাঙ হিসাবে চিত্রিত ক'রে 'দি বল অ্যাণ্ড দি ফ্রগ' নামে একটি ব্যঙ্গচিত্র ছেপেছিল। ভারতচন্দ্রের মর্যাদা রক্ষায় আরও কিছু কিছু কাগজের মতো এগিয়ে আসে 'মধ্যস্থ'। ওই পত্রে একটি প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল—"বঙ্গদর্শন গর্দ্দভ"। বিদ্যাসুন্দর-বিতর্ক উপলক্ষে 'মধ্যস্থ' এক-ই বছরে আরও একটি রচনা প্রকাশ ক'রেছিল। শিরোনাম—"অশ্লীল"। রচনা-সূত্রে জানা যায়—বিদ্যাসুন্দর বিক্রির অভিযোগে পুলিশ বটতলার কয়েকজন বই–বিক্রেতাকে ধ'রে নিয়ে গেছে। "তাহারা জামিন দিয়া খালাস হইয়া আসিয়াছে, অতি শীঘ্র মোকদ্দমা হইবে। শুনিতেছি পুস্তক-বিক্রেতাগণ চান্দা তুলিতেছে—তাহাদিগের স্বশ্রেণী ব্যতীত দেশস্থ অনেক লোকে নাকি তাহাদিগের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে।" বাবুসমাজ স্পষ্টতঃই বিভক্ত। কেশবচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' সংশোধনের যে-প্রস্তাব দেন তারও উত্তর দিয়েছে 'মধ্যস্থ'র এই রচনা। "তৈল বা শর্করা প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় সে–সমস্ত কাব্যকে 'রিফাইন' করার প্রক্রিয়া ও যন্ত্র অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই।"

হুতোম ব্যঙ্গ ক'রে লিখেছিলেন, "রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন।" নবকৃষ্ণ ইংরেজের সেবা ক'রে ধনী হ'য়েছিলেন, শহরে মস্ত কোঠাবাড়ি ক'রেছিলেন। তাঁর প্রাসাদে কলকাতার মান্য ইংরেজ নারী-পুরুষের নিয়মিত আনাগোনা ছিল। শুধু ইংরেজের আদবকায়দা নয়, তাঁদের রুচিও নবকৃষ্ণের অজানা থাকার কথা নয়। তবু তিনি কবিওয়ালাদের 'পেট্রন'। কারণ এটাই, তিনি দেশের সর্বজনের সাংস্কৃতিক রুচির-ই অংশীদার। গাঁয়ের কবি, গাঁয়ের পটুয়া—নগরে এসে, ক্রমে নানাভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়েছেন। দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে যেমন বাবুবিলাস নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ, কালীঘাটের পটুয়ার সামাজিক ছবিগুলোতেও তা-ই। বটতলার নক্‌শা আর প্রহসন-রচয়িতাদের অনেকে তাঁদের-ই আত্মার আত্মীয়। অন্যদিকে, নবকৃষ্ণরাও সমস্যায়। তাঁরা বাঙালীর গ্রামীণ সংস্কৃতির উর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। রসবোধ তাঁদের বড় জোর 'বাবুর গান' পর্যন্ত। অর্থাৎ নিধুবাবুর টপ্পা অবধি। নাগরিকতার আস্বাদন সেখানেই শেষ।

www.pathagar.com

শহরের বাঙালী সমাজের ওপরতলায় বহিরঙ্গে যত পরিবর্তন-ই ঘটুক, প্রায় একশ' বছর পরেও কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মৌলিক পরিবর্তন বিশেষ ঘটেনি। মনে রাখা দরকার, ১৮৭১ সালে এই শোভাবাজারের রাজবাড়ী থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হ'চ্ছিল 'আমার গুপ্তকথা'। বটতলার কালীকুমার একাধিকবার মঞ্চস্থ হ'য়েছে বাবুদের উদ্যোগে। বঙ্কিমচন্দ্র ব'লেছেন,—বটতলা থেকে সুরাপানের বিরুদ্ধে এক আনা-দু'আনা দামের রাশি রাশি বই বেরিয়েছিল। তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় একটির নাম ছিল—'বুঝলে কি না'। সেটি খুব-ই জনপ্রিয় ছিল। প্রায়শঃ পারিবারিক (প্রাইভেট) থিয়েটারে তার অভিনয় হ'ত। বঙ্কিম ব'লছেন—এ-সব বই নিতান্তই মাইকেলের প্রহসনটির অনুকরণ। তার চেয়েও প্রয়োজনীয় সংবাদ কিন্তু এই ঘটনাটি-ই যে, বড়ঘরেও বটতলার প্রহসনের কদর ছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন সিমলার দত্ত বাড়িতে বটতলার 'মহন্তের এ কি কাজ' অভিনয় ক'রতেন বাড়ির তরুণরা। তাঁর দাদা বীরেশ্বর, অর্থাৎ পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ, সে থিয়েটারের 'সিন' আঁকতেন। নাট্যশালার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরা জানেন কেমন ক'রে ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটার থেকে মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা'কে সরিয়ে দিয়ে মঞ্চ দখল ক'রে নিয়েছিল বটতলার লেখক জনৈক লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের 'মোহন্তের কি এই কাজ।' এসব টুকিটাকি খবর থেকে বোঝা যায়—পশ্চিমী হাওয়া শন শন বইলেও তা সমগ্র উচ্চ এবং মধ্যবিত্তের ভাবলোক স্পর্শ ক'রতে পারেনি। **তথাকথিত নবজাগরণ না ছিল সর্বজনীন, না সর্বাঙ্গীণ**। যাঁরা ইংরেজী জানতেন, তাঁরাও ছিলেন মূলতঃ বাংলার প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির অনুরাগী। কিংবা সেই নাগরিক সংস্কৃতির—যার প্রেরণা উচ্চমার্গের বিদেশী সাহিত্য নয়, একান্তভাবে নাগরিক পরিবেশের ফসল; যাতে এই শহরের দৈনন্দিন জীবন নানা ভাবে রঙ্গ-ব্যঙ্গে পরিবেশিত। বাবুদের একাংশ তাই একদিকে ভারতচন্দ্র-দাশুরায়ের অনুরাগী, অন্যদিকে কবিয়াল, সঙের গান, কিংবা বটতলার শস্তা প্রহসনেও তাঁদের দিব্যরুচি। অশ্লীলতার নতুন সংজ্ঞা স্বভাবতঃই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং, তাঁদের প্রতিরোধের সামনে কিছুটা পিছু হ'টতে হ'ল আন্দোলনকারীদের। টাউন হলের সভায় একাধিক বক্তাকে আশ্বাসবাণী শোনাতে হ'ল—তাঁরা বাঙালীর 'ধ্রুপদী সাহিত্যে'র বিরুদ্ধে কিছু ক'রতে চাইছেন না। অর্থাৎ কৃত্তিবাস-ভারতচন্দ্র ছাড়্। ১৮৭৪ সালে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে—আইন এবং পুলিশ কারও তোয়াক্কা না ক'রে বের হ'ল, 'কাঁসারিপাড়ার সঙ'।

তাঁদের মুখে গান, "শহরে এক নতুন হুজুগ/উঠেছে'রে ভাই/অশ্লীলতা শব্দ

মোরা আগে শুনি নাই।" বটতলাও, বলাই বাহুল্য, রঙ্গব্যঙ্গের তুফান ছুটিয়েছিল সেদিন আন্দোলনকারীদের নিয়ে। একটি প্রহসনে—'উঃ মহন্তের এই কাজ', একটি চরিত্র ব'লছে, "আরে আরে শুনছ কেশববাবু নাকি আইন কর্চ্চেন খারাপ কথা কইলে ম্যাদ হবে।" আর একটিতে সুরুচি নামে একটি চরিত্র যখন প্রেম-প্রসঙ্গে ব'লতে গিয়ে ওথেলো থেকে নিধুবাবু এবং ভারতচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করে, তখন নিতম্ব নামে আর একটি চরিত্র তাকে অশ্-লিতার দায়ে ফেলে। তার কথা, 'ভারতচন্দ্র কি অশ্লীল নয়? আমি অনেক শিক্ষিত লোকের কাছে শুনেছি ভারতচন্দ্র রায় কথাটি বড় অশ্লীল'।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও হাসতে জানত বিংশ শতাব্দীর বটতলা। হাসাতেও।"

এই হাসিতে শ্রীপান্থ বাবু ও তাঁর গুণমুগ্ধরা পুলকবোধ ক'রলেও মধ্য স্বভাবের রুচিবানরা পুলক অনুভব ক'রতে পারেন না। তাঁদের নিকট ঐ হাসি 'বেশ্যার হাসি; কদর্য ও অশ্-লিল হাসি'। এর সাথে বটতলার মুছলমান কবি-লেখক, প্রকাশনা, পুথি-কিতাব বা মুছলমানী ভাষার কোন সংশি-ষ্টতা নেই। কারণ ঐ সব লেখা হ'য়েছিল হিন্দু কলমে, ছাপা হ'য়েছিল হিন্দু প্রেসে এবং হিন্দু বাঙালায়। সাধু-মোহন্তদের সাধু-ভাষায়। নামান্তরে সংস্কৃত-বাঙালায়। তার চরম লক্ষ্য ছিল—চতুবর্গের এক বর্গ–সাধন। আসলে যা ছিল—অপমার্গ-সাধন।

তবু কালের খাতায় আসামী হ'তে হ'য়েছে—কেবল 'কোলকাতার বটতলা'কে নয়; গোটা অবিভক্ত বাঙালার 'সাহিত্য বটতলা'কেই। আর **সেই বেড়াজালে ঘেরা প'ড়েছে—বেগুনাহ্ মুছলিম কবি-মুছান্নেফ, মুছলিম পুথি-কিতাব আর মুছলমানী বাঙালাকেও। এই বিষয়টাকে কেউ আলাদা ক'রে দেখেননি। আলাদা ভাবে বিচার করেননি। অথচ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়।**

পরবর্তী আলোচনায় এ-বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করা হবে।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১.

১. আ. কা. মুহাম্মদ আদমুদ্দীন — পুথি-সাহিত্যের ইতিহাস
ঢাকা-১৯৬৯।

২. আজহার ইসলাম — মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি
ঢাকা-১৯৯২।

৩. আনিসুজ্জামান — মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
ঢাকা-১৯৬৫।

৪. আহমদ শরীফ — পুথি-পরিচিতি
ঢাকা-১৯৫৮।

৫. কাজী নজরুল ইসলাম — মরু-ভাস্কর
ঢাকা-১৩৬৪।

৬. কৃষ্ণদাস কবিরাজ — চৈতন্য চরিতামৃত
কলি-১৯৯৭।

৭. লোচন দাস — চৈতন্য-মঙ্গল
(নামপত্র ছিন্ন)।

৮. দীনেশচন্দ্র সেন — মৈমনসিংহ-গীতিকা
কলি-১৯৭৩।

৯. বিনয় ঘোষ — কলকাতা-কালচার
কলি-১৩৬৮।

১০. মীর মোশাররফ হোসেন — মশাররফ রচনা-সম্ভার
ঢাকা-১৯৮৭।

১১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ — বাংলা সাহিত্যের (কথা মধ্যযুগ)
ঢাকা-১৩৭১

১২. শ্রীপান্থ — বটতলা
কলি-১৯৯৭।

১৩. সুকুমার সেন — ইসলামি বাংলা সাহিত্য
বর্ধমান-১৩৫১।

১৪. আলী আহমদ — বাংলা কলমী পুথির বিবরণ
নোয়াখালি,-১৩৫৪।

১৫. আবদুল কাইয়ুম — ঢাকার কয়েকজন পুথি-রচয়িতা
বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা-১৩৭২।

১৬. আবদুল কাইয়ুম — ভাষা-সাহিত্য পত্র
বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়,
১৩৮২।

www.pathagar.com

২.

১. আছমতুল্লাহ্	বিবি ফাতেমার জহুরা নামা
২. আ. মা. মোহাম্মদ হামিদ আলী	কাসেমবধ-কাব্য
৩. ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্পেন-বিজয়-কাব্য
৪. শাহ্ গরীবুল্লাহ	ইউছুফ জোলায়খা
৫. জোনাব আলী	শহীদে কারবালা
৬. দোস্ত মোহাম্মদ	জেহাদে হায়দর/জঙ্গে খারর
৭. মোহাম্মদ খাতের	সাহানামা
৮. মোহাম্মদ তাজিম	ছহি মাহতাব গোলে লাল
৯. আলাওল	সয়ফল মুলক বদিউজ্জামাল
১০. আলী রজা	ছিরাজ কুলুব
১১. বাকের আলী	মনুচেহের মাছুমা পরী
১২. শেখ পরাণ	নছিহৎ নামা
১৩. শেখ মনসুর	ছির্নামা
১৪. শেখ মুত্তালিব	কায়দানি কিতাব
১৫. সৈয়দ নূর উদ্দীন	দাকায়েকুল হাকায়েক
১৬. সৈয়দ হামজা	আমীর হামজা
১৭. হেয়াৎ মামুদ	চিত্ত-উত্থান
১৮. মুন্‌শী রবিউল্লাহ	চৌদ্দ উজির
১৯. মালে মোহাম্মদ	ছয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল
২০. বালক ফকির	ফাএদুল মুক্তাদি
২১. মুনসী আবদুল করীম	শিরি-ফরহাদ
২২. রেজাউল্লাহ	কাছাছোল আম্বিয়া
২৩. মোহাম্মদ দানেশ	চাহার দরবেশ
২৪. শেখ আমীর উদ্দীন	মনছুর হাল্লাজ
২৫. হাজী আবদুল মজিদ	দাস্তানে আমীর হামজা
২৬. Rev. James Long.	

www.pathagar.com

ফারছী-বাঙালায় লেখা
বটতলার পুথি-সাহিত্যে
মুছলিম অবদান

এবার বটতলা-সাহিত্যের হিন্দু শরীকানার কথা বাদ দিয়ে মুছলিম শরীকানার দিকে তাকানো দরকার। আর তাদের অবদান নিয়ে আলোচনা করা জরুরী। এ-কথা সত্য যে, কোলকাতার বটতলায় ছাপাখানা স্থাপনের পয়লা আমলেই মুছলমান কবি-লেখক ও বই-ব্যবসায়ীরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন। তাঁরা ইংরেজী শিক্ষা কবুল না ক'রলেও, ইংরেজদের ছাপাখানা থেকে দূরে থাকেননি। সে-তরফে, আগেই বলা হ'য়েছে, বটতলা এলাকায় স্থাপিত তিনটি আদি প্রেসের একটি ছিল মুছলিম প্রেস, মালিক ছিলেন হেদায়েৎ উল-াহ্। তাঁর প্রেস কবে ব'সেছিল, কি নাম ছিল, কি কি বই সে প্রেস থেকে ছাপা হ'ত, সে-সব বিষয়ে কেউ কিছু না-বলায় প্রেসটির বিষয়ে এ-কালের পাঠকদের বিশেষ কিছু জানানো সম্ভব নয়। এছাড়া, জেমস্ লঙ্ তাঁর ১৮৫৭ সালের বিবরণে যে ৪৪টা প্রেসের উলে-খ করেছেন—তার মধ্যে এ-প্রেসটির নাম নেই। তাঁর লেখায় একটা মাত্র মুছলিম-প্রেসের কথা আছে। নাম—"রহমানি প্রেস, শিয়ালদহ"। এ-প্রেস থেকে একখানি মাত্র বইয়ের প্রকাশ-পরিচয় দেয়া হ'য়েছে। তাও একজন অমুছলমানের লেখা; অনৈছলামিক বই (নাটক)। শ্রীপান্থ লিখেছেন—"বটতলার হিন্দু প্রকাশকদের পাশাপাশি ব্যবসা শুরু করার আগে মুছলমান প্রকাশকদের আড্ডা ছিল প্রধানতঃ শিয়ালদহ এলাকায়। মেছুয়া বাজারেও ছিলেন কিছু প্রকাশক। ছিলেন কলিঙ্গ তথা পরবর্তীকালের ওয়েলেসলি স্ট্রীটের কাছাকাছি অঞ্চল। এইসব প্রকাশনার প্রকাশকদের দোকান থেকে উনিশ শতকে রাশি রাশি বাংলা বই ছাপা হ'য়েছে। হাজী মোহাম্মদ কোরবান আলী-প্রতিষ্ঠিত ৩০-মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের ওছমানিয়া লাইব্রেরির একটি বইয়ের মলাটে 'বোন বিবি জহুরানামা' এবং মোহাম্মদ মুনশী সাহেব দ্বারা প্রণীত 'নারায়ণী জঙ্গ' ও 'ধোনা মৌলের পালা'-র (১৩০৫) সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন-এ দেখা যাচ্ছে ৮০টির বেশি বইয়ের নাম। ধর্ম-সাহিত্য, প্রণয়কাব্য ছাড়াও তালিকায় রয়েছে 'রূপতন বিবির কেচ্ছা', 'কটুমিয়ার কেচ্ছা', 'নেক বিবির

www.pathagar.com

কেচ্ছা', 'সখি সোনার কেচ্ছা' ইত্যাদি বেশ কিছু কাহিনী। শাশুড়ী-জামাইয়ের ঝগড়া, লক্ষ্মী-শনির ঝগড়ানামা, রকমারি নাটক, পত্রদলিল শিক্ষা, হেকিমি চিকিৎসা ইত্যাদি। বিষয়ের ব্যাপ্তি বটতলার মতো বৈচিত্র্যময় না হ'লেও এই প্রকাশকদের ঝোঁকও যেন সেদিকে। প্রত্যেকটি মুছলিম প্রকাশনা থেকে এ-ধরনের অনেক বই বের হ'য়েছে। প্রচলিত বাংলা ভাষার সঙ্গে এসব বইয়ের ভাষা কিছুটা (?) পৃথক। সেকারণেই রেভা. লঙ্ তালিকা রচনা ক'রতে ব'সে ওই সব বইয়ের নাম দিয়েছেন 'মুছলমান বেঙ্গলি'। অর্থাৎ মুছলমানী বাঙালা।"

আলোচ্য বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হ'য়েছে ব'লে, বটতলার সাহিত্যে মুছলমানদের **ভাষাগত অবদান ছাড়াও অপরাপর অবদানের ছবি** তুলে ধরা যেতে পারে। এ-তরফে বটতলার মুছলিম-সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগের পরিচয় দেওয়া জরুরী।

মুছলিম পুথি-সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগ

এ-বিষয়ে ড. **আনিসুজ্জামান** লিখেছেন—"বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যগুলোকে কয়েকভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে আমরা পাই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান: যেমন, 'ইউছুফ–জেলেখা', 'লায়লী-মজনু', বেনজীর-বদরে মনীর', 'হুছনাবানু-মনীর শামী' ('হাতেম তাই'), 'গোলে বকাউলী–তাজুলমুল্‌ক', 'ছয়ফলমুল্‌ক-বদিউজ্জামাল' প্রভৃতি। দ্বিতীয় ধারার উপাখ্যানগুলোকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর দুটি ভাগ—ছদ্ম ঐতিহাসিক আর লৌকিক। প্রথম পর্যায়ে পড়ে 'আমীর হামজা,' 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি কাব্য অর্থাৎ ইতিহাসের পটে মুছলিম বীরদের কাল্পনিক কাফের-দলন-কাহিনী। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাই আমাদের দেশের পটভূমিকায় হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ক'রে কিম্বা অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে মুছলমান পীর-ফকীরদের প্রতিষ্ঠালাভের কথা, যেমন, 'বনবিবির জহুরানামা', 'কালু গাজী-চম্পাবতী', 'লালমোন', 'সত্যপীরের পুথি' প্রভৃতি। তৃতীয় ধারায় পাই ইছলামের ধর্ম, ইতিহাস, নবী-আউলিয়ার জীবনকথা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ছন্দোবদ্ধ রচনা, যথা, 'কাছাছুল আম্বিয়া', 'তাজকিরাতুল আউলিয়া', 'হাজার মছলা' প্রভৃতি।

ইছলাম-কেন্দ্রিক জীবন ও সাহিত্যের প্রতি অতিশয় আগ্রহের প্রকাশ, আর যা কিছু উদ্ভট ও অতিপ্রাকৃতিক, তার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধানিবেদন,এই কাব্য ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"

www.pathagar.com

অপরদিকে **আজহার ইসলাম** লিখেছেন (১৯৯২)—"দোভাষী পুথি সাহিত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। বিষয়ভেদে এ-সব কাব্য নানাভাবে চিহ্নিত। যেমন—

১. "রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে" রচিত পুথি।

২. "যুদ্ধকাব্য রূপে চিহ্নিত" পুথি।

৩. ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের হিন্দুর লৌকিক দেবতার প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড় করিয়ে লেখা "ইসলাম প্রচারক" পুথি।

৪. "ইছলাম ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থার উপর রচিত" পুথি। ইত্যাদি।

বলা দরকার যে, 'পুথি-সাহিত্যে'র ইতিহাস-লেখক মরহুম **আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন** এ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত-আলোচনা ক'রতে গিয়ে যে-শ্রেণী-বিভাগ ক'রেছেন;—তা নিচেয় কোট্ করা হ'ল। তিনি লিখেছেন—"চলিত সাহিত্যকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (ক) প্রেমমূলক কাহিনীকাব্য (Romantic Poems), (খ) বীরত্বমূলক কাহিনীকাব্য (Epic Poems), (গ) ইছলামী মঙ্গলকাব্য, (ঘ) সংস্কার ও শিক্ষামূলক কাব্য (Didactic Poems), (ঙ) ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ, (চ) তর্কমূলক গ্রন্থ (Polemic), (ছ) ফকীরী বা দেহতত্ত্ব, (জ) ভৈষজ্য-চিকিৎসা (Medicine), (ঝ) মন্ত্র-চিকিৎসা, (ঞ) সূফীতত্ত্ব (Mysticism) (ট) ইতিহাস, (ঠ) ঐতিহাসিক কাব্যোপন্যাস (Historical Romance), (ড) জীবন-চরিত, (ঢ) জীবন-চরিতের ছায়া (Pseudo-Biography), (ণ) প্রহসন (Farce) এবং (ত) ফলিত জ্যোতিষ।"

আলোচ্য শ্রেণী-বিভাগের ওপর শ্রদ্ধা রেখেও বলা যায়—**মুছলিম-রচিত পুথি-কেতাব মুলতঃ দু'ভাগে ভাগ** করা উচিত। তার একটা হ'ল—**মৌলিক রচনা** ও অপরটা **তরজমা**।

অনেকের লেখায়-ই মৌলিক রচনা ও তরজমার সীমারেখা লোপ পেয়েছে—তা ঠিক। কবি স্বাধীন ভাবেই লিখুন, আর তরজমাই করুন; তা যে বহু ক্ষেত্রে 'নবীন সৃষ্টি' হ'য়ে উঠেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একথা মনে রেখে উনিশ শতকে রচিত **'বটতলা'র মুছলিম 'পুথি-সাহিত্য'কে নিম্নোক্ত সাতটি** ভাগে ও একত্রিশটি উপভাগে বিভক্ত ক'রে দেখানো হ'ল।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের পুথি-কেতাবের বিস্তৃত বিষয়-ভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগ*

(১৮০১—১৯০০ খৃ. অ.)

১. ধর্মীয় কাব্য (ইসলাম ধর্ম)

১. ক. আল্ কোরআন-এর তরজমা

ক.১. আল্ কোরআন (?)/ মওলানা আব্বাস আলী।

খ. আল্ হাদিছের তরজমা

খ. ১.'জেমালুল ফেরদৌস'। জনাব আলী
(ছিহাহ্ ছেত্তার নির্বাচিত অংশের তরজমা)।

গ. ফিকাহের তরজমা

গ. ১ হয়বাতুল ফেকাহ্ (১২৭৩)/ মওলানা আতাউল্লা সিদ্দিকী।
২. হয়বাতুল ফেকাহ্ (১২৭৬)/গোলাম মওলা।

ঘ. শরীয়ৎ-বিষয়ক রচনা

ঘ.১. ছিরাতুল মোমেনিন (১২৯৬)/ মালে মোহাম্মদ।
২. ফেছানায়ে আজায়েব (১২৭৫)/ বেলায়েত হোসেন।
৩. একশত তিরিশ ফরজ (১২৪৬)/ মোহাম্মদ খাতের।
৪. মিফ্তাহুল জান্নাত (১২৮০)/ ঐ।
৫. হুজ্জতুল ইছলাম (?)/ ঐ।
৬. তরীকুল ইছলাম (?) রওশন আলী।
৭. বরকুল মোয়াহেদিন (?)/মওলানা আব্বাস আলী।
(একত্ববাদীদের বিদ্যুৎ)
৮. মোনাব্বেহাত (দশ খণ্ড) (?)/ জনাব আলী।
৯. নিয়তনামা (১২৮৭)/বেলায়েত হোসেন।
১০. মেছবাহুল ইছলাম (১২৭৯)/ ফছিহ উদ্দীন।
(ইছলামের বাতি)
১১. ছামছামুল মোয়াহেদিন (১২৯৫)/ ঐ।
১২. মিনহাজুল ইছলাম (১৩১৫)/ ঐ।
(ইছলামের পথ)।৫

*পাদটীকা—মূলতঃ মরহুম আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদম উদ্দীনের লিখিত "পুথি সাহিত্যের ইতিহাস"-এর ওপর ভিত্তি ক'রে উনিশ শতকে রচিত কিছু সংখ্যক মুছলিম বই-কেতাব, কাব্য-মহাকাব্যের—এ শ্রেণী বিভাগ করা হ'য়েছে।

www.pathagar.com

১৩. মিফ্‌তাহুল ইছলাম (?)/ ঐ।
(ইছলামের চাবি)
১৪ তরিকায়ে মুস্তফা (৩ খণ্ড) (?)/ ফছিহ্ উদ্দীন।
১৫. মফিছুল ইছলাম (১৩০১)/ শাহ আবদুল করীম।
(মক্কায় ব'সে লিখিত)
১৬. ফয়ছলে আহ্‌কাম (১৩১০)/ মুন্‌শী মোহাম্মদ।
১৭. আহ্‌কামুশ্ শরীয়ত (১২৮৮-১৩০৫)/ আয়েজউদ্দীন।
১৮. জিন্নাতুল মুছলেমিন (?)/ আজিমুদ্দিন।
১৯.গুলজারে মোমেনিন হলাহলে মোশরেকিন (১২৮৭)/মোহাম্মদ ইবরাহীম।
২০. তাকবিয়াতুল ইমান (?)/ উমেদ আলী।
২১. ফজিলতে বার চান্দ (১২৯৪)/ জনাব আলী।

ঙ. মারফত-বিষয়ক রচনা

ঙ. ১. মারফত নামা / মোহাম্মদ খাতের।
২. বিলাল নামা বা এশ্‌কে ছাদেক /মুন্‌শী আবদুর রহীম।
৩. নূরনামা বা হুলিয়া নামা (১২৭৮)/মোহাম্মদ খাতের ।
৪. মউত নামা (১২৮৩)/ গোলাম মওলা।

চ. ইছলামী আচার-আচারণ বিষয়ক রচনা

ক. আখবারুছ ছালাত (১২৭৮)/ মোহাম্মদ খাতের।
খ. আখবারুছ ছালাত (১২৯৬)/ আবদুল ওহাব।
গ. আহ্‌কামোল জোমা (১২৬৩/ মালে মোহাম্মদ।
ঘ. জুমার খুৎবা (?) । মওলানা আব্বাস আলী।
ঙ. রেছালা বেনামাজী (?) । জনাব আলী।

ছ. হজ্ব-বিষয়ক রচনা

ছ.১ ফজিলাতে হজ (১২৯৩)/শাহ আবদুল করীম।
(মক্কায় লিখিত)

জ. হালাল-হারাম সম্পর্কে রচনা

জ.১ আহকামোল জবেহ (?)/ আয়েজ উদ্দীন ও আমানুল্লাহ্।
২. তম্যিয়তুন্নেছা (?)/ মালে মোহাম্মদ।
(নারীদের প্রতি উপদেশ)।
৩. সতী বিবির কেচ্ছা (১৩০৬)/ আয়েজ উদ্দীন।

www.pathagar.com

৪ নেক বিবি (১২৯২)/ গরীবুল্লাহ্‌।
(ঢাকা)

ঝ. মছলা-মাছায়েলের কেতাব

ঝ. ১ মাছায়েলে জরুরিয়া (?)/ আব্বাস আলী।
২. রাহে নাজাত ( ) /জনাব আলী।
৩. হুজ্জুতুল ইমান /ঐ।
৪. তম্বিহুল গাফেলিন (১২৯৩)/ঐ।
৫. জান্নাতুল ওয়ায়েজিন (১২৯৭)/ঐ।
৬. মফিদুল খালায়েক (?)/শাহ্‌ আবদুল করীম।
(মক্কায় লিখিত)
৭. নাজাতুল আরোয়াহ (১৩১০)/ আবদুল ওহাব।
৮. মফিদুল আকেলিন/মোহাম্মদ ইবরাহীম।
৯. নাফেউল মোমেনিন/ঐ।

ঞ. মিলাদের কিতাব

ঞ.১ মৌলুদে আবদুর রহমীম/মুন্‌শী আবদুর রহীম।
২. এহিয়াউল কুলুব (?)/জনাব আলী।
৩. মৌলুদে শাহরিয়া (?)/গোলাম মওলা।
৪. মৌলুদে গোলজারে বাহারিয়া/রছুল মোহাম্মদ ।
৫. গুলশানে কাদেরী (১২৯৪)/পীর আবদুল কাদির।
৬. দরুদে মোস্তফা (?)/জনাব আলী।

ট. হেদায়েতের কেতাব

ট.১ হিদায়েতুল ইছলাম (১২৯৬)/ মুহম্মদ গোলাম মওলা।
২. নছিহতুল মুছলেমিন/মোহাম্মদ খাতের।
৩. নছিহত নামা (?) মোহাম্মদ আবদুর রহীম।
৪. হেদায়েতুল ফোচ্চাক /মোহাম্মদ ইব্‌রাহীম।

ঠ. মিরাজ বিষয়ক রচনা

ঠ.১. ছহি বড় মি'রাজনামা (?)/মোহাম্মদ খাতের।
২. নাজাতে কাওছার (?)/পীর আবদুল কাদির।
৩. মাজরে ফেরদৌছ (?)/ঐ।

www.pathagar.com

ড. মোহররম বিষয়ক রচনা

ড. ১. গুলজারে শাহাদৎ/হামীদুল্লাহ্ খাঁ।
২. কারবালা মাতম (১২৯৬)/পীর আবদুল কাদির।
(বইখানি ইতিহাসমূলক নির্ভরযোগ্য রচনা)
৩. শহীদে কারবালা (১৩০৭)/মুন্‌শী মোহাম্মদ ও মুন্‌শী আবদুল ওহাব।
৪. শহীদে কারবালা (?)/ মুন্‌শী জনাব আলী।

ঢ. কেয়ামত বিষয়ক রচনা

ঢ. ১. কেয়ামতনামা (১২৩৩?)/মুন্‌শী আশ্‌রাফ-উফুদ্দীন।
২. কেয়ামত নামা (১২৪১)/সৈয়দ হাজী আমানত উল্লা।
৩. হাসর মিছিল (১২০৮)/ছাদেক আলী।

ণ. ফকিরীতত্ত্ব বিষয়ক রচনা

ণ.১ ওজুদনামা (১৩০৩)/ আবদুল ওহাব।
২. মোরশেদনামা (১৩১৫)/আয়েজ উদ্দীন।
৩. আখবারুল ওজুদ (১২৮২)/ মোহাম্মদ খাতের।
৪. ছহি দেল দেওয়ানা (১২৬৮)/মুন্‌শী আবদুর রহীম।
৫. ফকির বিলাস (১২৯৯)/এনায়েতুল্লা সরকার।
৬. রদ্দে কুফর (?)/ছাদেক আলী।
৭. আশেক নামা (১৮৯৭)/আজিম উদ্দীন।

ত. জ্যোতিষতত্ত্ব বিষয়ক রচনা

ত.১. রাশি নামা (১২৯৫)/ফয়েজ উদ্দীন।
২. তালেনামা (১২৯৫)/ঐ।
৩. চাঁদরাশি ছায়েতনামা (১২৯৭)/ ডাক্তার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক।

২. জীবনী-কাব্য

২.ক. নবী করীম-(দ.)এর জীবনী

ক.১. হালাতুন্নবী (১২০৮)/ছাদেক আলী।
২. সায়েরে দোজাহান (১২৮৬)/ বেলায়েত হোসেন।
৩. তাওয়ারিখে মোহাম্মদী (?)/মোহাম্মদ ছায়িদ।
(৫ খণ্ডে লিখিত। অসম্পূর্ণ রচনা।)

খ. অন্যান্য নবী-রছুলের জীবনী

খ.১. কাছাছোল আম্বিয়া।

২. কাছাছোল আম্বিয়া (১২৭৩)/মোহাম্মদ খাতের
(২য় থেকে শেষ বালাম)।
৩. কাছাছোল আম্বিয়া (?) / জনাব আলী।
৪. খুলাছাতুল আম্বিয়া (?) / মোহাম্মদ খাতের।
৫. হজরৎ মুছা পয়গম্বরের পুথি (?) / মুন্‌শী আবদুর রহীম।

গ. অলি-আউলিয়াগণের জীবনী

গ.১. তাজকেরাতুল আউলিয়া (২খণ্ড)/মোহাম্মদ খাতের।
২. আখবারুল আউলিয়া (১২৭৬)/ জনাব আলী।
৩. মনছুর হাল-াজ (?) / শেখ আমির উদ্দীন।
৪. এবরাহীম আদ্‌হামের পুথি (?) / মুহম্মদ আবদুর রহীম।
৫. নিজাম পাগলা/রওশন আলী।
৬. ওমর উম্মিয়ার নকল (১৩০০)/মুন্‌শী মোহম্মদ ।
৭. হাতেম তা'য়ি (১২১০)/মুন্‌শী আবদুর রহীম।

ঘ. পীর-দরবেশগণের জীবনী

ঘ. ১.সত্যপীরের পাঁচালী (?)/ফয়জুল্লাহ।
২. সত্যপীরের পুথি (?)/ওয়াজেদ আলী।
৩. মানিক পীরের পুথি (?)/ফকীর মোহাম্মদ ।

৩. কাহিনী কাব্য

৩. ক. রোমান্টিক প্রয়োপাখ্যান

ক. ১ মধুমালতী (?) / সৈয়দ হামজা।
২. বাহার দানেশ (১২৪৪)/মুহম্মদ মীরণ।
৩. তুতিনামা (১২৯৭)/ মোহাম্মদ খাতের।
৪. মৃগাবতী-যামিনীভান (১২৯৮)/ ঐ।
৫. কুরঙ্গ ভানু (?)/এবাদত আলী খাঁ।
৬. গোলে বকাওলি (?)/ ঐ।
৭. নুরুন্নাহার (?)/রওশন আলী।
৮. গোল রওশন বিবির পুথি (?) / মুন্‌শী আবদুর রহীম।
৯. মহব্বত নামা (?)/।
১০. কিচ্ছা দেলারাম (?)/ ঐ।
১১. মনোহর মধুমালতী (?)/ ঐ।
১২. সুজান-চন্দ্রাবতী (?)/ ঐ।

www.pathagar.com

১৩. আজর শাহ্ শামারোখ (?)/ ঐ।
১৪. লায়লী-মজনু (১২৭১)/মোহাম্মদ খাতের।
১৫. গোলে হরমুজ (১২৮২)/ ঐ।
১৬. মালেকা-জোহরা বিবি (১২৯৮)/গোলাম মওলা।
১৭. সুলতান জমজমা(১২৮৭)/ ঐ।
১৮. সুলতান জমজমা (?)/ মোহাম্মদ খাতের।
১৯. সিকান্দার নামায়ে বাহারী (তরজমা) /
ডাক্তার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক।
২০. চোদ্দ উজীর (১২৮৭)/ মুহাম্মদ রবীউল্লাহ্।
২১. গেন্দ গোল হররোজ (১২৮৪)/ মোহাম্মদ তাহের।
(এটি বিশাল কাহিনী কাব্য)।
২২. ইন্শায়ে এমরান-চন্দ্রভান (১২৮৭)/ মুন্শী মোহাম্মদ।
২৩. শাম নুরীমান (১২৯০)/ ঐ।
২৪. মালতী কুসুম মালা (১৩০২)/ ঐ।
২৫. লায়লী-মজনু ()/ মুন্শী মোহাম্মদ।
২৬. লায়লী-মজনু (১২৮৭)/ আবদুল ওহাব।
২৭. পরীবানু শাহ্জাদী ও জামান শাহাজাদার কেচ্ছা (১২৮৮)/
আয়েজ উদ্দীন।
২৮. গোল আন্দাম (১২৮৮)/ঐ।
২৯. সেকেন্দারনামা (১২৯২)/ আয়েজ উদ্দীন।
৩০. কেচ্ছা দেল পছন্দ (১২৯৯)/ঐ।
৩১. মালঞ্চকন্যা (১৩০৮)/ঐ।
৩২. আল্মাছ ও গোল রায়হান (১৩০১) /মোহাম্মদ মনোয়ার আলী।
৩৩. সুরত জামাল (১৩১৬)/ খায়রুল্লা।
৩৪. জোবেদা খাতুন (১২৯২)/ মোহাম্মদ জনাব আলী।
৩৫. দেল রওশন (১২৯৫)/ গরীবুল্লাহ।
(ঢাকা)।
৩৬. দেলারাম (হিন্দী থেকে তরজমা/ ঐ।
৩৭. পবনকুমারীর পুথি (১২৯৫)/গোলাম ইছমাইল।
৩৮. সোমর্তভানের পুথি (১২৯৬)/ হাবিলুদ্দীন।
৩৯. নুরুল বাহার (১২৯৭)/ আবদুশ শুকুর।
৪০. গুলে বকাওলি (১৩০০)/ ঐ।
৪১. গুলশানে নওবাহার (১৩০৪)/ ঐ।

www.pathagar.com

খ. বীর-রসাত্মক কাব্য

খ.১. হজরৎ আলী- (ক.)র বীরত্ব কেন্দ্রিক রচনা

১. ক. ছিলছত্র রাজার জঙ্গ (১২৪৬)/ বাতাসু সরকার।
খ. ভানুমতি বিবির লড়াই (১৩০১)/ আলিম উদ্দীন গাইন।
গ. হনুফা বিবির লড়াই (?)/?
ঘ. ইমাম চুরি (১২৫০/বক্তার খাঁ।
ঙ. হজরৎ আলী ও বীর হনুমানের লড়াই (?)/?
চ. জোলমাত নামা (?)/?
ছ. জঙ্গে হায়দর (?)/ মুনশী কোবাদ আলী।
জ. জঙ্গে রছুল ও জঙ্গে আলী/?
ঝ. জঙ্গনামা (?)/?
ঞ. হজরৎ আলী ও রামচন্দ্রের লড়াই (?)/?

গ. হাছান -হুছাইনের শাহাদত বা কারবালার যুদ্ধ বিষয়ক কাব্য—

গ.১. শহীদে কারবালা (১২৮৭)/ মুন্‌শী আবদুল ওহাব ও ছাদ আলী।
২. শহীদে কারবালা (১৩০৭)/মুহম্মদ মুন্‌শী।
৩. শহীদে কারবালা (১২৯২)/ মুন্‌শী জনাব আলী।
৪. কারবালার লড়াইয়ের পুথি (২)/?
৫. কারবালা মাতমে হোসেনের পুথি/?/?
৬. শাহাদতে কারবালার পুথি (?)/?
৭. এমাম হোছেন ও এজিদের লড়াইয়ের পুথি (?)/?

ঘ. হানিফার লড়াই বিষয়ক কাব্য

৩.১. মলি-কা আকাবের পুথি (১২৭২)/ আমির উদ্দীন আহমদ।
২. জৈগুণের পুথি (১২০৪)/সৈয়দ হামজা।
৩. হানিফা ও কয়রা পরী (?)/?
৪. সোমর্তভানের পুথি (১২৯৬)/ হাবিলুদ্দীন আহমদ।
৫. সোনাভানের পুথি (?)/মুন্‌শী গরীবুল্লাহ্।
৬. সোনাভানের পুথি (?)/সৈয়দ হামজা।
৭. হানিফার জঙ্গ (?)/কুতুবুদ্দীন খাঁ।
৮. জঙ্গে ছোহ্‌রাব (?)/ মোহাম্মদ খাতের।
৯. বদিউজ্জমার লড়াই (?)/ মুনশী মোহাম্মদ।

www.pathagar.com

৪. মহাকাব্য

৪.১. সাহানামা (১২৮২)/ মোহাম্মদ খাতের।
২. দাস্তানে আমীর হামজা (১ম অংশ) /?/ বেলায়েত হোসেন।
৩.দাস্তানে আমীর হামজা (১২৯৮)/আবদুল মজিদ ভূঁইয়া।
(৩য় ও ৪র্থ দফ্‌তর)
৪. দাস্তানে আমীর হামজা (১১৯৯-১২০১)/ ছৈয়দ হামজা।
(শেষার্ধ)
৫. আলেফ লায়লা (১২৯৩?)/রওশন আলী।

৫. ইতিহাস

৫. ক. আরব জাহানে মুছলিম-অভিযানের বিজয়-ইতিহাস

ক.১. ফুতুহুশ্বাম (সিরিয়া বিজয়)/ মওলানা আব্বাস আলী।
২. ফুতুহুশ্বাম (১৮৮২?-১২৮৫)/ আজিম উদ্দীন।
৩. ফুতুহুল মিছর (মিশর বিজয়)/ আব্বাস আলী।
৪. ফুতুহুল মিছর (মিশর বিজয়/ আবুল হাছান।
৫. মজমুয়া ফুতুহুশ্বাম (?)/ জনাব আলী।
৬. ফুতুহুল ইরাক (ইরাক বিজয়)/ আব্বাস আলী।
৭. জঙ্গে খায়বর (১২৮৫)/দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী।

খ. বাঙালায় মুছলিম-অভিযানের বিজয়-ইতিহাস

খ. ১. বোন বিবির জহুরা নামা (১২৮৭)/ মোহাম্মদ খাতের।
২. বোন বিবির পুথি (?)/ কামালুদ্দিন।
৩. গাজী-কালু-চম্পাবর্তী (?) আবদুর রহীম।
৪. কালু-গাজী-চম্পাবতী (১২৮৫)। খোন্দকার আহ্‌মদ আলী।

গ. সমসাময়িক সামাজিক ঘটনার ইতিহাস

গ. ১. বারো শ' আশি সালের দুর্ভিক্ষের পুথি/ মুন্‌শী আবদুর রহীম।
২. তের শতের দুর্ভিক্ষের বিবরণ /ঐ।

৬. চিকিৎসা-বিষয়ক রচনা

৬. ক. পীরালী চিকিৎসা বা দোয়া-তাবিজের কেতাব।

ক. ১. নক্‌শে ছোলেমানি (৪খণ্ড) / জনাব আলী।
(যথাক্রমে ১২৬৮, '৬৯ ও '৭০-এ লিখিত)

খ. জ্বর ও অন্যান্য বিষয়ক রচনা

খ. ১. ত্র্যাহিক জ্বরের পুথি (?) /মুহম্মদ আবদুর রহীম।

www.pathagar.com

২. হায়জানামা (১২৯২)/
(ওলাওঠা-সংক্রান্ত)।
৩. এলাজে মজনুন (?) / মোহাম্মদ ইব্রাহীম।
(উন্মাদ রোগ-চিকিৎসা)।
৪. এলাজে বাঙালা (২খণ্ড) (১২৯৫)/ ডাক্তার মোঃ মোজাম্মেল হক।

গ. পশু-চিকিৎসা

গ. ১. এলাজে গাও (?) / ডাক্তার মোহাম্মেদ মোজাম্মেল হক।
৫. চিকিৎসা-রত্নাবলী(১২৯৫?) / ফয়জুদ্দীন।

৭. বিবিধ

৭. ১. কাজিনামা (১৮৮৫)/আজিম উদ্দীন।
২ নক্‌নিয়তে বাঙ্গালা (?)/ মো. আবদুর রহীম।
৩ ক খ-এর মানি (?)/ঐ।
৪. খোনার রচন (?)/ ঐ।
৫. আফিংখোরী কি ঝকমারি/ঐ।
৬. সতীনে-সতীনে দ্বন্দ্ব ..../ঐ।
৭. জুলমতকারের পুথি (?)/ঐ।
৮. রংবাহার (?)/আবদুল মজিদ ভূঁইয়া।
৯. দেল বোবা টারচামান (?) /ঐ।
১০. চোর-চক্রবর্তী (১২৮৪)/গোলাম মওলা।
(প্রহসন)
১১. নারী -পুরুষের দ্বন্দ্ব (?)/ মুহাম্মদ আবদুর রহীম।
১২. বিধবার বিরহ-বৃত্তান্ত (?)/ ঐ।
১৩. চৌত্রিশ অক্ষরের ফজিলত (১৩০০)/ রছুল মোহাম্মদ।
১৪. সোনাই যাত্রার পুথি (১২৮৬)/ নাজের মোহাম্মদ।
(গোলাম মওলা কর্তৃক সংশোধিত)
১৫. হদ্দ মজার শ্বশুর বাড়ী (১৩১৭)/ মুন্‌শী মোহাম্মদ।
১৬. দিনকানা শ্বশুর (১৩১১)/ আয়েজুদ্দীন।
১৭. দেশের শোভা (১৮৯১) / আজিম উদ্দীন।
১৮. ফাজায়েলে হারামাইন (১২৮৩)/ শাহ্‌ আবদুল করীম।
(মক্কা ও মদীনার মহিমা বিষয়ক রচনা)
১৯. সায়রুল মাহ্‌জুন (?)/ পীর আবদুল কাদির।

www.pathagar.com

(দুঃখিতের আনন্দ)

২৩. দেওয়ানা আবদুর রহীম (?)/ মুন্‌শী আবদুর রহীম।

২১. সায়েরে রূহ্ (?)/ পীর আবদুল কাদির।

২২. এছয়ারুল খাবনামা (১২৮২)/ মোহাম্মদ খাতের।

২৩. খাবনামা (১৩০৮)/ গোলাম মওলা।

এবার বটতলার মুছলিম কবিদের কাব্য-রচনার গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণে, উপরে লিখিত **সাতটি শ্রেণীর একত্রিশটি উপ-বিভাগে বিভক্ত** বই-কেতাবের মধ্যে 'ধর্মীয় কাব্য', 'পীর-দরবেশদের জীবনী মূলক কাব্য', 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্য', 'বীররসাত্মক জঙ্গনামা শ্রেণীর কাব্য' ও 'ইতিহাস-বিষয়ক কাব্য'—এই পাঁচ রকম রচনার ওপর আলোকপাত করা হবে।

১. ধর্মীয় কাব্য

ধর্মীয় কাব্য-রচনায় বটতলার মুছলিম অবদান—চির-উজ্জ্বল। অথচ সেই দিকটির ওপর তেমন কোন আলোকপাত করা হয়নি। মুছলিম কবি-মুছান্নেফরা সেদিন রাজ্যহারা, ক্ষমতাহারা হ'লেও ধর্মহারা এবং নিজেদের ঐতিহ্যিক শিক্ষা-সাহিত্য হারা হননি। বিপথে, অপথে, কুপথে পা বাড়াননি। রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ বিদেশীর চোখে তাঁদের বিচার ক'রে লিখেছেন—"মুছলমানদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোক-ই ইংরেজী স্কুলে পড়াশুনা ক'রতে ইচ্ছুক। তাঁরা স্যাক্সন জাতীয় লোকদের (অর্থাৎ বিজয়ী ইংরেজদের) অনুকরণ করাও পছন্দ ক'রে না। তাহ'লেও **তাদের বেশ বুদ্ধি আছে এবং তারা প্রাচ্য দেশীয় বিষয়সমূহ অধ্যয়ন ক'রতে ভালবাসে। তাদের যে মানসিক মৃত্যু হ'য়েছে তা নয়,** তারা স্বপ্নগ্রস্ত মাত্র।" লঙ্ কোন্-অর্থে তখনকার মুছলমানদের "স্বপ্ন গ্রস্ত' ব'লেছেন, তা তিনি-ই জানেন। তবে, এর অর্থ যদি রাজ্য ফিরে পাওয়ার স্বপ্নগ্রস্ততা হয়; তবে সেই স্বপ্ন তখন মুছলমানদের নিকট অবাস্তব ছিল না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিপ-ব তার-ই নজীর।

যদিও সে-সময় মুছলমানদের স্বপ্ন সফল হয়নি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিপ-ব দিল-ীর পতন রোধ ক'রতে পারেনি। তথাপি তাদের সে-চেষ্টা সফল হ'লে, বাঙালার পুথি-কেতাব রচয়িতাসহ আম-মুছলমানের রাজ্য ফিরে পাওয়ার খোয়াব অবশ্যই সফল হ'ত। কিন্তু তা হ'তে পারেনি—মুর্শিদাবাদের মতই দিল-ীর হিন্দুদের-ই বেইমানীতে, বিশ্বাসঘাতকতায়। জনাব মুর্তজার 'চেপে রাখা ইতিহাসে' তার করুণ বয়ান আছে।

www.pathagar.com

যাহোক, এ-সময়ের মুছলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সাহিত্য রচনা, প্রকাশ ও পঠন-পাঠনের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়—তা সত্য। সে-বিষয়ে ড. স্পেঞ্জার-এর যে-মত জেমস্ লঙ্ পাদটীকায় উল্লেখ ক'রেছেন—তাতে বলা হ'য়েছে—"শত শত বছর যাবৎ মুছলমানেরা তাদের ধর্ম-সম্পর্কিত মূল ধারণা সম্পূর্ণ বিস্মৃত থাকার পর, এখন তারা আবার তাদের পবিত্র গ্রন্থ—সকলের নিকট বোধগম্য করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এর ফলে, বাইবেলের অনুবাদ ও চর্চার দরুণ ইউরোপে যে-ফলোদয় হ'য়েছিল, এখানে তারাও অবশ্যই তদনুরূপ ফল লাভ ক'রবে।..... **সাম্প্রতিক কালে শুধু স্ত্রীলোকদের জন্যই লিখিত বহু গল্প ও ধর্মীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হ'য়েছে।** এখানে যে, **নতুন সাহিত্যের সূচনা হ'য়েছে**—যদিও তার শিল্পমূল্য খুব বেশী নয়, তাহ'লেও তা ইউরোপে মুদ্রণের প্রথম যুগের মতই দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। **এর ঝোঁক র'য়েছে প্রাচ্য এবং মুছলমানিত্বের দিকে। কিন্তু তার-ই মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।**"...

ড. স্পেঞ্জারের এই বক্তব্যের প্রথম কথা সত্য নয়। মুছলমানরা শত শত বছর তাদের ধর্ম সম্পর্কীয় মূল ধারণা বিস্মৃত ছিল, এ-উক্তি অনৈতিহাসিক এবং ভুল। তবে স্পেঞ্জারের পরবর্তী বক্তব্য ঠিক। ঐ সময় মুদ্রণযন্ত্রের সহায়তায় মুছলিম সাহিত্যের বা ইছলামী পুথি-কেতাবের যে বিশাল বিস্ফোরণ ঘ'টেছিল এবং দু'শ বছর যাবৎ তা সারা বাঙালার শহরে-বন্দরে, গাঁয়ে-গঞ্জে, ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে প'ড়েছিল, তা বেশক বলা যয়। তাই ড. সুকুমার সেন হিন্দু সমাজ সম্পর্কে যা লিখেছেন; মুছলমান সমাজ সম্পর্কেও তা সত্য। তিনি লিখেছেন—"আজ একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই (বটতলার) ছাপা পড়িয়াই আমাদের প্রপিতামহী-পিতামহীরা ইস্কুল-কলেজের ধার না ধারিয়াও তাঁহাদের ইংরেজি-পড়া পতিদেবতাদের তুলনায় সত্য করিয়া শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং এমনি তুচ্ছতা অবজ্ঞতার অন্তরালে থাকিয়াই কৃত্তিবাস-কাশীরাম-মুকুন্দরামের কাব্য, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণমঙ্গল-রাধিকামঙ্গল, নারদ-সংবাদ, প্রহ্লাদ-চরিত্র, নরোত্তম-বিলাস, ভক্তমাল, গীতচিন্তামণি, পদকল্প-লতিকা, পৌর ও জনপদ-জনসাধারণের চিত্ত সরস ও উন্নত করিয়া আসিয়াছে। অথচ তখন দেশের গণ্যমান্যরা, ইংরেজী শিক্ষাভিমানীরা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে বাংলা সাহিত্যের কোন ধার-ই ধারিতেন না।" একথা সত্য। আরও সত্য এই যে, **মুছলিম কবিরা নারীশিক্ষার ধারা অটুট ও শক্তিশালী রাখতে**, শিক্ষিত মুছলিম নারীদের তরফে, স্পেঞ্জারের ভাষায়—**"বহু গল্প ও ধর্মীয় গ্রন্থ" প্রকাশ করেন।**

বস্তুতঃ সে-কালে হিন্দু সমাজে কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে পদকল্প-লতিকা মাত্র

www.pathagar.com

নয়—'বিদ্যাসুন্দর' থেকে 'বেশ্যা গাইড' পর্যন্ত বইপত্র হিন্দু সমাজের অন্দর মহলে ঠাঁই ক'রে নিয়েছিল; **মুছলমান-সমাজে তার বিপরীতে ঠাঁই ক'রে নিয়েছিল—** বাঙালায় তরজমা করা আমপারা, চল্লিশ হাদীছ, কাছাছোল-আম্বিয়া, তাজকেরাতুল আউলিয়া, রছুল বিজয়, হালাতুন্নবী, জঙ্গে রছুল, জঙ্গে আলী, তাজকিরাতুল আউলিয়া, শহীদে কারবালা, দাস্তানে আমীর হাম্‌জা, জঙ্গে খয়বর, হেদায়েতুল ইছলাম, মেছবাহুল ইছলাম, নছিহৎনামা, জায়রুখ ফাছেকিন (পাপীদের ভর্ৎসনা), হিদায়েতুল মুত্তাকিন (খোদাভীরুদের পথ), বিদারুল গাফেলিন ওগয়রহ! ওগয়রহ! এসব বই সে-কালে (১৮,১৯ ও ২০ শতকের প্রথম ভাগ অবধি) মুছলমান সমাজকে ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও সামাজিকতায় বলীয়ান ক'রে রেখেছিল। **মুছলমানদের এই কালচারাল ভিত্তি অটুট এবং শক্তিশালী ছিল ব'লেই তাঁরা—রোমক অধিকারের পর গ্রীকদের মত একেবারে বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়নি এবং পরাজয়ের ১৪৮ বছর পর (১৭৫৭-১৯০৫) মাত্র চলি-শ বছরের মধ্যে** (১৯০৬-১৯৪৭) রাজনৈতিক উত্থান ঘটাতে পেরেছিল। 'স্বপ্নগ্রস্ত'রা স্বপ্ন সফল ক'রতে পেরেছিল। **অতএব, ড. স্পেঞ্জার-কথিত মুছলমানদের প্রাচ্যবাদ ও মুছলমানিত্ব বটতলার সাহিত্যের মাধ্যমে গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে প'ড়ে কোন ক্ষতি করেনি; বরং তাঁদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উজ্জীবন-ই ঘ'টিয়েছিল**। এর তুলনীয় তাৎপর্য পরে তুলে ধরা হবে।

২. পীর-দরবেশদের মহিমা-জ্ঞাপক জীবনী-কাব্য

পীর-দরবেশদের জীবনী-কাব্য বা পীর-মাহাত্ম্যমূলক পুথি-কেতাবেও এক-ধরনের **প্রগতিশীল ইতিহাস-চেতনা এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষার প্রয়াস** নজর করা যায়।

মুছলমানদের যেহেতু পুরাণ নেই; ইতিহাস আছে; পীর-দরবেশদের অলৌকিকতা আছে; আর আছে কেচ্ছা-কাহিনী-কিংবদন্তী—সেজন্য সে-সবের নানা রকম মিশেলে গ'ড়ে উঠেছে—পীর-মাহাত্ম্য গাঁথা। যার অনেকটাই সত্য। অন্ততঃ পুরোটাই মিথ্যে নয়। এরকম পীর-মহিমা-জ্ঞাপক কেতাবের তালিকায় যে-সব পুথির নাম-উলে-খ করা যায়—সেগুলো হ'ল—'শেখ ফরীদ-এর পুথি', 'নিজাম ডাকাত'-এর পুথি, 'পীর গোরাচাঁদ', 'শাহ্ মাঁদার', 'বায়েজিদ বোস্তামি', 'মনছুর হাল-াজ', 'ইছমাইল গাজীর পুথি', 'মানিক পীরের পুথি', 'সত্যপীরের পুথি' ইত্যাদি।

এ-শ্রেণীর পুথির মধ্যে 'মানিক পীরের পুথি'র পরিচয় দিতে ড. সুকুমার সেন

www.pathagar.com

লিখেছেন—" মানিক-পীরের উদ্দেশ্যে মাথা নত ক'রে কবি ব'লছেন যে, ব্যাধিগণ সৃষ্টি ক'রে আল-া মুশ্‌কিলে প'ড়লেন, তাদের বাগ মানায় কে। ইলাহি জিবরাইলকে ব'ললেন, মক্কায় যত পীর-পয়গম্বর আছেন তাঁদের ডেকে আন। আল-ার হুজুরে এসে "আউল্যাগণে কহে বাত, ছাতি পরে দিয়া হাত, তলব করহ কার তরে"। ইলাহি ব'ললেন, "শুন সভে এই মত ব্যাধিগণে লেহ উঠাইয়া"। তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা অনুভব ক'রে হেঁটমাথা হ'য়ে রইলেন। তখন—

"বাতুনে মানিক ছিল এলাহি মাঙ্গায়া নিল
ব্যাধি সুপিয়া দিল তারে।
ব্যাধিগণ লয়্যা যত তাহা বা কহিব কত
যান দেওান দুনিয়ার উপরে।"

তাঁর সঙ্গী হ'ল হজরৎ আলী। মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হ'য়ে —

"মানিক বলেন শুন হজরত আলী ভাই—
জাহির খাতিরে কহ কোনখানে যাই।
হজরৎ আলী বলে যদি পুছিলে আমারে
আগে গিয়া মুরসিদ হও মক্কা শহরে।

মুরসিদ হইলে ভাই মানবে দিবে ক্ষীর
যেখানে সেখানে শেষে করিব জাহির।"

এই পরামর্শ মানিক গ্রহণ ক'রলেন—

"ভাল ভাল বলিয়া মানিক দিল সায়
কালিয়া দিস্তার পীর বান্ধিল মাথায়।
নির্ঘৃণ ফকীর মর্দ ছিঁড়া কাঁথা গায়
ঘন ঘন মাছিগুলা উড়ে হাতে পায়।
আর্বল আসা হাথে নিল উঠাইয়া
দম দম মাদার ব'লে যায় নেকলিয়া।"

মক্কায় পৌছবার আগেই নামাজের বেলা হ'ল। জঙ্গলের পাশে নদীর ধারে একান্তে গুধ্‌ড়ি, আসা-বাড়ি ও সোনার খড়ম রেখে দু'জনে ব'সলেন নামাজে। সেই সময়ে দুখিয়া ও তার মা এসেছে জঙ্গলে গোরু চরাতে। দূর থেকে মানিক, আলীকে নদীর কিনারে নামাজ প'ড়তে দেখে দুখের কৌতূহল হ'ল। মাকে ব'ললে, "কেমন ক'রে নমাজ পড়ে দেখ্যা আসি আমি"। একটু এগিয়ে যেতেই সোনার খড়ম নজরে প'ড়ল।

www.pathagar.com

"সোনার খড়ম দেখ্যা দুখ্যা বড় খোশাল মন
সোনার খড়ম চুরি করিল তখন।
সেই দুটি খড়ম যে বগলদাবা কিয়া
মামাজীর হুজুরে খপর কয় গিয়া।"

মা দেখে ভর্ৎসনা ক'রলে, "ফকীরের খড়ম তুঞি কেন নিঞা আলি"?

"এই খপর শুনে যদি ফকীর দেওান
চোর-দায়ে ধ'রে লয়্যা মারিবে গর্দান।"

দুখে ব'ললে, "চুরি ক'রে লয়েচি ফকীর জানে নাই"। মা নিরুত্তর হ'ল। দুখে বাজারে গেল—খড়ম বেঁচতে। বেনে, ফকীরের সোনার খড়ম কিনতে ভীত হ'ল, অমনি-ই দুখেরে কিছু টাকা দিয়ে ব'ললে—

"শহর ভিতরে বাবা কেন দুর্খ পাও
এই টাকা ভাঙ্গাইয়া ঘরে গিয়া খাও।
কাঙ্গাল বান্যা আমি শুন মোর ঠাঞি
সুবর্ণের খড়মে আমার কাজ নাই।"

সেই টাকায় হাট-বাজার ক'রে ঘরে এসে—

"দুখ্যা বলে মা মাজী শুন গো জননী
নাড়িয়া ফকীরের খড়ম জোউরার ধনি।
এ দুটী খড়ম নিঞ্যে যেইখানে যাই
খড়ম দেখালে কিছু টাকা-কৌড়ি পাই।
টাকা-কড়ি-দেই সভে শুন মোর ঠাঞি
ফকীরের খড়ম, মাগো কেহ লেই নাঞি।
দুখ্যার মা বলে তোমার ভাগ্যের নাঞি ওর
ফকীর মহাম্মদ বলে নছীবের জোর ॥"

মাতা-পুত্রের ভোজন সমাধা হ'ল। পুত্র নতুন কেনা পালঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম ক'রছে; এমন সময় মানিক পীর এলেন, খড়মের সন্ধানসূত্র ধরে। ফকীরের জিগীর শুনে—

দুখের মা বেরিয়ে এসে ব'ললে,—"আকে কড়া ঘরে নাই ভিক্ষা দিব কি"। ফকীর ব'ললেন,—'ভিক্ষার জন্যে আসি নি। "এমন মেগ্যা-খেকো যে ফকীর মোরা নই"। তোর বেটা দুখেরে ডেকে দে'। দুখের মা উত্তর দিলে,—"সাত রোজ বেটা

www.pathagar.com

মোর ঘরে আইসে নাঞি" । ফকীর ব'ললেন,—'তোর বেটা তো ঘরে শুয়ে র'য়েছে' । দুখের মা দমবার নয়, ব'ললে,—'আমার বেটা ঘরে আছে জানলে কিসে? তোমরা ফকীর নও, "দিনে দেও কাঁথা গায়ে রাতে হও চোর" ।'

"পাড়াপড়শীর কিরে করি তোমার তরে
তোমার মাথার কিরে বেটা নাঞি ঘরে ।
খুবি চাও উঠে যাও দরজা ছাড়িয়া
বসিয়া রহিলে কেন কিসের লাগিয়া ।"

মানিক ধমক দিলেন,—'আমার সঙ্গে কপট চাতুরি ক'রছ' । কাঁদতে কাঁদতে এসে দুখের মা ছেলেকে অনুযোগ ক'রে ব'ললে—

"তখনি করিলাম মানা শুন মোর ঠাঞি
ফকীরের খড়ম আনিলে ভাল হবে নাঞি ।
কাহে-কো আন্যাচ খড়ম ঝকমারি কিয়া
এসেছে ফকীর তুমি জবাব দেও গিয়া ।"

দুখে বাইরে এসে ফকীরকে ব'ললে,—'মেয়েছেলেকে পেয়ে জঞ্জাল ক'রছ কেন? আমি সাত দিন পরে এইমাত্র ঘরে ফিরলুম, তুমি কেন বিরক্ত ক'রতে এসেছ ।' ফকীর ব'ললেন,—চালাকি রাখ, "সোনার খড়ম কাঁহা নিকলিয়া আন্" । দুখে ব'ললে, 'ভাঁড়াব না, তোমার খড়ম এনেছি' । তারপর সে ফকীরকে নিজের দুঃখের কথা শোনাতে লাগল । তার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে যে, 'কাঙাল দেখে তার সঙ্গে কেউ বেটির বিয়ে দেয় না । তার মনের সাধ, খড়ম বেচে বিয়ে ক'রব ।' মানিকপীর মনে মনে হেসে ব'ললেন, 'বীরসিংহ রাজার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেব, আমার খড়ম্ এনে দে ।' দুখে ব'ললে—

"বাগ্দির ছেল্যা আমি শুন শাহাজী
রাজকন্যা কাঙ্গাল দুখ্যার কাজ কি ।
বাগ্দির মায়্যা এ পৃথিবীতে আছে
করিব তাহারে বিভা যাব তার কাছে ।
বাগ্দির মায়্যা বিভা করি মাছেভাতে খাব
রাজকন্যা বিভা করি পরান হারাব ।"

ফকীর বিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন,—'যা খুশি কর্, ভাল চাস্ তো আমার খড়ম্ এনে দে' । দুখে উত্তর ক'রলে, —'কে তোমার খড়ম্ নিয়েছে?'

"পরিহাস্য করেছিনু শুন শাহাজী
সাহেবের খড়মে আমার কাজ কি ।"

www.pathagar.com

মানিক বেনের কাছে টাকা নেওয়ার কথা ফাঁস ক'রলেন। তখন দুখে তাঁর পা জড়িয়ে ধ'রলে, ব'ললে—

"যদ্যপি করিব বিভা কি বলিব আমি
জমিন উপরে থুক ফেল্যা দেহ তুমি।
তোমার মুখের ছেপ নাহি শুখাইবে
আমার সমন্দ করি এখনি আসিবে।"

তিন সত্য ক'রে পীর চললেন ব্রাহ্মণের বেশ ধ'রে—

"গলায় পৈতে দিল কপালেতে ফোটা
হাথে নিল পাঁজিপুথি মাথাভরা জটা।"

রাজার সভায় উপস্থিত হ'লে সকলে সম্ভ্রমে প্রণাম ক'রলে। ব্রাহ্মণ রাজার পাদবন্দনা গ্রহণ ক'রলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলে মানিক ব'ললেন,—'তোমার ঘরে বার বছরের মেয়ে আছে আইবুড়ো'—

"যুগ্য কন্যা তোর ঘরে বাত শুনে নে
তোকে ছোঁএ্য, পাজি রাজা জল খায় কে।"

পীর তখনি রাজকন্যার সম্বন্ধ-প্রস্তাব ক'রলেন,—

"গঙ্গা-রাজা একজন শুন মন দিয়া
আস্যাচে তাহার বেটা শিকার লাগিয়া।
দুর্গতনন্দন তার নাম শুন মোর ঠাঞি
অমন কুলীন রাজা আর পাবে নাঞি।"

রাজা ব্যগ্র হ'ল, এমন উপযুক্ত পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান ক'রতে। ঘটক ঠাকুর ব'ললেন, কুলীনের হাতে মেয়ে দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার—

"সেই বাড়ি আসিবে সেই শুন ফরমান
না কর বিলম্ব তারে কন্যা দিবে দান।
যদি কিছু বিলম্ব হয় কি কহিব আর
ঘরে তার মা বাপ পাইবে সমাচার।
তারা যদি খপর পায় শুন মোর ঠাঞি
তবে আর তোমার বেটির বিভা হবে নাঞি।"

কন্যা দেবার জন্যে রাজাকে তিন-সত্য করিয়ে নিয়ে মানিক দুখের কাছে ফিরে এলেন ফকীর-বেশ নিয়ে। আর ব'ললেন, "তোমার সমন্দ করয়া আনু রাজার

www.pathagar.com

দরবারে"। ফকীর এই গেল—এই এল দেখে—

"দুখ্যা কয় ভাল নয় নাড়িয়া ফকীর
পথ হৈতে ফিরে আইলে করিয়া ফিকির।
কে জানে কাহার বাড়ী ছিলে লুকাইয়া
ঝুট-মুট কহ—আইলে সমন্দ করিয়া।
সমন্দ কর্যাছ কোন্ রাজার দরবারে
কেমন রাজার কন্যা দেখাবে আমারে।"

মানিক ব'ললেন, "বেহা না হইলে আগে কন্যা দেখায় কে"। পাঁচ দিনের মধ্যে তার বিয়ে হবে শুনে—

"দুখ্যা বলে শাহাজী শুন মোর ঠাঞি
বাগ্দির বেহা তুমি কিছু জান নাঞি।
পাড়া পড়ুশির বাড়ী বুঝিবারে যায়
হ'লদি-তেল মাখ্যে আর খীর-পিঠা খায়।
আমি যদি করিব বিভা মন দিয়া শুন
হ'লদি-তেল খীর-পিঠ্যা মাঙ্গাইয়া আন।"

মানিক ব'ললেন,—'তুই আমার মাথা খেলি, "হলদি-তেল খীর-পিঠা বলে পাব কোথা"।' দুখে উত্তর ক'রলে—"তোমার মাথা খাইলে আমার বিভা হবে নাঞি"। মানিক ঠেকেছেন খড়মের দায়ে। করেন কি—"আছমানের চারি শৈলি" ডাকিয়ে এনে তাদের দিয়ে সব জোগাড় করালেন। তেল-হলুদ মেখে পেট ভ'রে খীরপিঠে খেয়ে দুখের খেয়াল হ'ল, "ধোব দাঁত কেমনে দেখাব রাজার দুয়ারে"। পীরকে ব'ললে,— "দাঁত-রাঙ্গার পাতা কোথা মাঙ্গাইয়া আন"। মানিক তাই ক'রলেন। তার পর দুখে ব'ললে,—'দাঁত রাঙা হ'ল কিনা বুঝব কিসে'। মানিক ব'ললেন—'থালায় জল ঢেলে মুখ দেখ'।

"শুনিয়া দুখিয়া মরদ কোন্ কাম কৈল
থালের উপরে পানি উঠাইয়া নিল।
আপনার দাঁত রাঙ্গা দেখে সেইখানে
দাঁত রাঙ্গা দেখি দুখ্যা খোশাল হৈল মনে।"

তখন সে মনে মনে স্বীকার ক'রলে, "নাড়্যা শেখ ভাল মানুষ বটে"। তারপরে মনে প'ড়ল বাজনা-বাদ্যির কথা। অমনি—

"দুখ্যা কহে শাহাজী কহি তোমার ঠাঞি
গুড়গুড় করিয়া যায় তাহা হল্য নাঞি।

www.pathagar.com

শুনিয়া মানিক জিন্দা কোন্ কাম কিয়া
আরসের বাজনা যত নিল মাঙ্গাইয়া।"

তার পর আতশবাজি—

"দুখ্যা বলে শাহাজী শুন মোর ঠাঞি
ফরফর করিয়া উঠে তাহা হল্য নাঞি।"

মানিক আতশবাজি জোগাড় ক'রলেন। তার পরে দুখে বাহানা ধ'রলে,"আঁধারে কেমনে যাব রাজার দরবারে"। মানিক-পীর বনের বাঘ জড় ক'রে তাদের হাতে মশাল দিয়ে বরকে নিয়ে রওনা হ'লেন। রাজবাড়ির একটু তফাতে বরযাত্রীদের থামিয়ে, পীর বামুনের বেশ ধরে গিয়ে রাজাকে ব'ললেন—"বৈরাত বসিবে কোথা দেহ দেখাইয়া"।

"শুনিয়া বীরসিংহ রাজা কোন কাম করে
আগাইয়া দেখে গিয়া ময়দান উপরে।
নেহাল করিয়া দেখেন বনের বাঘওান
দেখিয়া বীরসিংহ রাজার উড়িল পরাণ।
বীরসিংহ কহে কথা শুন ঠাকুরজী
জামাই আর তুমি আসিবে লোকে কাজ কী।"

মানিকও তাই চান। তিনি বনের বাঘদের সেইখান থেকেই বিদায় দিয়ে দুখেকে নিয়ে বিবাহসভায় এলেন। রাজা সোনার বিছানা দেখিয়ে দিলে জামাইকে। ভয় পেয়ে দুখে ব'সে প'ড়ল মাটিতে। তাই দেখে এক গোলাম অন্তঃপুরে গিয়ে বেগমকে ব'ললে, রাজার জামাই বিছানা ছেড়ে মাটিতে ব'সেছে। দুখের কাণ্ড দেখে পীর নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না, তার গালে ক'সে দুই চড় লাগালেন। দুখে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় উঠে ব'সল। পীরের মাহাত্ম্যে এ-ঘটনা কারো নজরে প'ড়ল না। তারপর জামাইকে ভোজনে বসানো হ'ল। পঞ্চ উপকরণযুক্ত কাঞ্চনের থালা সামনে ক'রে—

"কান্দে দুখিয়া মরদ হৈয়া জার জার
ঝালের ব্যঞ্জন খাইতে নাঞি পারি আর।"

মানিক-পীর বিপদ গুণলেন। না বুঝে গোরুর রাখালকে এনেছি রাজকন্যার বর ক'রে—"বাক্যমন্ত্র রাখাল বেটা পড়িবে কেমনে"। রাজা লোকজনদের ব'ললেন,—'জামাইকে নিয়ে এস. কন্যার হাতের সঙ্গে তার হাত নোতুন কাপড়ে বাঁধ।' পীর দেখলেন সমূহ বিপদ, হাত-বাঁধাবাঁধি হ'লে রাখাল বেটাকে থামান ভার হবে। তিনি রাগ দেখিয়ে ব'ললেন,—"অমন বেবস্তা দেখ আমা সভার নাঞি"।

www.pathagar.com

রাজা শুধোল,—'আপনাদের ব্যবস্থা কি প্রকার?'

"বামুন বলেন বাত শুন রাজাজী
হাস্যা খেল্যা বেহা হবে বাঁদাবাঁদি কি।
আমরা আনন্দে খাব অন্ন বিছানা বসিয়া
মাগু কোলে কর‍্যা বর ঘরে শুবে গিয়া।"

রাজা অন্তরে দুঃখিত হ'ল। জামাইকে ব'ললে, বাছা—

"সুবর্ণের মন্দিরে আমার কন্যা আছে
তোমাদের বেবস্তা মত যাহ তার কাছে।"

দুখে বাসর-ঘরে ঢুকে কন্যার রূপ দেখে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল।

"ইন্দ্রের কামিনী জিনি দেখি তনুবেশ
মুটিতে কাঁকালি লুকায় পিটে ভাঙ্গে কেশ।
বিনোদ-বন্ধন হার গাঁথ্যা দিছে গলে
মাথার মানিক কন্যার ধিকি ধিকি জলে।"

দুখের মনে হ'ল—যেন সাক্ষাৎ মা মঙ্গলচণ্ডী। সে বার বার গড় করে আর বলে—

"মহামাই চণ্ডী ঠাকুরাণী তোমাকে বুঝাই
আজি যদি বাঁচি মাগো কালি ঘরে যাই।
আজি যদি বাঁচি মাগো কালি যাই ঘরে।
অর্বল ছাগল মহিষ বলি দিব তোরে।"

শুনে রাজকন্যা হাসি চাপতে পারে না। ভাবলে, "বুঝিনু খামিদ আমার নিশ্চয় পাগল"। কন্যার হাসি শুনে দুখের ভয় বেড়ে গেল। সে ঘরের চাল থেকে ঘোড়ার ঘাস নিয়ে এক কোণে বিছিয়ে তার উপরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিলে। সকালে রাজকন্যা কেঁদে মায়ের কাছে জামাইয়ের আচরণ বর্ণনা ক'রলে। রাণী রাজাকে ব'ললে—

"কেমন তোমার জামই শুন নৃপবর
ঝিকে নাকি গড় করে হাজার হাজার।"

রাজা রেগে হুকুম দিলে—"ঘটক বামুন কোথা বাঁধে আন গিয়া"। আসতেই রাজা ব'ললে—'জামাই অন্ন না খেয়ে কেঁদেছিল কেন?' বামুন ব'ললেন—'ব্যঞ্জন মুখে দেয় কি ক'রে, "ঝালে-নুনে তোমরা ক'রেছ যবক্ষার", আর কান্নার কথা ব'লছ?'

www.pathagar.com

“বনে বনে হৈল বেহা শুন মোর ঠাঞিঃ
ঘরে তার বাপ-মা খপর পায় নাঞিঃ।
সাতে যে বৈরাত আল শুন মন দিয়া
ফিকির করিয়া তাকে দিলে ভাগাইয়া।
লোক-কুটুম্ব কেহ না পাইল সমাচার
একারণে কাঁদেছিল হইয়া জারজার।”

তখন রাজা ব'ললে,—‘আমার কন্যাকে সে প্রণাম ক'রছিল কেন?’ বামুন ব'ললেন—‘তুমি তো বেশ বল’—

“পরের মনের কতা আমি কেমনে জানি?
আমারে বিদায় দেহ ঈশ্বরের মুখ চায়্যা।
তোমার জামাঞ্যার তবে ডেকে আন যায়্যা।”

মানিক দুখের জবানে ভর ক'রলেন। সুতরাং—

“যেই কথা কওান পীর সেই কথা কয়
রাজার দরবারে আর দুখ্যার নাহি ভয়।”

শ্বশুরের প্রশ্নের উত্তরে দুখে ব'ললে—

“শোবার তরে এমন জায়গা দিয়াছিল মোকে
বেজার হইয়া গড় কর্‌্যাছিলাম তাকে।”

তার পরে সে নিজের ঐশ্বর্য্যের গর্ব ক'রলে। রাজা দেখতে চাইলে। ব'ললে, ‘পাঁচ দিন পরে যেও, দেখতে পাবে।’ রাজা বললে, ‘পাঁচ দিন এখানেই থাক, এক সঙ্গে যাব।’ মানিক দুখের জবান ছেড়ে আপন রূপ ধ'রলেন। দুখে মনে মনে কাঁদতে লাগল, “তালপাতার ঘর সভে ভরসা আমার”। মানিক ব'ললেন, ‘বড়াই ক'রতে গেলে কেন’। দুখে ব'ললে,—‘তুমি-ই তো ঝকমারি ক'রলে; রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। তুমি যদি আমার মান না রাখ, তবে তোমার “সোনার খড়ম দুটি খাইব বেচিয়া”।’ আর শুধু তাই নয়—

“যেখানে লাগালি পব শুনহ ফকীর
মারিয়া লবদা তুড়্যে দিব নাড়া শির।”

মানিক ব'ললেন, ‘এখন এগোই সব ব্যবস্থা ক'রতে’। দুখে ব'ললে,—‘আমাকে ফেলে রেখে পালাবার ফিকির ক'রছ’। মানিক ব'ললেন,—“পালাইয়া যাই যদি দোহাই আল-ার”। পীর গিয়ে দুখের তালপাতার কুড়ের চারদিকে সোনার

www.pathagar.com

বাড়িঘর তুলে দিলেন, শ্বশুর-বাড়ী থেকে ঘর পর্যন্ত সোনার জাঙ্গাল বাঁধিয়ে দিলেন। গ্রামের নাম রাখলেন কাঞ্চন নগর। অলি ব'ললেন,—'ব্যবস্থা তো সব হ'ল, এখন রাজার দলবলের সিপাহি-সামন্তের পরিচর্যা ক'রবে কে?'

"আসিবে রাজার দল শুন হকিকত
কাখে পাঠাইবে তখন করিতে খেজমত।
কে দিবে তামাক-হুকা শুন হে দেওান
কে শয্যা দিবে তাঁকে বসিতে বিছান।"

মানিক ব'ললেন—"উনকোটি ব্যাধি আমার মাঙ্গাইয়া আন"। উনকোটি ব্যাধি এসে মানিক-পীরকে কুর্ণিশ ক'রলে।

"মানিক বলে জরাসুর বাত বলি তোরে
তুমি গিয়া দেহ বার তক্তের উপরে।
ধমকা চমকা তোমরা প্রকার জানি
দুইজন হও গিয়া দুয়ারের দরওানি।
চক্ষুশূল বুকশূল হও কোতওাল
টঙ্কার ঝঙ্কার দুহে পাড়িয়া জঞ্জাল।
পশ্চিমা মউর আর চোরাবাত অর্বল
পেয়াদা সকল হয়্যা ঘেরহ মহল।
উনকোটি ব্যাধি তারা হুকুম পাইয়া
যে যার রহিল গিয়া জায়গা বুঝিয়া।
এই রূপে তামাম পেয়াদার কারবার
বসিয়া রহিল চৌকি সাত দেউড়ীর উপর।
গাঞ্জাপুর করি কেহ সিদ্ধি ঘুটে খায়।
কেহ বা হাসিয়া লুটে পড়ে কার গায়।
মোজে মোজে বসিয়া কেহ ঢোলক বাজায়
কৌতুক রূপেতে কেহ গীতনাট গায়।"

দুখের কুঁড়ে—যার চারদিকে সোনার শহর গ'ড়ে উঠল। সেটি হ'ল পীরের খাস আস্তানা। সেই—"তালপাতার ঘরে পীর সিদ্ধি ঘুটে খায়"।

পাঁচদিন কেটে গেলে রাজা জামাইকে ব'ললেন,—'চল তোমার বাড়ীতে—নয় লাখ কুকুর দেখিগে। জামা-কাপড় প'রে নাও, ঘোড়া-ঘরে গিয়ে ঘোড়া বেছে নাও।' দুখে প'রলে আটপৌরে মোটা কাপড়, বেছে নিলে বুড়ো

ঘোড়া। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া কঠিন ব্যাপার হ'ল। কোন রকমে লেজে লাগাম লাগিয়ে চ'ড়ে ব'সল উল্‌টো মুখে। সিপাইরা তো হেসে খুন। খবর পেয়ে রাজা চাইলেন এ-দৃশ্য দেখতে। অন্তর্যামী পীর বুঝলেন যে, রাজা এ-দৃশ্য দেখলে দুখের মুশ্‌কিল হবে। অমনি—

"লেজের দিখে মুখ হইল মানিকের বরে
মুখেতে লেকাম দেখে রাজা আপন নজরে।"

সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাদ্যভাণ্ড ক'রে রাজা এলেন জামাইয়ের বাড়ীতে। হজরৎ অলি এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা ক'রতে—

"ক্ষেত্রি-কুলেতে কেবল জনম তাহার
নবীন বয়েস যেন ষোড়শ্যা কুঙার।
ললাটে চন্দন চাঁদ পরম উজ্জ্বল
গগন মণ্ডলে যেন শশী টলমল।
খাঁড়া-ধার বাঁশি তার নাসিকার গঠনে
বিজলি ছটকে যেন মুখের দশনে।
কর্ণমূলে বীরবৌলি তাকে ভাল সাজে
রতন নুপূর দুটি চরণেতে বাজে।"

ব্যাধিরা রাজার দলবলের খেদমত ক'রতে লাগল।

"তোয়্যার তরাক হুকা কিয়া মেজমানি
বসিতে বিছান দিল পা ধোউতে পানি।
ভাঙ্গিয়া পানের খিলি সভারে জোগায়
পাঙ্কা হাত্যে করি কেহ বাতাস করে গায়।
অগৌর চন্দন সব পুরি হেম থালে
গলায় পুস্পের মালা চন্দন কপালে।"

আদর-অভ্যর্থনায় পরিতৃপ্ত হ'য়ে রাজা জামাইকে ব'ললে,—'বেহাই কোথা আছেন দেখি চল, তাঁকে গড় ক'রে আসি'। এই কথা শুনে—

"দুখিয়া বলেন শ্বশুর শুন মোর ঠাঞিও
ভাঙ্গি পুস্তি বুড়া মনুষ্যার কাছে গিয়া কাজ নাঞিও।
সুবর্ণের বাড়িঘর না লয় তার মনে
নিরবধি থাকে তালপাতার ভুবনে।"

রাজা নিষেধ শুনলে না। তালপাতার ঘর রাজার আসবার আগেই সুবর্ণমন্দিরে

www.pathagar.com

পরিণত হ'ল। মন্দিরে ঢুকে রাজা দেখে—

"সোনার পইতা গলে দিয়াছেন দেওান
লক্ষ্মী সরস্বতী কাছে সালগেরামের স্থান।
কীর্ত্তন্যা কীর্ত্তন করে ভায়্যাগণ নাচে
তুলসীমঞ্চ জে শিবের মটের কাছে।"

তফাৎ থেকে রাজা কুর্ণিশ ক'রলে। "জীতে রহ" ব'লে পীর আর্শীবাদ ক'রলেন। পরক্ষণেই বেজার হ'য়ে দু-চার ঘুসি মেরে ব'ললেন,—'তুই কে, কি নাম, কোথায় বাড়ী, কেন অন্দরে ঢুকেছিস?' বীরসিংহ ব'ললেন,—'আমি তোমার বেহাই, মার কেন'। তখন পীর খুশি হ'য়ে সকলকে ভোজনে বসালেন।

"জোড় করি দুই কর মানিক জিন্দা করে পস্থান
বিদুরের খুদকুঁড়া করহ ভোজন।"

খাওয়া শেষ হ'লে পান দেওয়া হ'ল। হজরৎ আলী রাজাকে ও তার দলবলকে মানিকের হুকুমে যথাযোগ্য ইনাম দিলেন। রাজাও জামাইকে অর্দ্ধেক পরগণা লিখে দিলে। বিদায়ের পূর্বে—

"মানিক কহেন কথা বেহায়ের সাতে
দুখ্যাকে সঁপিয়া দিল বীরসিংহের হাতে।
আমি দৈবে বুড়া লোক কবে মর্য়ে যাই
তোমার জামাঞ্যার তরে নাম করিহ বেহাই।"

সকলে চ'লে গেলে মানিক দুখেকে ব'ললেন, 'অনেক কষ্ট ক'রে তোর বিয়ে দিলুম বীরসিংহের ঘরে,—

"এখন সোনার খড়ম দুটি আনে দেহ মোরে
তোকে দুয়া কর্য়া যাই হজে মক্কা শহরে।"

দুখে শক্ত লোক, ব'ললে, হায় হায়,—"যে সাদ করেচ মনে সেটি হবার লয়"।—

"সাড়ে তিনটি বেটা আগে হউক মোর ঘরে
সোনার খড়ম তখন দিব সাহেবেরে।"

মানিক হেসে ব'ললেন—

"বাইশ লাখি পরগণার হইল রাজত্ত্বি
তবু নাঞি ছাড় বেটা রাখালিয়া মতি।"

www.pathagar.com

পীর মক্কায় চ'লে গেলেন। পীরের নামে দুখে ভালো রকম শির্নি দিলে—

"খাসি বকিরি দুম্বা হায়ওান খীর
বাইশ মন দুগ্ধ নিঞা করিল হাজির।
খানাপানি খায়্যা সভে চলিল ভবনে
মানিকের গীত যে রহিল এইখানে ।..."

মানিক পীরের গানের শেষ এখানেই।

এরকম আরও পীর-দরবেশের জীবনী মূলক পুথি-কিতাব পাওয়া যায়।

৩. রোমান্টিক কাহিনী বা প্রণয়মূলক কাব্য

বলা দরকার যে, রোমান্টিক কাহিনী বা প্রণয়মূলক কাহিনী কাব্য, মুছলিম কাব্য-চেতনার এক বিশেষ পরিচয় বহন করে। এ-পরিচয়ের সূচনা চোদ্দ শতকের কবি শাহ্ মুহাম্মদ ছগীরের সময় থেকে। সে-যুগে দেব-দেবী-নির্ভর অমুছলিম কাব্যধারার বিপরীতে মানবীয় কাব্য-ধারার সূত্রপাত করেন মুছলিম কবিরাই। এ-ধারায় গোটা মুছলিম আমলের পাঁচ শ' বছর ব্যাপী যে বিশিষ্ট মানবীয় প্রণয়-উপাখ্যানমূলক কাব্য রচিত হ'য়েছিল—তার মধ্যে শাহ্ মুহাম্মদ ছগীরের 'ইউছুফ-জুলায়খা,' দৌলৎ কাজীর 'সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী', আলাওল-এর 'পদ্মাবতী', দৌলৎ উজীর বাহ্রাম খানের 'লায়লী মজনু' প্রভৃতির নাম আজ সুপরিচিতি। বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন', অথবা ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অপেক্ষা এ-সব কাব্য অনেক পরিচ্ছন্ন, মহৎ, রুচিবান এবং অধিকতর কাব্যগুণ-সম্পন্ন।

আঠারো-উনিশ শতকের মুছলিম কবিগণ শাহ্ মুহম্মদ ছগীর, মুহম্মদ কবীর, আলাওল প্রমুখের মানবিক প্রেম-কেন্দ্রিক রোমান্টিক কাহিনী কাব্যের ধারাই নতুন ভাবে জাগিয়ে তোলেন এবং **সমকালীন অমুছলিম কবিদের ভারতচন্দ্রীয় যৌন-সাহিত্যের ধারার বিপরীতে, সুরুচি ও শালীন সাহিত্যের ধারাকেই বেগবান করেন**। আর তাঁরা তা করেন—সমকালীন ভাষা ও সাহিত্য-চেতনায়। কুরুচির বদলে সুরুচির পতাকা উড়িয়ে। একথা একশ' পার্সেন্ট সত্য না হ'লেও নব্বই পার্সেন্ট সত্য; তাতে কোন সন্দেহ নেই। বটতলার পুথি-সাহিত্যের মুছলিম কবিদের এমন সুনীতি-সুরুচির পৃষ্ঠপোষক হওয়ার দু'টি কারণের উলে-খ করা যায়। তার একটা হ'ল—**এই সময়ের মুছলিম সমাজ যথেষ্ট ধর্মপরায়ণ ও শুদ্ধাচারী ছিল। তাঁরা বাবু সমাজের অন্তর্ভুক্ত না থাকায়, ঐ সমাজের কুরুচিপূর্ণ গ-ানিময় জীবনের ছোঁয়া তাঁদের লাগেনি। তাঁরা তখন ধনবানও ছিল না।** জমিদারী,

বাগানবাড়ী, 'পাখীর দল', 'আড্ডা' তাদের দখলে ছিল না। ফলে, তাঁদের পক্ষে বেশ্যা-বাইজীর আর তাঁদের বাবুদের জন্য কোন 'গাইড', 'বিবরণ' লেখার কিংবা 'গুপ্তকথা' লেখার জরুরৎ দেখা দেয়নি। এজন্য "বটতলা"র কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য-রচনার একটা নজীরও মুছলিম কবি মুছান্নেফের মাঝে পাওয়া যায় না। ও-রকম অশ-ীল রচনা তাঁদের লেখা এক জনের একখানা পুথি-কেতবেও মেলে না। অতএব, **"কোলকাতার বটতলাই হোক; অথবা সারা বাঙালার সাহিত্যিক বটতলাই হোক- পর্ণোগ্রাফির সমস্ত দায়ভাগ হিন্দু লেখক-প্রকাশকদের-ই**। অথচ ঐ বিষয়টা এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন দোষটা গোটা পুথি-সাহিত্যিক আর সাহিত্যের-ই। সমগ্রভাবে "বটতলার"-ই। অতএব মুছলমানরাও তা থেকে আলাদা নন।

যাহোক, এসব কাহিনী কাব্য-বিষয়ে আলোচনা ক'রতে আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদম উদ্দীন লিখেছেন—"প্রেমমূলক কাহিনীকাব্যগুলির অধিকাংশের-ই সূত্রপাত প্রেম দ্বারা হইলেও প্রেমমূলক কাহিনীকাব্যগুলি মূলতঃ প্রেমের-ই কাহিনী। নায়ক নায়িকার প্রেমে পড়িবার পর হইতে নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া উভয়ের মিলনে কাহিনী সমপ্ত হয়। ইউছুফ-জুলায়খা, মৃগাবতী-যামিনী ভান, গাজী-কালু-চম্পাবতী প্রভৃতি এই শ্রেণীর পুথি। চলিত সাহিত্যে বিয়োগান্ত কাহিনী খুব-ই কম। লাইলা-মজনুন ও শিরী-ফরহাদ ব্যতীত বিয়োগান্ত কাহিনী নাই বলিলেই চলে। লাইলা-মজনুন-গ্রন্থে পরকালে নায়ক-নায়িকার মিলনের দৃশ্য দেখানো হইয়াছে।"

এ-শ্রেণীর পুথি-কেতাবের সংখ্যা প্রচুর। এগুলোতে শুধু প্রেম বা প্রণয়-চেতনার-ই পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই সাথে ধর্ম-চেতনা, লৌকিকতা ও অলৌকিকতার মিশেল এবং দেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাবও লক্ষণীয়। আলোচ্য শ্রেণীর রচনার মধ্যে আঠারো-উনিশ শতকে প্রকাশিত গরীবুল-াহ্র 'ইউছুফ-জোলায়খা,' মুনশী আবদুল গণির 'শিরী-ফরহাদ' এবং 'লায়লী-মজনু' বিশেষ মশহুর। এর পরেই উলে-খ ক'রতে হয়—গরীবুল-াহ্র 'ছয়ফল মুল-ুক ও বদিওজ্জামাল', 'কেচ্ছা আলেফ লায়লা', 'জৈগুনের পুথি', 'চাহার দরবেশ' ইত্যাদির।

এবার এগুলোর মধ্যে 'ইউছুফ-জোলায়খা' কাহিনীর মোখ্তছর পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে। তার আগে বলা দরকার যে, 'ইউছুফ–জোলায়খা'র প্রণয়-কাহিনী নিয়ে কাব্য-রচনার ধারা চোদ্দ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ তক চ'লে এসেছে। কাহিনীটি এরূপ—"ইউছুফ-জোলায়খার প্রণয়োপাখ্যানের মূল উপাদান

www.pathagar.com

বাইবেল ও কুরআন শরীফ থেকে সংগৃহীত। কোরআন-কাহিনীর কাঠামোয় ধীরে ধীরে রক্তমাংস জুড়ে এই উপাখ্যান পরিণত ও পৃথক হ'য়ে ওঠে। সব চরিত্রের-ই নামকরণ হয়, নানা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাযুক্ত হ'য়ে এবং মূল প্রণয়কাহিনী মিলনান্ত পরিণতি লাভ করে। বলা আবশ্যক যে, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর পরিবর্তন সাধনে কিংবা ইউছুফ নবীকে নিয়ে কল্পনাশ্রয়ী ঘটনা-বর্ণনায় তুরস্ক-ইরানের কল্পনা-প্রবণ কবি-মন বাধা অনুভব করে নি।

গরীবুল্লাহর 'ইউছুফ জেলেখা' কাব্যের বক্তা বদর পীর, শ্রোতা বড় খাঁ গাজী। আধ্যাত্মিক জীবনের মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি ফোরকান-অবলম্বনে এই প্রণয়কাহিনী রচনা করেন এবং পরিণামে বড় খাঁ গাজী আল-াহ্‌র পথে ফকীর হ'য়ে যেতে চাইলেন। তবে আমরা বুঝতে পারি যে, বদর পীরের জবানীতে কবি যে-কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন, তা কুরআন অবলম্বনে নয়, ফারছী কাব্য অবলম্বনে। আর সেজন্যে কুরআন-কাহিনীর সঙ্গে ঐক্যের চেয়ে এর অনৈক্যই বেশী। তাই কবি আল-াহর দেহও কল্পনা ক'রতে পেরেছেন, যা তাঁর মূল ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। ইউছুফের জন্মের পূর্বে আল্লাহ্‌তালা—

"আপনার দেহের রূপ আপনি লইয়া।
ছুরত করেন পয়দা আপনি বলিয়া ॥
ছয় ভাগ রূপ আল্লা আলমে ভেজিল।
তার বিচে চারি ভাগ ইউছফেরে দিল ॥"

এ-ভাবে কয়েকটি অনৈসর্গিক ব্যাপারও এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। ভাইদের হাতে ইউছুফের লাঞ্ছনায়—

"আছমান-জমিন কান্দে সূর্য আর তারা কান্দে
ফেরেস্তা ও কান্দে হুরপরী।"

এটা নিছক কবিত্বের কথা হ'তে পারে। কিন্তু ইয়াকুব নবীর সঙ্গে বাঘের বাক্যালাপ (যা কেবল তিনি-ই শুনতে পান), জিবরাইল কর্তৃক ইয়াকুব ও ইউছুফকে কেবল নয়, জেলেখাকেও স্বপ্নাদেশ দান, ইউছুফের প্রার্থনায় হৃতযৌবনা জেলেখার এক মুহূর্তে পূর্বরূপ প্রাপ্তি—প্রভৃতি অতি-প্রাকৃতিক ঘটনার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

আল্লাহ্‌র গরিমা ও ফকীরীর মাহাত্ম্য প্রচার কবির উদ্দেশ্য ব'লেই যে, এ-সব অনৈসর্গিক ঘটনা আরোপিত হ'য়েছে, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। হয়তো এই উদ্দেশ্য সফল হবে মনে ক'রেই কবি আল-াহ্‌কে ক্ষমাশীল হিসেবে চিত্রিত করেননি; বরঞ্চ দেখিয়েছেন যে, মানুষের অসঙ্গত ব্যবহারে তিনি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে

www.pathagar.com

তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এখানে কবি যতই মূলানুগ হোন না কেন, আমাদের কিন্তু মনে পড়ে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর কথা, ভক্তের সামান্য বিচ্যুতি-ই যাঁর শাস্তি দানের পক্ষে যথেষ্ট কারণ।

অনৈসর্গিক উপাদানের প্রাচুর্য ও ধর্মীয় বর্ণসংযোগের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাঙালার লৌকিক প্রভাব এবং হিন্দু পারিপার্শ্বিকের ছাপ এতে যথেষ্ট আছে। যেমন নায়িকার বর্ণনায়—

"বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার"

বা

"ভুরু দুটি জোড়া যেন কামের কামান"।

হিন্দু প্রভাবের প্রকষ্ট উদাহরণ। আর স্থানীয় বর্ণসংযোগের পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত অংশে সুস্পষ্ট—

১. "বাছুর হারাইয়া যেন হামলায় গোধন।"

২. "ইউছুফে ভুলাব মোরা ধুলাখেলা দিয়া।"

৩. "চিল যেন বাচ্চা নিয়ে ধাড়ি যায় উড়ে।"

৪. "সোনার পালঙ্কে বৈসে পান-গুয়া খায়।"

৫. "এক হাতে শঙ্খ করি আর হাতে সোনা।
পরিতে পরিতে যায় যত নারী জনা॥"

লৌকিক প্রভাবের স্পষ্টতর পরিচয় পাই রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে। বিদ্যাপতি থেকে শুরু ক'রে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্যে সংস্কৃত কাব্যানুসারী যে-রূপবর্ণনার ধারার সাক্ষাৎ আমরা পাই, গরীবুল-হ্ সেই ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রেই নায়ক-নায়িকার দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা ক'রেছেন। নায়কের সাজ-সজ্জা বা তাঁর মৃগয়ার বর্ণনায় বাঙালা প্রণয়কাব্যে প্রচলিত রীতির-ই অনুসৃতি দেখা যায়।

বাঙালা কাব্যধারার সঙ্গে 'ইউছুফ জেলেখা'র এই সাদৃশ্যে কবি হিসেবে গরীবুল-হ্র মৌলিকতার দাবী ক্ষুণ্ন হয় নি। কেননা, মধ্যযুগের সকল কবি-ই এই অর্থে প্রথানুগত। এক-ই বিষয়বস্তু এবং এক-ই ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার ক'রেও মধ্যযুগের প্রতিভাবান কবিরা যেমন শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন, গরীবুল্লাহ্ও তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ-কৃতিত্ব প্রধানত: প্রণয়াবেগের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যের শেষভাগে পূর্ণযৌবনপ্রাপ্তা জেলেখার প্রতি স্বভাবত: আত্মসংযমী ইউছুফের প্রবল রূপমোহের অভিব্যক্তি তার চরিত্রের সামঞ্জস্য ক্ষুণ্ন ক'রে থাকলেও

www.pathagar.com

মানবীয় গুণ প্রকাশ ক'রেছে।

তথ্যগত ছোটখাটো অসংগতি সত্ত্বেও কবিত্বশক্তির প্রকাশে 'ইউছুফ জেলেখা' গরীবুল-াহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা-সাহিত্যের একটি উলে-খযোগ্য কাব্য ব'লে গণ্য হ'তে পারে। ইউছুফের প্রতি জেলেখার অনুরাগকে 'অনল দেখিয়া যেন ধায় যে পতঙ্গ' বলাটা কিছু নয়, কিন্তু, "দেখিয়া বাঘিনী যে শিকারের রঙ্গ"-উক্তিটিতে কবি নিঃসন্দেহে নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছেন।" একথা সত্য।

৪. বীর-রসাত্মক কাহিনী কাব্য

এ-কিছিমের পুথি-কিতাবে কেবল বীর-রসের-ই পরিচয় পাওয়া যায় না; সেই সাথে প্রেম-রসেরও পরিচয় মেলে। কারণ, কবিদের নিকট তখন বীরত্ব ছিল—শুধু দৈহিক শক্তির পরিচয় দেবার জন্য নয়। **পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে এ-কিছিমের প্রায় সকল পুথি-কিতাবের কথা ছিল—'বীরত্ব চাই ভালবাসার জন্য, আর ইছলাম-প্রচার ও ইছলাম রক্ষার জন্য'**। জাতীয় জীবন বাঁচিয়ে রাখার সেটাই ছিল সর্বোত্তম পন্থা। কারণ আঠারো শতকের শেষ ভাগ থেকে ১৯৪৭ সাল তক বাঙালা সহ সারা ভারতের মুছলমানদের মনে যে-বৃটিশ-বিরোধী আগুন জ্ব'লছিল, মীর কাসিমের সময় থেকেই মুছলিম মুজাহিদরা অব্যাহতভাবে যে-লড়াই চালিয়ে আসছিলেন; পুথির কবিরা তা দিয়ে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হবেন—সেটাই স্বাভাবিক। আর সে-কারণেই **তারা "জঙ্গনামা"-শ্রেণীর কাব্য রচনা ক'রে দেশের গ্রামীণ জনকওমকে বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষ ক'রে রাজ্যহারা মুছলমানদের**। বিরাট "আমীর হামজা" একটি মহাকাব্য বিশেষ। এই শ্রেণীর অপরাপর পুথি সম্পর্কে মরহুম আদম উদ্দীন লিখেছেন—" আমীর হামজার পুথি ও হজরত আলী (রাঃ) এবং মুহম্মদ হানিফাকে নায়ক করিয়া যে সমস্ত পুথি রচিত হইয়াছে সেই গুলির প্রায় সব-ই এই শ্রেণীর। ক ও খ শ্রেণীর পুথির নায়ক যে শুধু মানুষের সহিত-ই লড়াই করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইঁহারা পক্ষী (ভানুমতীর লড়াই), পশু (হযরত আলী ও বীর হনুমানের লড়াই), দেও-দৈত্য (জৈগুণ বিবির পুথি ও আমীর হামজার পুথি) এবং পরীর (জৈগুণের পুথি) সহিতও লড়াই করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত যুদ্ধের পরিণাম সর্বত্রই এক অর্থাৎ নায়কের জয়লাভ ও প্রতিপক্ষের পরাজিত হইয়া ইছলাম গ্রহণ অথবা পলায়ন।"

বলা দরকার যে, 'জঙ্গনামা' জাতীয় একশ্রেণীর কাব্যে—যার, অধিকাংশই রোমান্টিক কাহিনী কাব্য, ধর্ম-প্রচার বা ইছলাম-প্রচারকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে কেউ কেউ মূল্যায়ন ক'রে লিখেছেন—"এই সকল পুথিতে নায়ক কেবলমাত্র

www.pathagar.com

ধর্মপ্রচারার্থই লড়াই করিয়াছেন। এই সমস্ত যুদ্ধের কারণ সাধারণতঃ বিধর্মী রাজার মুছলিম প্রজার উপর অত্যাচার। 'জুলমতনামা' প্রভৃতি পুথি এই শ্রেণীর। এই সমস্ত পুথিতে নায়ক, অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য হয় স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হন অথবা অত্যাচারের সংবাদে স্বয়ং উত্তেজিত হন, অথবা কাহারও দ্বারা প্ররোচিত হন। তারপর তিনি লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া বশীভূত ও ইছলামে দীক্ষিত করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পুথিগুলিকে 'বিজয়' বা মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত করিতে পারি এবং এইগুলি হিন্দু গ্রন্থকারগণ কর্তৃক রচিত মঙ্গলকাব্যের (যথা মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি) অনুরূপ বা উহাদের প্রত্যুত্তর বলিয়া মনে করিতে পারি। এই দুই হিন্দু-মুছলিম মঙ্গলকাব্য মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে যে, তৎকালে হিন্দু-মুছলিম সাহিত্যকগণের মধ্যে সাহিত্যের মাধ্যমে যে একটা রেয়ারেষি চলিতেছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। **এই রেষারেষির সূত্রপাত হয় হিন্দু গ্রন্থকারগণের মনসামঙ্গল কাব্য দ্বারা**। কারণ প্রায় যাবতীয় মনসামঙ্গলেই মুছলিমগণের নিকট হইতে বিশেষতঃ "মদীনার রাজা হাছন-হুছনের" নিকট হইতে মনসা দেবীর পূজা আদায়ের এবং তজ্জন্য মুছলিমগণের বিশেষতঃ হাছন-হুছনকে ও তাঁহার পরিবাবর্গকে দেবী কর্তৃক লাঞ্ছনার অধ্যায়টিও পাওয়া যায়। এক্ষণে মনসামঙ্গলের তারিখ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এ-পর্যন্ত যতগুলি মনসামঙ্গলের পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বিপ্রদাসের ১৪১৭ শকে (১৪৯৫-১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে) লিখিত মনসাবিজয় পুথি-ই প্রাচীন। ইহাতে এবং অন্যান্য পুথিতে এতদপেক্ষাও প্রাচীন রচয়িতা কানা হরিদত্তের উলে-খ পাওয়া যায়। ১৪৯৪-'৯৫ খৃষ্টাব্দে বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল রচনা করেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, মনসামঙ্গল কাহিনীটি-ই অন্ততঃ চতুর্দশ শতাব্দীর কিংবা তাহারও পূর্বের। মুছলিম কবি-রচিত মঙ্গল-কাব্যের কোন পুথি-ই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত বা অনূদিত হয় নাই। **হিন্দু সাহিত্যিকগণের এরূপ আক্রমণমূলক সাহিত্য-রচনার মূলে স্বীয় ইষ্টদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার ছাড়াও কতকটা নিজেদের রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রতিশোধ-গ্রহণস্পৃহা ও ইছলামের বিশ্বগ্রাসী শক্তির প্রতি ঈর্ষার ভাব নিহিত থাকা অসম্ভব নহে বলিয়াই মনে হয়**। মুছলিম অধিকার কালে, এমনকি তৎপূর্বকাল হইতেই মুছলিম ছুফী-সাধকগণের প্রভাবে দলে দলে হিন্দুর ইছলাম গ্রহণও এইরূপ সাহিত্য-রচনার প্রেরণা যোগাইয়া থাকিবে।

বলা দরকার যে, এ-সব রচনা "ফুতুহু শ্বাম", "ফুতুহুল মেছের" ও "ফুতুহুল ইরাক"-এর মত ঐতিহাসিক অভিযানের বিবরণ নয়। এগুলো হ'ল—অত্যাচারের প্রতীকারার্থে যুদ্ধাভিযান। ধর্মান্তর তার সাহিত্যিক অনুষঙ্গ মাত্র। আর ঐ সব

ধর্মান্তরিতদের ওপর কোন অত্যাচারও চালানো হয়নি। তাঁরা মুছলিম বাহিনীর বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা ও ইছলামী সমানাধিকারবাদের দৃশ্যমান পরিচয় পেয়েই দলে দলে ইছলাম কবুল ক'রেছে। এ-সব ঘটনাকে কখনো তরবারির জোরে ইছলাম প্রচার বলা যায় না। তাই ঐ এক-ই ব্যক্তি ব'লেছেন—"বীরত্বমূলক—এই সমস্ত কাহিনী কাব্যের কতকগুলির সূত্রপাত প্রেম দ্বারা হইলেও এগুলি মূলতঃ বীররসপ্রধান কাব্য। ইহাতে রাজপুত্র বা সম্ভ্রান্ত বীরনায়ক—কোনও শাহ্জাদী অথবা সম্ভ্রান্ত নায়িকার প্রেমে পড়িয়া তাঁহাকে লাভ করার জন্য বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে লাভ করেন। নায়ককে কখন কখন স্বয়ং নায়িকার সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। এই সমস্ত বীরকে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় নাইটদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। **কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র ধর্মপ্রচার অথবা বিধর্মী রাজার অত্যাচার নিবারণও কাব্যের উপলক্ষ হয়।** "বীর হনুমানের লড়াই" পূর্বোক্ত—ও "জুলমাতনামা শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্য। এই সমস্ত গ্রন্থের নায়ক মুছলিম এবং নায়িকা বা প্রতিপক্ষ অমুছলিম হইয়া থাকেন।"

লেখকের এই মূল্যায়ন যে, সমকালীন সামাজিক ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নয়—তা সত্য।

এই জাতীয় বহু পুথি বিচার-বিশে-ষণকালে সমকালীন জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতের কথা ভুলে গেলে চলে না। আজাদী, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হারাবার পর—বাঙালায় ও পরে সারা ভারতে মুছলমানদের সামগ্রিক জীবনে কী বিপর্যয় নেমে আসে, তার যে-বিবরণ ডবি-উ. ডবি-উ. হান্টার রেখে গেছেন, তা অকল্পনীয়। সেই সাথে, অব্যাহত ভাবে মুছলিম মুজাহিদদের লড়াই জারী রাখার যে-বিবরণ ভারতীয় বাঙালার গোলাম আহমদ মোর্তজা, তাঁর "চেপে রাখা ইতিহাস" বইয়ে দিয়েছেন—তার কথা মনে রেখে 'জঙ্গনামা' জাতীয় পুথি-কেতাবের মূল্যায়ন ক'রতে হবে। নইলে এ-সব পুথির যোগ্য মূল্যায়ন সম্ভব হবে না। **হজরৎ আলী, হানিফা, আমীর হামজা, 'জৈগুণ' কিংবা ভানুমতি চরিত্রগুলো বাস্তব-ই হোক, আর কাল্পনিক-ই হোক; ইতিহাস এবং আধা-কল্পনার এই সব চরিত্রের মধ্যেই যে—সে-কালের তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ্ এবং দেওয়ান মদীনারাই জীবন্ত—তা না-কবুল করা যায় না। যুদ্ধ—পশু, পাখী, দেও, পরী, নর, নারী যার সাথেই হোক না কেন; পুথির কবিরা তাদের বৃটিশ-প্রতিপক্ষ রূপেই গ্রহণ করেন। আর সেই যুদ্ধে প্রতীকী বিজয়-ই ছিল একমাত্র কাম্য। কাব্য-কাহিনীর অবধারিত পরিণাম।** অন্য দিকে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু ক'রে, পরবর্তী বাঙালা সাহিত্যে এই রকমের যুদ্ধ চ'লেছে—পশু-পাখী, দৈত্য-দানব, রাক্ষস খোক্ষসকে প্রতিপক্ষ ক'রে

www.pathagar.com

নয়; সরাসরি মুছলমানদের প্রতিপক্ষ ক'রে। 'নাম' ধ'রে ঘোষণা দিয়ে (আনন্দমঠে)।

তাই একথা বলা চলে না যে,—"আমীর হামজা" কাব্যে এবং অন্যান্য জঙ্গনামায় ইছলাম-প্রচারের যে-রূপ আমরা দেখতে পাই, তা কতখানি ইছলামের আদর্শ-সম্মত, এ-প্রশ্ন সহজেই উত্থাপন করা চলে। সর্বত্র দেখা যায়, পরাজিত ব্যক্তি জীবন-রক্ষার দায়ে ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রছে। কবি একবার তো প্রকাশ্যেই ব'লেছেন—"তারা মনে ডরাইয়া, রহে মোছলমান হইয়া।" তরবারির সাহায্যেই এখানে রাজ্যের ও ধর্মের বিস্তার ঘ'টেছে, ধর্মমতের মাধুর্য ও ঔদার্যের জন্য নয়।" ড. আনিসুজ্জামানের এ-বক্তব্য অনুসরণ ক'রে আজহার ইসলামও লিখেছেন—"যুদ্ধকাব্যরূপে চিহ্নিত আমীর হামজা, সোনাভান, জৈগুনের পুথি, জঙ্গনামা বা শহীদে কারবালার মুক্তাল হোছেন, হানিফার লড়াই, কাছাছুল আম্বিয়া ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এগুলোতেও কবির বল্গাহারা কল্পনার দৌড় নানাদিকে প্রসারিত। একদিক থেকে যুদ্ধকাব্যের অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে সঞ্জাত। ইছলাম ধর্ম প্রচারকল্পে হজরত আলী ও তৎপুত্র হানিফা কিংবা আমীর হামজার বীরত্বকে কেন্দ্র ক'রে এঁদেরকে নায়করূপে এবং অমুছলিম নারীকে নায়িকারূপে দাঁড় করিয়ে কাফের দলন ও ইছলাম ধর্মের বিজয় ঘোষণা করাই যেন সায়েরদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে ইছলামের প্রতাপে জনগণকে মাতিয়ে তোলা। যুদ্ধভিত্তিক পুথিগুলোতে সায়েরদের মধ্যে জেহাদী মনোভাব কাজ ক'রলেও ইছলাম ও ইছলামের প্রচার-প্রীতিই তাঁদের প্রেরণার উৎস। সেজন্যেই পুথির যুদ্ধবাজ চরিত্রদের "এক হাতে কোরআন আর এক হাতে তরবারী" এবং এই শক্তির জোরে কাফেরদের ইছলামে দীক্ষিত করার প্রয়াস।" ডক্টর আহমদ শরীফ শায়ের-কবিদের এই মৌল অভিপ্রায়ের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে তার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আরোপ ক'রে বলেন,—'এসব কাব্যে স্বধর্মের ও স্বজাতির অতীত গৌরব স্মরণে উল-াসবোধের আভাস আছে অবশ্য, কিন্তু সে-উল-াস হ'চ্ছে আত্মপ্রত্যয়হীন নিঃস্ব দুর্বলের আত্মীয়-গৌরবে আত্মপ্রসাদলাভের বাঞ্ছাজাত এবং এতে র'য়েছে বর্তমান আর্তনাদকে অতীত আস্ফালনে ঢাকা দেয়ার প্রয়াস—দুর্দিনে আত্মপ্রবোধ ও স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা।" এ-সব কথার সাথে একমত হওয়া যায় না।

কেননা, শায়েরদের কাব্য-রচনাকালে, পহেলা বাঙালায়, পরে সারা হিন্দুস্তানে অরাজকতার ঢল নেমেছে। তাতে বিপন্ন হ'য়েছে—ইছলাম ও মুছলমান। তখন দেশের মুছলিম অভিজাত ও বিত্তবান শ্রেণী ধ'সে গেছে। তাদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিপন্ন। সারা দেশে

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ভাবে গ'ড়ে ওঠা একটা মজবুত শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি হ'য়ে প'ড়েছে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন। তার সাথে তাল মিলিয়ে বানের পানির মত আসছে বিদেশীরা—বিধর্মীরা। তারা প্রবল ও প্রভাবশালী হ'য়ে উঠেছে—স্থানীয় মুছলিম-বিরোধী হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণী ও সরকারের সহযোগিতায়। তখন বাঙালায় ও ভারতে কেবল মুছলিম বাদশাহীর অবসান ঘ'টছে না; সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে, একটি 'সমসত্ত্ব বাঙালী' জাতি (এবং এক-ই রকম তখনকার হিন্দুস্তানের অপরাপর জাতিও) ও বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে অবৈর দ্বন্দ্ব থেকে বৈর দ্বন্দ্বে সবেগে নিক্ষিপ্ত হ'চ্ছে।

এ-অবস্থায়, মুছলিম কবিরা—"আর্তনাদে নিমজ্জিত" হ'লে—"জঙ্গনামা"-শ্রেণী"র বীর-বসাত্মক যুদ্ধকাব্য রচিত হ'তেই পারত না। কারণ ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল তক বাঙালার মুছলমানরা যত নির্যাতন-ই ভোগ করুক না কেন; তারাই বৃটিশ-বিরোধী লড়াই জারী রেখেছে। তারাই ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বাঁশের কেল-া বানিয়ে লড়াই ক'রেছে; ফকীর-বিদ্রোহ ক'রেছে, সিপাহী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছে, ওহাবী-আন্দোলন-ফরায়েজী আন্দোলন ক'রেছে। পুথি-লেখক শায়েরী কেতাবের কবিরা, এ-সব লড়াই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে এবং বীর রসাত্মক, ঐতিহাসিক ও আধা-ঐতিহাসিক বিজয়-কাব্য রচনা ক'রে সে-সব লড়াইয়ে সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে। **গোটা বাঙালার গ্রাম, শহর ও উপ-শহরের মুছলমানদের এই ঔপনিবেশিক শক্তি-বিরোধী ভূমিকা থেকে পুথির কবিদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায় না। তা দেখা কেবল অন্যায় নয়—অপরপাধও।**

মনে রাখা দরকার, সে-আমলে বঙ্কিমচন্দ্ররা মুছলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাথে ঐক্য স্থাপন ক'রলেও, মুছলমান কবিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে—মুছলিম ও হিন্দুর ঐক্য স্থাপনের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। নবাব মীর কাসিমের পতনের পর থেকে ১৯০৫ সাল তক, বৃটিশ-বিরোধী প্রায় সমস্ত সশস্ত্র রাজনৈতিক লড়াই চালিয়েছে সাধারণ মুছলমানরাই। একথা মনে রেখে, **'জঙ্গ-নামা' শ্রেণীর কাব্যগুলো সে ইতিহাসের আলোকেই** বিচার্য।

অতএব, ড. আনিসুজ্জামান, আহ্মদ শরীফ অথবা আজহার ইসলাম যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর পুথি-কেতাবের মূল্যায়ন ক'রেছেন; তা ঠিক নয়। এ-সব কাব্য এ-দেশে ইছলাম ও মুছলমানদের উত্থানের যুগে রচিত হয়নি। এগুলো লেখা হয়—মুছলিম শক্তি উৎখাতের পর। তখন নতুন ইউরোপীয় খৃষ্টান

www.pathagar.com

শক্তি এসেছে। তারা ধর্ম, ভাষা, সমাজ ও সাহিত্যে চেপে ব'সেছে। আজাদী কেড়ে নিয়েছে। কাজেই এমন অবস্থায় ইছলাম ধর্ম-প্রচার কবিদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং **তাঁরা শক্তি দিয়েই যদি শক্তিকে পরাভূত করা না যায়, তাহ'লে শুধু পরাজয় নয়; বিপর্যয়-ই যে ঘটে, সে-দিকে জনগণের চেতনা ফেরাতে চেয়েছিলেন।** কবিদের উদ্দেশ্য ছিল—তাই। তাঁরা ধর্ম, বীরত্ব এবং প্রেমের সাথে নানা অলৌকিক ও অতি-লৌকিক বিষয়বস্তু আমদানী ক'রে—আমীর হামজার মত যুদ্ধকাব্যগুলো সত্যকার মহাকাব্যের আকার দান ক'রেছেন। **সদ্য পরাজিত একটি শক্তিমান জাতির সাহিত্যিক মানস-বৈশিষ্ট্য যে, এ-রকম-ই হ'য়ে থাকে, তা সত্য**। সে-বিষয়ে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক রামচন্দ্র বর্মার বরাত দিয়ে ব'লেছেন—"হিন্দী সাহিত্যিকরা বলেন, মুছলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দুর পৌরুষের অন্তর্ধানের পর, হতাশ জাতির পক্ষে ভগবত শক্তি ও তাহার ধ্যান ছাড়া আর কোন উপায়-ই ছিল না। এই জন্য কবি ভক্তিতত্ত্ব দিয়া এক নূতন রাস্তা সৃষ্টি করেন। পরে এই ভক্তিতত্ত্ব এত বাড়িয়া উঠে যে, উদার মুছলমানরাও ইহাতে আকৃষ্ট হন। ইহার পরিণতি এই যে, **হিন্দু অস্ত্রের পরিবর্তে জপমালার আশ্রয় লয়**। আর নিজেদের লৌকিক জীবনে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খুঁজিতে থাকে নিজের সাংসারিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাইবার জন্যে ঈশ্বরের শরণ লয়। নিজের শক্তির অভাবে দুষ্টের দমনের জন্য ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়। এই প্রকারে বীররস শান্ত এবং শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়। এই নতুন পরিস্থিতির কোন ঐতিহাসিক অর্থনীতিক ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া এই স্থানে ইহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট যে, **ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যখন কোন জাতি পরাজিত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, তখন তাহারা ধর্ম্মের নাম করিয়া নিজেদের বাঁচাইবার চেষ্টা করে**। কি রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কারণে সে-জাতির পতন হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া ধর্ম্মের অভাবেই পতন হইয়াছে—এই বলিয়া ধর্ম্মের ধুয়া তুলিয়া বনিয়াদী স্বার্থের লোকেরা আসল ব্যাপারকে ঢাকিবার চেষ্টা করে। অনেক সরল লোকেরা ইহা বিশ্বাসও করেন। আবার অনেকে সংস্কার রূপে পুরাতন সমাজকে নতুন অবস্থার সহিত মিলাইবার চেষ্টা করেন। অধ্যাপক মাহাফি বলেন—**গ্রীস যখন ম্যাসিডোনিয়ানদের দ্বারা বিজিত হয় এবং পরে পুনরায় রোমের অধীনে আসে, তখন তাহাদের নিজেদের একটী বিশিষ্ট ধর্ম্মমত না থাকাতে—শিক্ষিতেরা নাস্তিক হয় এবং পরে ক্রীশ্চান হইয়া যায়**। অন্য পক্ষে, হিন্দুরা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া নিজেদের আত্মরক্ষা করে। পারস্য দেশেও তদ্রূপ। **পারসীকেরা আরবদের দ্বারা বিজিত হইবার পর বাধ্য হইয়া আরবদের ধর্ম্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ইছলামের নানা প্রকারের নূতন**

ব্যাখ্যা দিয়া নিজেদের মধ্য থেকে আরব প্রাধান্য দূরীভূত করিবার চেষ্টা করে। তাহারা, 'সূফীমতবাদ', 'জিন্দিকি' ধর্ম্ম, 'শিয়া মত' এবং বর্ত্তমান কালের 'বাবি' মতবাদ, 'বাহাই' মতবাদ বিবর্ত্তিত করিয়াছে এবং এবম্প্রকারের প্রচেষ্টা আজও চলিতেছে।" আলোচ্য কোটেশন থেকে **দু'টো বিষয় খুব স্পষ্ট** রূপে বোঝা যায়। **তার একটা** হ'ল—শায়েরী কেতাবের মহাকাব্য জাতীয় রচনাগুলোয় এবং 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর অপরাপর কেতাবেও বীররস **কেন** এবং **কিভাবে** শান্ত ও শৃঙ্গার রসে মিশ্রিত হ'তে পেরেছে এবং হ'য়েছে। ফলে, এদিক থেকে বিচার না ক'রে ড. আনিসুজ্জামানের মত-অনুযায়ী—"ইছলাম-কেন্দ্রিক জীবন ও সাহিত্যের প্রতি অতিশয় আগ্রহের প্রকাশ, আর যা কিছু উদ্ভট ও অতি-প্রাকৃতিক, তার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধানিবেদন, এই কাব্যধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য" ব'লে এসব কাব্যের মূল্যায়ন করা চলে না। কারণ **এই বৈশিষ্ট্য—'সাহিত্যিক মহাকাব্যের-(Literary Epic)ই বৈশিষ্ট্য। সমকালীন সামাজিক বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুছলমানদের মানস-বৈশিষ্ট্য। তাই তা 'অতি' দোষে দুষ্ট নয়।**

অপর বিষয়টি হ'ল—উনিশ শতকের ঐতিহাসিক পটভূমিতে **বাঙালী মুছলমানদের সামনে যদি ইছলাম ধর্মের শক্তিমান ভাণ্ডার না থাকতো, তাহ'লে—তখনকার মুছলমানরা নাস্তিক কিংবা খৃষ্টান হ'য়ে যেত।** এখনকার বাঙ্‌লাদেশী মুছলমান-(পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত)রা ধর্ম ছাড়ার কারণে যেমন নাস্তিক হ'য়ে যাচ্ছে। তাই "মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর" হিন্দী ভাষী হিন্দুরা যেমন ধর্মকে আশ্রয় ক'রে ভক্তিতত্ত্ব এবং প্রাচীন বীর-কাহিনী অবলম্বন ক'রে—'হাম্বীর রাসো', 'খুমান রাসো," "বিজয় পাল রাসো" রচনা ক'রে হিন্দী ভাষায় বীর-গাথা বা জঙ্গনামা-শ্রেণীর যুদ্ধ-কাব্যের জন্ম দেয়; **উনিশ-বিশ শতকে বাঙালী মুছলমান কবিরাও জাতীয় পতন ঠেকাতে ঠিক সেই কাজটি-ই ক'রেছিলেন। এ-সব কাব্যের অভাবে, সে-যুগের বাঙালা দেশে ইছলাম ও মুছলমান টুকরো টুকরো হ'য়ে যেত,** তা পরবর্তী আলোচনায় জানা যাবে। অতএব, **'জঙ্গনামা'-শ্রেণীর কাব্য-মহাকাব্যগুলো, "নিছক রোমান্স-রসের-ই গালগল্প" কিংবা "শুধু রোমান্স রসের উত্তেজিত কাহিনী" নয়—বরং ইতিহাসের এক সংকটকালীন সময়কে মোকাবেলা করার সাহসী তলোয়ার—তা সব দিক বিবেচনার পর কবুল না-ক'রে উপায় নেই।**

৫. ইতিহাস-বিষয়ক কাব্য

বটতলার পুথি-সাহিত্যে মুছলিম কবিদের আর একটি বিশেষ অবদান—

www.pathagar.com

ইতিহাস বিষয়ক কাব্য। বটতলার মুছলমানী পুথির রাজ্যে ইতিহাস-কন্দ্রিক দু'শ্রেণীর রচনা আছে। তার একটি **তরজমা** ও অপরটি **মৌলিক রচনা**।

বটতলার পুথি বা শায়েরী কেতাবের কবিরা যে, আরবী-ফারছী সাহিত্যের পাঠক হিসেবে ইতিহাস জানার মওকা পেয়েছিলেন—তা ঠিক। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজবিজ্ঞান, জেনারেল হিস্ট্রি, ইছলামিক হিস্ট্রির রোল-নম্বরধারী ছাত্র না হ'য়েও স্বশিক্ষিতের মতই ইতিহাস-পড়ুয়া ছিলেন। তাঁরা সমাজের নানা ঘটনারও ইসাদী রূপে, সে-সব লিখে রেখে—ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এ-রচনায় ১৯ শতকের মুছলিম পুথি-কেতাবের শ্রেণীভাগের পঞ্চম শ্রেণীতে তাঁদের ইতিহাস-বিষয়ক রচনার যে-তিনটি উপবিভাগ করা হ'য়েছে—তার একটিতে আছে—ইছলামের ইতিহাসে, আরবীয় মুছলিম-বাহিনীর সিরিয়া, ইরাক ও মিশর (মিছর) বিজয়; অপরটিতে আছে মুছলমানদের দক্ষিণ বাঙালা বিজয় কাহিনী। আর তৃতীয়টিতে—দু'টি দৈবদুর্বিপাকে বিধ্বস্ত ঘটনার সামাজিক ইতিহাস।

নিম্নে এ-সব বিষয়ে সম্যক আলোচনা করা হ'ল—

ক) আরবীয় মুছলিম-বিজয়াভিযানের ইতিহাস

এ-সব ইতিহাসের মধ্যে সিরিয়া, ইরাক ও মিশর বিজয়ের ইতিহাস সরাসরি আরবী মূল ইতিহাসের তরজমা। পুথির কবি, কার কোন্ কেতাব থেকে সিরিয়া বিজয়, ইরাক বিজয়, মিশর বিজয় তরজমা ক'রেছেন—তার রেফারেন্সও দিয়েছেন। এই তিন দেশ জয়ের কাহিনী, নানা কবি—বাঙালায় কাব্য রূপ দিয়েছেন। কাব্যগুলো একত্রে "মজমু'আ ফুতুহুশ্বাম" নামেও প্রকাশিত হ'য়েছে। "পুথি সাহিত্যের ইতিহাস" লেখক পূর্বোক্ত আ. কা. মু. আদম উদ্দীন লিখেছেন—"মজমু'আ 'ফুতুহুশ শাম'–গ্রন্থ ফুতুহুশ্ শাম, 'ফুতুহুল মিশর' ও 'ফুতুহুল ইরাক' এই কয়খানি গ্রন্থের সমষ্টি। ইহার প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেন মুন্শী আজিমুদ্দীন ও তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ করেন চব্বিশ পরগণা জেলার ফাজিল পুরের অধিবাসী মুনশী মুহাম্মদ মুছা। মওলানা আব্বাছ আলী মরহুমও এই তিনখানি গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার ক'রেছেন।" আদমুদ্দীন লিখেছেন—"এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯০ সালে ও চতুর্থ খণ্ড ১২৯৪ সালে রচনা করেন—কবি মুনশী জনাব আলী"।

খ) বাঙালায় মুছলিম বিজয়াভিযানের ইতিহাস

ঐ সব কবি মুছলিম রাজ্য বিজয়ের ইতিহাস রচনা করা ছাড়াও বাঙ্লাদেশে মুছলিম বিজয়ের ইতিহাসও লিখেছেন। ১৯ শতকে লিখিত এ-রকম কেতাবের মাঝে ১২৮৭ সালে লেখা মোহাম্মদ খাতের-এর "বোন বিবির জহুরানামা", আবদুর

রহিমের "গাজী-কালু চম্পাবতী" এবং ১২৮৫ সালে খোন্দকার আহমদ আলীর লেখা "গাজী-কালু-চম্পাবতী" বিশেষ মশহুর। এ-সব কেতাবে যে-গাজীর কথা বলা হ'য়েছে, তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না। সে-কারণে অনেকেই এ-কাহিনীকে "ইতিহাস"-ভিত্তিক ব'লতে নারাজ। তাই 'গাজী-কালু-চম্পাবতী'-কাহিনীর 'গাজী'কে কেউ ঐতিহাসিক লোক ব'লে মনে করেন না। কিন্তু এই 'গাজী' (নাম যা-ই হোক) যে, একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি তা নানা সূত্রে জানা যায়। ছিলেটে, যশোরের বারোবাজারে, সুন্দরবনে এই 'গাজী'র প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তির নজীর আছে। একজন ইউরোপীয় লেখকের লেখা থেকেও জানা যায়—ইনি সুপ্রসিদ্ধ ভারত বিজয়ী ছোলতান মাহমুদের আত্মীয় ছিলেন। ছোলতান মাহমুদ-ই তাঁকে দক্ষিণ বাঙালা জয় করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাহ'লে ঐ অভিযান যে, ইখ্তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজীর গৌড় জয়ের অনেক আগে ঘটে, তা বেশক বলা যায়।

আলোচ্য কাহিনী নিয়ে আগে-পরে আরও একাধিক মুছলিম কবি, পুথি-কেতাব লিখেছেন। তার মধ্যে হালু মিয়া ও আবদুল গফুরের নাম বলা যায়। সুকুমার সেন, আবদুল গফুরের রচনায়—ত্রিবেনীর জাফর খাঁ, গোরাচাঁদ পীর, একদিল শাহ্, ছোট খাঁ, বড় খাঁ, পাণ্ডুয়ার—শাহ্ ছুফী, বদর পীর, সত্যপীর প্রমুখের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হ'য়েছে ব'লে জানিয়েছেন। এঁরা যে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং এঁদেরও নামে নানা জনে নানা পুথি-কেতাব লিখে ইতিহাস-চেতনাকে রোমান্টিক উপাখ্যানের খোশবুতে ভ'রে দিয়েছেন—তা কবুল না ক'রে উপায় নেই। এ-তরফে বলা জরুরী যে, "শমসের গাজীর পুথি"র আলোচনাকালে দীনেশ চন্দ্র সেনও তার ঐতিহাসিক মূল্যের তারিফ করেছেন। আলোচ্য ইতিহাস-চেতনার ফলেই মরহুম আবদুর রহীম ১২৮০ সালের ও ১৩০০ সালের দুর্ভিক্ষের ওপর পুথি লিখে গেছেন। ১৮৭২ সাল ও ১৮৯৩ সালের দুর্ভিক্ষ কোন মিথ্যা গল্প নয়—সত্যই ঐ দু'বছরে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

কাজেই পুথির কবিরা ইতিহাস-সচেতন ছিলেন। তাঁরা কেবল অতীতের ইতিহাস নয়, অথবা শুধু মুছলিম জাহানে পরিচালিত আরবদের বিজয়াভিযান নয়; 'বাঙালা'তে মুছলিম বিজয়াভিযানের নায়ক; ছিপাহ্ছালার পীর-দরবেশানের বহু স্মৃতিও; কিতাবে সাজিয়ে রেখে মৌলিক ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। এগুলো নিয়ে গবেষণা হ'লে, এন্তার নতুন ঐতিহাসিক তথ্য মেলার সম্ভাবনা আছে।

মৌলিক ইতিহাসাশ্রিত রচনাগুলোর মধ্যে ড. সুকুমার সেন "বন-বিবির

www.pathagar.com

জহুরা-নামা" (আসল নাম "বোন বিবির জহুরা নামা"), "গাজী-কালু চম্পাবতী" (ড. সেন-এর দেয়া নাম—"কালু-গাজী চম্পাবতী") সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন। পহেলা কেতাবখানি জয়নুদ্দীন ও মোহাম্মদ খাতের-রচিত। আর দোছরা কেতাবখানি আবদুল গফুর-রচিত। এছাড়া, তিনি ছৈয়দ হালু মিয়ার "বড়ে খাঁ গাজীর কেরামতি", আবদুর রহীমের "গাজীর পুথি" এবং অজ্ঞাতনাম-লেখকের "মদন-পালা" নামক কয়েকখানি ইতিহাস-আশ্রিত কিতাবের নাম ক'রেছেন।

এই কিছিমের কিতাবের মধ্যে মোহাম্মদ মুনশীর "নারায়ণী-জঙ্গ" ও "ধোনা মৌলের পালা"র উল্লেখ ক'রেছেন—শ্রীপান্থ।

বলা দরকার যে, এ-সব পুথি-কিতাবে বাঙালা-বিজয়ে মুছলিম অভিযানের ঐতিহাসিক কাহিনী; প্রেম কাহিনীর পটভূমিতে বর্ণনা করা হ'য়েছে। গাজী একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি! তিনি বিখ্যাত বীর সোমনাথ-বিজয়ী ছোলতান মাহ্‌মুদের আত্মীয় ছিলেন ব'লে ইউরোপীয়দের লেখা ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়। "মদন-পালা" কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—"কলিকাতার দক্ষিণে মেদনমল- পরগণার জমিদার মদন রায় বাকি খাজনার দায়ে প'ড়ে ঢাকার নবাব শায়েস্তা খানের দরবারে লাঞ্ছিত হ'য়েছিল। অবশেষে গাজী সাহেবের কাছে মানত ক'রে উদ্ধার পায়—এই টুকুই গল্প।"

গ. বাঙালার পার্শ্ববর্তী এলাকা-বিজয়ের ইতিহাস

আরও বলা জরুরী যে, মুছলিম পুথি-কিতাবের চৌহদ্দিতে কেবল বাঙালার প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাস নয়, তার আশ-পাশ এলাকার ইতিহাসও লেখা হ'য়েছে। চাট গাঁ, ময়মনসিংহ, সিলেট এলাকার লোক-কবিদের মতই পুথির কবিরাও নানা এলাকার ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে কাব্য রচনা ক'রেছেন। নজীর হিসেবে এখানে ড. সেন পাণ্ডুয়া-ত্রিবেণীর ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে "শান্তি পুর নিবাসী মহীউদ্দীন উস্তাগ"-রচিত "সা ছুফি ছুলতান" বা "পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা"র যে-বিশদ আলোচনা ক'রেছেন, তা কোট্ করা যেতে পারে—

"ত্রিবেণীর কাছে যে পাণ্ডুয়া ("ছোট পেঁড়ো") আছে—যার প্রাচীন দরগার উঁচু মিনার ট্রেন থেকে দেখা যায়—সে-স্থান শাহ-সুফীর আস্তানা ব'লে বহুকাল থেকে প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলে কি ক'রে মুছলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল, সে সম্বন্ধে যে-জনশ্রুতি আছে তার উপরে জোবড়া রঙ্ ফলিয়ে পাঁড়ুয়ার এই "কেচ্ছা" লেখা হ'য়েছে। এর মূলে আছে কোন হিন্দী বা উরদু কেতাব। কেচ্ছার উপক্রমে কবি লিখেছেন—

www.pathagar.com

"বড় পেঁড়ো ছোট পেঁড়ো তিরবেনী আর
পীরের খাতেরে আল-া ক'রেছেন তৈয়ার।
তিন পীরে তিন স্থান বক্‌শেশ করিল
তিন পীর তিন স্থানে জাহের হইল।
কুতুব জেন্দা রহিল বড় **পেঁড়ো ধামে**
গৌড়-বাদশাহী যার জাহের আলমে।
জাফর-খাঁ গাজী রহিল **ত্রিবেণী** স্থানে
গঙ্গা যারে দেখা দিল ডাক শুনি কানে।
আল্লার পেয়ারা **পীর শা' ছুফী ছোলতান**
পাঁড়োয়া মকান মাঝে করেন মকান।
এখাতেরে পাঁড়োয়া যে জাহের আলমে
শিরনি খতম হয় শাহ্-ছুফী নামে।
এয়ছা ভাতে কত লোক করে কহা শুনা
নাহি জানে কোন রূপ নেহাৎ ঠিকানা।
আমি বান্দা গোনাগার পাঁড়োয়াতে যাইয়া
দেখিনু মনুরা ঘর নেহাল করিয়া।
বাদশাহী মকান হেন হয় অনুমান
দেল জুড়াইয়া যায় দেখিয়া মকান।
দানাই মুরুব্বি যারা পাঁড়োয়াতে আছে
খবর পুছিনু যেয়ে তাহাদের কাছে।
নেহাৎ খবর কেহ কহিতে নারিল
এখাতেরে দেলে মেরা আফছোছ রহিল।
খামোসে রহিনু আমি না পেয়ে সন্ধান
পেরেসানে এক সাল হৈল গুজরান।
বহুতর আলেমের নিকটে যাইয়া
পুছিনু খবর খুব আজিজি করিয়া।
মমিনদ্দি ওস্তাগর শান্তিপুরে বাড়ী
কেতাব এক পাইলাম নিকটে তাহারি।
হিন্দি জবানেতে সেই কেতাব আছিল
পড়িয়া সকল ভেদ্ মালুম হইল।
আগাগোড়া জেনে দেল হইল খোসাল
এখাতেরে লিখিতেছি সে সকল হাল।"

তারপর কাহিনী শুরু। পাণ্ডুয়া-নগরে ছিল পাণ্ডু রাজা, অশেষ সৌভাগ্যশালী ও পুণ্যবান। তাঁর অন্দর মহলে এক কুণ্ড ছিল; যার জলে তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিষ্ঠান।

"এয়ছা কেরামত ছিল সে পানির শুনি
মোর্দা দিলে জিন্দা হইত কুদ্‌রতে রব্বানি।"

পাণ্ডু-রাজার আমলে পাণ্ডুয়ার বাসিন্দা ছিল সব হিন্দু, কেবল পাঁচ ঘর মুছলমান।

"কাফেরের কাছেতে মোমিন মোছলমান
বাঘের নিকটে রইত বকরির সমান।
এছলামের কারবার করিতে নারিত
করিলে পাণ্ডব-রাজা সাজা দেলাইত।"

মনের দুঃখে পাণ্ডু-রাজার মুছলমান প্রজারা গোপনে আল-ার দরবারে দোয়া মাগত—

"এলাহি আলমিন আল্লা জগতের সার
কুফরে গারদ কর পাক করতার।
তোমার কুদ্‌রত আল্লা কে বুঝিতে পারে
কাফেরে বাড়ালে এত দুনিয়া ভিতরে।
এয়ছা দিন কর তুমি এলাহি আলমিন
খুশিতে জাহের হোক মহাম্মদী দীন।"

একদিন এক মুছলমান প্রজা পুত্রজন্মোৎসব উপলক্ষে কোরবানী ক'রেছিল। পড়শী হিন্দুরা টের পেয়ে ছেলেটিকে মের ফেলে। বাবা রাজার কাছে নালিশ ক'রলে। রাজা অভিযোগ গ্রাহ্য ক'রলে না। তখন ছেলের মৃতদেহ নিয়ে সে চ'লল দিল্লীতে—এই ভেবে যে বাদশাহকে—

"আনিব সঙ্গেতে করি পাণ্ডুয়া-শহরে
লড়িয়া পাণ্ডুয়া-রাজে দিব ছারে খারে।"

দিল্লীর তখতে তখন ফীরোজ শাহ্—আসীন। অভিযোগ শুনে তাঁর ভাইপো শাহ্-ছুফীকে পাঠালেন ফৌজ দিয়ে পাণ্ডুয়ায়। শাহ্-ছুফী এসে তাঁবু গাড়ল বালুহাটায়। তারপর লাগল যুদ্ধ। জীয়ন-কুণ্ডের প্রভাবে রাজার সৈন্য-ক্ষয় হয় না, শাহ্-ছুফীও যুদ্ধে পেরে ওঠেন না। এমনভাবে বছর কেটে গেল। শাহ্-ছুফী হ'লেন

www.pathagar.com

হতাশ। তিনি দিল্লীতে ফিরে যাব যাব ক'রছেন এমন সময় পাণ্ডু-রাজার এক হিন্দু গোয়ালা প্রজা, নাম— নগর ঘোষ; শাহ্-ছুফীর কাছে এসে জীয়ন-কুণ্ডের কথা ব্যক্ত ক'রলে। নগর ঘোষ মুছলমান হ'ল এবং যোগীর বেশে রাজার অন্তঃপুরে ঢুকে গোপনে জীয়ন-কুণ্ডে গোমাংস ফেলে দিয়ে কুণ্ড-জলের মাহাত্ম্য নষ্ট ক'রে দিলে। উপায়ান্তর না দেখে রাজা ও রাজমন্ত্রী সপরিবারে ত্রিবেণীতে গঙ্গা প্রবেশ ক'রলে। পাণ্ডুয়া মুছলমান ফৌজের দখলে এল। এক বিরাট মছজিদ তুলে শাহ্-ছুফী সেখানেই র'য়ে গেলেন আজীবন। কাহিনী এইখানেই শেষ। তারপর কবির বিশিষ্ট মন্তব্য—

"শোন হে আল্লার বান্দা জত বেরাদর
বহুত মোমিন আছে পাঁড়োয়ার মাঝার।
শত শত আয়মাদার পাঁড়োয়াতে ছিল।
কালেতে তাহারা খুব লায়েক হইল।
এনাম জায়গীর পেয়ে শাহ্-ছুফী শাহার।
আজ তক করে ভোগ পাঁড়োয়া মাঝার॥"

এছাড়া—উত্তর বঙ্গে মহাস্থানের ঐতিহ্য নিয়ে আবদুল মজিদ লিখেছিলেন— "ছোলতান বলখি।" সুকুমার সেন এ-পুথি নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। নাম-উল্লেখ ক'রেছেন মাত্র।

যাহোক, নানা ঐতিহাসিক বিষয়ে লিখিত অনুরূপ পুথি-কিতাব যে, আরও লিখিত হয়—তা বেশক বলা যায়। যদিও এসব কিতাব ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রিত রচনা; তবু এগুলোয় ধর্ম, যুদ্ধ, প্রেম, নানা সম্ভব-অসম্ভব অলৌকিক ও অতি-লৌকিক কাহিনীর মিশেল দেখা যায়। এসব কাব্যে মুছলিম কবিরা, অমুছলিম চরিত্র এবং হিন্দু দেব-দেবীরও শক্তি, মহিমা উদারতা এবং মুছলিম নর-নারীর পীর-দরবেশের প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছেন। ফলে, যে-কালে বৃটিশ রাজশক্তি; এ-দেশের মুছলিম ও অমুছলিমের মিলিত দেশ, জাতি, ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চেতনাকে সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত ক'রে দিচ্ছিল এবং হিন্দুদের একাংশ তাদের সাথে হাত মিলিয়ে মুছলিম-বিদ্বেষ প্রচার ক'রছিল; সে-সময় বটতলার মুছলমান কবিরা তাদের এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক কাব্যে ধর্ম ও জাতিগত ঐক্যের রূপায়ণ ঘটাচ্ছিল। তৈরী ক'রছিল মুছলিম, হিন্দুর মিলন-মধুর জাতীয় ঐতিহাসিক কাব্য। সমকালীন মুছলিম-বিদ্বেষী হিন্দু কাব্য-মহাকাব্য থেকে তা ছিল-পুরোপুরি বিপরীত। এর এতিহাসিক গুরুত্ব না-কবুল করার উপায় নেই।

www.pathagar.com

শায়েরী কেতাবের কবিদের কাব্য-প্রতিভা

যে-কোন কবির কাব্য-প্রতিভা-বিচারের প্রচলিত রীতি—তাঁর ভাব, ভাষা ও ছন্দ-বিচার। এখানে ভাষা ব'লতে কবির শব্দ-চয়ন দক্ষতা বা 'পোয়েটিক ডিক্শন'-(Poetc Diction) এর কথাই বলা হয়। আধুনিক সাহিত্যের চলমান এই কাব্য-বিচার-ধারায় মুছলিম বটতলার পুথির কবিদের 'শায়েরী জবান'-এরও বিচার করা দরকার। দেখা দরকার—যাঁরা তাঁদের আদৌ কবি ব'লেই কবুল ক'রতে চান না; তাঁরা প্রকৃতই তেমন অ-কবি কিনা। আর যাঁরা পুথি সাহিত্যকে 'আদৌ সাহিত্য পদবাচ্য নয়' ব'লে এলান-বয়ান করেন, তাঁদের কথাই বা কতটা ঠিক; তাও যাচাই করা জরুরী।

শায়েরী কেতাবের কবিদের কাব্য-প্রতিভা এবং তাঁদের রচনাবলীর 'কাব্যগুণ'-বিচারে তাই পহেলা আলোচ্য কবিদের ভাব-জগতের পরিচয় দেয়া হবে।

ক. শায়েরদের ভাব-জগৎ

কবিদের 'ভাব-জগৎ' ব'লতে তাঁদের 'মনোজগৎ'কে বোঝায়। প্রতিভাবান কবিদের প্রত্যেকের-ই মানসলোক ভিন্ন ভিন্ন। তাঁদের ব্যক্তিগত মানসপুষ্টি অনুযায়ী তাঁরা এক একজন এক এক রকম চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনা দ্বারা তাড়িত হন। এক এক রকম বিষয়-বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হন। এক এক রকম প্রকাশ-ভঙ্গি দ্বারা নিজের নিজের প্রতিভার আখলাক-খাছিয়ৎ গ'ড়ে তোলেন। বিচলিত হন—ভাবের নানা আবর্তে। বিষয়ের নানা বৈভবে। ফলে, প্রতিভাবান কবিরা কখনও এক-ই ভাব-জগতে কুণ্ডলীবদ্ধ হ'য়ে থাকেন না। এক-ই বিষয়েও নয়। এক-ই পরিসরেও নয়। মহৎ কবি-প্রতিভার ভাব-বৈচিত্র্য তাই অসীম। সেই অসীম ভাব-বৈচিত্র্যের সবটাই প্রকাশযোগ্য নয়। সবটা প্রকাশ করাও যায় না। তবু যিনি যেটুকু ক'রতে পারেন; তাঁর রচনায় সেটুকু ভাব-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে এবং বিচিত্র রস ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে শায়েরী কাব্যের কবিদের ভাব-জগৎ, চিন্তা-চেতনা, অনুভব-অনুভূতি ও মনলোকের বিচার ক'রলে দেখা যায়—কবিরা কখনও কাব্য-ভাবনায় এক-ই বিষয়ে আবদ্ধ ছিলেন না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম ভাব-ভাবনায় আন্দোলিত হ'য়েছেন। তার ফলে, এক-ই কবি নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হ'য়েছেন। নানা রকমের কাব্য রচনা ক'রেছেন। যেমন কবি মোহাম্মদ খাতের। তিনি একদিকে যেমন তরজমাকার; অপর দিকে তেমনি মৌলিক কবিও। তিনি এক

www.pathagar.com

দিকে যেমন ধর্মীয় কাব্য "একশত তিরিশ ফরজ", "মারফৎ-নামা", "আখবারুছ ছালাত", "নছিহতুল মুছলেমিন" "আখবারুল ওজুদ" (দেহের খবর) এবং "ছহি মিরাজ নামা" লিখেছেন—তেমনি অন্য দিকে লিখেছেন—নবী-রছুলদের জীবনী—"কাছাছোল আম্বিয়া", "খোলাছাতুল আম্বিয়া", "তাজকেরাতুল আউলিয়া" প্রভৃতি। আবার এই কবি-ই যেমন মহাকবি ফেরদৌছির "সাহানামা"র তরজমা ক'রেছেন; তেমনি খোলা কলমে লিখেছেন "জঙ্গে ছোহ্‌রাব"। তাঁর কাব্য ভাবনার বিচিত্র বিবরণ তাঁকে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান-রচনায়ও নিয়োগ ক'রেছে। ফলে, তিনি লিখেছেন—"তুতিনামা", "মৃগাবতী-যামিনীভান", "লায়লী-মজনু", "ছোলতান জমজমা" প্রভৃতি। এই কবির লেখা "বোন বিবির জহুরানামা"—বাঙালায় মুছলিম-বিজয়ের প্রত্ন-ইতিহাসকে ধারণ ক'রে আছে। মোহাম্মদ খাতেরের "এছরারুল খাবনামা"—তাঁর বিচিত্র মানস-লোকের আর একটি ভাব-পরিচয়।

এভাবে, কেবল মোহাম্মদ খাতের নন; আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের আরও অনেক বিচিত্র-ভাবের ভাবুক কবি-মহাকবির পরিচয় বটতলার মুছলিম কবি-সমাজ উপহার দিয়েছেন। তাঁরা কেবল বাঙালা দেশকেই নয়; উড়িষ্যা, বিহার ও আসামকেও প্রভাবিত ক'রেছেন। কিন্তু সে-ইতিহাসের তত্ত্ব-তালাস কেউ করেননি। নিন্দুকরা নিন্দাই ক'রেছেন, তারিফের কিছু দেখেননি। তার ফলেই পরিচিত পুথির অপরিচিত মূল্যায়ন ক'রতে তাঁরা বাধ্য হ'য়েছেন।

বলা দরকার যে, ভাব ও বিষয়বস্তু পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে। এজন্য পূর্বোক্ত আলোচনায় কবি মোহাম্মদ খাতেরের বিচিত্র ভাবজগৎ যেমন বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পেয়েছে; অপরাপর কবির ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘ'টেছে। তার নজীর র'য়েছে ইতোপূর্বে উপস্থাপিত উনিশ শতকের পুথি-কেতাবের বিস্তৃত বিষয়-ভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগে।

এজন্য এবার শায়েরী কেতাবের কবিদের 'ভাষা' বা 'ডিক্‌শন' (Diction) নিয়ে আলোচনা করা হবে।

খ. শায়েরদের কাব্য-ভাষা

শায়েরী কেতাবের কবিদের কাব্য-ভাষা নিয়ে এ-যাবৎ কেউ কোন আলোচনা করেননি। তাই এ-বিষয়ে আলোচনাকালে বলা দরকার যে, আমরা জানি—'সকলেই কবি নয়; কেউ কেউ কবি'। যে-কোন দেশের, যে-কোন কালের, যে-কোন ভাষার, যে-কোন কবি-কওমের হাজার হাজার কবির মধ্যে দু'চার জনের

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠত্বই তাদের সকলের শ্রেষ্ঠত্ব ব'লে গণ্য হয়। সে-কথা বাঙালা দেশের, বাঙালী জাতির, বাঙালা কাব্যের যে-কোন ধারা সম্পর্কেও সত্য। এক-ই কথা সত্য—শায়েরী কেতাবের কবিকুল সম্পর্কেও। তাঁদের মধ্যেও হাজার হাজার কবি আছেন; যাঁরা নিজেদের শায়ের বা কবি ব'লে দাবী ক'রেছেন। কিন্তু তাঁদের সবার কবি-প্রতিভাই সমান শ্রেষ্ঠ ছিল না। অল্প উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার সাথে বহু নিকৃষ্ট কবিকেও এই ধারার কাব্যের "কবি" ব'লেই কবুল ক'রতে হবে। তবে আলোচ্য ধারার মূল পরিচয় ও সার্থকতার নিশানবরদার হবেন—দু'চারজন শ্রেষ্ঠ কবি। আর তাঁদের উৎকৃষ্ট কাব্যের রচনাশৈলী বা কাব্য-ভাষা, ছন্দ ও অলংকার-ই হবে—শায়েরী কেতাবের গোটা সত্ত্বার সফলতা-বিফলতার নজীর।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা ক'রলে দেখা যায়—বিষয় অনুযায়ী শব্দ-চয়ন বা কাব্য-ভাষা-নির্মাণ একটি মহৎ কবি-প্রতিভার বিশেষ পরিচয়। এই পরিচয় শায়েরী কেতাবের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় সুলভ। তাছাড়া, যাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, তাঁদের মধ্যেও শব্দ-নির্বাচনের বা কাব্য-ভাষা নির্মাণের ঐ বিশেষ ক্ষমতার নজীর কম নয়। পহেলা সারির কাব্য-ভাষার নজীর দিতে এখানে ঢাকার "গড়-পাড়া মোকাম"—এর বাসিন্দা **কবি তাজুদ্দীন** এর **'কাছাছোল আম্বিয়া'র** নিম্নোক্ত দু'টি অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। যথা,—

ক. "এলাহি আলমিন আল্লা রাজ্জাক সবার॥
মানুষ করিল পয়দা অনেক প্রকার*
কেহ রাজা কেহ প্রজা কেহ নেঘাবান॥
কেহ তাবেদার কেহ গাঁয়ের প্রধান*
কেহ কানা খোঁড়া হ'য়ে প'ড়ে থাকে ঘরে॥
কেহ ছালামতে ফেরে দেশ-দেশান্তরে*
ভিখারি ফকির কেহ কৌড়ির কাঙ্গাল॥
সামালিতে নারে কেহ আপনার মাল*
কেহ তো জালেম কেহ মজলুম লাচার
কেহ দাদ চাহে কারে এনছাফের ভার।
কেহ ছেলে কেহ বুড়া কেহ তো জওয়ান॥
কেহ আক্কেলমন্দ কেহ আহমক নাদান
আলেম ফাজেল কেহ কেহ তো জাহেল ॥
কেহ দয়াবান কেহ দাগার আক্কেল
কেহ নেক কেহ বদ কেহ তো মমিন।
কেহ বোত পূজে হৈল কাফের বেদিন॥"
—পৃ. ১।

www.pathagar.com

খ. "আরবার পুছিলেন ইয়ার সবায় ॥
কি দিয়া জমিন পয়দা করিল খোদায়*
রছুলোল-া কহিলেন সবার কারন॥
পানির ফেনাতে হৈল জমির সৃজন*
পহেলা এলাহী আল-া করিম রব্বানী।
আপনা কোদরতে পয়দা ক'রে ছিল পানি*
তার পরে হাওা পয়দা করে ছোবহান।
পানির উপরে দিল ফুকিতে তুফান।
হুকুম পাইয়া হাওয়া বহিল এয়ছাই*
ঢেউতে২ ফেনা হৈল ঠাই ঠাই।
তারপরে আল-াতালা আগ পয়দা করে।
ধুঙা নেকলিল সেই পানির উপরে*
সেই ধুঙা সাত হিস্বা করে ছোবহান।
তাহা দিয়া বানাইল সাত আছমান*
হরেক আছমান দূর হইল এমত।
দরমিয়ানে পাঁচ সও বৎসরের পথ*"---ইত্যাদি।
—পৃ. ৪।

এই ভাষা বিষয়ের সাথে সুসমঞ্জস। কেউ একে দুর্বল ব'লতে পারেন না। সমকালীন সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনায় অন্যান্য কবির কাব্য-ভাষা থেকে এ-ভাষা পৃথক, তা সহজেই বলা যায়। সেই সাথে একথাও বলা যায় যে, এই কবি-ই যখন আলোচ্য কাব্যে আত্মদৈন্য প্রকাশ ক'রে লেখেন—

"কাছাছল আম্বিয়া যে কেতাবের নাম ॥
নবি সকলের কথা জাহাতে তামাম*
সেই কেতাবের আমি করিতে সাইর॥
কলম ধরিনু যে নামে এলাহির*
কিন্তু এহা মোর হক্কে দেখি ভারি কাজ ॥
আদার বেপারি যেন তালাসে জাহাজ*
ওঠাইতে সাধ্য নাই গোলপাতার ঘর ॥
নিলামে যাইয়া করে বালাখানা দর*
খাইতে নাহিক আছে পরিতে বসন ॥
নিলাম ডাকিতে জায় কাঞ্চন রতন *"... —পৃ. ৩।

www.pathagar.com

তখন কবির আগের দু'টো কোটেশনের ভাষার সাথে এই অংশের ভাষার ফারাক সহজেই বোঝা যায়। সেই সাথে এও বোঝা যায় যে, কবি সমাজের সাধারণ মানুষের নিকট অতি পরিচিত বিশিষ্টার্থক বাক্যে, যেমন—'আদার বেপারির জাহাজের খবর' (নেয়া) ও শব্দাবলী (যেমন—কেতাব , তামাম, এলাহী, তালাস, গোলপাতার ঘর, নিলাম, বালাখানা, বসন, রতন, কাঞ্চন ইত্যাদি) কী চমৎকার দক্ষতার সাথে কাব্যগত ক'রেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে কবির এ-রকম ভাব ও বিষয় অনুযায়ী ভাষা-নির্মাণের বা শব্দ-নির্বাচনের আরও নজীর আছে।

এবার ছৈয়দ হামজার **"আমীর হামজা" মহাকাব্যের কাব্য-ভাষার পরিচয়** দেয়া যায়। আমীর হামজার লড়াইয়ের বয়ানে কবির উক্তি—

"আমির হাকিল হাক এলাহি ভাবিয়া।
সিমারের তরে মর্দ্দ লিল ওঠাইয়া*
এয়ছা জোরে ছের পরে ঘোমাইল তায়॥
আলম তারিফ করে আমির হামজায়
জমিনে ডালিয়া তারে লিলেক বান্ধিয়া ॥
লস্করেতে লিয়া গেল ওস্কার উস্কিয়া *
বাজিল বাহুড়ি ডঙ্কা ফিরিল লস্কর ॥
লড়াই হইল বন্দ হয়রান কুফর *"

—পৃ. ২২০।

'আমীর হামজা'র অপর এক লড়াইয়ের বয়ানে কবির উক্তি—

"আল-াকে ইয়াদ করে আমির পাহালওান॥
এয়ছা হাক মারে জেন গিরিল আছমান *
ঘোড়া হইতে ওঠাইয়া বরহানার তরে ॥
ঘোমাইয়া আছাড় মারিল জমি পরে *
এয়ছাই জোরেতে হামজা মারিল পটকান॥
দুই ঘড়ি বরহানার না ছিল চেতন॥ "

—পৃ. ১৯৮।

এবার কবি **মোহাম্মদ খাতেরের 'সাহানামা' থেকে লড়াইয়ের বয়ানের একাংশ** হাজির করা হবে। যথা—

"বেছা তবে লস্কর লইয়া আপনার ॥
আইল ময়দান পরে বলে মার মার
দুই দলে মোকাবেলা হইল লস্কর ॥

www.pathagar.com

মউজ উঠিল জেন দরিয়া উপর *
জঙ্গের তবল বাজে ভেউর করনাল ॥
সেপাই কোদায় ঘোড়া হৈয়া মস্তহাল *
মার ২ ধর ২ হৈল সোর সার ॥
ধুলাতে হইয়া গেল ময়দান আন্ধার *
নেজা গোর্জ্জ তলওার লইয়া সবাই ॥
দু'দলে ঝুকিয়া সবে করিল লড়াই *
তেগ তলোয়ারে চলে জত আছওার ॥
ইরানি তুরানি গেরে হাজারে হাজার*
মারে তেগ বেদেরেগ জোরেতে খেচিয়া ॥
পায় জারে নাহি ছাড়ে দেয় গেরাইয়া*
মারা গেল দুই দলে বহুত লস্কর ॥
লহুর তুফান চলে ময়দান উপর *"

—পৃ. ১৮৩।

কবি মোহাম্মদ খাতের-এর এই মহাকাব্যিক-ভাষা আধুনিক কালের মহাকবি কায়কোবাদ, নবীনচন্দ্র সেন ওগয়রহের কাব্য-ভাষা থেকে উৎকৃষ্ট বই নিকৃষ্ট নয়।

এবার ১২৮৪ বনাম ১৮৭৭ সালে **কবি দোস্ত মোহাম্মদ-বিরচিত "আদি ও আসল জেহাদে হায়দর/জঙ্গে খয়বর"-কাব্য থেকে** আহরিত নিচের বয়ানের প্রতি মনোযোগ দেয়া যেতে পারে—

"এমন জোরেতে ফেলাইল পাহালওান।
কাঁপিতে লাগিল তার ধমকে আছমান*

--- ---- ---- ----- ----- ----- ---

বোলন্দ দেউড়ি তার বড়া উচা শান ॥
চারিদিকে ছিল তার শাহানা দালান।
জমরূদের তখ্‌ত এক শাহানা উপর
জড়াও চমক মারে চান্দ বরাবর *"

--- ---- ---- ----- ----- ----- ---

শুনে দেও গোস্বা ভরে গোর্জ্জ উঠাইল ॥
গোর্জ্জের মাথায় আলী তলওার মারিল
জুলফিক্কার গোর্জ্জে পরে লাগিল জখন
বিজলি সমান আগ উঠিল তখন *"—পৃ. ৮৮।

www.pathagar.com

অপর নমুনা—

"আছিল আজদাহা এক সিন্দুক ভিতর ॥
দুই চক্ষু আছমানের তারা বরাবর
আগুন বাহির হয় মুখ দিয়া তার ॥
ধুয়াতে তামাম ঘর হইল অন্ধকার *".....

—পৃ. ৮৯।

এ-সব রচনার কাব্য-ভাষার চমৎকারিত্ব শ্রদ্ধাবান পাঠকের নজর আকর্ষণ না ক'রে পারে না। কারণ, আধুনিক কবিদের সংস্কৃত নিংড়ানো কর্কশ ও দুর্বল কাব্য-ভাষার কৃত্রিমতা এতে নেই। আলোচ্য ধারার শায়েরী কেতাবের কবিদের কাব্য-ভাষা অভিধানের কেতাবী ভাষা নয়; তা জন-জীবনের আবেগ-অনুভূতির সাথে জড়িত, পরিচিত ভাষা, পল-বিত ও কুসুমিত ভাষা। হাঁক, তারিফ, আলম, জমিন, লস্কর, লড়াই, হয়রান; ইয়াদ, এয়ছা, আছমান, আছাড়, পটকান, ময়দান, মোকাবেলা, মউজ, দরিয়া, আছোয়ার, তেগ, বেদেরেগ, ময়দানের উপর লহুর তুফান, শান, শাহানা দালান, চমক, আজদাহা, আগ, **তামাম; "কাঁপিতে লাগিল তার ধমকে আছমান", "বিজলি সমান আগ উঠিল তখন", "লহুর তুফান চলে ময়দান উপর" ইত্যাকার শব্দ ও বাক্য-পংক্তির অসাধারণত্ব অস্বীকার করা যায় না।**

বলা দরকার যে, শায়েরী কাব্যের কবিদের এই নিপুণ ভাষা-শৈলীর সাথে যখন তাঁদের অলংকার-চেতনা যুক্ত হ'য়েছে—তখন সে-রচনা কতটা রসময় ও কাব্যগুণান্বিত হ'য়ে উঠেছে—তা,একটু শ্রদ্ধা-ভালবাসার সাথে নিচের আলোচনার দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে।

ছন্দজ্ঞান

বটতলার সাহিত্যের আলোচক-গবেষকগণ, এই সব কাব্যের কবিরা 'কাব্য-প্রকরণ' সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিনা, সে-বিষয়ে কখনও দরদ ও সহানুভূতি নিয়ে আলোচনা করেন নি। তাঁরা তাঁদের 'শিক্ষিত' ব'লেই মনে করেননি। তাই তাঁরা তাঁদের সাহিত্যিক জ্ঞান, বিশেষতঃ কবিতার প্রকরণ বা ছন্দ-অলঙ্কার নিয়ে ভাববেন, এমনটি আশা করা যায় না। আধুনিক জহুরীগণ সে-কথা ভাবুন আর নাই ভাবুন, এ-বিষয়ে খোঁজ-খবর নিলে জানা যায়, **বটতলার মুছলিম কবি-মুছান্নেফগণ আরবী, ফারছী, উরদু কাব্যের ঐতিহ্য ধারায় সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁরা ফারছী কাব্য-প্রকরণের উত্তরসূরী রূপে বাঙালা কাব্যের ছন্দ-চর্চা ক'রেছেন। তাঁরা যা-কিছু কাব্যাকারে লিখেছেন; তা ছন্দের শর্ত**

www.pathagar.com

মেনেই—লিখেছেন। তাঁরা সচেতনভাবে কবিতার চরণে চরণে যতি, মিল ও অক্ষরের হিসাব রেখে—হিসাব মেনেই পয়ার, ত্রিপদী, ভঙ্গ ত্রিপদী ইত্যাদি কাব্য-প্রকরণ বা ছন্দের কাঠামোগত রূপায়ণ ঘ'টিয়েছেন।

শায়েরী কেতাবের কবিরা যে ছন্দ-সচেতন ছিলেন, তার নজীর হিসেবে পূর্বোক্ত কবি দোস্ত মোহাম্মদের 'জঙ্গে খয়বর' থেকে কোট্ করা নিচের অংশের ওপর নজর আকর্ষণ করা যায়।

"কেতাব মাফিক কথা **বাঙ্গালা** ভাষায় ॥
শুনাইব যদি কেহ্ শুনিবারে চায় *
**পদ যদি সমান না পাও কোন ঠাঁই ॥
তাহাতে আমার দোষ নাহি দিবে ভাই *
কেননা ফারছির কথা বাঙ্গালা করিতে ॥
হরেক চিজের নাম হইবে লিখিতে *
একারণে ঠিক ঠাক চৌদ্দ হরফেতে ॥
সর্ব ঠাঁই না পাইবে এই পুস্তকেতে *
দু'এক হরফ কভু বেশী হবে ভাই ॥
আল্‌ফাজ ফারছির জন্য মোর দোষ নাই *
কিন্তু পড়িবার কালে ওজন সবার ॥
সমান হইবে বটে হানি নাহি তার *
ফলাবর্গে দু'হরফে এক-ই জানিবে ॥
তবে আনন্দেতে মোর পুস্তক পড়িবে ***"

—পৃ. ৭।

এ-রকম ছন্দ-চেতনা আলোচ্য কাব্য-ধারার অপরাপর কবিরও ছিল। তবে তাঁরা কেউ দোস্ত মোহাম্মদের মত এমন ভাবে ভেঙে ব'লেছেন কিনা, তা জানা যায় না। অনেক কবি-ই তাঁদের রচনায় একথা ব'লেছেন যে—

"পুস্তকের আখেরেতে আরজ আমার ॥
দেল লাগাইয়া সোন জত বেরাদর *
কিতাব লিখিতে কত করিয়াছি **সেকি** ॥
আল-তাতালা মাফ কর আমার গোস্তাকি *
পদ মেলাইতে জদি বেশি হ'য়ে থাকে ॥
ইয়া এলাহি মাফ্ কর অধম বান্দাকে *"

প্রায় এক-ই রকম কথা ব'লেছেন—**কবি আছমতুল্লাহ্**। তিনি তাঁর "বিবি

www.pathagar.com

ফাতেমার জহুরা নামা”-য় ছন্দ -চেতনার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

“সকলের পদে মোর এই নিবেদন ॥
সায়েরের যোগ্য আমি নহে কদাচন *
কত২ কত কবিকার সায়েরি করিল ॥
মুক্তার হার যেন বানাইয়া দিল*
আমি হিন খাকছার গরিব লাচার ॥
সাইর করিতে কিবা যোগ্যতা আমার *
সাইরির বিচে যদি ভুলচুক পাবে ॥
মেহের চাদরে তারে ছাপাইয়া দিবে *
শুদ্ধ-অশুদ্ধর কিছু না ধরিবে ভুল ॥
অক্ষরের কম বেশী না করিবে তুল”

অপর এক কবি **মোহাম্মদ তাজিম**, তাঁর “ছহি মহাতাব ও গোলে লাল” কিতাবের “গ্রন্থারম্ভে” লিখেছেন—

...“মণ্ডলের পুত্র নাম কবির তাহার ॥
কহিল পুস্তকাকার কর না তৈয়ার *
বাঙ্গলা সাএরে ভাই কর এক পুথি ॥
পড়িয়া শুনিয়া লোকে জাতে হবে প্রিতি *
তাহার খাহেস আমি এড়াইতে নারি ॥
পদবন্দ করিলাম **বাঙ্গালায়** সাএরি *
সজ্ঞানের মত নহে এসব কাহিনি ॥
অবিচারে কেহ জেন মন্দ বল জানি *
এ চোদ্দ অক্ষরে পদ দেখহ শুনিয়া ॥
জদি চুক থাকে তবে পড় সম্বরিয়া *”

এভাবে বহু পুথি-কিতাবে শায়েরানের ছন্দ-চেতনা, অক্ষর-চেতনা ও ফলা-বর্গের হিসাব-নিকাশের পরিচয় আছে। এ-সব পরিচয়ের নিকটস্থ হ'লে বোঝা যায়; তখনকার ঐতিহ্য অনুযায়ী কবিরা চোদ্দ হরফে পয়ার রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। তবে **নানা কারণে পদের মাত্রা-গণনায় কোন কোন চরণে বেশি-কমি দেখা গেলেও, কবির নজর ছিল—কিতাব-পড়ুয়া যেন প'ড়বার সময় “ওজন” ঠিক ক'রে পড়েন। বলা দরকার, এই ওজন ছিল সংগীতের “ওজন”। কারণ শায়েরদের এসব কিতাব সুরসহযোগে পঠিত হ'ত। আজকের কবিতার মত, সেগুলোর**

ওপর কেবল চোখ বুলিয়ে যাওয়া হ'ত না। কিবা আবৃত্তি করা হ'ত না।

তাছাড়া, কবিরা কেবল পয়ার-ই লেখেননি। সেই সাথে ত্রিপদী, চৌপদী, পঞ্চপদী প্রভৃতিরও রূপদান ক'রেছেন। নজীর হিসেবে আদ্যন্ত খণ্ডিত "ছয়ফল মুল-ুক ও বদিউজ্জামাল" কেতাবের পনের থেকে একশ' চব্বিশ পৃষ্ঠার দরমিয়ানে প্রাপ্ত পয়ার, ত্রিপদী, ভঙ্গ ত্রিপদী, চৌপদী, পঞ্চপদী, চুট্‌কী, সিন্দরিয়া চুট্‌কি ইত্যাদির নজীর দেখানো যায়।

একাব্যে নিহিত সাত রকম ছন্দের সাতটি নমুনা নিচেয় তুলে দেয়া হ'ল—

১. পয়ার—

"সাহাজাদা দেখে রঙ্গ হয় চমৎকার ॥
আকিক পাথরে ঘর কৈরাছে তৈয়ার *
দূর থেকে দেখে যেমন জেলেছে আগুন ॥
অন্ধকার রাত্র হয় জ্যোতিতে রৌশন *
ঘরের ছুরতে সাহার জীউ হইল তাজা ॥
চৌদিগে ঘুমিয়া দেখে নাহি তার দরওাজা*
সাহাজাদা আচরিতে ভাবে মনে ২ ॥
বেগর দুয়ার ঘরে যাইব কেমনে *

—পৃ. ৪০।

২. ত্রিপদী—

"ছায়াদ ধ'রে জোরে, জমিতে খাড়া ক'রে
দেখে সাহা ছায়াদের মুখপানে॥
দেখিয়া ছুরত তার, বেহুসিতে বেকারার
হাতি হৈতে গিরিল জমিনে *
ভুমে গড়াগড়ি যায়, সবে বলে হায় ২
কি করিব এহার তদ্বির ॥
সবে মিলে এই কয়, মোর মনে এই লয়,
বিদেশী হইবে যাদুগীর*"

—পৃ. ৬৪।

৩. ভঙ্গ ত্রিপদী—

"রসে রসবতী, রসে সারা রাতি,
রসে ২ কহে বাত॥
নাগর নাগরী, নহে ত অন্তরী,

www.pathagar.com

পোহাইল রস-রাত*

বহুত দিবসে, অনেক অম্বেসে,
পাইয়াছিল এক নিশি।
না পুরিল আশ, ভাঙ্গিল সে রস,
দারুণ ফজর আসি*"

—পৃ. ৮২।

৪.চুট্‌কী ত্রিপদী—

"সাহাজাদা	ভাবে খোদা	নিরখিয়া দেখে॥
আগপ্রায়,	জ্যোতিময়	পাথর আকিকে*
বালাখানা	আমিরানা	আকিকের লাদা॥
তার জ্যোতে,	আগ হৈতে	চমক জেয়াদা*
সাহাবরে,	মনে করে,	যাব একে দেইখে॥
কিবা আছে,	দেখিপাছে	মহল আকিকে*"

—পৃ.-৩৯।

৫. সিন্দ্‌রিয়া চুট্‌কি ত্রিপদী—

"মুখ পুর্ণশশী	মন্দা ২ হাসি,	বচন মধুর ধারা॥
নয়ানে কাজল,	কপালে সিন্দোল,	মাঝে দুই আঁখি তারা*
রঙ্গের জেওর	রঙ্গিন কাপড়	বুকে ডালিম্ব শোভে॥
খোস বাস বিকসে	মধু পিবার আসে,	ঘুমে ভোমরা লোভে*
আন্ধারেতে ধুপ	হেন সমরূপ,	ভাব কে দেখিয়াছে॥
যে দেখে যে শোনে,	ধন্দ লাগে মনে	ভেবাচেকা হইয়াছে*"

—পৃ. ৮৭।

৬. চৌপদী—

"মালেকারে যে পাহাড়ে ২
যেই মতে তিলিছমাতে রাখিল দানব জাতে,
যেই মতে মারে দানবেরে ॥

যেথা যেই তামাসা দেখিল ২
যেথা খাইল যেই ফল, দেখাইল সেই সকল,
দেখে পরী তাজ্জব হইল*

www.pathagar.com

তারিফ করেন সাহা জাদার ২
সাবাস ২ মর্দ, আক্কেল হিম্মত হর্দ্দ,
হেন বুঝি না হইল আর॥
সারথি চালায় রথ ঝুমে ২,
চলে অতি তরাতর, মুল_ক করিয়া ছফর,
গেল গোলেস্তা এরোমে *"

—পৃ. ১১৯।

৭.পঞ্চপদী—

"মালেকা শুনিয়া এই বাণী, আরম্ভিল দুখের কাহিনী।
কহিতে দুখের কথা অন্তরে দারুণ বেথা,
ঝর ২ ছাড়ে আখের পানি*
কহিতে না পারি সে বচন, ক্ষণে কহে ক্ষণে সে কান্দন।
সঙ্গেতে সহস্র সখী, বাগানে তামাসা দেখি,
আচম্বিতে দানব দুর্জন *
ছিনু আমি বকুলের তলে, থাপা মারি নিল মোরে কোলে
মা মা বলিয়া ডাকি চাহি রহে সব সখী
উড়ে গেল কুকাফ জঙ্গলে ॥"

—পৃ. ৫৩।

বলা দরকার যে, আলোচ্য কবি এ-সব ছন্দ এ-কাব্যের একাধিক জায়গায় একাধিকবার ব্যবহার ক'রেছেন।

এ-রকম ছন্দ-বৈচিত্র্য অপরাপর মুছলিম কেতাবেও পাওয়া যায় এবং সে-সব কিতাবে আরও পাওয়া যায়—ছন্দ, গীতি এবং তাল-আদির নাম।

অতএব,এ-কালের বিবেচনায় ঐ সব "মূর্খ" কবি যে, একেবারেই ছন্দ-জ্ঞান-বর্জিত মূর্খ ছিলেন না; তা কবুল না ক'রে উপায় নেই।

ঘ. অলংকার-চেতনা

আধুনিক কাব্য-বিচারকদের অজানা নয় যে, কাব্য-কবিতায় অলংকার অপরিহার্য। অলংকার ছাড়া 'কবিতা' হয় না। পদ্য হয় মাত্র। আর **অলংকার দু'রকম। শব্দালংকার ও অর্থালংকার। শব্দালংকার শব্দকে আশ্রয় ক'রে আর অর্থালংকার অর্থকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পায়।** তাই শব্দালংকারে পাওয়া

www.pathagar.com

যায়—শব্দের ব্যঞ্জনা; যা এক-ই ব্যঞ্জন বর্ণের বার বার উচ্চারণ বা নুপুর-নিক্কণ থেকে শোনা যায়, বোঝা যায়। আর অর্থালংকারে পাওয়া যায়—অর্থের ব্যঞ্জনা বা কাব্যময় উক্তি ও তার অর্থ-প্রসারণ। যাকে কোন কোন কবি ব'লেছেন—'ব্যঞ্জনার সঙ্গে উদ্‌ঘাটন'। এই ধরনের চরণ জোর ক'রে বানানো যায় না, তা হ'য়ে ওঠে। ছেরেফ পদ্যের সাথে কবিতার এখানেই ফারাক। পদ্য বানাতে হয় বা বানানো হয়। আর 'কবিতা হ'য়ে ওঠে'। তা আপনি 'জন্মায়'।

যা হোক, এবার দেখা যাক, মুছলিম কবিদের লেখা শায়েরী কেতাবে—কাব্যে-মহাকাব্যে উক্ত 'হ'য়ে ওঠা' পাওয়া যায় কিনা। দেখা যায় কিনা—কবিতার নজীর হিসেবে তাতে—শব্দালংকার-অর্থালংকার।

শব্দালংকার ও অর্থালংকার

মুছলিম কবিদের রচিত পুথি-কেতাবে সচেতন অলংকার-সৃষ্টির কোশেশ ও দেখা যায়। তবে ভাল-মন্দ ভেদে বিভিন্ন কবির কাব্যে অলংকার-সৃষ্টির অধিক্য বা স্বল্পতা দেখা যায়। যাঁরা ভাল কবি, তাঁদের কাব্যে উত্তম ও অধিকসংখ্যক অলংকারের পরিচয় পাওয়া যায়। এ- সব অলংকারের মধ্যে শব্দালংকার ও অর্থালংকার উভয়-ই বিদ্যমান। নিচেয় পুথি-কেতাবের নানা কবির কাব্য থেকে এরকম কিছু সংখ্যক শব্দালংকার ও অর্থালংকারের নজীর হাজির করা হ'ল—

১. শব্দালংকারের নজীর

ক. কবি আজিমুদ্দীন-রচিত কাব্যেতিহাস "ফুতুহশ্বাম"—এর পহেলা 'জেলদ' (খণ্ড) থেকে—

i. "কান মন দিয়া শোন দিন দার ছারে*"

—পৃ. ১৮।

ii. "জার জার বেকারার হইয়া কাঁদিল ॥
আল-ার মনজুর যাহা কে খণ্ডাবে বল॥"

—পৃ. ২৭।

iii. "শাম ফতে দিবে ফতে ফারেছ যে আর ॥
এই মত রহিয়াছে তোমার কারার*"

—পৃ. ৩৭।

iv. "মালেকুল মওত আমি আজরাইল নাম ॥
জানকে কবজ করা আমার যে কাম*"

—পৃ. ৫৬।

www.pathagar.com

v. "খত পেয়ে আপে আবু আবিদা ছরদার ॥
হাজার হাজার করে শোকর খোদার*"
—পৃ. ৪৮৭।

উপরের পাঁচটি কোটেশনের প্রথমটিতে 'র' এবং 'ন', দ্বিতীয়টিতে 'জ' এবং 'র'; তৃতীয়টিতে 'ফ' এবং 'র', চতুর্থটিতে 'ম' এবং 'জ' আর শেষ চরণদ্বয়ে 'আ' (যদিও এটি স্বরবর্ণ) এবং 'র'-এর শব্দালংকার সৃষ্টি হ'য়েছে। এ-সব চরণে স্বাভাবিক ভাবেই অলংকার সৃষ্টি হ'য়েছে। জবরদস্তির নালিশ করা চলে না।

২. অর্থালংকারের নজীর—

এবার ঐ এক-ই কবির এক-ই কাব্য থেকে অর্থালঙ্কার তথা রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির কয়েকটি নজীর নিচেয় হাজির করা হ'ল—

i. "আমাদের হামলাতে না টলিল তারা ॥
অচল অটল থাকে পাহাড়ের পারা*"
—পৃ. ২৫।

ii. "তাড়া ক'রে মারি মোরা হরকলের দলে ॥
কলাগাছ সব কেটে লুটাই ভুতলে*"
—পৃ. ২৫।

iii. "নর্তন কুর্দন আগে হ'তে ছিল যাহা ॥
সিংহ গরজনে এবে ঠাণ্ডা হ'ল তাহা*"
—পৃ. ৩৭।

iv. "অতএব নিজে তুমি হও সাবধান ॥
এখনি তলওয়ারে তেরা নেকালিব জান *
হেন কথা আজরাইল-মুখেতে শুনিয়া ॥
খালেদ সিংহের মত উঠিল গরজিয়া *
বাঘ ও সিংহের যুদ্ধ যে-সে কথা নয়॥
যে যাকে পাইবে হাতে ছাড়িবে না তায় *"
—পৃ. ৫৪।

v. "ছহিল নামাতে রাবি করিল বয়ান ॥
আমার ছওয়ারী ঘোড়া ছিল তেজিয়ান *
লাগাম ছাড়িয়া আমি দিলাম ঘোড়ার ॥
ছুটিল আমার ঘোড়া বিজলী আকার *"
—পৃ. ৭৬।

www.pathagar.com

বলা দরকার যে, এসব বয়ানের মধ্যে মহাকাব্যে নিহিত পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, অগ্নি-বিদ্যুৎ ও বাঘ-সিংহের মত চমৎকার ও বিশেষত্বময় রূপক-উপমাও বিদ্যমান। আর তা আলোচ্য বিজয়-অভিযানকে কেবল ইতিহাসের মধ্যে সীমিত না রেখে মহাকাব্যের দোর-গোঁড়ায় পৌছে দিয়েছে।

এ-রকম নজীর কেবল 'ফুতুহ্-শ্বামে' নয়; অপরাপর শায়েরী কেতাবেও পাওয়া যায়। নজীর হিসেবে শেখ মোহাম্মদ মুন্সী-বিরচিত "সহিদে কারবালা"র নিচের কোটেশনগুলোয় নজর দেয়া যায়। যথা—

১. শব্দালংকারের নজীর—

ক. "এহাল দেখিয়া জানে নাহি যায় সহা ॥
দুসমনের নেসান না পাওয়া যায় তাহা *
আহা ভাই উঠো উঠো উঠে কথা কও ॥
আমাকে অনাথ ক'রে কোথা তুমি যাও*"
—পৃ. ১৬৭।

খ. "ঘরে ঘরে ফেরে সবে তাল্লাস করিয়া ॥
ঢোড়ে সবে গলি গলি দোহার লাগিয়া ॥"
—পৃ. ২২২

গ. "গোশ্বায় জলিয়া তবে আরব্বি ছওয়ার॥
কুফিকে কাটিয়া চলে হাজার হাজার *
----- ----- ----- ------ ------ -
আরব্বি ছওয়ার এক পালোয়ান ছিল ॥
এয়ছা তেগ বেদেরেগ চালাইয়া দিল ॥
পাচ হাজার খারেজিন দোজখে পাঠায় ॥
আখেরে সহিদ হৈল দস্ত কারবালায়*"
—পৃ. ২৭৫।

ঘ. "এই পাহালওান জান নওাছা নবির ॥
আলীর জে পোতা এই মাফিক আলীর*"
—পৃ. ২৯৫।

ঙ. "এয়ছাই করিল জঙ্গ, খারিজানে লাগে ভঙ্গ,
জঙ্গ ছেড়ে পালাইয়া যায়।".....
—পৃ. ৩০১।

www.pathagar.com

পষ্টই পহেলা নজীরে 'হ', 'ন', 'স', 'ঠ' এবং 'ক' বর্ণের; দোছরা নজীরে— 'গ', 'ঘ', 'র' এবং 'ল' বর্ণের; তেছরা নজীরে—'ক', 'হ', 'জ', 'র' এবং 'গ' বর্ণের; চৌথা নজীরে—'ন' এবং শেষ নজীরে—'র', 'ল' এবং 'ঙ্গ'-(জঙ্গ, ভঙ্গ ও ফের জঙ্গ শব্দের ব্যবহার) যুক্ত বর্ণের ব্যবহার যে-চমৎকার ধ্বনিস্রোত সৃষ্টি ক'রেছে—তার সৌন্দর্য-মাধুর্য ও শব্দালংকারগত তাৎপর্য—কেউ না-কবুল ক'রতে পারে না।

ঐ এক-ই কবির এক-ই কাব্যে যে-সব অর্থালংকার পাওয়া যায়–তা নিম্নরূপ—

২. অর্থালংকারের নজীর—

ক. "শুনিয়া জওাব দিল জত খারিজান ॥
আবদুল্লা গোস্বায় আছে আগুন সমান *
ওজর করিল সবে নানান প্রকারে ॥
আবদুল্লা বরদাস্ত আর করিতে না পারে *
তখনি কুদিয়া পড়ে কাফেরের দলে॥
বাঘ যেন সান্দাইল ছাগলের পালে*"
—পৃ. ২৮৫।

খ. "যাহার ছেরেতে মারে খেচিয়া তলওার ॥
গুড়ি কাঠ চেরে জেয়ছা তেমনি প্রকার*"
—পৃ. ২৮৬।

গ. "কত সত খারিজানে তেগ তলে দিল ॥
কারবালায় খুনের নদী বহিয়া চলিল *"
সের নর মত এয়ছা তলওার চালায় ॥
কাটিয়া হাজার কুফি জমিনে গেরায় *"
বিজলি চমকায় জেন তলওারের ধার ॥
এক চোটে কত কাটে জানে পরওার*"
—পৃ. ২৮৭।

ঘ. "গর্দান হইতে ছের জুদা হয় তার ॥
গিরিলেন জমি পরে পাহাড় আকার*"
—পৃ. ২৯৭।

www.pathagar.com

ঙ. "আলি আকবরে দেখে সকলেতে বলে
আছমানের চান্দ বুঝি পড়িল ভূতলে" *
—পৃ. ৩১৩।

উপরে উপস্থাপিত পাঁচটি নমুনা থেকে কবি শেখ মোহাম্মদ মুনশীর কবিত্ব-শক্তির প্রতি কারও কোন সন্দেহ হ'তে পারে না। তাঁর রচিত ৪৫৪ পৃষ্ঠার বিরাট "সহিদে কারবালা"র বহু স্থানে এরকম চমৎকার কাব্যালংকারের নজীর পাওয়া যায়।

এবার একখানি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের ছায়ায় রচিত 'বাঙালা বিজয়ের ইতিহাস'-বিষয়ক কাব্য থেকে শব্দালংকার ও অর্থালংকারের কিছু নজীর হাজির করা হবে। এ-কেতাবের নাম—"গাজি-কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি"। শায়েরের নাম—আবদুর রহীম।

১. শব্দালংকারের নজীর—

ক. "দিনমণি কমলিনী, আর কুমুদিনী ধনি,
ধন্য প্রেমের প্রশংসা জগতে ॥
পতঙ্গ পুড়িয়া মরে, শ্রেষ্ঠ প্রেমী বলি তারে
প্রাণ দিয়া মিশে প্রিয়া সাথে*"
—পৃ. ১৮।

খ. "চরণে পড়িল কেশ দীর্ঘ সে এমনি ॥
কাল হইতে কাল জিনি কাল ভুজঙ্গিনী*"
—পৃ. ২৭।

গ. "তার রূপ অপরূপ ত্রিভুবনে নাই ॥
হুর পরী মানিবেঁক তাহারে গোসাই*"
গন্ধর্ব কিন্নর দেব ছার তার কাছে ॥
অপরূপ রূপ সেহ বিধাতা গ'ড়েছে*"
—পৃ. ৩৩।

ঘ. "বসিছেন শাহা গাজি রত্ন সিংহাসনে ॥
সোনার নিশান খানি উড়ে চারি কোনে*"
—পৃ. ৫৭।

www.pathagar.com

ঙ. "সেনাগণ রনে সাজে, নানা ইতি বাদ্য বাজে
শব্দে তার যায় কান ফেটে ॥.....
ঢোল বাজে তিন লাখ, দুই লাখ জয় ঢাক,
রাম কাড়া বাজে কত কত ॥
বাজে ডঙ্কা রায় বাঁশী, মৃদঙ্গ দামামা কাশী,
বাজে আর বাজা কত শত *"
—পৃ.-৬৫।

বলা দরকার যে, উপরের কোটেশনগুলোয় শব্দালংকারের যে-নমুনা র'য়েছে; আশা করি তা আর হরফ ধ'রে ধ'রে তফছির-রচনার জরুরৎ নেই। তবে এটুকু **বলা দরকার যে, উৎকলিত কোটেশন-নিচয়ের কোন কোনটিতে শব্দালংকারের সাথে চমৎকার অর্থালংকারও মিশে আছে। আর যে-সব চরণে এমনটি ঘ'টেছে, সে সব চরণে চমৎকার কাব্য-লালিত্যও ফুটে উঠেছে।**

২. অর্থালংকারের নজীর—

এবার এই কেতাবের কতিপয় অর্থালংকারের নজীর তুলে ধরা হবে।

ক. "এক কন্যা আছে ওগো আমি তাহা জানি ।
নিশ্চয় গগণ শশী সেই বিনোদিনী *
হেন রূপ না পাইছে দেবতা কিন্নর ॥
মুখের আভায় জিনি কোটি শশধর *
আর যে বত্রিশ দাঁতে মিশি লাগাইয়াছে ।
লক্ষ কেটি তারা জিনি উজ্জ্বল করিছে *
জবা ফুল জিনি জিহ্বা তাতে খায় পান ॥
না খাটে উপমা কিবা করিব বাখান *
মৃগের নয়ন তুল্য শোভিত লোচন ॥
জিনিয়া চান্দের ছটা চোখের কিরণ *
চোখ মেলি সেই ধনি যার দিকে চায় ॥
প্রাণ হারা হইয়া সেই করে হায় হায় *
ভ্রমরের বর্ণ জিনি লম্বা কেশ মাথে ॥
দাঁড়াইলে পড়ে কেশ পায়ের পাতাতে *
জোলায়খার কটি তুল্য কটি তাঁর সরু ॥
তাদৃশ নিতম্ব আর পীঠ পাছা উরু *

সুগঠন হস্তপদ কি কহিব মরি ॥
তাহার উপমা নাই ত্রিজগৎ ভরি *"
—পৃ. ১৯।

খ. "রাজার বাটিতে সব মন্দির সোনার ॥
দূরে থেকে দেখা যায় অগ্নির আকার *
তাঁহার ধনের সংখ্যা কহি যে কেমনে ॥
হীরা ও মাণিক্য রাজা কড়ি সম গণে *
নামেতে দক্ষিণা রায় রাজার গোসাঁই ॥
তাহার সমান বীর সংসারেতে নাই *"
—পৃ. ২০।

গ. "বিধুমুখি চাম্পাবতী কাছে আছে বসি ।
জ্বলিতেছে রূপ জিনি লক্ষ কোটী শশী*"
—পৃ. ২২।

ঘ. "কবরী খুলিয়া কেশ দিল আউলাইয়া ॥
কাল মেঘে চন্দ্র যেন ফেলিল ঢাকিয়া *
কালি হইতে কাল কেশ উড়ায় বাতাসে ॥
গাজীর দিকে চায় কন্যা হাত দিয়া কেশে *
লোটন বান্ধিছে কেশ যখন ঝাড়িল ॥
শিলাবৃষ্টি গগনেতে যেমন গর্জ্জিল*
পরে সতী চাম্পাবতী নামে কণ্ঠ জলে ॥
কোটি রবি জিনি অঙ্গ জল মধ্যে জ্বলে *
উপরেতে মুখ খান শোভিত এমনি ॥
যেমন শরৎ শশী লক্ষ কোটি জিনি *"
—পৃ. ৪৬।

ঙ. "ভয়ঙ্কর অঙ্গ অতি পর্বত আকার ॥
হাতীর কানের মত কান দুটি তার *"
—পৃ. ২৪।

এসব অলংকারের মৌলিকতা, জনমন-ঘনিষ্ঠতা আর কাব্য-সৌন্দর্যকে কেউ না-কবুল ক'রতে পারে না। শায়েরী কেতাবে নিহিত এ-রকম সব বয়ান প'ড়তে

www.pathagar.com

প'ড়তে দীনেশচন্দ্র সেন এ-দেশের মুছলিম লোক-কবিদের সম্পর্কে যে-কথা ব'লেছেন, তা ইয়াদ হয়। তিনি "ময়মনসিংহ"-গীতিকার কবিদের কাব্য-শক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে ব'লেছিলেন—"চাষা'দের কবিত্বশক্তি অদ্ভুত।" প্রকৃতই তাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় ময়মনসিংহের লোক-কবিরা ভাগ্যবান। কারণ তারা দীনেশচন্দ্র সেনের নজরে প'ড়েছিলেন। পক্ষান্তরে, শায়েরী কেতাবের কবিরা দুর্ভাগা। কারণ তাঁদের ওপর কোন দীনেশচন্দ্র সেনের নজর পড়েনি। এ-কারণে তাঁদের সৃষ্টির উত্তম রত্নরাজি ছাই চাপা প'ড়েই আছে।

অথচ এসব শায়েরী কেতাব বা বটতলার সাহিত্যের অস্বীকৃত অবদান আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে, উপন্যাসে, রূপকথা-সংকলনে বা লোক-সাহিত্যের ওপর কম প্রভাব ফেলেনি। মরহুম নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাসে" তা বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন।

বটতলার মুছলিম কবিদের মূল্যায়ন

উপরে আলোচিত একশ' বছরের দরমিয়ানে রচিত পঞ্চাশ জন কবির নানা শ্রেণীর রচনার বিচিত্র বৈভবের প্রতি নজর রেখে সাহিত্যিক বটতলার মুছলিম পুথির কবি-মুছান্নেফদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এই মূল্যায়ন কি হ'তে পারে, সে-বিষয়ে আলোকপাতের আগে; বাঙ্লাদেশে ও ভারতীয় বাঙালায় যাঁরা তাঁদের ছিটেফোঁটা মূল্যায়ন ক'রেছেন; পহেলা তাঁদের সে-মূল্যায়নের উল্লেখ করা আবশ্যক। এ-বিষয়ে বলা আবশ্যক যে, বটতলার পুথি নিয়ে বাঙ্লাদেশে ও ভারতে যাঁরা আলোচনা ক'রেছেন; তাঁদের মধ্যে ড. সুকুমার সেন, বিনয় ঘোষ, শ্রীপান্থ প্রভৃতি উলে-খযোগ্য। এঁদের মধ্যে শ্রীপান্থ লিখেছেন—"কারা ছিলেন বটতলার লেখক? রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ যে-তালিকাগুলো পরবর্তীকালের সন্ধানীদের জন্য রেখে গেছেন, তাতে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের স্বনামধন্য এবং বিশিষ্ট লেখকরা যেমন আছেন, তেমনি র'য়েছে অনেক স্বল্প পরিচিত ও অপরিচিতের নাম।...প্রহসন-রচয়িতাদের তালিকায়ও দেখি সুখ্যাতদের পাশাপাশি, কাছাকাছি অখ্যাতদের ভিড়। পুথি-পুস্তিকার লেখকরা তো ব'লতে গেলে সব-ই অভাজন। তাছাড়া র'য়েছেন অসংখ্য ছদ্মনামী"। বলা দরকার যে, শ্রীপান্থ এখানে বিশেষ ক'রে অমুছলিম লেখকদের দিকে নজর রেখেই এ-আলোচনা ক'রেছেন। তাই এ-তরফে বলা জরুরী যে, শ্রীপান্থ বহু অমুছলিম বিশিষ্ট লেখকের নাম উল্লেখ ক'রলেও বিশিষ্ট মুছলিম লেখকদের কারো নাম উলে-খ করেননি। তিনি তাঁর ঐ আলোচনার পরবর্তী অংশে লঙ্-এর তালিকায় নিহিত ৫১৫ জন (১৮৫৫) লেখকের মধ্যে মাত্র দু'জন মুছলমান লেখকের নাম উলে-খ

www.pathagar.com

ক'রেছেন। তাঁদের একজন মুন্‌সী নুরুদ্দীন; অপর জন মুনসী এন্তেজাম রিয়াজা। এঁদের কোন বই-কেতাবের নামও তিনি উল্লেখ করেননি। তারপর শ্রীপান্থ জানিয়েছেন—"এটা ঠিক **বটতলার লেখকরা সুশিক্ষিত ছিলেন না। একথাও মিথ্যা নয়, বটতলা-সাহিত্যের অবদান অনেক ক্ষেত্রেই অতি সাধারণ। কখনও কখনও সে-সাহিত্যে রুচিহীনতা ও স্থূলতাও প্রকট**। কিন্তু তাঁদের সকলকে 'স্কুলবয়' ব'লে খারিজ ক'রে দেওয়া যায় না। বটতলা-সাহিত্যের বিশিষ্ট এক ঘরানা 'রহস্য' বা গুপ্তকথা-পর্যায়ের রচনাগুলো পর্যালোচনা ক'রতে ব'সে প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছেন—গুপ্তকথার লেখকরা অশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা পশ্চিমী সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।" অপরদিকে, **মুছলিম কবি-লেখকরা পশ্চিমী সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকলেও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ছিলেন তাই "বটতলার লেখকরা সুশিক্ষিত ছিলেন না"—এ কথা বটতলার মুছলিম লেখকদের সম্পর্কে বলা যায় না।**

কারণ মুছলিম লেখকরা ছদ্মনামে 'গুপ্তকথা' জাতীয় কোন অশ্লীল লেখা লেখেননি। তাঁরা পশ্চিমী সাহিত্য পড়ুয়াও ছিলেন না। তাই বটতলার মুছলিম-অমুছলিম সকল লেখককে এক সাথে গুলিয়ে ফেলে বিচার করা চলে না। ঐতিহ্যবাদী মুছলিম কবি-লেখকরা গোটা উনিশ শতক ব্যাপী যে-ট্র্যাডিশনাল শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ক'রে এসেছেন, তার দিকে নজর আকর্ষণ ক'রে জেমস্ লঙ্ সেই ১৮৫৭ সালে তাঁদের মূল্যায়ন ক'রে লিখেছেন— "মুছলমানদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোক-ই ইংরেজী স্কুলে পড়াশোনা ক'রতে ইচ্ছুক।...তা' হ'লেও তাদের বেশ বুদ্ধি আছে এবং তারা প্রাচ্য দেশীয় বিষয়সমূহ অধ্যয়ন ক'রতে ভালবাসে। তাঁদের যে মানসিক মৃত্যু হ'য়েছে তা নয়...।" অতএব **তাঁরা ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে না প'ড়লেও দেশীয় শিক্ষার দৃঢ় ও শক্ত ভিত্তির ওপর-ই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাজেই তাঁদের সাহিত্য-সাধনা—বঙ্কিমের ভাষায় 'ক্যালা কা ফুল' ছিল না**। তাই বাঙলাদেশী পুথিবিশারদ জনাব আজহার ইসলামের মত একথা বলা যায় না যে,—"স্বল্পশিক্ষিত শায়ের-কবিরা সাহিত্য কী জিনিস তা না বুঝেই আরবী, ফারছী, উরদু-কন্টকিত মিশ্র ভাষায় স্বজাতির মধ্যে বীরত্বব্যঞ্জক ইছলামের মহিমা কীর্তন ক'রতে গিয়ে আমীর হামজা, হজরত আলী, হানিফা এঁদের শৌর্যদীপ্ত জীবনের ইতিবৃত্তকে শুধু রোমান্সরসের উত্তেজিত কাহিনীর মতো পল-বিত ক'রেছেন। তাতে শায়েরদের উদ্দেশ্য যা-ই থাক, তাঁদের রচিত কাহিনীগুলো যে নিছক রোমান্স রসের-ই গাল্পগল্প হ'য়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সে গালগল্প অবশ্যই অতিলৌকিক বিভীষিকায় ভয়াবহ। এই

www.pathagar.com

পরিচর্যাহীন রচনায় ইছলামের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে, তবে তা কবিদের আজ্ঞাতে কী জ্ঞাতসারে তা বলা মুস্কিল; কিংবা নিছক কাহিনীর পরিপুষ্টি সাধনেও হ'তে পারে। আর শেষোক্ত ধারণা যদি সঠিক হয় তাহ'লে ব'লবো, শায়ের-কবিরা নিজেরাই রোধ ক'রতে পারেন নি তাঁদের স্থূল চিন্তাচেতনা-প্রসূত কল্পনার অতিপল্লবিত বিস্তারকে। আর সেই চেতনায় সৃষ্ট যে-সাহিত্য, সে-সাহিত্য হ'তে পারে গণমানুষের সাহিত্য, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যপদবাচ্য কিংবা সৎসাহিত্যের মর্যাদা পায় না কখনো; যে-কারণে তার অবস্থান স্বজাতি ও স্বসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সাহিত্যের অমরাবতীতে কখনোই তা উত্তীর্ণ হওয়ার স্পর্ধা রাখে না।"

জনাব আজহার ইসলামের পুথি ও পুথির কবিদের বিষয়ে এই মূল্যায়ন, কতটা যথাযথ তা এবার আলোচনা করা যেতে পারে।

জনাব আজহার ইসলামের মত অনেক আধুনিক লেখকের-ই ধারণা; বটতলার পুথি লেখকরা যেহেতু শহরে বাস না ক'রে পাড়াগাঁয়ে বাস ক'রতেন, তাই তাঁদের কোন সাহিত্যবোধ ছিল না। তাঁরা লেখাপড়াও জানতেন খুব-ই কম। একেবারে জানতেন না, একথা যেহেতু বলা চলে না; সে-কারণে তাঁরা খুব কম লেখাপড়া জানতেন ব'লে তাঁদের ধারণা।

কিন্তু এ-ধারণা যদি লেখকগণ একটু দয়া ও কষ্ট ক'রে যাচাই ক'রে নিতে দু'চারখানা মানসম্পন্ন পুথি একটু মনোযোগ দিয়ে প'ড়তেন, তাহ'লে হয়তো তাঁরা অন্য কথা ব'লতেন । **পরিচিত পুথি ও পুথির লেখকদের তাঁরা অপরিচিত মূল্যায়ন ক'রতেন না।**

বটতলার পুথি লেখকরা যে, কত অল্পশিক্ষিত ছিলেন—তার নজীর দিতে তাঁদের তরজমা করা কেতাবগুলোর দিকে নজর দেয়াই যথেষ্ট। ইতোপূর্বে ধর্মীয় কাব্যের আওতাভুক্ত যে **ষোল শ্রেণীর শায়েরী রচনার উলে-খ** করা হ'য়েছে—তার মধ্যে আল্ কোরআন ও 'ছিহাছেত্তা'র (হাদিস) নির্বাচিত অংশের অনুবাদ—পষ্ট রূপেই মওলানা আব্বাস আলী, জনাব আলী প্রভৃতির আরবী (ফারছী-উরদু সহ) ভাষায় গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। মরহুম আব্বাস আলীর "মওলানা" টাইটেলটিরও তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের প্রমাণ দেয়। তারপর 'ফেকাহ্'-এর তরজমাকারী মওলানা আতাউল-াহ্ সিদ্দিকী এবং গোলাম মওলাকেও এক-ই রকম সুশিক্ষিত বই সামান্য শিক্ষিত বলা যায় না। যেহেতু তাঁরাও ছিলেন—বাঙালা, আরবী, ফারছী ও উরদু ভাষায় সুবিদ্বান। শরীয়ৎ, মারেফত, ইছলামী আকিদা, হজ, হালাল-হারাম,

www.pathagar.com

মছলা-মাছায়েল ওগয়রহ সম্পর্কে লিখিত কেতাবগুলোও নিশ্চয় অল্পশিক্ষিত লোকের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। **এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে দশ খণ্ডে প্রকাশিত জনাব আলীর "মোনাব্বেহাত", তিন খণ্ডে লিখিত ফছিহ উদ্দীন-এর "তরিকায়ে মুস্তফা" মশহুর। শাহ্ আবদুল করীমের "মফিজুল ইছলাম", "ফজিলতে হজ্ব" ও "মফিদুল খালায়েক" কেতাবগুলো তো মক্কায় ব'সে লেখা। অতএব, এই কবি যে, হাজী ছিলেন এবং অতি উঁচু মানের আরবী, ফারছী ও হিন্দুস্তানী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।** আলোচ্য রচনাধারার অন্যান্য পীর, মওলা, মওলানা, মুনসী, হাজী কবিরাও যে—**আরবী, ফারছী, উরদু, হিন্দীতে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন**—সে-কথাও না-কবুল করার উপায় নেই। এঁদের মধ্যে **মোহাম্মদ ছায়িদ-এর দশ খণ্ডে লিখিত অসম্পূর্ণ রচনা "তাওয়ারীখে মোহাম্মদী"** ছাড়াও র'য়েছে—"কাছাছোল আম্বিয়া", "খুলাছাতুল আম্বিয়া", এবং "তাজকেরাতুল আউলিয়া", "আখবারুল আউলিয়া" প্রভৃতি। "খুলাছাতুল" আম্বিয়ার অপর কবি মোহাম্মদ খাতের মহাকবি ফেরদৌছীর "সাহানামা" মূল ফারছী থেকে বাঙ্গালায় তরজমা করেন। "আমীর হামজা", "দাস্তানে আমীর হামজা", "আলেফ লায়লা"—যাঁরা রচনা ক'রেছেন—তাঁদের অল্পশিক্ষিত বলার কোন সুযোগ নেই। **আর 'ইরাক', 'সিরিয়া' ও 'মিশর-বিজয়'-এর ইতিহাস যাঁরা একাধিক আরবী ও ফারছী কেতাব পাঠ ক'রে লিখেছেন—জাতিকে উপহার দিয়েছেন, তাঁরা ইংরেজী শেখেননি ব'লে, যদি স্বল্পশিক্ষিত হন; তা হ'লে, সারা দুনিয়ার বৃটিশ-উপনিবেশের বাইরে যে-সব দেশ ও জাতি ছিল—সে-কালে তারাও ছিল স্বল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। তাঁদের লেখালেখিও ছিল প্রতিভাহীন মূল্যহীন। একথা না ব'লে উপায় কি? কিন্তু কেউ কি তা মানবেন?**

যাক, এবার ঐ সাধারণ আলোচনার বাইরে এসে **কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক কবির ভাষাজ্ঞান-এর পরিচয়** তুলে ধরা হবে। এঁদের মধ্যে পহেলা মওলানা মরহুম আব্বাস আলীর উলে-খ করা যায়। তাঁর সম্পর্কে আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদম উদ্দীন লিখেছেন—"মওলানা আব্বাস আলী ১৮৫৯ ইং—১২৬৬ বাংলা, ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বশীরহাট মহকুমার অধীন চণ্ডীপুর গ্রামে এক সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী তমিজউদ্দীন। গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুকাল শিক্ষালাভ করিবার পর তাঁহার চাচা দেশ-বিখ্যাত ওয়ায়েজ ও মুহাদ্দিছ "মুনিরুল হুদা" নামক পুথি-রচয়িতা মওলানা মুনিরুদ্দীন সাহেবের নিকট **আরবী, ফারছী ও উরদু শিক্ষা করেন। এই সময়-ই টাঙ্গাইল করটিয়াস্থিত**

www.pathagar.com

জমিদার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাছায় বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মওলানা আবদুর রহমান কানপুরীর নিকট ১৫ বৎসরকাল আরবী সাহিত্য, তফছীর (কোরআনের ব্যাখ্যা), হাদীছ প্রভৃতি ইছলামী ইলম অধ্যয়ন ও উক্ত মাদ্‌রাছাতেই পরবর্তী ১৫ বৎসরকাল অধ্যাপনা করেন।"....তারপর তিনি স্বগৃহে ফিরে এসে জনহিতকর কাজে নিয়োজিত হন এবং কোলকাতার নূর আলী লেনে "আলতাফী প্রেস" নামে একটি প্রেস স্থাপন করেন।"

মরহুম আব্বাস আলী ঐ প্রেস থেকে—"মোহাম্মদী" নামক ২ পাতার একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ৭৩ বছর বয়সে ১৯৩২ সালে মৃত্যুর পূর্বে অন্ততঃ **সাতখানা গ্রন্থ রচনা** করেন। এগুলোর মধ্যে **আরবী থেকে আল্ কোরআনের পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিহীন তরজমাই তাঁর বিশেষ অবদান**। মরহুম আবুল কাসিম লিখেছেন—"ইহা (কোন) মুছলিম কর্তৃক সমগ্র কুরআন শরীফের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ। ইহাতে আয়াতের নীচে উরদু (ও তারপরে) বাঙালা অনুবাদ ও হাশিয়ায় (পাশে?) ছহীহ হাদীছ হইতে গৃহীত তফছীর দেওয়া হইয়াছে।" তাহ'লে, এ-মহাগ্রন্থ প্রণয়নে আব্বাস আলী তিনটি ভাষায় (আরবী, উরদু ও বাঙালা) দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—তা কবুল না ক'রে উপায় নেই। তাঁর 'ফুতুহুশ্বাম', 'ফুতুহুল ইরাক' ও 'ফুতুহুল মিছর' গ্রন্থত্রয়ও **আরবী ইতিহাস-গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত অথবা ঐ নামীয় মূল গ্রন্থের তরজমা**। তাঁর মছলা-মাছায়েল সংক্রান্ত কিতাবও আরবী, ফারছী ও উরদু কিতাব অনুযায়ী লিখিত। সেকালে যাঁরা আরবী-উরদু জানতেন; তাঁরা ফারছীও জানতেন। সে-কথা মরহুম আব্বাস আলীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এ-বিবরণ থেকে পষ্ট জানা যায়—পুথি-সাহিত্যের এই কবি; কেবল আরবী, ফারছী, উরদু ও বাঙালা ভাষায় সুবিদ্বান ছিলেন না; তিনি ছিলেন—একটি সুশিক্ষিত বনেদী খানদানের আওলাদ, মর্যাদাবান একটি মাদরাছার মুয়ালি-ম (শিক্ষক), প্রেস-মালিক ও কবি।

অতঃপর এই ধারার **অপর কবি মৌলবী হাজী আবদুল মজীদ ভূঁইয়া 'উৎকল সিতারা'র উল্লেখ** করা যায়। এই কবির আদি নিবাস ছিল উৎকলে বা উড়িষ্যায়। তিনি ছৈয়দ হামজার কিতাব প'ড়ে অতিশয় মুগ্ধ হন এবং উড়িষ্যা ছেড়ে কোলকাতায় এসে বসবাস ও কাব্যচর্চা শুরু করেন। **তাঁর লেখা ৪১ খানা কিতাবের মাঝে** মাত্র তিনখানার খবর জানা যায়। এই তিনখানা রচনার মাঝে 'দাস্তানে আমীর হামজা'র তেছরা ও চৌথা (৪র্থ) জেলেদ কবি মূল রচনা থেকে 'ইছলামী জবানে' তরজমা করেন।

তাঁর সম্পর্কে, তাঁর আশ্রয়দাতা মুন্‌শী বিলায়েত হোছেন লিখেছেন—

"আবদুল মজিদ নাম বলিয়া যাহার।
মৌলবী, শায়ের, হাজী, ভুইঁয়া, জমিদার ॥
পুরাতন খানদানী, সিদ্দিকী, পাঠান।
বড়া নেক বক্ত, খুশ মেজাজ, খোস বয়ান ॥
হরেক জবানে ফের শায়েরী তেয়ছাই।
সোনার হারেতে মোতি জড়াও জেয়ছাই ॥
একে একে একচলি-শ লিখিল কেতাব।
উৎকল ছেতারা বলি হইল খেতাব ॥"...

এ-বিবরণে ছাফ ছাফ বলা হ'য়েছে—কবি আবদুল মজিদ একাধারে ছিলেন মৌলবী, মাদ্‌রাছায়-শিক্ষিত কবি, হাজী, ভূ-স্বামী বা জমিদার। তিনি পুরাতন জমিদার শ্রেণীর খানদানী পাঠানের আওলাদ এবং সিদ্দিকী উপাধিধারী। তিনি কাব্য-প্রতিভায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়দানকারী রূপে "উৎকল ছিতারা" (উড়িষ্যার নক্ষত্র) লকবে ভূষিত।

এ-ভাবে আলোচনা ক'রলে দেখা যায়, 'মুছলিম বটতলার পুথি সাহিত্যে'র শায়ের-মুছান্নেফগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন—আরবী, ফারছী, উরদু, বাঙালা ও হিন্দী ভাষায় সুশিক্ষিত। তাঁদের মধ্যে নবাব, জমিদার-খানদানের লোক যেমন ছিলেন; তেমনি ছিলেন, সে-কালের নামজাদা নামজাদা মাদ্‌রাছার আলিম-মুয়াল্লিম, মওলানা, মৌলবী, পীর, দরবেশ ওগয়রহ্‌ও। এঁদের অল্পশিক্ষিত, 'পথের কবি' বলা যায় না। বরং আমরাই অল্প শিক্ষিত এবং পথিক কবি। কারণ **আমরা যেখানে একটা-দু'টা (বাঙালা-ইংরেজী) ভাষাও ভাল ক'রে জানিনে; সেখানে ঐ সব কবির চার-পাঁচটি ভাষায় (আরবী, ফারছী, উরদু, হিন্দী ও বাঙালা) দক্ষতা কম গৌরবের কথা নয়। অল্প-শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নয়।**

অতএব, এ-সব কবি 'স্বল্প-শিক্ষিত' ছিলেন, 'সাহিত্য কি জিনিস তা না বুঝে'ই তাঁরা লিখতেন, তাঁদের রচনা 'প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য নয়', তাঁদের রচনা 'স্বজাতি ও স্বসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমিত' থেকেছে; তাঁদের রচনা 'সাহিত্যের আমরাবতীতে কখনোই উত্তীর্ণ হবার স্পর্ধা রাখে না'—এসব কথা বলা যায় না। যে-সব আলোচক-গবেষক এরকম মন্তব্য প্রকাশ করেন; তাঁরা হয়তো সহজলভ্য তুচ্ছ ও অপদার্থ পুথি-কেতাবগুলোই দেখেছেন—মুছলিম বটতলার পুথি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর দেখাও পাননি। তাঁরা যদি ইছলাম সম্পর্কে লিখিত

www.pathagar.com

উৎকৃষ্ট পুথি-কেতাবগুলোয় শ্রদ্ধাসহ নজরদান ক'রতে পারতেন; অথবা কবি খাতেরকৃত 'সাহানামা'র তরজমা প'ড়তেন; প'ড়তেন—ফুতুহশ্বাম, ফুতুহুল ইরাক, ফুতুহুল মিছের, কিবা 'দাস্তানে আমীর হামজা' (এই গ্রন্থটি প্রথম **১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে আবদুন নবী ৮০ পূর্বে অনুবাদ করেন**), 'কাছাছুল আম্বিয়া', 'তাজকেরাতুল আম্বিয়া', 'কেচ্ছা আলেফ লায়লা'—তাহ'লে ও-রকম কথা ব'লতে সংকোচ ও শরম বোধ ক'রতেন। তাঁরা পুথিগুলোর সাথে পরিচিত হ'লে কখন-ই অমন অপরিচিত মূল্যায়ন ক'রতেন না। আলোচ্য কেতাবগুলো আকারে যেমন বৃহৎ, তেমনি রচনা ও মুদ্রণ পারিপাট্যেও চমৎকার। এমনকি, কোন কোন কাব্য (যেমন—আমীর হামজা) বহু চিত্র-শোভিত ও অলংকৃত।

নজর করা দরকার যে, এই বিপুল পরিমাণ-বিচিত্র-বিষয়ক রচনার মধ্যে একখানাও অশ্লীল রচনার স্থান নেই। তাছাড়া, **মুছলিম শায়ের বা কবিগণ কেবল ধর্মবিষয়ক পুথি-কেতাব রচনা করেননি; সেই সাথে দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস ও রচনা ক'রেছেন। মুছলিম কবিরা ইছলামের বিজয় অভিযানের ইতিহাসের সূত্রে বাঙালা বিজয়েরও আদি ইতিহাস রচনা ক'রেছেন**। তবে সে-ইতিহাস তাঁরা লিখেছেন—প্রেমাভিযানের ধারায়। নইলে সমকালীন বৃটিশ সরকার তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ তুলত নিশ্চয়। মুছলিম কবিরা এই অভিযোগ এড়িয়ে যাবার কৌশল হিসেবেই তাদের লিখিত বাঙালা বিজয়ের ইতিহাসে নানা লৌকিক-অলৌকিক, সম্ভব-অসম্ভব বিষয় ও ঘটনার স্থান দিয়েছেন। আর সেই সাথে তাঁর মুছলিম-অমুছলিম নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য বাঙালা বিজয়ী পীর-দরবেশ, হাজী-গাজী সাহেবানের আত্মার এবং তরবারির শক্তির বিজয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে হিন্দুদেরও ধর্মবল এবং বাহু বলের কম পরিচয় লিপিবদ্ধ করেননি। তারা হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিও ঘৃণা-কটাক্ষ না ক'রে তাদের ভালবাসা ও ন্যায়পরায়ণতার বেদীতে স্থাপন ক'রেছেন। তাঁরা তাঁদের দখল ছেড়ে দিয়ে গাজী শাহ্ এবং বোন বিবির সাথে আত্মীয় সম্পর্ক কবুল ক'রেছে।

তাই মুছলমান কবিরা বটতলার পুথি-সাহিত্যে যা-কিছু উপহার দিন না কেন, তার কোথাও অশ্লীলতা, অনৈতিকতা, ধর্ম-বিদ্বেষ, ভাষা-বিদ্বেষ, ভূমি-বিদ্বেষ বা জাতি-বিদ্বেষের স্থান ছিল না। মুছলিম পাঠকদের চিত্তে হাসির রসময়তা সৃষ্টি ক'রতে, তাঁরা কেউ কেউ দক্ষিণা রায় বা অন্য কোন কোন চরিত্রে দুর্বলতা আরোপ ক'রেছেন, পরাজয় বরণ ক'রতে বাধ্য ক'রেছেন; কিন্তু বিজয় লাভের পর বিজয়ীরা কখনও কোথাও অত্যাচার করেননি।

www.pathagar.com

আধুনিক সাহিত্যে বটতলার পুঁথি ও শায়েরদের অবদান

আধুনিক সাহিত্য-চর্চা, সাহিত্য-প্রকাশ, সাহিত্যের নতুন ধারা নির্মাণ এবং বিষয়বস্তু ও কাহিনীর ইন্‌ফিউশনে বটতলার ভূমিকা এবং সেই সাথে মুছলিম শায়ের ও তাঁদের রচনার অবদান কি রকম, সে-বিষয়ে আলোচনা করা জরুরী। এই আলোচনার শুরুতে পহেলা কোলকাতার 'বটতলা' ও 'বেলতলা'র মধ্যে বিনয় সরকার যে-তুলনা ক'রেছেন—তা কোট্ করা জরুরী। তিনি লিখেছেন—

....."দূর থেকে বটতলায় ব'সে বটতলার বিচার করা যায় না। শুধু কলকাতার বাবু কালচারের প্রতিবিম্ব বটতলা নয়। এক সময় হয়ত তাই ছিল। তবু বাঙালীর জাতীয় কালচারের সঙ্গে যোগসূত্র কোনদিন-ই বটতলা ছিন্ন ক'রে দেয়নি। আজও তাই বটতলা বাঙালী জীবনের এক দিকের প্রতিচ্ছবি হ'য়ে আছে।...এখনও তাই মনে হয়। বাংলার জনসমাজের আসল পরিচয় পেতে হ'লে, বটতলায় যেতে হবে, অন্য কোন গাছতলায় নয়।" একথা কেবল কোলকাতার বটতলা নয়; 'ঢাকার বটতলা' ওরফে চক বাজার সম্পর্কেও সত্য।

বিনয় ঘোষ কোলকাতার বটতলার সাথে বেলতলার তথা চিৎপুর রোড আর বর্তমান কলেজ স্ট্রীটের পারস্পরিক তুলনা দিয়ে লিখেছেন—"কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের কালচার-অভিযান আজ সমুদ্যত। তার কাছে বটতলা আজ অবজ্ঞাত। যে-কোন কুৎসিত সাহিত্য ও কদর্য ছাপা গ্রন্থকে আজ কলেজ স্ট্রীটের কালচার-বাগীশ্‌রা "বটতলার সাহিত্য" ব'লে বিদ্রূপ ক'রে থাকেন। কিন্তু কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলের হরেক রকমের যৌন-সাহিত্য ও পত্রিকাদির দিকে চেয়ে বটতলা শুধু মুচকি হাসে, বোবার মতন চুপ ক'রে থাকে, কোন উত্তর দেয় না। কলেজ স্ট্রীট থেকে বটতলা বেশী দূর নয়; কিন্তু মানসিক দূরত্বটা আজ অনেক বেশী। কলকাতার মধ্যবিত্ত কালচারের স্তরে স্তরে অনেক পলেস্তরা জ'মেছে, তার-ই তলার স্তরে বটতলা, উপরের স্তরে বর্তমান কলেজ স্ট্রীট। কলেজ স্ট্রীট যে বটতলার-ই বংশধর, আজও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বটতলা তাই শুধু বিদ্রূপের পাত্র নয়, তার একটা ইতিহাস আছে এবং একটা বিশেষ কালের সাহিত্যের ইতিহাসে তার একটা ভূমিকাও আছে। বিদ্রূপ করবার আগে কলেজ স্ট্রীটের "কালচার্ড"দের সেটা জানা উচিত নয় কি?" অবশ্যই জানা উচিত। কিন্তু যা জানলে হামবড়া ভাব ধ'সে যায়; তা কেউ জানতে চায় না। সেজন্যেই **বেলতলা যেমন বটতলার খবর রাখে না; তেমনি কলেজ স্ট্রীটের লোকেরাও চিৎপুর রোড দিয়ে হাঁটে না। এক-ই রকমে, মুছলিম বটতলার দিকে হিন্দু বটতলার হাঁটুরেরা তাকায় না ব'লেই মুছলিম**

বটতলার মুছলমান শায়ের-মুছান্নেফরা কি দিয়ে গেছেন, কি রেখে গেছেন—তার ও খোঁজ-খবর কেউ তেমন নেয়নি। নেয় না।

আধুনিক সাহিত্য নির্মাণে বটতলার পুথির দান

বটতলার সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যকে কিছু দান ক'রেছে—এমন কথা অনেকের কাছেই হয়তো পয়েলা চোটে হাসির হুল্লোড় তুলবে। কিন্তু তা তুললেও, একথা সত্য যে, আধুনিক বাঙালা ভাষায় বটতলার ভাষাকে মুছে ফেলা সম্ভব হ'লেও ভাব, ভাবনা ও বিষয়বস্তুসহ ঐতিহ্যের প্রবাহ রক্ষায় বটতলার অবদানকে মুছে ফেলা যায়নি। এখনও যাচ্ছে না। নজীর হিসেবে পহেলা অমর কথা-শিল্পী মীর মোশাররফ হোসেনের "বিষাদ সিন্ধু"র কথা বলা যায়। ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন—জোনাব আলীর "শহীদে কারবালা" প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। এই কাব্য সেই সময় থেকে আজ তক সারা বাঙালায় বিপুল জনপ্রিয়তা ধারণ ক'রে আছে। মীর মোশাররফ হোসেনের "বিষাদ-সিন্ধু" এই কাব্যের-ই প্রভাবে লিখিত এবং বিষাদ-সিন্ধুর তিনটি খণ্ডের প্রকাশ যথাক্রমে ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯০ সালে। এ-থেকে পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মীর মোশাররফ হোসেন তৎকালে জোনাব আলীর 'শহীদে কারবালা'র ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তায় মুগ্ধ হ'য়েই নতুন যুগের নতুন ভাষায় তথা সংস্কৃত-বাঙালায় 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনা করেন। আর **তা মৌলিক রচনা হিসেবে নব শিক্ষিত পাঠকদের নিকট জনপ্রিয় হয়।**

শুধু এই একটি গ্রন্থ-রচনায় নয়; মীর মোশাররফ হোসেনের দোছরা পর্বের প্রায় সব রচনাই বটতলার মুছলিম সাহিত্য-ধারার অনুসরণ মাত্র। যেমন—'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৫), 'হজরৎ ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ' (১৯০৫), 'মদীনার গৌরব' (১৯০৬), 'মোসলেম বীরত্ব' (১৯০৮), 'এসলামের জয়' (১৯০৮), 'হজরৎ ইউসুফ', 'জুমার খোৎবা' ইত্যাদি। এ-সব গ্রন্থ-রচনার উৎস তথাকথিত বটতলা-চকবাজারের-ই শায়েরী কবিদের বই-কেতাব; তাতে কোন সন্দেহ নেই। মীর মোশাররফ হোসেন তাঁর পূর্বসূরী শায়েরী কবিদের-ই রচনা থেকে প্রেরণা লাভ ক'রে যে, উক্ত গ্রন্থাদি রচনা ক'রেছেন; তা বলা অমূলক নয়। আমাদের ইতোপূর্বে প্রদত্ত "উনিশ শতকের পুথি-কেতাবের বিস্তৃত বিষয়-ভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগ" দেখলেই তা বোঝা যাবে।

মীর মোশাররফ হোসেন সচেতনভাবেই যে, আলোচ্য মুছলিম কবিদের ইছলামী ধারার সাহিত্য-উপাদান নিয়ে তাঁর নতুন ভাষায়, নতুন যুগের, নতুন

www.pathagar.com

পাঠকদের তরফে সাহিত্যের ডালি সাজিয়েছিলেন, তা ড. আনিসুজ্জামানের নিচের উক্তি থেকেও সমর্থিত হয়। ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন...." ধর্ম চর্চা নয়, ধর্মীয় আবেগের শস্তা ও জনপ্রিয় রূপায়ণ-ই মশাররফ হোসেনের লক্ষ্য। এখানে তিনি ফিরে গেছেন (তথাকথিত) মিশ্রভাষা-রীতির কাব্যের জগতে ......। এই অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে অচেতন ছিলেন, তা মনে হয় না। 'বিবি খোদেজার বিবাহে'র ভূমিকায় তিনি ব'লেছেন যে, "সমাজের চৌদ্দ আনা লোকের" (যাঁরা অশিক্ষিত এবং পুঁথি সাহিত্যের রসগ্রহণ ক'রে থাকে, তাদের) জন্যে তিনি এই কাব্য রচনা ক'রছেন। (তাঁর) শেষ জীবনের সমস্ত রচনাই এই শ্রেণীর পাঠককে মনে রেখে লেখা। অতএব, ভাবে, ভাষায়, আঙ্গিকে কিছু মাত্র সতর্ক (না স্বতন্ত্র?) হবার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেননি। এ-সব রচনা বহুল প্রচারিত হ'য়ে লেখকের ইচ্ছা পূরণ ক'রেছে"। এ-থেকে ভালভাবেই বোঝা যায় যে, শায়েরী কেতাবের কবিরা তাঁদের রচনার সাহায্যে মীরকে কেবল চির অমর "বিষাদ-সিন্ধু" উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেনি; পরিণামে নিজেদের দলেও টেনে নিয়েছে।

মীর মোশাররফ হোসেনের মত চট্টগ্রামের আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৭৫?) শায়েরী কেতাবের ধারাতেই 'কাসেমবধ কাব্য' (১৯০৫),'জয়নালোদ্ধার কাব্য' (১৯০৭),'তাপসী রাবেয়া' (১৯১৭); ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'স্পেন-বিজয় কাব্য'; মতীয়র রহমানের "এজিদের সভায় হজরৎ জয়নাল আবেদীন', "মোসলেম বধ", "ছোহরাব রোস্তম"; আবুল হোসেন-এর 'মোসলেম পতাকা" "তারিখুল ইসলাম" (১৯২৪), "হাব্শী বাদশা" (১৯২৫), "মিশর বিজয়" (১৯২৬); ইমদাদুল হক-এর "নবী কাহিনী"; বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের "মরুভাস্কর" (১৩৬৪), "কাব্যে আমপারা" এবং তাঁর ইছলামী সংগীতসহ মুছলিম ইতিহাস-ভিত্তিক রচনা 'মোহররম', 'উমর ফারুক' প্রভৃতি কবিতা যে,—সমকালীন এবং পূর্ববর্তী কালের মুছলিম শায়েরদের-ই বিষয়-বস্তুর নব রূপায়ণ, তা কেউ না-কবুল ক'রতে পারে না। কাব্য-নামে এবং বর্ণনাভঙ্গী ও ভাষায় এঁরা ভাষা ও বাক্য-নামে সমকালীন হিন্দু কবিদের রচনাধারায় প্রভাবিত হ'য়েছিলেন সত্য; কিন্তু শায়েরী কিতাব তথা পুথি সাহিত্যের সাথে এঁদের প্রত্যেকের-ই যোগাযোগ ছিল গভীর ও অন্তরঙ্গ। নজরুল ইসলামের মত শক্তিমান কবি পুথি-কেতাবের প্রতি কটাক্ষ ক'রেও, তাঁর ভাষা ও বিষয়-বস্তুকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। পুথি-কেতাবের হামদ-না'ত তাঁর গানে এক-ই রকম ভাষা ব্যবহার সত্ত্বেও নব জীবন পেয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

তাই ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন—"এভাবে নতুন লেখকদের সঙ্গে পুরোনো

www.pathagar.com

সাহিত্য-ধারার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মিশ্রভাষারীতির 'তাজকেরাতুল আউলিয়া', 'কাছাছুল আম্বিয়া', 'জঙ্গনামা', 'শাহনামা' ও 'হাতিম তাই' এবং শাস্ত্রকথার নানা রকম বইয়ের সাধু গদ্যে চমৎকার রূপান্তর দেখতে পাই একালে। সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পুনঃসৃষ্টি একে----বলা যেতে পারে, **কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মূল কারণ স্বতন্ত্র**।" কারণ যাই হোক, আধুনিক কালের কবি-সাহিত্যকরা যে, ১৮-১৯ শতকের সাহিত্যধারার নব-রূপায়ণ ঘটিয়েছেন (পুনঃ সৃষ্টি ক'রেছেন)—তা ঠিক-ই। মূল ধারার কাঠামোটা ঠিক-ই আছে; কেবল বাইরের খোলস ব'দলেছে।

এই বদলের যেমন গুরুত্ব আছে, তেমনি যে ধারা-প্রবাহ অনুসরণ ক'রে বদল ঘটানোর আয়োজন চ'লেছে, সেই ধারার এবং তার বিষয়-বস্তুরও গুরুত্ব কম নয়। তাই তাকে খাটো ক'রেও দেখা চলে না।

বিশেষ ক'রে, জীবন-চরিত ও ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে, ঐতিহ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক মুছলিম ইতিহাস-লেখকদের যে, এই শায়েরী কিতাবের কবিরা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ ক'রতে পেরেছিলেন—তা কবুল ক'রতেই হবে। কোন কোন লেখক একে 'আলীগড়-আন্দোলনের ফল' ব'লে ব্যাখ্যা ক'রেছেন। কিন্তু আলীগড়-আন্দোলনের পূর্ব থেকেই যে, মুছলিম শায়েরগণ আরবী,ফারছী ও উরদু কিতাব অবলম্বনে বিশুদ্ধ ইতিহাস রচনা ক'রে, তা আধুনিক ইতিহাস লেখকদের (১৯ শতকের) হাতে তুলে দিয়ে গেছেন—তা সত্য। জীবনী-রচনার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

নজীর হিসেবে উনিশ শতকে মোহাম্মদ ছায়িদ **এর পাঁচ খণ্ডে লেখা** "তাওয়ারিখে মোহাম্মদী"র অনুসরণে শেখ আবদুর রহীম-রচনা করেন—"হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্ম্মনীতি" (১২৯৪/১৮৮৭)। এমনি ভাবে ১৮-১৯ শতকের শায়েরী কবিদের নির্বাচিত ধারায় জীবন-চরিত ও ইতিহাস-চর্চার আধুনিক কালের প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয়। এ-পর্যায়ের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুছলিম লেখকান শায়েরী কিতাবের ভাষা ত্যাগ ক'রে; ফারছী-বাঙালার বদলে সংস্কৃত-বাঙালা গ্রহণ করেন। কিন্তু **দরদ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা ছিলেন—শায়েরী কিতাবের কবিদের-ই ইতিহাস-চেতনায় আত্মসমর্পিত**। এই ধারার অনুসারীরা যখন সংস্কৃত-বাঙালাও ত্যাগ ক'রে ইংরেজীতে ইছলামের বা নবী করীম-(স.)এর জীবন ও কার্যাবলীর ইতিহাস রচনায় হাত দেন—তখনও মূল দরদ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করেননি। যেমন পাটনার আমীর আলী। এ-বিষয়ে ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন—"পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও খৃষ্টধর্মের তুলনায় ইছলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার যে-প্রয়াস দেখা যায় আমীর আলীর রচনায়, সেই ধারাই অনুকৃত হ'য়েছে—শেখ আবদুর রহীম থেকে শুরু ক'রে মোহাম্মদ কে, চাঁদের রচনায়।"

বলা দরকার যে, শেখ আবদুর রহীম থেকে কে. চাঁদ তক প্রবহমান ধারার সাথে আমীর আলীর নয়; তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পুথি-কিতাবের ঐতিহাসিক ধারাই প্রভাবশীল ছিল। সমকালীন পাদরীদের খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের প্রয়াস এবং তাঁদের ইছলাম-নিন্দা ও নবী-নিন্দার প্রসঙ্গটি মনে রাখলে আধুনিক কালের প্রথম পর্যায়ের ধর্ম ও ইতিহাস-সচেতন আলোচ্য লেখকদের শায়েরী কিতাবের ধর্ম ও ইতিহাস-সচেতন কবিদের রচনাধারার সাথে যুক্ত না ক'রে উপায় নেই। এই ধারাই আরও পরবর্তীকালে মওলানা আকরম খানের "মোস্তফা-চরিতে"র মত গ্রন্থের জন্ম দেয়—যেখানে শায়েরী কিতাবের ভাষাই কেবল ত্যাগ করা হয়নি; বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত দরদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশেষ বিশেষ ইছলামী বিষয়ে—প্রশ্নহীন আনুগত্যের দাবীও পরিত্যক্ত হ'য়েছে। তার ফলে, 'মোস্তফা-চরিতে'র মত ইতিহাস ও জীবন-চরিতগুলো ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদের ছায়ায় দাঁড়িয়ে-পড়া আধুনিক লেখক, গবেষক ও চিন্তাবিদ্‌দের নিকট এবং অমুছলিমদের নিকট যতটা আদর-কদর পেয়েছে, মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদের মত লোকদের নিকট তা পায়নি বরং তা বিরোধিতার সম্মুখীন হ'য়েছে।

সে যাহোক, জীবন-চরিত ও ইতিহাস-রচনার এই গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান ধারাটি—শায়েরী কেতাবের কবিরা পেশাদার ঐতিহাসিক না হ'য়েও যে, সন্ধানী-দৃষ্টি ও অতীত-সচেতনতার পরিচয় দিয়ে পরবর্তীকালের আধুনিক ঐতিহাসিকদের প্রথম পর্যায়ের লেখকদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছেন; তা তাঁদের কম সাফল্যের কথা নয়। কারণ পুথি-সাহিত্যের ধারা জীবিত না থাকলে ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত মুছলমানরা স্বতন্ত্র ধারায় সাহিত্য-চর্চা ক'রতে পারতেন না। তাঁরা সাহিত্য-জগতে আত্মলোপ ক'রতে বাধ্য হ'তেন।

বস্তুতঃ মুছলিম আমলের পেশাদার মুছলিম ঐতিহাসিকদের আরবী-ফারছীতে রচিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য জীবন-চরিত ও ইতিহাস আর একেবারে আধুনিক যুগের পেশাদার মুছলিম ঐতিহাসিকদের ইংরেজী-বাঙালায় (সংস্কৃত-বাঙালায়) লেখা ইতিহাসের মাঝে ফারছী-বাঙালায় (ফারছীর বিকল্প রূপে) লেখা শায়েরী কেতাবের কবিদের রচনার স্থান। তাঁরা যদি সে-সময় ইতিহাস-সচেতন না হ'তেন; তাহ'লে শেখ রেয়াজউদ্দীন আহমদের "আরব জাতির ইতিহাস" (৩ খণ্ড), আবদুল করিমের "ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত" (১৮৯৮), শেখ আবদুল জব্বারের "মক্কা শরীফের ইতিহাস" (১৯০৭);"বয়তুল মোকাদ্দছের ইতিহাস" (১৯১০) ও "হজরতের জীবনী" প্রভৃতি লেখা হ'ত কিনা সন্দেহ। **বিশ শতকের আধুনিক ভাষায় লেখা এই জাতীয় অধিকাংশ বইয়ের উৎস যে শায়েরী কেতাব বা**

মুছলিম বটতলার সাহিত্য, তা সত্য। পরে, এর আরও আধুনিক নতুন নতুন রূপের বিকাশ হ'য়েছে—ফারছী এবং ইংরেজী উৎস-সান্নিধ্যে।

ভাষাগত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বটতলার কবিদের দান

বলা দরকার যে, বটতলার পুথি-সাহিত্যের কবিরা তাদের রচনার সাহায্যে কেবল পরবর্তীকালের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রেরণা সঞ্চার ক'রে যাননি; সেই সাথে তাঁরা পূর্ববর্তী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের ভাষা ও সাহিত্যধারা এবং মানস-পরিবেশকেও সজীব রেখেছেন। তাঁরা ভাষাগত ঐতিহ্য রক্ষায় যে-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন; তার মূল্য এ-কালে কেউ বোঝার কোশেশ করেননি। অথচ তা করা দরকার। নইলে বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার ইতিহাস, জানা-শোনার বাইরেই থেকে যাবে। **বটতলার কবি-মহাকবিদের মূল্যায়ন ব্যতীত বাঙালীর বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ। কারণ আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম তিরিশ বছরের মুছলিম শিক্ষা, সাহিত্য ও ভাষা-চর্চার অব্যাহত গতি এই শায়ের-মুছান্নেফরা নিষ্ঠার সাথে ধ'রে না রাখলে, সংস্কৃত-বাঙালা আর ফারছী-বাঙালা যে, পুরোপুরি দু'টো আলাদ আলাদা ভাষারূপ, তা জানা-বোঝা সম্ভব হ'ত না। অধিকন্তু একথাই সত্য ব'লে চির-সাব্যস্ত হ'ত যে, আঠারো-উনিশ শতকে মুছলমানরা কেউ লেখাপড়া জানত না। তারা ছিল আকাটমূর্খ, আওলাদ-ব-আওলাদ জাহেল। আর বাঙালা ভাষানির্মাণে, পৃষ্ঠপোষণে ও চর্চায় যে, তাদের কোন হাত ছিল; তাও কেউ কবুল ক'রত না। আদি বাঙালা গদ্য রচনায় মুছলমানদের দানের কথা যেমন কেউ জানে না; তেমনি আজ যাকে** 'মিশ্রভাষারীতির কাব্য', 'দোভাষী সাহিত্য', 'বটতলার পুথি', 'ইসলামি বাংলা' বা 'মুসলমানী সাহিত্য' বলা হ'চ্ছে—তাও বলার কোন সুযোগ থাকত না। বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার মূল স্রোতধারা রক্ষায় ১৭৬০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল তক মুছলিম শায়ের-মুছান্নেফরাই নিষ্ঠার সাথে সাহিত্য-চর্চা ও জনগণের রস-পিপাসা নিবারণ ক'রে এসেছেন, **তাঁরা ইতিহাসের এই প্রয়োজন না মেটালে বাঙালী মুছলমানরা ছোট নাগপুরের ওঁরাওদের মত বহু আগেই ভাষা ছেড়ে দেবার সাথে সাথে ধর্মকেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ত। এখন যেমন আমরা বাধ্য হ'চ্ছি। অতএব, ভাষাগত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা আঠারো ও উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানদের ধর্মরক্ষা, সমাজ রক্ষা, সংস্কৃতিরক্ষা ও ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষায় সহায়ক হ'য়েছে। আত্মরক্ষার জন্য ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদ ও খৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শায়েরী কিতাবের কবিদের কলমের লড়াইকে**

www.pathagar.com

কোন অর্থেই খাটো ক'রে দেখা যায় না। এই লড়াইয়ে মুছলমানরা না জিতলে বা না টিকলে, তারা রাজনৈতিক লড়াই চালাতে পারত না। দাঁড়াতেও পারত না। গোটা বাঙালার মুছলমান সমাজ হ'য়ে পড়ত বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। সংস্কৃত-বাঙালার চাপ ক্রমাগত মুছলমানদের কোন ঠাসা ক'রে ফেলেছে। হঠিয়ে দিয়েছে ফারছী-বাঙালাকে। দুই কওমের দুই ভাষার এই কঠিন লড়াইকে ভারতীয় বাঙালা ও বাঙালাদেশী বাঙালার মুছলমানরা আজও স্পষ্ট ভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে দুই ভাষার এই সংঘাতের পরিণাম সম্পর্কে কেউ কেউ সচেতন না হ'য়ে পারেননি। নজীর হিসেবে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের নিম্নোক্ত বক্তব্যের উলে-খ করা যায়। যথা—

"মোছলমান সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা ভাষার পক্ষপাতী, কিন্তু আমার মত চিরদিন-ই ইহার বিপরীত। **হিন্দুয়ানী বাঙ্গালা ভাষার দ্বারা আমাদের জীবনের গতি বিপরীত পথাভিমুখী হইয়াছে।** আমরা আল-াহতালা স্থলে ঈশ্বর, পরমেশ্বর বা ভগবান শব্দ ব্যবহার করিতেছি... আমাদের নবীন সাহিত্যিকদিগের জানা উচিত যে, মোছলমান জাতির ভাষা আরবীর সাহায্য ব্যতীত এই বিশাল পৃথিবীতে কখনই পরিপুষ্টতা ও পূর্ণতা লাভ, এবং জাতীয় জীবনগঠনে সহায়তা করে নাই।... বর্তমান নব্য তুর্কী বা কামালী দল অবশ্য আরবীর সে প্রভাব নষ্ট করিয়া, সেই স্থলে রোমান প্রভাবের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক, মোছলমানদিগের জাতীয় জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।... উরদু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মোছলমানগণ জাতীয়তাবিহীন ও কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মোছলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা (সংস্কৃত-বাঙ্গালা) হওয়াতে, বঙ্গীয় মোছলমান জাতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন, নিস্তেজ, দুর্ব্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।... বেহারে মোছলমান সংখ্যা খুব কম(শতকরা ১৪ ।১৫ জন) হইলেও, তাহাদের মাতৃভাষা খাঁটি উরদু, এবং তাহারা জীবন্ত মোছলমান।... আমাদের নব্যশিক্ষিত তরুণ সাহিত্যিক দল আরবী-ফারছীর সঙ্গে অপরিচিত। যুবকবৃন্দ উরদু ভাষার নাম শুনিলেই নাক সিটকাইয়া থাকেন, এবং শিহরিয়া উঠেন। অনেকে উরদু-ফারছীর বিরুদ্ধে গরলোদ্‌গার করিতেও কুণ্ঠিত হন না।" মরহুম রেয়াজ উদ্দীনের এ-বক্তেব্যের বিরুদ্ধে ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন—"তাঁর চিন্তাধারার পশ্চাদ্‌গতির স্পষ্টতর পরিচয় আছে আধুনিক জীবন ও জগতের প্রতি তাঁর মনোভাবে। লেখক ছোলতান হামিদের ভক্ত ছিলেন, তার পরিচয় আমরা আগে পেয়েছি। কামাল পাশার অভ্যুত্থান তাই তাঁর চিত্তে দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার ক'রেছে, নব্য তুরকীর বিজয়াভিযানের কল্যাণময় দিকটা তাঁর চোখেই পড়েনি। বাংলা ভাষা যে

www.pathagar.com

মুছলমানদের মাতৃভাষা, এটা তাঁর কাছে একটা বেদনাদায়ক সত্যের রূপ ধারণ ক'রেছে। এই কাফেরী জবানকে শুদ্ধ ক'রে নেবার জন্যে যতদূর সম্ভব আরবী-ফারছী শব্দের প্রয়োগ তাঁর কাম্য ছিল। এই কামনা যদি ভাষার মাধুর্য ও স্বাভাবিকতার প্রতি প্রবণতা থেকে আসত, তাহ'লে আক্ষেপ ছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রয়োজন তিনি অনুভব ক'রেছেন সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে।"

এখানে বলা দরকার যে, রেয়াজ উদ্দীন নতুন যুগের নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সংস্কৃত-বাঙালায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত-বাঙালায় লিখতেন ও পড়াশুনা ক'রতেন। তাঁর কালের অন্যান্যের মতই তিনিও জানতেন না—ফারছী-বাঙালার কথা। কিন্তু সামাজিক ভাবে তখন মুছলমানদের মধ্যে যে-মুছলমানী ভাষা চালু ছিল, সেটার নাম-ই 'ফারছী-বাঙালা'। একথা না জেনেও তিনি তার সাথে সংস্কৃত-বাঙালার দূরত্ব বুঝতে পারেন। আর সে-কারণেই তিনি "সংস্কৃত মূলক বাঙ্গালা ভাষার পক্ষপাতী" ছিলেন না। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি 'মুছলমানী বাঙালা', বা 'ইছলামী বাঙালা'র বিরোধী ছিলেন। তিনি "হিন্দুয়ানী বাঙ্গালা ভাষার দ্বারা এদেশী মুছলমানদের জীবনের গতি বিপরীত পথাভিমুখী হইয়াছে"—ব'লে যে-উক্তি ক'রে গিয়েছেন—তা কি আজ মিথ্যা মনে হয়? এজন্য তিনি যখন বলেন—"বাঙ্গালা দেশের মোছলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে বঙ্গীয় মুছলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে"—তখন বুঝতে হ'বে—তিনি মুছলিম সমাজে ও শায়েরী কেতাবে ব্যবহৃত "বাঙ্গালা"র কথা বলেননি; ব'লেছেন—"সংস্কৃত বাঙ্গালা"র কথা। **'সংস্কৃত বাঙালা' যে মুছলমানদের সর্বনাশ' ক'রেছে—এবং ক'রছে; আজও আমাদের সে-হুঁশ আসেনি**। এই সর্বনাশ হওয়ায়— বাঙ্লাদেশী মুছলমানরা দুই ধরনের শিক্ষা ও দুই রকম বাঙালা ভাষায় অভ্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছে এবং রাজনীতি-ভাষা-শিক্ষা-সাহিত্যে এক মুছলমান জনকওম দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গেছে। **সংস্কৃত-বাঙালায় লেখা ইতিহাস-সাহিত্য-ব্যাকরণ পাঠের কারণে, এদেশী মুছলমানরা কেবল আত্মবিদ্বেষী নয়, ভাষা-বিদ্বেষী এবং ইছলাম-বিদ্বেষী হ'য়ে প'ড়েছে**। একথা সত্য যে, প্রত্যেক জাতির ধর্মীয় ভাষা ও সাহিত্য, সেই জাতির সম্পদ। তার প্রাণশক্তির উৎস। আর সেজন্যই ইংরেজী ভাষা-ভাষী খৃষ্টানদের নিকট ইংরেজী ভাষা যতটা প্রিয়, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা তার থেকে কম নয়। একজন শিক্ষিত ইংরেজও পাওয়া যাবে না, যিনি গ্রীক-ল্যাটিন ভাষা-বিদ্বেষী, অথচ ইংরেজী ভাষা-অনুরাগী। এক-ই ভাবে হিন্দুদের নিকট সংস্কৃত-বাঙালা যতটা প্রিয় সংস্কৃত তার থেকে কম প্রিয় নয়। বরং অধিক প্রিয়। এমন একজন হিন্দুও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ—যিনি সংস্কৃত-বিদ্বেষী এবং সংস্কৃত-বাঙালার অনুরাগী। অন্যদিকে, এদেশের অমুছলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ যে,

www.pathagar.com

মুছলমানদের থেকে কত বেশী—তা আগে আলোচনা করা হ'য়েছে। অতএব, **"সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধ" তাদের জন্য খারাপ না হলে রেয়াজ উদ্দীনদের জন্য নিন্দনীয় হ'বে কেন?** বস্তুতঃ কামাল পাশার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ভূমিকা এবং আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি পরিবর্তনের ভূমিকা যে,এক-ই রকম বৈশিষ্ট্যময় ক'রে তুলেছে—তা গত ৩৩ বছরে আমাদের জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে বিভ্রান্তির মধ্যে কি ফুটিয়ে উঠেনি?

গত একশ' বছর ধ'রে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মুছলমানদের-ই কেবল **দেখা যায়—তাঁরা 'বাঙালা' (তা সংস্কৃত-বাঙালাই হোক না কেন) ভাষাকে যতটা ভালবাসে; ধর্মীয় ভাষা আরবী-ফারছী-উরদুকে ততটা ভালবাসে না। বরং তারা ঐ বাঙালা-ভাষার যতটা অনুরাগী; তার থেকে অনেক বেশী আরবী-ফারছী-উরদু ভাষা-বিদ্বেষী। তাবৎ দুনিয়ার মধ্যে বাঙ্‌লাদেশীদের ছাড়া এমন কোন জাতি পাওয়া যাবে না; যারা তাদের জাতীয় ভাষার সঙ্গে ধর্মীয় ভাষাকেও ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসার সঙ্গে আঁকড়ে রাখেনি। আঁকড়ে ধরেনি। ধরে না।**

বাঙ্‌লাদেশে এরকম অবস্থা ছোলতানী আমলে ও নবাবী আমলে বা মোগল আমলে ছিল না। এরকম দশা এখনও দেখা দিত না; যদি আমরা শায়েরী কেতাবের ভাষাকে আপন জনকওমের খাঁটি ও অকৃত্রিম ভাষা ব'লে বুঝতে পারতাম। আমাদের পূর্ব পুরুষরা বুঝতে পারতেন। তাই দেখা যায়; আঠারো-উনিশ ও বিশ শতকে যতদিন ফারছী-বাঙালায় রচিত শায়েরী কেতাবের সাহিত্য-ধারা জীবন্ত ছিল; তত দিন ব্যাপকভাবে বাঙালী মুছলমানরা বিভ্রান্ত হয়নি। আত্মসমাজ-বিরোধী, আত্মভাষা-বিরোধী ও আত্ম-ধর্ম বা স্ব-ধর্মীয় সাহিত্য-বিরোধী হয়নি। এ-কারণে, মুছলিম সাহিত্যের 'সাহিত্যিক-বটতলা'য় এককালে মুছলমান শায়ের-মুছান্নেফ্‌দের যে জাতীয় জীবনের 'মিলাদ-মহ্‌ফিল' ব'সেছিল, আজ তাঁর ধারাবাহিকতা বজায় নেই। ফলে, তার—গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝারও কোন লোক নেই।

কারণ উনিশ ও বিশ শতকের ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনর্জাগরণে নিবেদিত, বাঙালা-ভাষার ইতিহাস-লেখক, গবেষক, ব্যাকরণবিদ্ ও ভাষাতাত্ত্বিকরা মুছলমানদের লেখা পুথিগুলোকে অবজ্ঞা ক'রেছেন; পক্ষান্তরে অমুছলমানদের লেখা পুথিগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যে বিরাট গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও মুছলমানদের লেখা ব'লে সেগুলো মর্যাদাহীন এবং অমুছলমানদের লেখা রচনা বা পুথিগুলো আকারে ছোট হলেও মর্যাদাবান। **এই মর্যাদা-অমর্যাদার বিভাজন সৃষ্টি**

www.pathagar.com

বিশ শতকের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের-ই অবদান।

অপর একটি বিষয় হ'ল—সে-কালে, মুছলমান কবিরা, কেউ কেউ তাঁদের রচনাকে পোথা-পুস্তক, গ্রন্থ ও কেতাব ব'লে লিখলেও কোন অমুছলিম কবি-ই তাদের কোন রচনাকে 'কেতাব' বা 'কিতাব' বলেননি বা লেখেননি। এই বিশিষ্ট আরবী মুছলমানী শব্দটি তাঁদের কাছে চিরকাল ঘৃণ্য হ'য়েই আছে।

আরও বলা দরকার, মুছলিম আমলে অমুছলিমদের হাতে লেখা বা কপি করা পুথিগুলো উনিশ ও বিশ শতকে যখন ছাপা হয়, তখন তা যথাযথভাবে ছাপা হয়নি। সেগুলোর 'ভাষাদোষ', 'ছন্দদোষ', 'যবন-স্পর্শদোষ' ওগয়রহ সম্পাদনা ক'রে ঘুচিয়ে; প্রকাশ করা হ'য়েছে। এমনকি, মূল বানানকেও বদলানো হ'য়েছে। বিষয়-দু'টোর দিকে রামগতি ন্যায়রত্ন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সকলের নজর আকর্ষণ' ক'রেছেন। ঐ সব বদল ঘটানোর ফলে—"মুছলিম আমলের মুছলমান-অমুছলমান-নির্বিশেষে লেখা এক-ই বাঙালা ভাষার রূপ, ভিন্ন ভিন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। অমুছলিম পুথিগুলো থেকে আরবী, ফারছী শব্দ, পদ ও বাক্-ভঙ্গি বর্জিত হ'য়েছে এবং সে-সব জায়গায় সংস্কৃত শব্দ, পদ ও বাক্-ভঙ্গি ঢোকানো হ'য়েছে। এমনকি, শব্দের বিকৃতিও ঘটানো হ'য়েছে। একটা নজীর দিই—

"শুনিয়া **তামার** মনে বাড়িল পীরিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে চৈতন্য চরিত॥"

লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল'-এর পৃষ্ঠা-৬ থেকে 'কোট্' করা, ঐ দু' লাইনের পহেলা বাক্যের দোছরা শব্দটি "তামাম"। কিন্তু সেটি ছাপা হ'য়েছে—"তামার" রূপে। এরকম আরও নজীর পূর্বে দেওয়া হ'য়েছে। ফলে, অমুছলিম পুথিগুলো আধুনিক সংকলক-সম্পাদক, প্রকাশকদের হাতে প'ড়ে কেবল আলাদা হ'য়েই পড়েনি; অনেকখানি সংস্কৃতায়িতও হ'য়ে প'ড়েছে। উনিশ শতকীয় সংস্কৃত-বাঙালা ভাষায় তালিম পাওয়া মুছলমান-অমুছলমান পাঠক-গবেষকদের নিকটও সেগুলোর তাই আদর-কদর বেড়েছে আশাতীত ভাবে।

অপরদিকে, ফারছী-বাঙালায় লেখা মূল মুছলিম পুথিগুলো ঐ ভাবে সংশোধন ক'রে, ব'দলিয়ে ছাপানো হয়নি। মুছলিম আমলের সংস্কৃত-বাঙালায় লেখা পুথিগুলোর একাংশই কেবল সম্পাদিত ও প্রকাশিত হ'য়েছে—তাও ব্রাহ্মণ্যবাদী লাইনে; শব্দ ও বানান ব'দলিয়ে। কিন্তু আসল ফারছী-বাঙালায় লেখা মূল মহাকাব্য সদৃশ গ্রন্থগুলো এ-কালের কোন পুথি-বিশারদ শব্দ-দোষ, ছন্দদোষ, বানান-দোষ ব'দলিয়ে, আধুনিক কালের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করেননি। ফলে, সংস্কৃত-

www.pathagar.com

বাঙালায় অভ্যস্ত এ-কালের মুছলমান পাঠকরাও সেগুলোর আদর-কদর করেননি। পুথির ভাষা তাঁদের কাছে অপরিচিত হ'য়েই আছে। ফলে, মহাকবি ফেরদৌছীর 'সাহানামা'র বিশাল অনুবাদ, 'কাছাছোল আম্বিয়া', 'তাজকেরাতুল আউলিয়া', 'আমীর হামজা', 'শহীদে কারবালা' ইত্যাদির মত এক-দেড়-হাজার পৃষ্ঠার এক একখানি মহাকাব্যও একালের আলেমদের কাছে হ'য়ে র'য়েছে অবহেলিত, অনাদৃত। অস্পৃশ্যও।

এদু'টো কারণেই বাঙালা-সাহিত্যের আধুনিক পাঠকদের মাঝে মুছলিম-অমুছলিম নির্বিশেষে, মুছলিম-বিদ্বেষী মনোভাবের জাগরণ ঘ'টেছে এবং মুছলমানরা-ই মুছলমানদের শ্রেষ্ঠ কীর্তির মূল্যায়নে বিমুখ হ'য়ে প'ড়েছে। উনিশ ও বিশ শতকীয় সংস্কৃত-বাঙালার আছরের চাপে তার আগেকার পাঁচ-ছ'শ' বছরের ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক গৌরবময় ধারাটিকে তাঁরা ধ'রতে পারছেন না। তাঁরা গণমুখী বাঙালা-ভাষায় লেখা পুথি-কিতাবের দিকে না গিয়ে—ঝুঁকে প'ড়েছেন, গণ-বিরোধী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-তান্ত্রিক হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর সংস্কৃত-বাঙালার দিকে। অথচ তাঁদের লেখা ঐ ভাষাকে তাঁরা পাঁচশ' বছর যাবৎ "বাঙালা" ব'লেও ডাকেননি। ব'লেছেন—"ভাষা"। বিশেষণহীন একটা শব্দ মাত্র। একথা আগেই বলা হ'য়েছে।

এখনও একটু আছে

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হ'য়েছে যে, বটতলার ভাষা, বটতলার চেতনা, বটতলার শিক্ষা—পতন-যুগের মুছলমানদের কি ভাবে টিকে থাকতে সাহায্য ক'রেছিল। বর্তমান বিপর্যয়কালেও ঐ ভাষা, ঐ চেতনা, ঐ শিক্ষা এবং সাহিত্য এ-দেশ এবং এ-জাতিকে নতুন পথ দেখাতে পারে। নতুন আলো ফোটাতে পারে। পারে নতুন ভাবে বাঁচিয়ে তুলতে। জাগিয়ে তুলতে। (তা তুলছেও)। কারণ কোলকাতার চিৎপুরের শান বাঁধা বটগাছটা এখন না থাকলেও সাহিত্যিক বটগাছের বটতলা এখনও একটু আছে। এক-ই ভাবে ঢাকায় এখনও একটু আছে—চকবাজারের কেতাবপট্টির অবশেষ। সেই অবশেষ যে, এখন 'বাংলা বাজারে' গত তিন দশকে কিভাবে উঠে এসেছে—তা সেখানে পা রাখলেই বোঝা যায়।

কোলকাতার আধুনিক বটতলা ঘুরে এসে বিনয় ঘোষ লিখেছেন—"বটতলায় বই বিক্রী এখনও যা হয় তা শুনলে কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশকরা চ'মকে উঠবেন। ধর্মগ্রন্থের টান আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী টান যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র ও হস্ত-গণনার।.....বেশ বোঝা যায়, কলকাতা শহরের পক্ষীর দলের বাবুরা এবং তাঁদের

বংশধরেরা আন্তর্ধান ক'রবার পরেও বটতলার কালচার বিলুপ্ত হ'য়ে যায়নি। অ্যামেচার যাত্রার দল ও অপেরা পার্টি অসংখ্য গজিয়ে উঠেছিল বটতলা অঞ্চলে এবং শুধু সখের নয়, পেশাদার দলও ছিল তার মধ্যে। এই সব অপেরা দল-ই বটতলার সাহিত্যকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। এদের-ই কল্যাণে নাটক ও প্রহসনের যে আবাদ হ'য়েছিল বটতলায়, তাতে সোনা বিশেষ না ফ'ললেও, সবটাই তার তামা-পেতল নয়।"

এক-ই ভাবে চক বাজারের কেতাব পট্টিতে গিয়েছি আমিও। ১৯৮৯ সালে পহেলা চকবাজারের কেতাবের গলি-ঘুঁজিতে ঢুকি। কয়েকজন দোকানদারের সাথে আলাপ করি। তাঁদের বই নিয়ে আলোচনা ক'রব শুনে তাঁরা আমাকে কয়েকখানি দোয়াতাবিজের বই দেন বিনা পয়সায়। সেগুলো নিয়ে একটা আর্টিকল লিখি সে-সময়। ছাপা হয়—বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থ-সংস্থার মাসিক "বই" পত্রিকায়।

পুথির ভাষা ও সাহিত্যের কদর বাড়ছে—বাড়বে

বাঙ্‌লাদেশে পুথির ভাষা ও তথাকথিত বটতলার সাহিত্য-কাব্যের কদর আগেও ছিল, এখনও আছে। ভবিষ্যতে সে-কদর বাড়বার সম্ভাবনা সৃষ্টি হ'য়েছে। পাকিস্তানী 'আমলে' পুথির ভাষায় 'পাকিস্তানের জারী' লিখেছিলেন মৌলানা আকরম খান। সে-সময় এই ভাষা ও সাহিত্যের দিকে যদি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হ'ত, তাহ'লে এই ভাষা ও সাহিত্যের এত দ্রুত বিলুপ্তি ঘ'টত না। কিন্তু সে-সময় দৈনিক আজাদের উপ-সম্পাদকীয় রূপে মরহুম ওসমান গণি লিখতেন "ওমর উম্মিয়ার জাম্বিল।" তারপর বাঙ্‌লাদেশী আমলেও তিনি দৈনিক আজাদে ঐ ধারার ফারছী-বাঙালায় অনেক আর্টিকল লিখেছেন। যদিও তিনি জানতেন না যে, যা তিনি লিখেছেন; তা তার পূর্ব পুরুষদের-ই পয়দা করা **বাঙালীর মূল বাঙালা-ভাষা বা খাছ বাঙালা ভাষা।** তার পর এই ভাষায় দৈনিক পত্রে লেখালেখি কেউ না ক'রলেও গত শতকের আশি ও নব্বই-এর দশকে লেখা বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সরদার শফীউদ্দীনের লেখা "গৌড় থেকে সোনার গাঁ" ঐতিহাসিক উপন্যাস-এর উলে-খ করা যায়। তা-ছাড়া ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সাবেক একজন মহাপরিচালকও ঐ মুছলমানী বাঙালার একজন বিশিষ্ট লেখক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহ্‌জাহান মিয়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আলমগীর জলিল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া প্রমুখ একাধিক গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকা, পুথি-কেতাবের জগৎ থেকে টেনে বের ক'রে এনে স্বস্ব-সম্পাদনায় আধুনিক কালে প্রকাশ ক'রেছেন। সেগুলো পাঠক-প্রিয়তাও পাচ্ছে।

www.pathagar.com

এ-সব তৎপরতার সাথে পুরানো পুথি-কেতাব অনুসন্ধানের ও সে-সব নিয়ে নতুন গবেষণারও চেষ্টা চ'লছে। আশা করা যায়—"মরা গাছে ফুল ফোটা"র মত ঘটনা এদেশের সাহিত্য-জগতে ঘ'টতেও পারে।

এ-কথা সত্য যে, **'পুরাতন নূতন হয় পুনরায়।" সেটা ক'রতে পারলেই হয়।** তার জন্য অবশ্য যোগ্যতার প্রয়োজন। সেই যোগ্যতা যদি এখনকার গবেষকগণ, লেখক-লেখিকাগণ দেখাতে পারেন; তাহ'লে স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্রে লোক-কাহিনী যেমন জনপ্রিয়তা পেয়েছে; সার্থকতার পরিচয় দিয়েছে—সাহিত্যেও তেমনি ফারছী-বাঙালা ফিরে আসবে। জনপ্রিয়তা পাবে। চক বাজারের কেতাব-পট্টিকে নতুন ক'রে সাজিয়ে তোলা গেলে, এ-দেশী বাঙালা ভাষা আপন ছুরৎ ফিরে পাবে এবং ম'রতে ম'রতে বেঁচে যাওয়া শায়েরী কেতাবের কবিদের ভাষা ও সাহিত্যের পরিচিত জগৎ অপরিচয়ের আবরণ ফেলে নতুন আলোয় ভেসে উঠবে। বাঙালী তার আপন 'বিত্তি-ব্যাসাত' চিনতে পারবে। তখন বটতলার ভাষা ও সাহিত্যের হবে নব মূল্যায়ন। আর **তাহ'লেই হবে বাঙ্লাদেশীদের রেনেসাঁ।**

আধুনিক পুথি-সম্পাদক, লেখক, প্রকাশক, গবেষক, শিক্ষাবিদ্‌দের বা শিক্ষা-কর্মকর্তাদের অসচেতনতা, অজ্ঞানতা, অনবহিতি ও সংস্কৃত-বাঙালায লেখা অমুছলিম সাহিত্যের প্রভাবে তাই 'কৃষ্ণকীর্তন', 'বৈষ্ণবপদাবলী', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গলে'র মত অশ্লীল বইগুলো মুছলমান ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষককে প'ড়তে হ'চ্ছে; পড়াতে হ'চ্ছে। কিন্তু মুছলিম কবিদের লেখা 'ইউছুফ—জোলায়খা', 'শহীদে কারবালা', 'কাছাছোল আম্বিয়া'র মত চরিত্র-গঠন মূলক, মূল্যবোধ যুক্ত, সুশীল গ্রন্থগুলো পড়া-শোনার ব্যবস্থা হ'চ্ছে না। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থীদের কাছেও আজ প্রাক-আধুনিক আমলের অমুছলিম ধর্মীয় কাব্য ও গান যত প্রিয়, মুছলিম কবিদের লেখা প্রকৃত আধুনিক বিশুদ্ধ মানবীয় প্রেমকাহিনী মূলক "কাব্য-কথা"গুলো তা নয়। অথচ "মধ্য যুগের কাব্যে মানবতার জয়গান" খুঁজে খুঁজে এরাই সব চেয়ে বেশী হয়রান-পেরেশান।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১.

১. আ. কা. মুহাম্মদ আদমুদ্দীন	পুথি-সাহিত্যের ইতিহাস ঢাকা-১৯৬৯।
২. আজহার ইসলাম	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ঢাকা-১৯৯২।
৩. আনিসুজ্জামান	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ঢাকা-১৯৬৫।
৪. আহমদ শরীফ	পুথি-পরিচিতি ঢাকা-১৯৫৮।
৫. কাজী নজরুল ইসলাম	মরু-ভাস্কর ঢাকা-১৩৬৪।
৬. কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চৈতন্য চরিতামৃত কলি-১৯৯৭।
৭. লোচন দাস	চৈতন্য-মঙ্গল (নামপত্র ছিন্ন)।
৮. দীনেশচন্দ্র সেন	মৈমনসিংহ-গীতিকা কলি-১৯৭৩।
৯. বিনয় ঘোষ	কলকাতা-কালচার কলি-১৩৬৮।
১০. মীর মোশাররফ হোসেন	মশাররফ রচনা-সম্ভার ঢাকা-১৯৮৭।
১১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাংলা সাহিত্যের (কথা মধ্যযুগ) ঢাকা-১৩৭১
১২. শ্রীপান্থ	বটতলা কলি-১৯৯৭।
১৩. সুকুমার সেন	ইসলামি বাংলা সাহিত্য বর্ধমান-১৩৫১।
১৪. আলী আহমদ	বাংলা কলমী পুথির বিবরণ নোয়াখালি,-১৩৫৪।
১৫. আবদুল কাইয়ুম	ঢাকার কয়েকজন পুথি-রচয়িতা বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা-১৩৭২।
১৬. আবদুল কাইয়ুম	ভাষা-সাহিত্য পত্র বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮২।

www.pathagar.com

২.

১. আছমতুল্লাহ্	বিবি ফাতেমার জহুরা নামা
২. আ. মা. মোহাম্মদ হামিদ আলী	কাসেমবধ-কাব্য
৩. ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্পেন-বিজয়-কাব্য
৪. শাহ্ গরীবুল্লাহ	ইউছুফ জোলায়খা
৫. জোনাব আলী	শহীদে কারবালা
৬. দোস্ত মোহাম্মদ	জেহাদে হায়দর/জঙ্গে খারর
৭. মোহাম্মদ খাতের	সাহানামা
৮. মোহাম্মদ তাজিম	ছহি মাহতাব গোলে লাল
৯. আলাওল	সয়ফল মুলক বদিউজ্জামাল
১০. আলী রজা	ছিরাজ কুলুব
১১. বাকের আলী	মনুচেহের মাছুমা পরী
১২. শেখ পরাণ	নছিহৎ নামা
১৩. শেখ মনসুর	ছির্নামা
১৪. শেখ মুত্তালিব	কায়দানি কিতাব
১৫. সৈয়দ নূর উদ্দীন	দাকায়েকুল হাকায়েক
১৬. সৈয়দ হামজা	আমীর হামজা
১৭. হেয়াৎ মামুদ	চিত্ত-উত্থান
১৮. মুন্‌শী রবিউল্লাহ	চৌদ্দ উজির
১৯. মালে মোহাম্মদ	ছয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল
২০. বালক ফকির	ফাএদুল মুক্তাদি
২১. মুনসী আবদুল করীম	শিরি-ফরহাদ
২২. রেজাউল্লাহ	কাছাছোল আম্বিয়া
২৩. মোহাম্মদ দানেশ	চাহার দরবেশ
২৪. শেখ আমীর উদ্দীন	মনছুর হাল্লাজ
২৫. হাজী আবদুল মজিদ	দাস্তানে আমীর হামজা
২৬. Rev. James Long.	

www.pathagar.com

বাঙালীর অবিভক্ত বাঙালা-ভাষার বিভাজনে
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূমিকা ও
তার 'জাতীয়তাবাদী' তাৎপর্য

বলা আবশ্যক যে, মুছলিম আমলের শুরু থেকে শেষ অবধি, বিশেষ ক'রে ১৩৫১ খৃ. অব্দ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালার মুছলিম শাসকগণ কয়েক শ' বছরের চেষ্টায় 'বাঙালা' নামে একটা দেশ, 'বাঙালা' নামে একটা ভাষা আর 'বাঙালী' নামে একটি 'জাতি' গ'ড়ে তুলতে সমর্থ হন। এ-জাতি ধর্মীয় জাতি ছিল না। ছিল—'রাষ্ট্রীয় জাতি' (Nation State)। কিন্তু বাঙালার অমুছলিম জনগণের খুব ছোট্ট একটা অংশ—যাঁদের একালের পরিভাষায় সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণী বলা যায়—তারা এই জাতিগঠনে কখনো সাড়া দেয়নি। **তারা মুছলমানদের সাথে মিলিতভাবে এক জাতি-নামে পরিচয় দিতে চায়নি; দেয়নি**। অন্যদিকে, সাধারণ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অমুছলিম জনগণ ছিল—এর ব্যতিক্রম। তাঁরা মুছলমানদের সুশাসনে ও সমদর্শিতায় আকৃষ্ট হ'য়ে এক দেশের এক জাতিতে পরিণত হয় এবং ব্রাহ্মণদের দেয়া শত অভিশাপ এবং রৌরব নরকের ভয় উপেক্ষা ক'রে, বাঙালা ও আরবী-ফারছী ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত রাখে। ফলে, হিন্দু পুরোহিত শ্রেণীর খুব ছোট্ট একটা অংশের বিরোধ-বিদ্বেষ উপেক্ষা ক'রে, চারশ' বছরের কাল-পরিধিতে বাঙালায় বাঙালী জাতির এক অবিভক্ত সমাজ, সাহিত্য, ভাষা, শিক্ষা ও কৃষ্টি কায়েম করা সম্ভব হয়। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাঙালীর পরাজয় ও ইংরেজদের বিজয় ঐ অবস্থার অবসান ঘটায়। হিন্দুরা, মুছলমানদের থেকে ক্রমাগত দূরে স'রে যেতে থাকে এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দের আগেই এই বিচ্ছিন্নতা—পূর্ণতা লাভ করে।

বস্তুতঃ ১৭৫৭ সালে পলাশীর 'প্রহসনে'র পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব বেশ ভালভাবে কায়েম হবার ফলে, বৃটিশ বণিক এবং সৈনিকদের পর; আসা শুরু করে বৃটিশ বিদ্বান ও পাদ্রীরা। এ-সময়ে এবং এর পরবর্তীকালে আগত ইংরেজ বিদ্বান

www.pathagar.com

এবং সিভিলিয়ানরাও কোলকাতার ব্রাহ্মণ-বন্ধুদের সঙ্গেই আঁতাত গ'ড়ে তোলেন। এ-আঁতাতের স্বরূপ নির্দেশ ক'রতে; ইতিহাস-আলোচনা-প্রসঙ্গে রোমিলা থাপার লিখেছেন—"অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন-ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ভারতবর্ষের সম্পর্কে এলেন ও তার অতীত সম্পর্কে কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন, তখন তাঁদের তথ্য-সংগ্রহের সূত্র ছিলেন—ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। কেননা এঁরাই ছিলেন—প্রাচীন সংস্কৃত-আশ্রয়ী ঐতিহ্যের একমাত্র স্বীকৃত অভিভাবক। তাঁদের মধ্যে এই ঐতিহ্য সংরক্ষিত ছিল, সংস্কৃত আকর গ্রন্থগুলির মতে এবং এগুলিতে ব্যুৎপত্তি ছিল কেবল তাঁদের-ই। অতএব, কেবল মাত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ—বিভিন্ন পুথিপত্র বা সূত্র থেকেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচিত হ'ল। প্রাচীন বইপত্রের অনেকগুলি-ই মূলতঃ ধর্মগ্রন্থ এবং স্বভাবতঃই ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অতীতের বিবরণকে প্রভাবিত করে। এমনকি, অপেক্ষাকৃত ধর্ম-নিরপেক্ষ রচনা (?), যেমন আইন সম্বন্ধীয় বই 'ধর্মশাস্ত্র'—তারও রচয়িতা ছিলেন—ব্রাহ্মণরাই। সুতরাং রচয়িতাদের ব্যাখ্যা ছিল, সমাজের উচ্চ পদস্থদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের উপর ততটা দৃষ্টি না দিয়ে, **এসব গ্রন্থে অতীতকে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছিল শুধু ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।**"

বলা আবশ্যক যে, রোমিলা থাপার আঠারো-উনিশ শতকে প্রাচীনপন্থী ইঙ্গ-হিন্দুদের লেখা ইতিহাসগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি-নির্মাণে ইংরেজদের ওপর ব্রাহ্মণদের যে-প্রভাবের কথা ব'লেছেন; তা কেবল ইতিহাসের বেলায় নয়—ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অভিধান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে তিনি যে "সংস্কৃত আকর গ্রন্থ"-গুলোর কথা ব'লেছেন, সেগুলো যে, আদৌ পুরানো কিছু ছিল না; তার পরিচয় আগেই দেওয়া হ'য়েছে।

ইঙ্গ-হিন্দু আঁতাত পরবর্তীকালের বৃটিশ-বাঙালা তথা ভারতের ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বা কালচারের গোটা সৌধে কি রকম আঘাত করে; আর সে-আঘাতে অবিভক্ত বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের শরীরেও কেমন ফাটল ধরায়; সে-কথা পূর্বেই কিছুটা বলা হ'য়েছে। মূলতঃ বৃটিশ বাঙালায় বাঙালীদের মধ্য থেকে 'ইংরেজ-সিভিলিয়ান' বানাবার জন্য মেকলে যে-শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন ঘটান; তার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় লোকদের বাঙালা সহ অন্যান্য দেশীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজী শেখানো। **বাঙালা ভাষার পাত্রে ইংরেজী সাহিত্যের রস পরিবেশন এবং তাদের আত্মা ইউরোপীয় রঙে রাঙানো। আর ইউরোপীয় রঙ্ মানেই হ'ল—ইছলাম ও মুছলিম-বিরোধী** রঙ্। এজন্যেই তিনি ১৮০০ সালে কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। দিনটা ছিল ১৮ই অগাস্ট।

www.pathagar.com

আর এটা খুব-ই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে, ঐ কলেজে পরবর্তী বছর চৌঠা মে, **যখন বাঙালা বিভাগ চালু করা হ'ল—তখন তার দায়িত্ব—বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষায় সু-শিক্ষিত কোন মুছলমান বা অব্রাহ্মণ হিন্দুকে দেওয়া হ'ল না; শিক্ষক হিসেবে চাকুরী দেওয়া হ'ল—সেই সব ব্রাহ্মণ ও ইংরেজ-বন্ধু পণ্ডিতদের , যারা তখনকার সমাজে ও শিক্ষা-ক্ষেত্রে, চালু-বাঙালা আদৌ জানতেন না। কারণ তাঁরা বাঙালাকে ঘৃণা ক'রতেন; বাঙালা 'স্কুলে' যেতেন না। বাঙালা প'ড়তেন না। কেবলমাত্র সংস্কৃতই ছিল তাঁদের প্রিয় ভাষা।** বিদ্যাচর্চার ভাষা। ফলে, চাকুরী রক্ষার স্বার্থে ১৮০১ সাল থেকে তাঁরা অনভ্যস্ত কলমে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য যে-সব কলেজপাঠ্য বই বাধ্য হ'য়ে লেখা শুরু করেন, তা যেমন ছিল পূর্ব-নজীরহীন, অপরিচিত, অপাঠ্য; তেমনি অবোধ্য ও অনধিগম্য। ঐ সব বইয়ের ভাষা, তখনকার মুছলিম-অমুছলিম সকল সাধারণ মানুষের নিকট ছিল—পুরোপুরি অজানা-অচেনা। **ফলে, শিক্ষা-সাহিত্যের ভাষা, জনগণের ভাষা থেকে তখন সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবার পথ ধরে। এক-ই বাঙালা ভাষা দুই শ্রেণীর মধ্যে দুই রূপ নিতে থাকে।**

ইংরেজরা চেয়েছিল; সেকালে এদেশী জনকওমের মাঝে চালু বাঙালা ভাষার সাথে, ইংরেজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিচয় করিয়ে দিতে; আর তার সাথে নিজেরাও পরিচিত হ'তে। কিন্তু **'পণ্ডিতরা' ক'রেছিলেন উল্টো। তাঁরা চালু-বাঙালাকে ঘৃণা ক'রতেন ব'লে, নতুন বাঙালা তৈয়ার করেন।** আর ঐ বাঙালা হ'ল—এ-কালের সুপরিচিত—"সংস্কৃত-বাঙালা"।

সবাই জানেন, বৃটিশরা দেশ দখল করার পরও এ-দেশের ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির চলমান ধারা ১৮০০ খৃষ্টাব্দ তক বহাল ছিল। সে-সময় তো বটেই, তার পরও বহুকাল অফিস-আদালতের কাজের ভাষা ছিল ফারছী ও বাঙালা। ইউরোপীয়রা বাঙালায় তথা হিন্দুস্তানে আসার আগে ভালভাবে ফারছী শিখে নিয়ে, জাহাজে উঠতেন। বাঙালা দেশে তখন যে-ফারছী-বাঙালা চালু ছিল;তার সাথেও তাদের দেশে থাকতেই কিছু পরিচয় হ'ত। কেননা, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে-সব দেশী কর্মচারী এদেশে তাদের পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা ক'রতেন; অথবা সেগুলোর সাথে জড়িত ছিলেন; তাঁরা ঐ সময়েও (১৭৩৫ থেকে ১৮৫৭) ফারছী-বাঙালাতেই চিঠিপত্র, রিপোর্ট, দাদনের হুকুম-আহ্‌কাম লিখতেন।

কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙালা শেখাবার চাকুরীতে নিযুক্ত **'পণ্ডিত'রা যেহেতু সে-ভাষা কখনও শেখেননি এবং শিখতেন না; সেকারণে তাঁরা নতুন কালের**

www.pathagar.com

নতুন পড়ুয়াদের পড়াবার জন্য—সংস্কৃতের ধাঁচে-ছাঁচে নতুন 'ভাষা' তৈরী ক'রে; সেটাই 'বাঙালা ভাষা' নাম দিয়ে চালাতে থাকেন। তাঁরা এ-নতুন 'ভাষা'র একটা নতুন নামও দেন। তা হ'ল—"সাধু ভাষা"। এর মানে দু'তরফে দু'রকম। ইংরেজ ও অন্যদের তরফে "সাধু ভাষা"-র অর্থ—বাঙালা 'শুদ্ধ ভাষা'; আর ব্রাহ্মণদের তরফে—'সাধু-(ব্রাহ্মণ)দের তৈরী বাঙালা ভাষা'। তার অর্থ এ-ভাষা—'পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধওয়ালা ইতরদের-বাঙালা ভাষা' নয়।

যাহোক, **ঐ 'সাধু ভাষা'-ই পরে "বঙ্গভাষা" নামে অভিহিত** হ'তে থাকে। প্রকৃত বাঙালা-(ফারছী-বাঙালা) ভাষাকে এ-সময় থেকে; এ-ভাবেই দূরে সরিয়ে দেয়ার কাজ শুরু হয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তথা নির্দিষ্টতঃ মুছলিম-বিদ্বেষ বশতঃ—এর পরের শতকে বাঙালীর এই মুল 'অসাম্প্রদায়িক' 'বাঙালা ভাষা'-কে ছাপ্পা মারা হ'তে থাকে—"জবানে মুছলমানী", "মুছলমানী বাঙালা", "ইছলামি বাংলা" ব'লে। ফলে, **ইংরেজরা চাইল এক; পেল আর**। ইংরেজ সিভিলিয়ানরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে, 'বাঙালা'র নামে 'বঙ্গ ভাষা' শিখে বাঙালী জনকওমের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারেনি। তবে তারা এই সুবাদে পণ্ডিত-পুরোহিতদের খুব খয়ের খা হ'য়ে ওঠে—তা ঠিক।

এই ধারা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ—প্রশাসন ও অর্থ-প্রতিপত্তি কব্জা ক'রে; মুছলিম-অমুছলিম উভয় সমাজে সমভাবে চালু ও লোক-প্রিয় **বাঙালা ভাষাকে দু'জাতির দিকে নজর রেখে দু'ধারায় ভাগ ক'রে ফেলে। 'বঙ্গ ভাষা' ও 'বাঙালা ভাষা'—একটি হিন্দুর; অপরটি মুছলমানের ভাষা।**

এরকম কাজ ভারতীয় ব্রাহ্মণরা কেবল বাঙালা ভাষার বেলায় ক'রেছেন—তা নয়। সারা উপমহাদেশের আরও অনেক ভাষার ক্ষেত্রেই ক'রেছেন। এর অপর বড় নজীর দিতে অবিভক্ত "হিন্দুস্তানী" ভাষার কথাও বলা যায়। 'হিন্দুস্তানী' ভাষা মোগল আমলে 'উরদু' নামে পরিচিত ছিল। আর তা ছিল—সারা উপমহাদেশের-ই সাধারণ (common) ভাষা বা 'লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা'। তাকে সারা হিন্দুস্তানের জাতীয় ভাষা রূপে 'হিন্দুস্তানী ভাষা' নাম দেয়া হয়। এই হিন্দুস্তানী-ই ছিল—দেশে-বিদেশে পরিচিত, সারা হিন্দুস্তানের সকল ধর্মের, সকল এলাকার, সকল জনকওমের আপন ভাষা। কিন্তু সংস্কৃতের দাসানুদাস ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সে-ভাষার চর্চা থেকে সর্বোতভাবে দূরে থাকতেন। শুধু দূরে থাকা নয়; উনিশ শতকের

www.pathagar.com

প্রথম ভাগে **বাঙালা ভাষাকে বিভক্ত করার পথ ধ'রে—তাঁরা 'বাঙালা'র মতই ঐ শতকের শেষ ভাগ থেকে হিন্দুস্তানীকেও ভাগ ক'রে ফেলার প্রয়াসী হন। তাঁরা মুছলমানদের দেওয়া 'উরদু' ভাষা-নামের পাশে "হিন্দী" শব্দে আর-একটা ভাষা-নাম দাঁড় করান; যা আসলে ছিল এক-ই ভাষার নামান্তর।** তাঁদের ঐ চেষ্টা বিশ শতকের প্রথম ভাগে আরও ব্যাপক রূপ লাভ করে; যা গত পঞ্চাশ বছরে বিভাগোত্তর ভারতের "হিন্দুর ভাষা—হিন্দী"—শে-াগানে পরিণত হ'য়েছে এবং সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার উচ্ছেদকল্পে ব্যবহার করা হ'চ্ছে।

সবাই জানেন—১৮৩৬-এ বৃটিশ বাঙালার সকল অফিস-আদালত থেকে ফারছী ভাষার উচ্ছেদ করা হয়। ইংরেজ শাসকরা সে কাজ ক'রেছিলেন—রাজা রামমোহন রায়ের পরামর্শে। এর ফলে, সরকার-পরিচালনায় মুছলমানদের যে-ভূমিকা ছিল—তা একেবারে অপসারিত হয়। তারপর ১৮৫৭ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহে' পরাজিত হবার পর; সারা হিন্দুস্তানের মুছলমানরা যখন চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখী; সেই সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উরদু ভাষা ও মুছলমান সমাজকে পুনরুজ্জীবন দানের প্রয়াস পান। এ-ঘটনাটিও হিন্দু ব্রাহ্মণদের শংকিত ক'রে তোলে। তাঁরা উরদু-ফারছী ভাষা-নাম বর্জন ক'রে "হিন্দী" নাম ব্যবহার ও তা জনপ্রিয় করার চেষ্টায় লেগে যান। তাঁরা বৃটিশ সরকারকে কনভিন্স ক'রে ১৮৮১ সালে বিহারের অফিস-আদালতে "হিন্দী' ভাষার ব্যবহার শুরু করান। **কিন্তু "হিন্দী" তখনও উরদু-ই । নামটাই যা আলাদা। কারণ 'হিন্দী'কে তখনও নাগরী (সংস্কৃত) লিপিতে লেখার কথা কেউ চিন্তাও করেননি।** হিন্দীকে উরদু হরফে না-লিখে, নাগরী বা সংস্কৃত-লিপিতে লেখার পহেলা প্রস্তাব দেন;—১৯০৫সালে; মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিক বালগঙ্গাধর তিলক। তারপর এ-ভাষা থেকে আরবী-ফারছী-উরদু শব্দ তাড়িয়ে সংস্কৃত শব্দ এনে বসিয়ে* পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধ'রে তাকে আরও "হিন্দু" করার চেষ্টা চ'লতে থাকে

এজন্য ড. সুনীতিকুমার উরদু-হিন্দীর ফারাক-এর পরিচয় দিতে গিয়ে ঠিক-ই লিখেছেন—"হিন্দুস্তানী ভাষার দুইটি সাহিত্যিক রূপ—হিন্দী, উরদু। ইহাদের ধ্বনি ও ব্যাকরণ এক; প্রভেদ শুধু বর্ণমালা ও উচ্চ ভাবের শব্দাবলী লইয়া। ফারছী হরফে লেখা এবং প্রচুর ফারছী-আরবী শব্দ-যুক্ত হিন্দুস্থানী ভাষার নাম "উরদু," এবং দেবনাগরী অক্ষরে লেখা ও প্রচুর সংস্কৃত-শব্দে-ভরা হিন্দুস্থানী ভাষার নাম "হিন্দী"; উরদুকে—"মুছলমানী হিন্দী" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। **এই রূপে এক-ই দেশের মানুষ—এক-ই ভাষাকে, ধর্ম-অনুসারে বিভিন্ন বর্ণমালায়**

---

*দেখুন—সুধাকর দ্বিবেদী। হিন্দী-অস্তিত্ব কি তলাস। নয়া দিল্লী, ১৯৮২ (হিন্দী সংস্করণ), পৃ. ২০-২৪।

www.pathagar.com

(অর্থাৎ দু'টি আলাদা বর্ণমালায়) লিখিয়া এবং অন্য ভাষা হইতে (সংস্কৃত ভাষা থেকে) শব্দ গ্রহণ করিয়া দুইটি পৃথক সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করিয়াছে।" ১৯৩৯ সালে লেখা, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে"র রূপা-সংস্করণের (মে-১৯৮৯) ৪৪৯-'৫০পৃষ্ঠা থেকে 'কোট্' করা ঐ বক্তব্যে, হিন্দী ভাষা তৈরীর যে স্থূল রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়, তা যিনি বুঝতে পেরেছেন; তিনি-ই বুঝতে পারবেন, **বিশ শতকের গোড়ার দিকে 'উরদু ভাষা' নিয়ে যা করা হ'য়েছে; ঠিক তা-ই বাঙালা ভাষাকে নিয়ে করা হয়—উনিশ শতকের শুরু থেকেই।** **তবে অনেক হুঁশিয়ারীর সাথে।** বিশ শতকের কর্ম-নায়কদের মধ্যে ছিলেন মশহুর রাজনীতিক, মুছলিম-বিদ্বেষী তিলক, প্যাটেল, গান্ধী, নেহেরু; আর উনিশ শতকের কর্মনায়কদের মধ্যে ছিলেন আর একদল মুছলিম-বিদ্বেষী কুখ্যাত সাহিত্যিক মৃত্যুঞ্জয়, রাজীব লোচন, রাম মোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন ওগয়রহ।'

যাহোক, অবিভক্ত ভাষার 'কালচারাল রোয়েদাদ'-রচনায় দেশীয় মাউন্টব্যাটেনদের এই দুই দল কর্মী, উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগ ধ'রে, যা ক'রেছেন; সে-বিষয়ে, আমাদের আজ তক কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়নি ব'লে, **'বাঙালা-ভাষা' ও 'বঙ্গ'ভাষার মাঝের ডিমার্কেশন লাইনটি আমরা দেখতে পাইনি।** সে-জন্য এ-যাবৎ প্রশ্ন ওঠেনি; 'বাঙালা' ভাষা ও 'বঙ্গ' ভাষা কি এক? এবার এ-প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করার পর, রোয়েদাদকারীদের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মের পরিচয় হাজির করা হবে।

'বাঙালা'-ভাষা বনাম 'বঙ্গ'-ভাষা

'বাঙালা' ও 'বঙ্গ' যেমন এক-ই শব্দ নয়, তেমনি 'বাঙালা'-ভাষা ও 'বঙ্গ'-ভাষাও এক-ই ভাষা নয়।

এ-কথায় অনেকে তাজ্জব হ'তে পারেন। কারণ এসব বিষয় নিয়ে আমরা কখনও ভাবিনি বা ভাবি না। তাই এক-ই দিনে, এক-ই লেখায়, এক-ই দেশের তিন চার রকম নাম লিখতে যেমন আমাদের কারো বাধে না, তেমনি 'বাঙালা' ভাষা ও 'বঙ্গ' ভাষাকেও আলাদা আলাদা ভাবার ফুরছৎ মেলে না। আমরা একবারও মনে করি না—'বাঙালা' ভাষা ও 'বঙ্গ' ভাষা যদি এক-ই হয়, তবে তা দু'টি নামে ডাকা হয়, লেখা হয়—কেন? একজন মানুষের দু'টো নাম থাকে বটে, কিন্তু একটি দেশের এক সময়ে দু'টা নাম কোথাও দেখা যায় না। একটা ভাষারও এক নাম-ই সব দেশে দেখা যায়; দু'টা নাম নয়। অথচ বাঙালা দেশ ও ভারতীয় বাঙালায় 'এক

বাঙালা ভাষা'র দু'টো নাম—"বাঙালা"-ভাষা ও "বঙ্গ"-ভাষা কেন, তার কারণ বোঝা কঠিন বৈকি!

তবে, "গৌড়ীয়" বা ভারতের "পশ্চিম বঙ্গীয়" ব্রাহ্মণ্যবাদী সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর একাংশের ভাষা, ধর্ম ও জনবিদ্বেষ প্রভৃতির দিকে নজর রেখে; তাঁদের, মুছলিম আমলে রচিত কয়েক শ' বছরের কাব্য-কবিতা খোঁজ ক'রলে, 'বাঙালা-ভাষা' বা 'বঙ্গ-ভাষা'র কোন দেখাই মেলে না। ১২০১ থেকে ১৮০০ সাল তক, এই অবাক কাণ্ডের পাশাপাশি মুছলিম কবিদের রচনা খুঁজলে 'বাঙালা' (বাঙ্গালাহ্) ভাষার দেখা মেলে। তাও একবার দু'বার নয়—বহু বহু বার।

ইয়াদ করা চলে যে, 'বাঙালা' ভাষা ও সাহিত্যের পহেলা ইতিহাস-এর নাম "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"। লেখক—রামগতি ন্যায়রত্ন। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে দীনেশ চন্দ্র সেন বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের যে-ইতিহাস লেখেন, তার নাম "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য" দীনেশচন্দ্র সেন এ-বইয়ের অষ্টম সংস্করণে ১৮০৪ সালে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বী চন্দ্রের লেখা, "গৌরী মঙ্গল" থেকে, কোটেশন দিয়ে, একটা অদ্‌ভুত বিষয়ের দিকে পাঠকদের নজর আকর্ষণ ক'রেছেন। এখানে পহেলা সেই কোটেশন দাখিল ক'রে পরে ড. সেন-এর মন্তব্য উপহার দেয়া হবে। "গৌরী-মঙ্গলে"র বয়ান—

"সত্যযুগ বেদ অর্থ জানি মুণিগণ।
সেই মত চালাইল সংসারের জন ॥
ত্রেতাযুগে বেদ অর্থ জানিতে নারিল।
তেকারণে মুনিগণ পুরাণ রচিল ॥
অনেক পুরাণ-উপপুরাণ হইল।
দ্বাপরে মনুষ্যগণ ধারণে মারিল ॥
স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল ॥
কলি যুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হৈল।
মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ।
'স্মৃতি' ভাষা কৈল রাধাবল-ভ শর্ম্মণ॥
'বৈদ্যক' করিয়া ভাষা শেখে বৈদ্যগণে ॥
'জ্যোতিষ' করিয়া ভাষা শেখে সর্ব্বজনে ॥
'বাল্মিকী' করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস।
'মনসা মঙ্গল' ভাষায় হৈল প্রকাশ।

www.pathagar.com

মুকুন্দ পণ্ডিত কৈল শ্রীকবিকঙ্কণ।
কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচন।
'ভাগবত' **ভাষা করি** শুনে ভক্তিমান।
'চৈতন্য মঙ্গল' কৈল বৈষ্ণব বিজ্ঞান।
বৈষ্ণবের "শাস্ত্র" **ভাষায়** অনেক **হইল**।
'অন্নদা মঙ্গল' **ভাষা** ভারত **করিল** ॥
মেঘ ঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা।
শিবরাম গোস্বামী করিল 'ভক্তিলতা' ॥
'অষ্টাদশ পর্ব' **ভাষা কৈল** কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে 'ভারত' প্রকাশ ॥
চোর চক্রবর্তী 'কীর্তি' **ভাষায়** করিল।
বিক্রমাদিত্যের 'কীর্তি' পয়ার রচিল ॥
দ্বিজ রঘুদেব 'চণ্ডী' পাঁচালী করিল।
কবিচন্দ্র চোর কবি **ভাষায় হইল** ॥
গঙ্গানারায়ণ রচে "ভবানী মঙ্গল"।
'কিরীট মঙ্গল' আদি হইল সকল ॥
এ সকল গ্রন্থ দেখি মনে আশা হইল ॥
'গৌরী মঙ্গলে'র পুথি **ভাষায় রচিল** ॥"

এই কোটেশনের **বোল্ড করা ও নিচেয় রেখা টানা অংশগুলো খেয়াল ক'রলে বোঝা যায়—রাজা মশায়, 'ভাষা' ব'লতে 'বাঙালা' ভাষার কথাই ব'লেছেন। কিন্তু সে-ভাষার নামটি চৌদ্দ বারের মধ্যে একবারও লেখেননি**। বলেননি। কিন্তু কেন?

এ-বিষয়টির দিকে নজর দিয়ে, দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"বাঙ্গলা ভাষা যে পূর্বকালে প্রাকৃত ভাষা নামেই পরিচিত ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। সঞ্জয় রচিত একখানি মহাভারতের ২০০ বৎসরের প্রাচীন) পুথিতে রাজেন্দ্র দাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে আমরা এই দুইটি ছত্র পাইয়াছি,—"ভারতের পুণ্য-কথা শ্রদ্ধা দূর নহে। **পরাকৃত পদবন্ধে** রাজেন্দ্র দাসে কহে ॥"----'কৃষ্ণকর্ণামৃত' পুস্তকে,—"তাহা অনুসারে লিখি **প্রাকৃত কথনে।"** যদুনন্দন দাসকৃত 'গোবিন্দ-লীলামৃতে'র অনুবাদে—**"প্রাকৃত লিখিয়া** বুঝি এই মার সাধ"। লোচন দাসের "চৈতন্য মঙ্গল"-এর মধ্য খণ্ডে—"ইহা বলি গীতার

পড়িল এক শে-াক। **প্রাকৃত প্রবন্ধে** কহি শুন সর্ব্ব লোক॥"---একখানি 'গীত গোবিন্দে'র বঙ্গীয় অনুবাদের দ্বাদশ সর্গের অন্তে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয়;—"ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে **প্রাকৃত ভাষায়াং** স্বাধীন ভর্ত্তৃকা বর্ণনে সুপ্রীতি পিতাম্বরো নাম দ্বাদশ সর্গ।" এই কাব্যের অপর একখানি অনুবাদে (৪৩ সংখ্যক পুথি) "সপ্তদশ পর্ব কথা সংস্কৃত ছন্দ। মুর্খ বুঝিবার কৈল **পরাকৃত ছন্দ**॥ "এই রূপ **বহু স্থানে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত সংজ্ঞায় অভিহিত** হইয়াছে।" কিন্তু কেন হ'য়েছে, তার কোন জবাব নেই। বলা দরকার যে, লেখক যদি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' খুঁজতেন, তাহ'লেও অবাক হ'য়ে দেখতে পেতেন, কবিরাজ তাঁর **ঐ কাব্যের 'মধ্য লীলা'র দোছরা পরিচ্ছেদে "সংস্কৃত" ভাষার নাম নিলেও; তিনি যে-ভাষায় ঐ কাব্য লিখছেন—সেই 'বাঙালা' ভাষার নাম নেন নি**। তিনি তাঁর ঐ কেতাব লেখার কারণ জানাতে লিখেছেন—

"কৃষ্ণে উপজিলে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই হয় বড় হিত।
ভাগবত শে-াকময় টীকা তার **সংস্কৃত** হয়
তভু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহা শে-াক দুই চারি তার অর্থ **ভাষা** করি
কেনেনা বুঝে সর্ব্ব জন॥"

গোটা মুছলিম আমলে তো বটেই, তারপরও প্রায় আধা শতক তক হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর কবিরা "বাঙ্গালা ভাষা" এই নাম কবুল করেননি। বিশেষ ক'রে "বাঙ্গালা" এই শব্দ ১২০১ থেকে ১৮০০ সাল (এমনকি, বহু ক্ষেত্রে তার পরও) তাঁরা 'ঘৃণা ও উপেক্ষা' ক'রে এসেছেন। **কেননা, ঐ সময় তক গোটা বাঙালায়, যে-ভাষা চালু ছিল, তা ছিল, মুছলমানদের তৈরী "ফারছী-বাঙালা"**। 'ব্রাহ্মণ্যবাদী'রা যেহেতু 'আর্য ভাষা' ছাড়া আর সব ভাষাকেই 'অপভাষা', 'পাপ ভাষা' মনে ক'রে; বিশেষ ভাবে, মুছলিম আমলে মুছলমানদের তারা 'যবন' ও 'মে-চ্ছ' ব'লে ছাপ্পা মেরে; তাঁদের ভাষাকে "যাবনী ভাষা" ও "মে-চ্ছ ভাষা" ব'লে ঘেন্না ক'রেছেন; সেই কারণে, তাঁরা ঐ ভাষায় লেখালেখি ক'রলেও, ভাষাটির 'মে-চ্ছনাম' মুখে আনেননি বা কলমে লেখেননি। তার ফলে, **তাঁদের পাঁচ শ' বছরের রচনায় "বাঙ্গালা ভাষা" নাম নেই; আছে "দেশী ভাষা", "প্রাকৃত" বা "পরাকৃত ভাষা", "পরাকৃত ছন্দ", "শে-াক বন্ধ", "পাঁচালী প্রবন্ধ", "পয়ার" ইত্যাদি; "বাঙ্গালা" নাম নয়**। দীনেশচন্দ্র সেন, এই মূল কারণটি বুঝে উঠতে না

www.pathagar.com

পেরে; ১৯ শতকেও বাঙালা ভাষার নাম "প্রাকৃত" ভাষা ছিল ব'লে মনে ক'রেছেন। তিনি ভেবেছেন 'বাঙালা ভাষা' নামটা খুব-ই আধুনিক। কিন্তু ড. সেন যদি মুছলিম আমলে লেখা, মুছলমানদের পুথি-কেতাবগুলোর কয়েকখানিরও গোড়ার দিকের দু'চার পাতা ওল্টাতেন এবং দেখতেন; তাহ'লে অবশ্যই অবাক হ'তেন। দেখতে পেতেন যে, **ঐ সব পুথি-কেতাবে যে-ভাষা লেখা হ'য়েছে; সে-ভাষাই যে "বাঙ্গালা ভাষা"—সে-কথা তাঁরা খোলাছা বয়ান ক'রেছেন।** আর এর নজীর পাওয়া যায়—চোদ্দ শতক থেকেই। ষোল শতকের মুছলিম কবি শেখ পরাণ (১৫৫০-১৬২৫ সাল) পষ্ট ভাষায় তাঁর 'নছিহত নামা' কাব্যে লিখেছেন—

"এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দিতে আছিল।
বাঙালা ভাষায় কৈলুঁ বুঝিতে কারণ।

শেখ পরাণের পুত্র শেখ মুত্তালিবও তাঁর "কায়দানি কিতাব"-এ ব'লেছেন—

"হীন মোত্তালিব কহে আল-াকে ভাবিয়া।
কহিমু কায়দানি কিতাব **বাঙ্গালা করিয়া** ॥

এভাবে চোদ্দ শতক অথবা তাঁরও আগের থেকে ১৯৩০-'৪০ সাল তক শত শত পুথি-কেতাবে মুছলিম কবিরা, অবিচ্ছিন্নভাবেই তাঁদের লিখিত ভাষাকে "বাঙ্গালা" ভাষা ব'লে-লিখে এসেছেন। অতএব, এ-কথা বেশক বলা যায় যে, উনিশ ও বিশ শতকে চালু এদেশের ভাষা ও সাহিত্যে "বাঙ্গালা ভাষা" এবং "বঙ্গ ভাষা" নাম দু'টোর, পহেলা নামটি-ই যে, মূল নাম এবং পরের নামটি পরবর্তী কালের দেয়া উপনাম, তাতে কোন ভুল নেই।

'বাঙালা-ভাষা' ও 'বঙ্গ-ভাষা'র উৎস

এবার দেখা যাক, 'বাঙ্গালা'- ভাষা ও 'বঙ্গ'-ভাষার উৎস ও সম্পর্ক এক কি না। দু'টো 'ভাষা' কি কেবল নামেই ভিন্ন; না, উৎসেও আলাদা। কোন্‌টা কখন, কি ভাবে তৈরী—তা জানা জরুরী।

কেউ কেউ মনে করেন, 'বাঙ্গালা' ও 'বঙ্গ' শব্দ দু'টো এক-ই। তা আদৌ ঠিক নয়। 'বাঙালা' বা "বাঙ্গালাহ্" লফ্‌জটি যে, 'ফারছী'; সে কথা ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ছাফ ছাফ কবুল ক'রেছেন। অপর দিকে, "বঙ্গ" শব্দটি আস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড়। শব্দটি বহু পুরানো। এটি 'এদেশে' আর্য-অধিকারের সময় 'ঘৃণ্য' ব'লে বিবেচিত হয়* এবং সেটি "গৌড়" নামে ব'দলে দেয়া হয়। 'বঙ্গ' হয় 'গৌড়'।

*দেখুন—নীহাররঞ্জন রায়। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), (দে'জ সংস্করণ,. কলি-১৪০০), পৃ. ১২৪।

www.pathagar.com

কিন্তু গৌড়ে মুছলিম হুকুমৎ কায়েম হবার পর, চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি যখন দেশের নাম আবার বদলায় এবং 'গৌড়' হয়—"বাঙ্গালাহ্"; তখন হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর পণ্ডিতরা, মুছলমানদের বিপরীতে, কালচারাল-প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলতে, 'গৌড়ে'র সাথে 'বঙ্গ' শব্দটিও ব্যবহার ক'রতে থাকেন। তবে তাও খুব-ই সীমিত ক্ষেত্রে এবং নিন্দার্থে। পাল ও সেন যুগে 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' শব্দ দু'টো "গৌড়ান্" এবং 'বঙ্গান্"—এই সংস্কৃত রূপ লাভ করে। তার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে, সেই অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষীদের সময় থেকে আজতক "বঙ্গ ভাষা" এক-ই ভাবে এক-ই ধারায় চালু আছে। এখানে এ-বিষয়ে বেশী আলোচনার মাঝে না গিয়ে, কেবল এটুকু বলা যথেষ্ট যে, 'বঙ্গ-ভাষা' নামে কোন ভাষা, বাঙ্গালা-ভাষা থেকে আলাদা চেহারা-ছুরৎ নিয়ে ১৮০৪ সাল তক পরিচিত ছিল না। কেবল মুছলমান কবিদের লেখাতেই দেখা যায়, তাঁরা মুছলিম আমল থেকেই তাদের লেখা বাঙালা ভাষাকে তাঁরা কখনও "বঙ্গবাণী", "বঙ্গদেশী ভাষা", "বঙ্গ ভাষা" ইত্যাদি ব'লেছেন; "বঙ্গ" শব্দটি তাঁদের নিকট "ঘৃণিত" ছিল না। কিন্তু হিন্দু লেখকরা তা করেননি। তাঁদের নিকট "বঙ্গ" ও "বাঙালা" শব্দদ্বয় "ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত।" 'বাঙালা' ও 'বঙ্গ' শব্দের ব্যবহারিক ইতিহাস তাই এক নয়; শব্দ দু'টোও অভিন্ন নয়।

এক-ই ভাবে, ঐ দুই নাম-শব্দের দুই ভিন্ন ভিন্ন উৎসের মতই—'বাঙালা-ভাষা' ও 'বঙ্গ-ভাষা'র দৈহিক উৎসও এক নয়; বরং সুস্পষ্ট ভাবেই পৃথক।

'বাঙালা' ভাষার উৎস আরবী-ফারছী ভাষা

আমি এর আগে একটি লেখায় দেখিয়েছি—বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার নাম-ফারছী-বাঙালা এবং তার উৎপত্তি হয়,—এগারো শতকে বা তারও আগে। আর মুছলমানরাই আরবী-ফারছী ও হিন্দুস্থানী ভাষার মিশেল ঘটিয়ে ফারছীর আদলে বাঙালা ভাষা গ'ড়ে তোলেন। ঐ 'ভাষা'—আম মুছলমান ও হিন্দু উভয় জনকওম-ই দীর্ঘ পাঁচ-ছ' শ' বছর ব্যবহার ক'রে এসেছে। তাদের এ-ভাষার "ফারছী বাঙালা" নামটিও মুছলমানদের দেয়া। আর এর পয়দা যে, "ফারছী ভাষা" থেকে সেকথাও তাঁরা লিখে গিয়েছেন।

অপরদিকে, নানা কিছিমের চালাকির সাহায্যে ঐ বাঙালা ভাষার বিপরীতে 'বঙ্গ ভাষা' চালু করা হয়—১৮০১ সালে। কারা, কি ভাবে উনিশ শতকের শুরু থেকে কি-নামে 'বঙ্গ ভাষা' চালুর প্রথম উদ্যোগ নেয় এবং তার স্বরূপ কি, এবার সে-বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

'বঙ্গভাষা'র উৎস—সংস্কৃত ভাষা

খ্যাত-অখ্যাত; মার্কসবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী বা হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বাঙালার পণ্ডিতগণ ও তাঁদের এদেশীয় অনুসারীদের বেশীর ভাগ-ই একদা "বঙ্গ ভাষা"কে "সংস্কৃতের দুহিতা" ব'লে বয়ান ক'রতেন। এখনও করেন। এ-বিষয়ে মার্কসবাদী পণ্ডিত ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ব'লেছেন—"আপাততঃ সংস্কৃতের সন্তান বাঙ্গলা ভাষা ছাড়িয়া দিয়া"---ইত্যাদি। স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায়, 'সংস্কৃত ভাষার সন্তান' বা 'দুহিতা' হিসেবে 'বাঙ্গালা' ভাষাকে পরিচিতি দেবার চেষ্টা। এরকম চেষ্টার আরও নজীর আছে।

অন্যদিকে,রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন—"অনেকে কহিয়া থাকেন যে, 'সংস্কৃত ভাষা'—'বাঙ্গালা-ভাষার জননী'। অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত ঐ সংস্কৃত ভাষা হইতেই 'বাঙ্গালা ভাষা' উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের তাহা বোধ হয় না।" এরপর অনেক আলোচনার পর ন্যায়রত্ন বাবু নিজ মত প্রকাশ ক'রে লিখেছেন—"এক্ষণে আমাদের প্রকৃত বক্তব্য বিষয় এই যে, পূর্ববর্ণিত 'প্রাকৃত ভাষা'ই বাঙ্গালার জননী; সংস্কৃত উহার জননী নহেন–কিন্তু মাতামহী।" এরকম কথা আরও কেউ কেউ ব'লেছেন।

এ-রচনায় সে-সব বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনায় যাবার দরকার নেই। কারণ যাঁরা 'বাঙ্গালা'কে আজ 'সংস্কৃতের দুহিতা' (কন্যা) কিংবা 'নাতনী' (কন্যার কন্যা। অর্থাৎ 'সংস্কৃত' থেকে 'প্রাকৃতে'র জন্ম আর 'প্রাকৃত' থেকে 'বাঙ্গালা'র জন্ম) বলেন; তাঁরা আসলে, 'আধা সত্য, আধা অসত্য' বলেন। তাঁদের পুরো সত্য বলা হ'ত,—যদি তাঁরা ব'লতেন যে, **'সংস্কৃত' থেকে 'বাঙ্গালা' ভাষার জন্ম নয়; 'বঙ্গভাষা'র জন্ম** বটে। তার অর্থ, হিন্দু সামন্ত-পুরোহিত—সংস্কৃতের পা-বন্দ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর তৈরী উনিশ ও বিশ-শতকের 'বঙ্গ-ভাষা' সংস্কৃতের-ই দুহিতা; নাতনী-পুতনী নয়। আধুনিক 'ভাষাতত্ত্ববিদ্'গণ যদি বাঙালীর মূল বাঙালা-ভাষার গণমুখী ফারছী ধারাটি ঘেন্নায় উপেক্ষা না ক'রতেন এবং যথাযথভাবে বাঙালা-ভাষার ঐতিহাসিক প্রবাহ-বিচারে মনোযোগী হ'তেন; তাহ'লে পষ্ট রূপে দেখতে ও বুঝতে পারতেন 'বাঙ্গালা' -ভাষা ও 'বঙ্গ'-ভাষা এক নয়। আধুনিক 'বাঙ্গালা সাহিত্যে'র তথাকথিত 'বাঙালা ভাষা' ও প্রকৃত 'বাঙালা'-ভাষার মধ্যে তাঁরা যদি ডিমার্কেশন লাইনের পিলার গুলো (ব্যাকরণ, অভিধান, শব্দকোষ, রচনা, পাঠ্য গ্রন্থ তথা উপন্যাস, কাব্য, নাটক, মহাকাব্য ইত্যাদি) একটু ক্রিটিক্যালি নজর ক'রে দেখতেন; তাহ'লে পূর্ব-কথিত 'ফারছী-বাঙালা' ও 'সংস্কৃত-বাঙালা' ('সাধু-ভাষা' বা 'বঙ্গ-ভাষা') ভাষার উৎস ও চৌহদ্দি চিনতে পারতেন। তাঁরা তাহ'লে ছাফ্ ছাফ্ কবুল ক'রতে বাধ্য হ'তেন;

www.pathagar.com

একাদশ শতকে রচিত "কলিমা জাল্লাল" (শূন্য পুরাণ) আর আঠারো শতকের গরীবুল্লাহ্‌র ভাষা এক-ই এবং সে-ধারা আজও পুথি সাহিত্যে বেঁচে আছে। তাঁরা সেই সাথে এও কবুল ক'রতেন যে, এই ভাষা-প্রবাহ; আর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-পূর্ববর্তী অ-নামা "ভাষা" ধারার সাথে যুক্ত—রাজীব লোচন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম চন্দ্র ও তাঁদের অনুরাগী-অনুসারীদের ভাষা একেবারেই আলাদা। **আগেরটা 'বাঙালা' ভাষা আর এই শেষেরটা 'বঙ্গ' ভাষা।** 'বাঙালা' ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ও বাঙালা সাহিত্যের শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকগণ এ-পর্যবেক্ষণে সমর্থ হ'লে, তাঁরা 'রোয়েদাদ'টি ধ'রতে পারতেন এবং বাঙ্গালা-ভাষাকে 'সংস্কৃতে'র এগানা বা আত্মীয় না ব'লে, "বঙ্গ ভাষাকে"ই সংস্কৃতের সন্তান ব'লতেন। সে-কথা ব'ললে, তা অসংগত হ'ত না। মিথ্যা বলাও হ'ত না। কারণ **তথাকথিত 'সাধু-ভাষা' বা 'বঙ্গ-ভাষা' যথার্থই সংস্কৃতের 'সন্তান'। এর শব্দকোষ (Vocabulary) সংস্কৃতের, পদ-গঠন-পদ্ধতি সংস্কৃতের এবং বাক্যরীতিও সংস্কৃতানুসারী।**

ফলে, খুব পষ্ট ক'রেই বলা যায়—'ফারছী-বাঙালা'—ফারছীর 'নন্দন'; আর 'সংস্কৃত-বাঙালা'—'সংস্কৃতের সন্তান'। পহেলাটি-ই মূল 'বাঙালা ভাষা'; আর দোছরাটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তৈরী 'বঙ্গ ভাষা'। দু'টি ভাষা এক-ই লিপিতে লেখা হ'লেও এদের উৎস ও চরিত্র দু'রকম। এক নয়।*

যাহোক, এবার 'বাঙালা' ও 'বঙ্গ'—এই উভয় নামধারী বর্তমান 'বাঙালা ভাষা'র গণপতি গণেশ-রূপটির মাথা থেকে ধড় বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলার কাজটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ব'সে কারা, কবে করেন এবং নতুন এক হস্তীমুণ্ড এনে কিভাবে তা জোড়া দেবার আনজাম দেন; আর এক দেহে দুই নামের দুই মাথা লাগিয়ে পরে গোটা দেহটাই ব'দলে দিতে সমর্থ হন—তার মুখোশ খুলে ধরা হবে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-এর ভাষা-বিভাজন
কারখানা—বাঙালা বিভাগ

দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—'বড় সুকর্মের জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হ'য়েছিল।' ঐ সুকর্মটি কি, তা খুলে বলার আগে জানানো দরকার যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কায়েম করা হয় ১৮০০ সালে। লর্ড ওয়েলেসলি তখন 'বাঙালা'-রাষ্ট্রের তথা 'ভারতে'র বৃটিশ শাসক। রাজধানী তখন কোলকাতায়। আর 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-ই তখন রাজ্যের 'মা-বাপ'। সে-সময় কোম্পানীর কাজ

* দেখুন—ড. এস.এম. লুৎফর রহমান। বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস-২য় খণ্ড, (ঢাকা-২০০৫), পৃ.২৩২-'৫৩।

www.pathagar.com

আর—তেজারাতির মাঝে আটকা নেই। তখন তাঁদের এদেশ শাসনের জরুরৎ দেখা দিয়েছে। বেশ ভালভাবেই কাজ চালাতে হবে। তাই ওয়েলেসলি ঠিক ক'রলেন ইংরেজ সাহেবদের বাঙালা ভাষা না শেখালে দেশ-শাসনের কাজ চালানো কঠিন হবে। তাই দেশে চালু, দেশীয নানা ভাষা (বাঙালা, হিন্দী, উরদু ওগয়রহ) শেখাবার জন্যই তিনি কোলকাতায় একটা কলেজ কায়েমের ইরাদা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছিল তাঁর সেই খায়েশের ফল। তাই মার্শম্যান লিখেছেন—"Lord Wellesley, finding the Civil Servants inperfectly acquainted with the language of the country, established the College of Fort William in Calcutta, in the year 1800". এ-কলেজ ১৮০০ সালের অগাস্ট মাসের ১৮ই তারিখে ওপেন করার পর, ১৮০১ সালে খোলা হয়—বাঙালা বিভাগ। দিনটা ছিল চৌঠা মে। তা আগে বলা হয়েছে।

বাঙালা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় উইলিয়ম কেরী-(১৮৬১-১৮৩৪) কে। তাছাড়া, তাঁর অধীনে প্রধান পণ্ডিত পদে নিয়োগ দেয়া হয়—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারকে। কারো মতে ইনি উড়িয়া। কারো মতে 'বঙ্গজ'। চট্টোপাধ্যায় ছিল তার কুল-উপাধি। বিদ্যালংকার ছাড়া এ-বিভাগে আরও ছ'জন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা হলেন—

১. রাম রাম বসু
২. গোলোক নাথ শর্মা
৩. তারিণী চরণ মিত্র
৪. রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়
৫. চণ্ডীচরণ মুনশী ও
৬. হরপ্রসাদ রায়।

এসব পণ্ডিত অনেক আগে থেকেই কোম্পানীর কর্তাদের দোসর ছিলেন। কেউ কেউ ছিলেন—শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনারীদের মুনশী বা লেখক। যেমন রাম রাম বসু। খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজে তিনি উইলিয়ম কেরীর খুব ঘনিষ্ঠ সহযোগী হ'য়ে ওঠেন। তাই বামুন না হ'লেও, উত্তম ফারছী ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা জানার জন্য তিনি কেরী, টমাস ওগয়রহের অধীনে চাকুরীও ক'রেছেন। এ-রকম সব লোকজন নিয়ে কেরী যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙালা শেখাবার দোকান খোলেন,—তখন দেখা যায়, ঐ সব পণ্ডিতের পড়াবার মত কোন "গ্রন্থ" "ভাষায়" ('বাঙালা ভাষা'য়) লেখা নেই। যা আছে, তার সব-ই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়

www.pathagar.com

"পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধে ভরা, ক-অক্ষর গোমাংস"। সে-সব ছোঁয়া তো যাবেই না; এমন কি, মুখে তোলাও (উচ্চারণ করা) যাবে না। আবার এদিকে বহু-মূল্য চাকুরী বাঁচাবার দরকার। বিদ্যালংকারকে তখন মাসে, দু'শ' টাকা বেতন দেয়া হ'ত। এক দিকে, এই টাকার লোভ, অপর দিকে ধর্মরক্ষা ও মান-ইজ্জৎ। তাই বই নেই তো কি হ'য়েছে। ভাষা? পণ্ডিতের আসাধ্য কি? পড়ুয়া ইংরেজ ব্যাটারা তো আর জানে না, কোন্‌টা কুকুর আর কোন্‌টা মেকুর। কাজেই তাঁরা লেগে গেলেন "ভাষা"য় বই লিখতে। একাজে পহেলা কিছু মক্‌শ করা ছিল,—রাম রাম বসুর। তিনি শ্রীরামপুর-মিশনের সঙ্গে থেকে কেরীর বেতন ভোগী লোক হিসেবে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য কিছু গান-কবিতা লিখেছেন। কলেজে যোগ দেবার আগে, ১৮০০ ও ১৮০১ সালে তার দু'টো বইও লণ্ডন থেকে ছাপা হ'য়েছে। কাজেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজ ছাত্রদের জন্য তাঁকেই পহেলা বই লিখতে এগিয়ে আসতে হ'ল। তিনি ১৮১৩ সালের সাতই অগাস্ট ইন্‌তেকালের আগ তক কলেজ-পড়ুয়াদের জন্য দু'খানা পাঠ্য বই লেখেন। তার একখানা ছাপা হয়—১৮০১ সালে। নাম—'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। এ-বছর-ই ছাপা হয়—উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন'। এ-সালে, আরও একখানি ছাত্র-পাঠ্য বই ছাপা হয়। নাম—'হিতোপদেশ'। লেখক গোলোকনাথ শর্ম্মণঃ।

পরের বছর ১৮০২-এ রাম রাম বসুর আর একখানি বই ছাপা হয়। নাম—"লিপিমালা"। এ-বছর-ই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের বিদ্যাদিগ্‌গজ-গ্রন্থ "বত্রিশ সিংহাসন" প্রকাশ পায়। এটি-ই তাঁর প্রথম বাঙালা কেতাব।

এরপর ১৮০৩ সালে তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট', ১৮০৫-এ রাজীব লোচন-এর 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর 'তোতা ইতিহাস', ১৮০৮-এ মৃত্যুঞ্জয়-এর "হিতোপদেশ" ও ১৮১০-এ তার 'রাজাবলী' ছাপা হয়।

তারপর, ১৮১২ সালে বেরোয় উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাসমালা'। এ-ধারায় ১৮১৫-তে প্রকাশিত হয়—হরপ্রসাদ রায়-এর 'পুরুষ পরীক্ষা'। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার-এর শেষ বই "প্রবোধচন্দ্রিকা" ছাপা হয় ১৮৩৩ সালে।

এসব বইয়ের প্রায় সব-ই লণ্ডন থেকে ছাপা হ'য়ে আসত। সরকারী খরচে। সরকারী মদদে। এসব বইয়ের কোন কোনটি ছিল অনুবাদ বা তরজমা। দেশে তখন এসব বই কেউ ছাপত না। ছাত্রদের খাতিরে পাঠ্য বই ছাড়া 'বাঙালা'-

www.pathagar.com

অভিধান ও ব্যাকরণেরও দরকার ছিল। কারণ ঐ সময় তক এবং তারপরও এক শ' বছর যাবৎ বাঙালীদের বাঙালা ভাষা শেখার ও জানার জন্যে কোন ব্যাকরণ-অভিধান লাগত না। দু'চারটা কঠিন আরবী ফারছী শব্দের কারণে সাধারণ পাঠকদের কোন অসুবিধে হ'লে, "গিয়াস লোগাত" নামের একখানা ফারছী অভিধানের সাহায্য নেয়া হ'ত ব'লে জানা যায়। তাই অন্য অভিধান না থাকায় কাউকে তেমন বেকায়দায় প'ড়তে হ'ত না। কারণ **জনগণের ভাষার সাথে তখনকার চালু সাহিত্যের ভাষার কোন ফারাক ছিল না। কথাটা গ্রীয়ার্সন সাহেব ব'লে গেছেন।**

কিন্তু পণ্ডিতদের সেই 'ভাষা'য় লেখা-পড়া ক'রলে ধর্ম থাকে না এবং ইজ্জৎ থাকে না ব'লে, তাঁরা যে-নতুন 'ভাষা-শব্দ' পাঠ্য বইয়ে লেখেন, তার অর্থ কোথায় পাওয়া যাবে? এই অভাব মেটাতেই উইলিয়ম কেরী তাঁর চার পাশের পণ্ডিতদের নিয়ে কাজে লেগে যান এবং ১৮১০ থেকে ১৮২৫ সালের মাঝে এক বিশাল "অভিধান" বা 'ডিক্শনারী' লিখে ফেলেন। নাম—"A Dictionary of the Bengali Language". বইটি ছিল "তিন বালামে" (ভলিউম) "দু'হাজার ষাট পৃষ্ঠায় সমাপ্ত"। মূল্য—তখনকার টাকায় এক শ' দশ। ইংরেজী-বাঙালায় লিখিত বিপুল তকলিফ ও তঙ্কা (টাকা) খরচ ক'রে ছাপা, এ-"ডেকসিয়ানরি" তখন আম জনকওমের আদৌ কোন দরকার মেটাতে না পারলেও, ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত ও ছাত্রদের যে, "বেশ" কাজে লাগে,—তা সত্য। কারণ তা তাদের মুখস্ত ক'রতে হ'ত।

বলা দরকার যে, 'ফোর্ট উইলিযম কলেজ' ১৮৫৪ সাল তক চালু থাকলেও, ১৮১৫ সাল তক ছিল তার বিশেষ জমজমাট হাল। ১৯২৫-সাল অবধি নতুন ভাষা-শিক্ষার্থীদের তরফে কেরীর 'ডেকসিয়ানরী' লেখা ও ছাপা হ'লেও, 'বাঙালা ব্যাকরণ' তখনও বেরোয়নি। যদিও এর অনেক আগেই হ্যালহেড পহেলা 'বাঙালা ব্যাকরণ' লেখেন (১৮৭৩-এ)। তবু তা ফোর্ট উইলিয়মীয় আলেমদের পছন্দ হয়নি। তাই তাঁরা একাজের ভার দেন, রাজা রামমোহন রায়কে।

'স্কুল বুক সোসাইটি'র ভূমিকা

আলোচ্য বইটি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে ১৮১৭ সালে সরকারী ভাবে কায়েম হওয়া 'স্কুল বুক সোসাইটি'র কথা বলা দরকার। এই 'সমিতি' বানানো হয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পড়ুয়াদের জন্যে লেখা বই ছাপার উদ্দেশ্যে। তবে পাণ্ডুলিপিগুলো ছাপার আগে, 'উপযুক্ত আলেম'দের দিয়ে তা সংশোধন ক'রে নেয়া

www.pathagar.com

হ'ত। তার আগ তক কলেজ পাঠ্য বইগুলো লণ্ডন থেকে ছাপা হ'য়ে আসত। সেকথা আগেই বলা হ'য়েছে।

রামমোহন রায়-এর ব্যাকরণ

রামমোহন ও তাঁর লেখা 'ব্যাকরণ'-বিষয়ে বলা দরকার, এ-বই লেখার আগে ১৮১৫ সালে তাঁর 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' নামে পণ্ডিতী গদ্যে নতুন "বঙ্গ" ভাষায় লেখা, একটি বই ছাপা হয়। তারপর যখন তাঁকে ব্যাকরণ লেখার ভার দেয়া হয়, তখন আযাচিত ভাবে তাঁর একটি বিশেষ সুযোগ এসে যায়। যার ফলে, তিনি খুব সাত-তাড়াতাড়ি, ব্যাকরণখানি লিখে ফেলেন এবং ১৮২০ সালে বিলাত যাবার আগে রচনাটি 'স্কুল বুক সোসাইটি'র পরিচালকের হাতে দিয়ে যান। তাঁরা সে-বই ঠিকঠাক করিয়ে ছাপেন ১৮৩৩ সালে। রামমোহনের ইন্‌তেকালের পর। বাঙালা ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনাকালে পরে বইটির পুরো পরিচয় হাজির করা হবে।

রাজা রামমোহন-এর বিলেত যাওয়া নিয়ে, ভারতীয় বাঙালার লেখক—গোলাম আহমাদ মোর্তজা, তাঁর "চেপে রাখা ইতিহাস" নামক মহা মূল্যবান বইয়ে লিখেছেন—"রামমোহন ইংরাজীতে সুপণ্ডিত হওয়ার পর, তাঁর পাণ্ডিত্যের খবর চারিদিকে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় আকবর শাহ্ তখন দিল্লীর বাদশাহ্। নামে মাত্র বাদ্‌শাহ্ ছিলেন, ক্ষমতা ছিল আসলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। তাই বাদশাহ্ রামমোহনকে ডেকে তাঁকে (তাঁর পক্ষে কিছু দাবী দওয়া বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ ক'রে, তা আদায়ে) বিলেত যাবার জন্য অনুরোধ করেন। রামমোহন এই সুযোগকে স্বর্ণমণ্ডিত মনে ক'রে রাজী হ'য়ে যান। কারণ খরচপত্র সব বাদশাহের পক্ষ হ'তে পাওয়া গেল।

বিলেতের বড় কর্তারা ভারতীয় হেজিপেজি লোকদের সঙ্গে কথা ব'লতে ঘৃণা বা আপত্তি ক'রতেন। শুধু ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের-ই সরাসরি কথা বলার সুযোগ দিতেন। তাই রামমোহনকে "রাজা" উপাধি দিয়ে দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠালেন। বাদশাহের পক্ষ হ'তে নিবেদনে কোন ফল না হ'লেও (কেননা, তাঁর পক্ষে কোন দাবী-ই তিনি বৃটিশ সরকারের কাছে তোলেননি), রামমোহনের বিলেত-যাত্রা এবং হঠাৎ-প্রাপ্ত "রাজা" উপাধি রামমোহনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ক'রতে সাহায্য করে। আর তাই রামমোহন যখন বিলেতে, তখন ভারতের বিখ্যাত ইংরেজ নেতা ডেভিড্ হেয়ার বিলেতে তার ভাইকে পত্র লিখলেন,—'রাজা রামমোহনের থাকা, খাওয়া ও নানা স্থানে বক্তৃতাদি করার সমস্ত রকম সহযোগিতা দেবার জন্য'।

www.pathagar.com

পত্র মোতাবেক সব রকম ব্যবস্থা হ'য়েছিল।"

ঐ সময় রামমোহন বিলেতে অসুস্থ হ'য়ে পড়েন এবং তিনি তাঁর বক্তব্য লিখিতভাবে বৃটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপন করেন। সে-বিষয়ে জনাব মোর্তজা লিখেছেন—"সেই বিবৃতিতে পাঁচটি দাবী ছিল। অনেকের মতে তাঁর মধ্যে উলে-খযোগ্য দাবী হ'ল—ভারতে ফারছী ভাষা এবং আরবী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ক'রতে হবে এবং সরকারী কাজকর্ম ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই ক'রতে হবে। এটা অবশ্য পরে কার্যকরী হ'য়েছিল। অর্থাৎ ইংরেজ সরকার তাঁর পরামর্শ ও দাবী অনুযায়ী ফারছী ও আরবীর মৃত্যু ঘটিয়ে ভারতীয় বা বঙ্গীয় মুছলিম শিক্ষিত সমাজকে মূর্খ বেকার সমাজে পরিণত ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিল।"

রামমোহনের এই দেশ, জাতি, সমাজ ও মুছলিম-বিরোধী নিমকহারামী-ভূমিকা, কেবল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর ও আরবী-ফারছী ভাষা-বিদ্বেষে সীমিত ছিল না; তার বিস্তৃতি অনেক দূর অবধি গড়িয়েছিল। সে-বিষয়ে ড. অমলেন্দু দে লিখেছেন—"রামমোহন ভারতে বৃটিশ শাসন সমর্থন করেন। বৃটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি ভারতে বৃটিশ কলোনাইজেশন সমর্থন করেন। এমনকি, বৃটিশ নীলকরদেরও প্রশংসা করেন। তাঁর মতে নীলকরেরা দেশের উপকার সাধন ক'রেছে। তাছাড়া, তিনি ভারতীয়দের সভ্য করার বিষয়ে ইংরেজের ভূমিকার প্রশংসা করেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন জমিদারী প্রথার সমর্থক। মোট কথা, দেশাত্মবোধের বাস্তব প্রকাশ রামমোহনের মধ্যে পাওয়া যায় না।" ছাফ কথা—রামমোহন সর্ব বিষয়ে ছিলেন বৃটিশ-অনুগত।

মোটের ওপর, এরকম বাপে-তাড়ানো, মায়ে খেদানো (কারণ রামমোহনকে তাঁর মা ত্যাজ্যপুত্র করেন) "হঠাৎ রাজা" {কারণ কপর্দকহীন রামমোহন দিল-ীর বাদশাহের নিকট থেকে কেবল "রাজা" উপাধি বাগাননি, সেই সাথে, বৃটিশের দালালি ক'রে, জমিদারী ক্রয়, লগ্নী-(সুদের) ব্যবসা, কোম্পানীর কাগজ-ক্রয় (শেয়ার?) ব্যবসায় প্রভৃতি অনেক কিছু ক'রে, কোলকাতায় একাধিক বাড়ী ও জায়গাজমির মালিক হন} এবং রাম রাম বসুর মত চরিত্রহীন (এ-দোষে শাস্তি স্বরূপ বসুকে ১৭৯৬ সালে কেরীর চাকুরী ছাড়তে হয়) আর বিদ্যাসাগরের মত চটিধারী টুলো পণ্ডিতরাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে জোট বেঁধে বাঙালা তথা সারা উপমহাদেশের 'ভাষা-ভাগে'র রোয়েদাদ-রচনায় নিয়োজিত হন। রামমোহনের পর বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গটিও এ-কারণে এখানে আনতে হ'ল যে, তিনিও শেষ দিকে

www.pathagar.com

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন।

এ-সব 'পণ্ডিত' তাঁদের রচনাবলীর কাঁটা-কম্পাস দিয়ে কি ভাবে, কোন্ রঙে, কোন্ রেখায় অবিভক্ত বাঙালা ও বাঙালীর ভাষা, শিক্ষা ও সাহিত্য-কেন্দ্রিক কালচারের রোয়েদাদ বা বিভক্তি রচনা করেন এবং তার রূপ-চেহারা কেমন দাঁড়ায়; এবার তার পরিচয় হাজির করা হবে।

বলা দরকার, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও 'স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রকাশিত সব ক'টি বই হাতে পাওয়া যায়নি। তার অবশ্য দরকারও নেই। সেজন্য প্রাপ্ত কয়েকখানি মূল গ্রন্থ ও অন্যগুলোর প্রাপ্ত কোটেশনের সাহায্যে পণ্ডিতী "বঙ্গ ভাষা"-র পরিচয় তুলে ধরা হবে।

১. রাম রাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রং"।

আগেই বলা হ'য়েছে—১৮০১ সালে রাম রাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' যখন প্রকাশিত হয়, তার আগে তিনি আরও দু'খানি বই প্রকাশ করেন। তাঁর খৃষ্টধর্ম-প্রচার মূলক গদ্য-পদ্য রচনাও ছিল। সেগুলো পাওয়া না গেলেও রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র বইখানি মিলেছে। ১৩৪৫ সালে সজনী কান্ত দাস-প্রকাশিত দ্বিতীয় মুদ্রণে এ-বইয়ে যে-ভাষারূপ দেখা যায়—তার মাঝে নতুন-পুরানা উভয় ধাঁচ-ই র'য়েছে। অর্থাৎ তখনকার চালু 'বাঙালা' ভাষা-রূপ ও নতুন নির্মিতব্য 'বঙ্গ' ভাষা-রূপ এ-বইয়ে খুব পষ্ট ভাবেই চোখে পড়ে। দেখা যায়—বর্তমান ৬৮ (পুরানা ১৫৭) পৃষ্ঠার পুস্তকটি শুরু হ'য়েছে সচেতন ভাবে এ-রকম ভাষায়—"বঙ্গ ভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু প্রভৃতি অনেক ২ রাজাগণ উদ্ভব হইয়াছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহারদের কথা মাত্র শুনা যায়, তদব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই উপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এশকল প্রশঙ্গ শ্রবণ করে আনুপুর্ব্বিক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়—

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এদেশে প্রত্যপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রথিত আছে"... ইত্যাদি। পরের পৃষ্ঠায় শেষ দিক থেকে অনেক দূর তক (পৃষ্ঠা-৪২) এরকম ভাষা নেই। তার বদলে যে-ভাষা-রূপের দেখা মেলে তা হ'ল—"যে কালে দিলি-র তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল একারণে হোমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর ২ ঝকড়া লড়াই

www.pathagar.com

কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল না।....”

রাম রাম বসুর রচনার ঐ দু'টি অংশের মধ্যে পহেলা অংশ 'বঙ্গ' ভাষায় আর দোছরা অংশ 'বাঙ্গালা' ভাষায় লেখা। পহেলা রূপটি ছিল সৃজ্যমান বা নব নির্মিত; আর পরের রূপ—শত শত বছর ধ'রে চালু মূল গণমুখীভাষা-রূপ। শেষ ভাষা-রূপটির আরও কতিপয় নমুনা—

(১) “এ হেঁদুর দেশ। তাহারদের অধিকার। মোছলমানেরা আপন পরাক্রমে এরাজ্য করতল করিয়াছেন। দিলি-পতি মোছলমান। আমিও সেই জাতি।.....তাহার নামে শিক্কা মারা যায় এবং তিনি তক্তে বসেন আমি তাঁহার দাস মত একি অসঙ্গত কার্য্য। তাহাকে আমি আর কর দিব না। খানাজাতে সৈন্য মুরচাবন্দি করিয়া মজবুতিতে আপন মুলুকে কতৃত্ব করিব।”

(২) “ইহা শ্রবণ মাত্রই একব্বর বাদসাহ.....এ.....মতে ফরমান রাজা তোড়লমল দুই লক্ষ ফৌজ সমেত দাউদের নিপাতার্থে গৌড়ে তাঁই হইলেন”—

(৩) “দ্বিতীয় বার মাশুম খাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিত এবং তাহার দ্বারায় সিংহ রাজার কাছে এই কথার আলোচনা হইলে গুপ্তে ওমরাও গৌড় হইতে উত্তরিয়া মাশুম খাঁকে বড়ই একটা দেলাসা করিল এবং বক্সিসহ কিছু দিয়া কহিল তাহাকে তুই দাউদকে আন যাইয়া কিঞ্চিত মাত্র গৌন করিস না শীঘ্র আনিস তবে আমি পুনর্ব্বার খুব ইনাম দিব তোকে” ।... ইত্যাদি।

(৪) “এ খবরে ফের রাজা প্রতাপাদিত্য দরখাস্ত করিলেন যদিত এ গোলামের উপর রাজ্যের ভার হয় তাহার ফরমান প্রাপ্ত এ গোলাম এখানে হয় তবে এ তিন বৎসরের যে বক্রি কর তাহা এ গোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে হুকুম হইলে কর্জ্জ দাম করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে।

ইহাতে বাদসাহের মনস্থ হইল চাকলে যশহর ওগএরহের রাজত্বের বহলি ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল রাজা প্রতাপাদিত্য ঐ আমানত টাকা সেই দিবস খালিসা দাখিল করিলে তিন বৎসরের করের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা উহাকে রেয়ায়ত হইল এবং নানাবিধ খেলাত রাজ্যের ও নবাবের মনছবদারির ইহাতে রাজা অতি দন্ডায়মান হইয়া ওজির ইত্যাদি সমস্তকেই শওগাত দিয়া হর্ষমনে বান নেসান ডঙ্কা সমস্ত মনছবদারের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া বাইশ হাজার ফৌজ সমেত ডঙ্কা দিতে ২ উকিল নিযুক্ত করিয়া হেন্দুস্থান হইতে বাহির হইলেন।”

এ-ভাষাই ছিল তখনকার চালু বাঙালা ভাষার কিছু কাছাকাছি ভাষা। কিন্তু সারা বইখানি এ-ভাষায় লেখা হয়নি। ৪৩ পৃষ্ঠা থেকে খুব পষ্ট ভাবেই রাম রাম তাঁর পণ্ডিতী ভাষায় ফিরে গেছেন। ফলে, সে-ভাষা যে বঙ্কিমী "ভাষা"র কত কাছাকাছি হ'য়ে উঠেছে, তা নিচের কোটেশন থেকে বোঝা যায়। যথা—"শুভক্ষণানুসারে যশহর পুরীর সমস্ত রাণীগণেরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য অম্-ান বস্ত্র কেহ বা পট্ট বস্ত্র কেহ বা কামতাই কেহ বা লক্ষ্মীবিলাষ কেহ বা পীতাম্বর কেহ বা নীলাম্বর নানা প্রকার পরিচ্ছদে সকলে পরিচ্ছদান্বিতা হইয়া বেশ বিন্যাস করিয়া বহুবিধ সুগন্ধি আতর প্রভৃতিতে আমোদিতা হইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণে ধুমঘাটের পুরীতে আগমন করিতেছেন।" (পৃ. ৪৪)।

অতএব, রাম রাম বসু পণ্ডিতদের সঙ্গে মিশে পণ্ডিতী "ভাষা" যেমন রপ্ত ক'রেছিলেন; তেমনি চালু ফারছী-বাঙালাও ইচ্ছা ক'রলে মোটামুটি লিখতে পারতেন—তা সত্য। কিন্তু, পণ্ডিতী "ভাষা"র সংস্কৃত-নির্গত শব্দ-শোষণে তাঁর ক্ষমতা থাকলেও, নতুন ভাষা-রীতির বাক্-ভঙ্গি নির্মাণে তাঁর যোগ্যতা ছিল না। সেই সঙ্গে নতুন ভাষার নতুন পদ-রচনা রীতিও গরহাজির থাকায়, সে-ক্ষেত্রেও তাঁর মুন্শীয়ানার পরিচয় নেই। তার ওপরে, চালু ফারছী-বাঙালায় বাক্য গঠন-তরতিব (পদ্ধতি) মুছলিম বাক্-ভঙ্গি-নির্ভর ছিল ব'লে, তখনকার লেখকান (লেখকগণ) শত শত বছর ধ'রে দাঁড়ি কমা, সেমিকোলন, হাইফেন, ড্যাশ ওগয়রহ বিরাম ও বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার না করায়, সেই—অভ্যাসটি রাম রাম বসুও ছাড়তে পারেননি। তাই তাঁর বইয়ে প্যারার শেষে ছাড়া কোন বিরাম চিহ্ন কিংবা হাইফেনাদি নেই ব'ললেই চলে। ফারছী-বাঙালায় শব্দের দ্বিত্ববোধক ২-সংখ্যার ব্যবহারও রাম রাম বসু ক'রেছেন—তা লক্ষণীয়। এর আগে বলা হ'য়েছে—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এসব সংস্কৃতনিষ্ঠ (ফারছী জ্ঞান সম্পন্নও) পণ্ডিতান চ'লতি 'বাঙালা' শেখাতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। সেকথা কতটা সত্য—রাম রাম বসুর পণ্ডিতী "ভাষা"য় লেখা নিচের কোটেশন-গুলো থেকেই তার নজীর মিলবে।

১) "এই মত আসন্ন কালে বিপরিত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল দিলি-র কর ও শওগাত এক কালিন বন্দি করিয়া আপন অধিকার তিন সুবা উৎপন্নীয় ধন দিয়া সৈন্য প্রচুর রাখিয়া থানাজাতে মুরচাবন্দি করিল আট দশ বৎসরাবধি ধন-সঞ্চয় করিল ও সৈন্য সামন্তের বাহুল্য।" (পৃ.৫)।

২) "অতএব এখন আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাভাইয়া বরাবরি করিতে তাহার সহিত বুঝি আমার এই শেষ দসা নতুবা এমত কুবুদ্ধি আমাকে

www.pathagar.com

ঘটিত না আমি পতঙ্গ কমর বন্দি করি সিংহের সাতে যাহা হউক সমস্তই সময়ানুযায়ি।" (পৃ. ১০)।

৩) "তোর ঐশ্বর্য্য হবেক বৃহৎ তোর পিতৃ পিতামহ হইতে। এভূমি সমস্ত হবেক তোর করতল। আমি কন্যা ভাবে স্থিতি করিব তোর গৃহে যাবৎ তুই বিদায় না করিবি আমাকে।" (পৃ. ৫১)। ইত্যাদি।

এ-সব বাক্য 'বাঙালা' ভাষার বাক্-রীতির কাছাকাছি ছিল, তাও বলা যায় না। কারণ সমকালে চালু ফারছী-বাঙালায় লেখা নমুনাগুলোর বাক্-ভঙ্গি বা বাক্য গঠন তরতিব, এর থেকে উন্নত ছিল। নতুন "ভাষা"য় লিখতে গিয়েই যে, বসু মশায় ঐ রকম লিখেছেন, তা কবুল ক'রতেই হবে। তবে তার নতুন-পুরানো কোন ভাষার জ্ঞান-ই উচ্চতর ছিল না।

রাম রাম বসু সেকালের চালু ফারছী-বাঙালার বানান-রীতিও একেবারে ভুলতে পারেননি এবং অচল সংস্কৃত শব্দ লিখতে গিয়ে "ভাষা"য় অসংগত বানান ব্যবহার ক'রেছেন, তা নিচের ইসাদী থেকে জানা যায়। যথা —

১) "দাউদ শিশু পাঠদসায় পাঠসালায় পারসি ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করেন।" (পৃ.৩)।
[এবাক্যে "পাঠসালা", "পাঠদসা", 'পারসি" ইত্যাদি বানান ফারছী-বাঙালার-ই বানান।]
২) "আমরা কোন কিটস্য কিট ক্ষুদ্র বস্তু।" (পৃ. ৩০)।
[এখানে কিটস্য কিট বানান লক্ষণীয়]

অথচ এই বানান, অন্য রূপ পেয়েছে—অপরাপর শব্দের বানানে। সে কারণে বোঝা যায়—রাম রাম বসুর মত পণ্ডিতান (পণ্ডিতরা) তখনও ফারছী-বাঙালা ভাষার চালু বানান রীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত বানানও সর্বত্র লিখতে সমর্থ হননি। তাই "শকল" "প্রশঙ্গ", "সমিভ্যারে" (সমভিব্যাহারে), দুর্দ্দর্শ (দুর্দ্ধর্ষ), "যাবদীয়" ইত্যাদি বানান রূপও নজরে না প'ড়ে পারে না। কেননা, পণ্ডিতদের কাছে তখনও "সোনা"—"স্বর্ণ", "রূপা",—"রৌপ্য", "দোকান"—"বিপণি", "তদবির"—"অনুরোধ", "নহবৎ (নৌবৎ) খানা"—"নাটমণ্ডল", "দোমহলা-ছেমহলা"—"দ্বিতল-ত্রিতল অট্টালিকা", "দিবা—"দিক," "হেন্দোস্তান"—"হিন্দুস্থান" হ'য়ে ওঠেনি। তাঁদের কলম থেকে

www.pathagar.com

তখনও স'রে যায়নি—"দুলিচা গালিচা সতরঞ্চি মখমল", "কারোয়ান" (পশু বিক্রেতা), "মাল গুজারি", "দোপাটি সহর", "ছেমহলা বালাখানা", "দেয়ান", "দেয়ানি", "মালের কাছারি", "ফৌজদারি আদালত", "তেজারতের কাছারি" "খাজানা", "খাজানা খানা", "দেয়ানখানা", "তোষাখানা" এবং "দস্ত-ব-দস্ত", "তরো-ব-তরো" প্রভৃতি শব্দ ও ইডিয়ম। (দেখুন—পৃষ্ঠা-৩৫-৪০)।

এ-রকম আরও বেশুমার নজীর হাজির ক'রে দেখানো যায়, রাম রাম বসু নয়া 'বঙ্গ ভাষা' রচনায় যেটুকু কামিয়াবী দেখিয়েছেন, তা থেকে অনেক বেশী কামিয়াব হ'তেন যদি তিনি 'বাঙালা ভাষায়' আজাদ মনে আজাদ কলমে বইখানি লিখতেন। তাই একটা উট্‌কো ভাষায় বই লেখার সেই আমলে না-কামিয়াবী কেবল রাম রাম বসুর কলমে নয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অপরাপর পণ্ডিতের লেখায়ও ফুটে উঠেছে।

২. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-এর "রাজাবলী"

তার আর একটা নজীর হিসেবে এবার এই কলেজের অপর পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার চট্টোপাধ্যায়ের রচনার হকিকৎ বয়ান করা যায়।

বিদ্যালংকার—মেদিনীপুরে ১৭৬২-তে চট্টোপাধ্যায়কুলে পয়দা হন। কাজেই তিনি উড়িয়া নন, বঙ্গজ বটে। তাঁর বইগুলোর মধ্যে 'রাজাবলী' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' মৌলিক রচনা। অন্য সব সংস্কৃত থেকে তরজমা। মৃত্যুঞ্জয়ের "রাজাবলী"র, ১৩১২-সালে ছাপা কপিতে, পহেলা যে-ভাষার নমুনা মেলে, তা হ'ল—" ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একাধারে এরূপ জ্ঞাতব্য তত্ত্বপূর্ণ বিচিত্র ইতিহাস গ্রন্থ কেবল বঙ্গ ভাষায় কেন, ইংরাজীতেও নাই। এ বিষয়ে এই গ্রন্থ অদ্বিতীয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়।...কলির প্রারম্ভ হইতে কত জন হিন্দু-নৃপতি ভারতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাহাদের কত জন ক্ষত্রিয় এবং কত জন হিন্দু জাতির কোন্ বর্ণভুক্ত ছিলেন, এবং কোন্ নৃপতি কিরূপ গুণগৌরব সম্পন্ন ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিহাস রাজাবলী গ্রন্থে বিবৃত আছে।"

এরপর মূল লেখক যে-ভাষায় তাঁর গ্রন্থ শুরু ক'রেছেন, তা হ'ল—"ব্রহ্মপ্রভৃতি কীট পর্য্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকদের ভূলোকাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধতন সপ্ত লোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্ত লোকরূপ নিবাসস্থানের এবং অমৃত যব ব্রীহি তৃণাদিরূপ তাবৎ ভোগ্য-বস্তু সকলের ও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্বর্গ, নরক, বন্ধ, মোক্ষ ব্যবস্তমা ও কল্প, মন্বন্তর যুগাদিরূপ কাল বিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের

www.pathagar.com

মঙ্গল করুন।

পিতৃকল্পাদি ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণ বশতঃ বর্ত্তমান শ্বেতবারাহ কল্প যাইতেছে, একেক কল্প কল্পেতে চতুর্দ্দশ চতুর্দ্দশ মনু হয়ত তাহাতে শ্বেতবরাহ কল্পের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু যাইতেছে।" (পৃ. ১)।

খেয়াল ক'রলে বোঝা যায়, 'কোট্' করা অংশে হাইফেন-কমা র'য়েছে। বাক্য মধ্যে দ্বিত্ব বোধক ২ সংখ্যাও নেই। তার অর্থ এ-মুদ্রণে সম্পাদক-প্রকাশক বানান ঠিক রেখেছেন কিনা, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তথাপি লেখক যে, খুব সচেতন ভাবেই নতুন "বঙ্গ ভাষা"য় গ্রন্থ রচনার কোশেশ ক'রেছেন, তা বুঝতে কারো তকলিফ্ হবার কথা নয়। কারণ কোন কৃত্রিমতাই বেশী দূর টেনে নেওয়া যায় না। লেখা তো নয়-ই; সে-কারণে রাম রাম বসুর মত বিদ্যালংকারও "রাজাবলী" যে -ভাষায় শুরু ক'রেছেন; সে-ভাষায় শেষ ক'রতে পারেননি। তিনি তাঁর এ-বইয়ের শেষ ভাগে "বঙ্গ-ভাষা" ছেড়ে চালু ফারছী-বাঙালায় ফিরে গিয়েছেন; যা হয়তো তার নিজের অজানায়-ই ঘ'টেছে। ফলে, তিনি বইটির শেষ ভাগে যে-ভাষা লিখেছেন, তা এরূপ—

১) "আলি গওরশাহ বাদশাহ হইয়া আপনি শাহ আলম নামে এই হিন্দুস্থানে খোঁতবা ও সিক্কা জারি করিলেন ও সুজাওদ্দৌলাকে উজির করিলেন। কিছুদিনের পর লর্ড ক্লাইব নামে বড় সাহেব দিলি- গিয়াছিলেন, তখন নবাব সয়ফদৌলার খানে আজম খেতাব ও হপ্ত হাজারী মনসব ও বাঙ্গালার সুবেদারি ও কোম্পানি বাহাদুরের বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও বেহার এই তিন সুবার বাদসাহী দেওয়ানি এবং বাদশাহের ইচ্ছামতে আপনার সাবজ্জঙ্গ খেতাব এবং নবাব মুজফরজঙ্গের খানখানানি খেতাব ও জায়গীর ও হপ্তহাজারি মনসব ২০.০০০ মোসহরা এবং মহারাজ দুর্ল্লভরামের মহীন্দ্র খেতাব ও জায়গীর ও স্বস্ব হাজারী মনসব ও ১৬ শ হাজার মোসহরা ও রাজা শেতাব রায়ের মহারাজ খেতাব ও পঞ্চহাজারী মনসব ও সুবে বেহারের নেযাবত এবং (পৃ. ১২৯) মহারাজ দুর্ল্লভরামের পুত্র রাজবল-ভের রায়রায়ানি কার্য্য ও জায়গীর ও চাহার হাজারী মনসব এবং জগত শেঠ মহাতাব রায়ের পুত্র খোসালচন্দ্রের জগত শেঠ খেতাব এবং মুন্সী নবকৃষ্ণের রাজগী খেতাব পাঁচসদ্দি মনসব এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া বাঙ্গালাতে আসিয়া ঐ সকল ঐ সকল ওমরাদিগকে লইয়া সাহেবান ইংরাজবাহাদুর ঐ তিন সুবার মুক্তিয়ার হইলেন, কিন্তু চৌথে উড়িষ্যা বর্গিদের দখলে থাকিল।" (পৃ. ১২৯-'৩০)।

www.pathagar.com

২) "আলমগীরসানি বাদশাহ্ হন ১১৬৭ হিজরি সনে, ঐ আলমগীর সানি বাদশাহের জলসী ২সনে নবাব সিরাজদ্দৌলা ঐ তিন সুবার সুবেদার হইয়া এক বছর পাঁচ মাস (মূলে ১/৫ লেখা) সুবেদারী করিয়া এই রূপে মীরনের হাতে মারা গেলেন।" (পৃ. ১৪৮)।

৩) "এই রূপে নবাব জাফরালীখাঁ কলিকাতায় কএদ হইয়া থাকিলে পর নবাব কাসমলীখাঁ সুবেদার হইয়া ঝাড়ী অঞ্চলে আলী গৌহর শাহাজাদার নিকটে অনেক ধন ও অনেক উত্তম সামগ্রী ও আবদাস্ত পাঠাইয়া সুবেদারীর সনন্দ এবং নসীরুল্লুল্ক (নাসির -উল-মুলক) ইমতেয়াজদ্দৌলা আলীজাহ মীর কাসমলীখাঁ বাহাদুর এই খেতাব ও হপ্তহাজারী মনসব এই খেতাব পাইয়াই সাহেবলোকদের সহিত বিমতাচরণ করিয়া আপনি স্বতঃ প্রধান হইলেন এবং".....(পৃ.১৫১)।

এ-তিনটি কোটেশনে ভালভাবে নজর দিলে দেখা যায় 'রাজাবলী'র আলোচ্য এডিশন-(Edition) এর ভাষা ও প্রকাশ-রীতির বিরামচিহ্ন এবং বানানাদির অনেক বদল ঘটানো হ'লেও লেখকের সমকালীন ফারছী-বাঙালা ভাষায় লেখার তরতিব একেবারে মুছে যায়নি। বিদ্যালংকার যদি স্বাভাবিক বাঙালা ভাষায় বই লিখতেন; তাহ'লে, তা যে কত চমৎকার হ'ত, তা বইটি মন দিয়ে শ্রদ্ধাভরে প'ড়লেই বোঝা যায়। আরও বোঝা যায়, তখনও তাঁর কলমে "হপ্ত"—সপ্ত', "হুকুম"—'আদেশ' বা "আজ্ঞা", "সাহেবান" (ফারছী' আন্-প্রত্যয় যোগে বহুবচন)—সাহেবগণ, "কএদ"—'অবরুদ্ধ', "হিন্দুস্তান"/"হেন্দুস্তান"—'ভারতবর্ষ' হ'য়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেনি। আরও বলা দরকার যে, বিদ্যালংকার "বঙ্গ-ভাষায়" তাঁর বই লেখা শুরু ক'রলেও শেষ ক'রেছেন "গৌড়ীয় ভাষাতে"। বইটার অশুদ্ধ শেষ বাক্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সেটি এই—".....পরমেশ্বরের ইচ্ছামতে এই হিন্দুস্থানের রক্ষার্থ আরোপিত কোম্পানিবাহাদুরের অধিকার রূপ বৃক্ষের পুষ্পিতত্ত্ব ও ফলিতত্ত্বের সমবধায়ক যে বড় সাহেব তৎকর্ত্তৃক ঐ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার রূপ বৃক্ষের আলবালতে নিরূপিত **পাঠশালার পণ্ডিত** মৃত্যুঞ্জয় **শর্ম্মা** কর্ত্তৃক **গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গ নামে গ্রন্থ** সমাপ্ত হইল।" (পৃ. ১৫৮)।

এ-কোটেশনে—নিহিত "আলবালতে" শব্দটি লক্ষণীয়। তাছাড়া, বইয়ের নাম-পৃষ্ঠায় লেখক-পরিচয়ে লেখককে "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের/প্রধান পণ্ডিত এবং গ্রন্থ-নাম "রাজাবলী" লেখা হ'লেও; শেষ বাক্যে লেখক নিজেকে "পাঠশালার পণ্ডিত" ও গ্রন্থ-নাম "রাজতরঙ্গ" লিখেছেন। তা থেকে বোঝা

www.pathagar.com

যায়, তিনি দীর্ঘদিন (প্রথম জীবনে) "পাঠশালার পণ্ডিত" ছিলেন। তারপর সুপ্রীম কোর্টের 'রাইটার' এবং পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'টীচার' হন। তিনি ঐ কলেজের ছাত্রদের জন্য নির্মিতব্য "গৌড়ীয়" বা "বঙ্গ-ভাষা"তে যে-বইটি লেখেন, তার আদি নাম "রাজাবলী" ছিলনা; ছিল "রাজতরঙ্গ"। আর তার ভাষা; সত্যি সত্যি ফারছী-বাঙালার গদ্য তরতিব থেকে কতটা ফারাক ছিল, তাও আজ পুরোপুরি বোঝার উপায় নেই। বইটির আদিনাম, ভাষা, বাচন-ভঙ্গি, বানান সব-ই কমবেশী বদলানো হ'য়েছে। ব'সেছে বিরাম-চিহ্নাদিও। তবে ফারছী-বাঙালার 'কমা'-বোধক বিরাম-চিহ্নের নির্দিষ্ট হরফ "ও"-এর বার বার ব্যবহার লক্ষণীয়।

এবার তাঁর অপর মৌলিক পুস্তক "প্রবোধ চন্দ্রিকা"র ভাষা-রূপ নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তার আগে বলা উচিত, আমি মূল বইখানি পাইনি। তাই ঐ বই থেকে জহরলাল বসু তাঁর "বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস"-এ যে-কোটেশন দিয়েছেন, তা থেকে কিছুটা নমুনা নিচেয় তোহ্‌ফা (উপহার) দিচ্ছি। বইটির দিবাচায় (মুখবন্ধে) লেখা হ'য়েছে—"অনভিব্যক্ত-বর্ণ-ধ্বনিমাত্রারূপা পরানশী ভাষা প্রথমা যেমন অভিনব কুমারেরদের ভাষা তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পশ্যান্তী নামক ভাষা দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্ত যৎকিঞ্চিদ্বয়স্ক বালকবাণী। তৎপর পদমাত্রাত্মক মধ্যমাভিধা তৃতীয়া ভাষা যেমন পূর্বোক্ত বালকাধিক কিঞ্চিদ্বয়স্ক শিশুভাষা। তার পর বাক্য রূপ বেখরী নামধেয়া সকল শাস্ত্র স্বরূপা বিবিধ জ্ঞান প্রকাশিকা সর্ব্বব্যবহার প্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক শাস্ত্রীয় ভাষা।" ইত্যাদি। আলোচ্য বইটির আলোচনায় জহরলাল বসু লিখেছেন—"রাজাবলী অপেক্ষা চার বৎসর পরের রচনা হইলেও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষা দুরুচ্চার্য্য উৎকট সংস্কৃত শব্দ এবং অপভ্রষ্ট গ্রাম্য ভাষায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"এই 'উপস্থিত গ্রন্থ যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন এবং ইহার লিপিনৈপুণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন বলা যাইতে পারে'। বাস্তবিক সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে এগ্রন্থ সম্যগ রূপে বুঝিতে পারা যায় না। এখানি সম্যগ রূপে বুঝিতে পারিলে অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।...উপদেশজনক ভুরিভুরি কথার সমাবেশ থাকিলেও এ-গ্রন্থকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। গ্রন্থে সুশৃঙ্খলা নাই, ভাষায় মাধুর্য নাই; কখন দীর্ঘ সমাস সম্বলিত, কখন নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ সংশ্লি-ষ্ট।" (পৃ. ৮৭)।

এভাবে, অতি-প্রচলিত সংস্কৃত-বাঙালা ভাষায় আপাদমস্তক নিমজ্জিত থাকার যুগেও সমালোচক জহর লাল বসু যে-ভাষার তারিফ ক'রতে পারেননি এবং যে-ভাষার সাথে, 'ছহি বাঙালা'-ভাষার কুন্তলাগ্রপরিমাণ সম্পর্কও ছিল না; তাকে, কেবল

www.pathagar.com

লেখক বিদ্যালংকার-ই নন; মার্শম্যান-আদি ইংরেজ আলেমরাও "উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা" ব'লে গণ্য ক'রেছেন। মার্শম্যান ১৮৩৩-এ বইটির মুদ্রণকালে ভূমিকায় লেখকের সাথে এক মত হ'য়ে লিখেছেন—"পুস্তকখানি খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালা গদ্যের একটি সুন্দর নমুনা।*** যিনি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন তিনি নিজেকে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন বলিয়া মনে করিতে পারেন।" (উদ্ধৃত, বসু, পৃ.৯০)। মাশাল-াহ্। মার্শম্যানের কী বাঙালা এলেম ছিল! তাজ্জব হ'তে হয়! কিন্তু তাজ্জব হবার কিছু থাকে না, যদি ইয়াদ করা হয় যে, ওঁরা ওই বাঙালাই, ওঁদের মাইনে ক'রে রাখা, পাঠশালার টুলো উস্তাদদের কাছে বাঙালা ব'লে শিখেছিলেন। জেনেছিলেন।

৩. চণ্ডীচরণ মুন্সীর "তোতা ইতিহাস"

যাহোক, এবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আর এক জন পণ্ডিত চণ্ডীচরণ মুনসীর "তোতা ইতিহাস" নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

এ-বইটির সাথে বৌদ্ধ 'জাতক', 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি সংস্কৃত রচনার যোগ আছে। এ-সব রচনায় 'শুক সপ্ততি' নামে যে-কাহিনী র'য়েছে,—"তাতে মোট সত্তরটি কিচ্ছা দেখা যায়। ঐ সব কিচ্ছার বেশ কয়েকটি রুচিহীন এবং অপাঠ্য। বইটি দিল-ীর ছোলতান মুহম্মদ তুঘলকের আমলে ১৩৩০ ইছায়ীতে বদায়ুনের অধিবাসী মওলানা জিয়াউদ্দীন নাখ্‌শাবী "তোতী-নামাহ্" নামে ফারছী ভাষায় তরজমা করেন। তাতে তিনি অতিশয় অশ-ীল কিচ্ছাগুলো বাদ দেন। তাঁর রচনায় সত্তরটির মাঝে বায়ান্নটি কিচ্ছা র'য়েছে; অপর আঠারোটি বাদ প'ড়েছে। এছাড়া, তিনি নায়ক, তার পিতা ও নায়িকার অমুছলিম নাম ব'দলিয়ে মুছলিম নাম আরোপ ক'রেছেন। বইটির পরিচয় দিতে গিয়ে মরহুম আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন, তাঁর "পুথি সাহিত্যের ইতিহাস"-এ লিখেছেন—(এ-তরজমায়) "তৃতীয় পরিবর্তন এই যে, সংস্কৃতে সর্বশেষে নায়িকার দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রাপ্তি এবং নায়ক-নায়িকার মিলিত ভাবে সুখে দিন যাপন। ফারছীতে মায়মুন (নায়ক), তোতার মুখে সব কিছু শুনিয়া খুবিস্তা-(নায়িকা)কে হত্যা করিয়া সংসার ত্যাগ করে।" এ-ইতিহাস থেকে আরও জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় আবুল ফজল, নাখ্‌শাবীকে অনুসরণ ক'রে 'তুতীনামা'র অপর এক সংস্করণ তৈরী করেন। নাখ্‌শাবীর কেতাব অনুসরণে আরও একখানি কেতাব তৈরী করেন,—"সৈয়দ মুহাম্মদ কাদেরী ১৭০০ খৃষ্টাব্দে। এতে ছিল পঁয়ত্রিশটি কিচ্ছা"। আদম উদ্দীন লিখেছেন—"সম্ভবতঃ এই সংস্করণ হইতেই কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের

www.pathagar.com

অধ্যাপক বেনারসের অধিবাসী প্রসিদ্ধ উরদু সাহিত্যিক সায়িদ হায়দার বখ্শ হায়দারী (মৃ. ১৮২৩) "তোতা কাহিনী" নামে উরদু অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা খুব-ই জনপ্রিয় হয়। হায়দার বখ্শ হায়দারীর উরদু অনুবাদ হইতে চণ্ডীচরণ শ্রীরামপুরী ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত-বাঙালায় "তোতা-ইতিহাস" রচনা করেন"। (পৃ.১৩৩)।

আলোচ্য বইটির পরিচয় দিতে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—"চণ্ডীচরণ মুনসীর তোতা-ইতিহাস (১৮০৫), হিন্দীর অনুবাদ। সেকালে বাঙ্গালা পদ্যে শুক সপ্ততির গল্প অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। পাঠ্য পুস্তক ও গল্পের বই দুই ভাবেই চণ্ডীচরণের গ্রন্থ সমাদৃত হইয়াছিল।" (পৃ. ১৩)।

এক-ই ভাবে মার্কসবাদী গোপাল হালদারও লিখেছেন—"তোতা-ইতিহাস হিন্দুস্থানী থেকে অনূদিত। ৩৫টি কাহিনী তাতে আছে। এ-জাতীয় কাহিনী সংস্কৃতে পাওয়া যায়। কিন্তু ফারছী তোতা-কাহিনী-ই সে-যুগে বেশী প্রচলিত ছিল। তাই তা হিন্দুস্থানীতে ভাষান্তরিত হয়। যে-কোন কারণেই হোক, চণ্ডীচরণের তোতা-ইতিহাস (ইতিহাস অর্থ অবশ্য সেদিনে গল্প) বারে বারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তার সমাদর তাই যথেষ্ট হ'য়েছিল ব'লতে হবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র-পাঠ্য বহুপুস্তকের এত সৌভাগ্য ঘটেনি, তাও লক্ষণীয়।" (পৃ. ১০৬)।

বলা দরকার যে, এ-বইয়ের অপরাপর আলোচকদের বেশীর ভাগ-ই বইটির ভাষা-প্রকৃতির পরিচয় এড়িয়ে গেলেও গোপাল হালদার এর সামান্য পরিচয় দিয়েছেন। লিখেছেন—"চণ্ডীচরণের অনুবাদে প্রথম দিকে একটু ফারছী শব্দ থাকিলেও ক্রমে তা ফারছীর প্রভাব কাটিয়ে ওঠে।" (পৃ. ১০৬)।

আরও বলা দরকার যে, সুকুমার সেন ও গোপাল হালদার—চণ্ডীচরণ মুনসীর 'তোতা-ইতিহাস' 'হিন্দি' বা "হিন্দুস্থানী" থেকে অনূদিত ব'লেছেন। কিন্তু আ. কা. মু. আদমুদ্দীন ব'লেছেন—বইটি "উরদু থেকে অনূদিত"। এর-কোন্‌টা ঠিক? প্রশ্নটি জরুরী এই কারণে, হাল আমলের নয়া পাঠকান (পাঠকগণ) একথা জানেন না যে, "উরদু"র-ই অপর-নাম "হিন্দুস্তানী"। 'হিন্দুস্তানের ভাষা'— এই অর্থে। আর "হিন্দুস্তানী" শব্দটির-ই সংক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক রূপ—"হিন্দী"। হিন্দুর ভাষাই "হিন্দি"—এই অর্থে। তার ছাফ অর্থ—মুছলমানরা যে-ভাষার জন্ম দেন; এবং যে-ভাষার নাম রাখেন—"উরদু"; সেই ভাষা-নাম 'যাবনিক' বিবেচনা ক'রে, ঘেন্নায় ঐ-ভাষা-নামটি না-লিখে, মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী হালদার-সেন উভয়-ই লিখেছেন; নিজেদের পছন্দসই নাম 'হিন্দী-হিন্দুস্থানী'। এ-ব্যাপারে তাঁরা

www.pathagar.com

ইতিহাসকেও তোয়াক্কা করেননি। কারণ ঐ সময় "হিন্দী" ব'লে কোন ভাষা-নামও সৃষ্টি হয়নি। তবু তারা উরদুকে ব'লেছেন হিন্দী। গোপাল হালদার-এর ভাষা-বিদ্বেষ বিশেষ ক'রে, মুছলিম ভাষা-নাম ও জন-নামের ওপর বিদ্বেষ; তোতা কাহিনীর সামান্য পরিচয় দেবার সময়ও ফুটে উঠেছে। কারণ পূর্বেই বলা হ'য়েছে—চণ্ডীচরণের বইয়ে নায়িকার নাম—"খুবিস্তা"। কিন্তু মিঃ হালদার সে-নাম বিকৃত ক'রে লিখেছন—"খুস্তা"। চণ্ডীচরণ তথাকথিত "হিন্দুস্থানী" থেকে কোন্ লেখকের কি নামের বই অনুবাদ করেছেন, তাও বলেননি। এ-ক্ষেত্রেও প্রাচীন পণ্ডিত চণ্ডীচরণ অপেক্ষা, আধুনিক মার্কসবাদী সাহিত্যিক গোপাল হালদারের মুছলিম-বিদ্বেষ, বেশী প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই শেষ নয়, গোপাল হালদারের এ-রকম ভাষা-বিদ্বেষ, নাম-বিদ্বেষ, জন-(মুছলিম) বিদ্বেষ ও ধর্ম-(ইছলাম) বিদ্বেষের আরও পরিচয় তাঁর লেখার অপরাপর স্থানেও র'য়ছে।

সে-সব কথা মুলতুবি রেখে, ড. সেন ও হালদার তোতাকাহিনীর আদর-কদরের যে ঢালাও উলে-খ ক'রেছেন, এবার সে-বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। কেননা, ছাচ্চা তথ্য অন্য রকম।

'পণ্ডিত-মুন্‌সীদের 'বঙ্গভাষা' বা 'ভাষা'র 'জনপ্রিয়তা

কেবল চণ্ডীচরণ মুন্‌সীর 'তোতা-ইতিহাস'-ই নয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত-নিষ্ঠ মুনসী-পণ্ডিতদের "ভাষা"-ধারায় রচিত কোন বই-ই সেকালে জনপ্রিয় ছিল না। তার নজীর—সে-কালে 'তোতা-ইতিহাস'সহ আরও অনেক বইয়ের দু'রকম ভাষায় লেখা ও প্রকাশের ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। অথচ এই ঐতিহাসিক ছাচ্চা কথাটা বাঙালা সাহিত্যের কোন ঐতিহাসিক লেখেননি। এ-আমলের অমুছলিম উস্তাদ্‌রা সে-সব খেয়াল করেননি বা চেপে গেছেন। তাঁদের মুছলিম তালবিলিমরা (তালিব-উল-ইলমরা) তা তত্ত্ব-তালাসের কোশেশ করেননি। কিন্তু বিষয়টি "পুথি সাহিত্যের ইতিহাস'-লেখক মরহুম আ. কা. মু. আদমুদ্দীন চেপে যেতে পারেননি। তিনি 'তোতা-ইতিহাস'-এর আলোচনাকালে লিখেছেন—"এই তোতা-ইতিহাস-ই আমাদের আলোচ্য কবি, কলিকাতার পুথি প্রকাশক কাজী শফীউদ্দীনের অনুরোধে "মুছলমানী"-ভাষায় অনুবাদ করেন। উক্ত পুথির বর্ণনামতে জানা যায় যে, উক্ত কাজী শফীউদ্দীন ইতিপূর্বে হিন্দু বাঙালায় উহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহা মাষ্টারদিগের উপদেশে স্কুলের ছাত্রেরা সাগ্রহে পাঠ করিত। কিন্তু মুছলিম জনসাধারণ তাহা পড়িত না বলিয়া তাহাদের অনুরোধে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'বাহার দানেশ' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ এই

www.pathagar.com

ভাবে **মুছলিম বাঙালা হইতে হিন্দু বাঙালায়** অনূদিত হইয়াছিল।" (পৃ. ১৩৩)। বলা দরকার, আদমুদ্দীন যাকে "মুছলিম বাঙালা" ও "হিন্দু বাঙালা" ব'লেছেন; তা-ই আসলে পরিচিত ছিল—"ফারছী-বাঙালা" ও "সংস্কৃত -বাঙালা" ব'লে। কথাটা অবশ্য পুরো ছাচ্চা হ'ল না। কেননা; সে-কালে তথাকথিত "হিন্দু-বাঙালা"র আসল-নাম ছিল —"ভাষা"। নামহীন ভাষা। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতরা ঐ "ভাষা"কে "সাধু-ভাষা", "বঙ্গ-ভাষা" বা "গৌড়ীয় ভাষা"ও ব'লতেন। দু'একজন অতি দুঃসাহসের সাথে ঐ "ভাষা"কে "বাঙ্গালা-ভাষা"ও ব'লেছেন বটে, তবে তার একটা-দুটার বেশী নজীর নেই। যথা—

১. রাম রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র নাম-পৃষ্ঠায় বইটি **কোন্ ভাষায় লেখা** তার কোন উলে-খ নেই।

২. তবে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের "বত্রিশ-সিংহাসন"-এর নাম-পৃষ্ঠায় লেখা হ'য়েছে—----"বত্রিশ সিংহাসন **সংগ্রহ ভাষাতে**। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণং ক্রিয়তে শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।"

৩. ঐ লেখকের অপর কেতাব "রাজাবলী"রও নাম-পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে—"রাজাবলী। অর্থাৎ কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস। **সংগ্রহ ভাষাতে**। **ক্রিয়তে**। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। "আগেই বলা হ'য়েছে—লেখক এ-বইয়ের শুরুতে **"বঙ্গ ভাষায়"** লেখা শুরু করলেও শেষ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–"**গৌড়ীয় ভাষাতে**।"

বলা দরকার যে, তখনকার ঐ সব পণ্ডিতের লেখা ও ছাপা সব বই-এর পহেলা সংস্করণ বা তার নাম-পৃষ্ঠা নজরে আসেনি। অথবা তার হকিকৎ (সত্য বিবরণ) মেলেনি। এ-কারণে ঐ ক'টি নজীর থেকেই পষ্ট বোঝা যায়; বাঙালা ভাষার বিপরীতে যে-নয়া ভাষা-তরতিব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃতনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ পয়দা করেন, তা তাঁরা পহেলা প্রাচীন ধারা অনুসারে "ভাষা" নামেই পরিচয় দিতেন। সংস্কৃতের এই গোপন ও অবৈধ সন্তানটিকে দেশবাসীর নিকট সঙ্গে সঙ্গে "বাঙ্গালা" ব'লে পরিচয় দিতে না পারলেও, তাঁরা অসংকোচে ইংরেজ প্রভুদের নিকট ঐ "ভাষা"কেই "বাঙ্গালা" ভাষা, ব'লে জাহির ক'রতেন। তাই দেখা যায়, বিদ্যালংকারের "বত্রিশ সিংহাসন"-এর পহেলা এডিশন **"ভাষা"য় সংগৃহীত** বা লিখিত ব'লে পরিচয় দেয়া হ'লেও; ঐ বইয়ের পরবর্তী এডিশন যখন "লন্দন" থেকে ছাপা হয়, তখন তার নাম-পৃষ্ঠায় ছাপা হয়----"বত্রিশ পুত্তলিকা সংগ্রহ।

www.pathagar.com

বাঙ্গালা ভাষাতে ।.... লন্দন মহানগরে ছাপা হইল (১৮১৬) ।" বঙ্গজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতান, এ-ভাবে হাতির মুণ্ডকে দেবমুণ্ড ব'লে চেনাবার ফলেই বিদ্যালংকারের প্রবোধ-চন্দ্রিকার মত "উৎকট, দুরুচ্চার্য, দুস্পাঠ্য" বইয়ের ভাষাকেও "খাঁটি বাঙ্গালা" ব'লে, মার্শম্যান (১৮৩৩-এ বইটি মুদ্রণকালে), ভূমিকায় লিখেছেন—"পুস্তকখানি **খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায়** লিখিত এবং **বাঙ্গালা গদ্যের একটি সুন্দর নমুনা"** ।* রাজা রামমোহন রায় বিদ্যালংকারের সাথে বিতর্ক কালে ঐ ভাষাকেই ব'লেছেন—"সাধু ভাষা" । তাঁর ইংরেজীতে লেখা বাঙালা ব্যাকরণটির **নাম ছিল "গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ"** । মোটের ওপর তখনকার পণ্ডিত মুনশীদের লিখিত ঐ ভাষা সমাজ-স্বীকৃত বাঙালা ভাষা ছিল না কিছুতেই । সেজন্য "বঙ্গ-ভাষা" রূপ ব্রহ্ম দৈত্যের এই অচমকা আবির্ভাব; জনগণের ঘাড়ে তা শক্ত ক'রে চাপিয়ে দেবার ফলে, এক-ই ভাষা "বঙ্গ-ভাষা" ও "বাঙ্গালা-ভাষা" এই দু'টি নামেই কেবল বিভক্ত হ'ল না; বিভক্ত হ'তে থাকল অবিভক্ত বাঙালীর সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও কালচারও । সাহিত্য জগতে এর প্রতিক্রিয়ার কিছু পরিচয় সে-কালের পুথি সাহিত্যেও ছড়িয়ে আছে । নজীর হিসেবে, ইতোপূর্বে, 'বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার নাম ফারছী-বাঙালা' নামক রচনায় দেখিয়েছি যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই যুগে পণ্ডিতদের ঐ নয়া "ভাষা", "সাধু-ভাষা" বা "বঙ্গ-ভাষা" কী খতরনাক হাল সৃষ্টি ক'রেছিল । তা সে-সময়ের কবি মরহুম মালে মোহম্মদ লিখে গেছেন । তিনি তাঁর একখানি কাব্যে লিখেছেন—

"এই পুথির শায়ের ছিল আগু জামানার ।
সংস্কৃতে সাধু ভাষা হইল তৈয়ার॥
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কছেল্লা ।
তে কারণে অধীন রচে ছলিছ বাঙালা ॥"

অতএব, ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতানের 'বাঙালা' যে আদৌ জনপ্রিয় হ'তে পারেনি; তা একটি ঐতিহাসিক সত্য । তাঁদের "গৌড়ীয় ভাষা", "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" ছিল—প্রাচীন 'গৌড়ীয় সংস্কৃত ভাষা' ও 'সংস্কৃত ব্যাকরণ' মাত্র । সে-ভাষা ও ব্যাকরণ-এর সাথে "ছলিছ" বাঙালা বা চালু ও শুদ্ধ বাঙালার কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না; তা সত্য । সাধারণ পাঠকান; তা পড়তে-বুঝতে "কছেল-া" বা সমস্যার মুখোমুখী হ'তেন । ফলে,তাঁরা সহজ ভাষায় বা চালু ফারছী-বাঙালায় কেতাবলেখার জন্য কবিদের অনুনয় ক'রতেন । এরকম অনুনয় জানাবার নজীর পাওয়া যায়—পুথি কাব্যেই ।

*দেখুন—জহরলাল বসু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪-৯০ ।

www.pathagar.com

পণ্ডিতদের পণ্ডিতী 'বঙ্গ ভাষা'র বিরুদ্ধে তখনকর লোক সাহিত্যও সরব। লোক-সাহিত্যেও এমন কিছু কিছু প্রবাদ, গল্প ও গল্পমূলক ছড়া পাওয়া যায়, যা কেবল হাসির খোরাক হিসেবেই এযাবৎ গণ্য হ'য়ে আসছে। সে-গুলোর ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য কেউ বোঝার কোশেশ করেননি। নিচেয় এরকম একটি গল্প মিশ্রিত ছড়ার উলে-খ ক'রছি।

ছড়াটির ভূমিকায় বলা হ'য়ে থাকে,—'একদিন এক গ্রামে এলেন একজন টিকিধারী পণ্ডিত। তিনি শুদ্ধভাষা-প্রচার কার্যে এসেছেন। গাঁয়ের লোকে যাতে গেঁয় ভাষায় কথা না বলে, তার জন্য তিনি সবাইকে ডেকে বোঝাচ্ছেন। ব্যাকরণ অনুযায়ী কথা ব'লতে হবে। 'হপ্ত' বলা যাবে না; ব'লতে হবে "সপ্ত"—বেহেশ্‌ত বলা যাবে না ব'লতে হবে—"স্বর্গ" ইত্যাদি। এসব কথা গ্রাম্য লোকদের মগজে ঢুকল না। তারা পণ্ডিতের কথা শুনে খেপে উঠল এবং পণ্ডিতকে ধ'রে কিল-ঘুষি মারা শুরু ক'রল। তাতেই শেষ হ'ল না। তাঁরা তাকে নিকটস্থ বাজারে নিয়ে 'মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে', সারা বাজার ঘোরাবার পর এক দোকানে এনে "লবণ" দেখিয়ে ব'লল 'বল্ ব্যাটা, এটা কি? লুন; না 'লবণ'?

এত শাস্তি পাবার পর, তার পণ্ডিতের "পাণ্ডিত্য" ছুটেছে কিনা, তা পরীক্ষা করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। পণ্ডিত অবস্থা বেগতিক দেখে চুপ ক'রে রইলেন। তখন দোকানী ব'লল—"বলুন ঠাকু মশাই; এটা কি? 'লুন' না 'লবণ'?" ...পণ্ডিত তখন মনের কষ্ট মনে চেপে রেখেই ব'ললেন—

"সপ্ত স্বর্গ ব্যাকরণ
তে পাচা পন্দেরো কিল খেয়েছি অকারণ।
এখন যদি বলি 'লবণ'—তবে তো
পোন্দ্‌দে বেরিয়ে যাবে জীবন।"

অতএব, উপায় না দেখে, পণ্ডিত ব'ললেন—'ও হ'ল লুন'।'

গল্পটি যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে নয়া ভাষা সৃষ্টির যুগেই সৃষ্ট—তা বেশক বলা যায়। এ-থেকে, তথাকথিত আধুনিক 'বাঙালা-ভাষা' ড. সেন-হালদার বাবুদের কথিত-মতে, 'অতিশয় জনপ্রিয় ছিল' না বরং অতিশয় অবজ্ঞাত-উপেক্ষিত ছিল, তা উক্ত গল্প থেকে সহজেই বোঝা যায়।

ভাষা-বিভক্তি ও ভাষা-বদলের এ-কাজ পণ্ডিতরা ক'রতে সমর্থ হন—কেবল তখনকার ইংরেজদের সাহায্য-সহযোগিতার পুরো 'সদ্ব্যবহার' (?) ক'রে।

www.pathagar.com

নিজেদের-ই শ্রেণী-স্বার্থে। বৃটিশ-স্বার্থেও নয়। পণ্ডিতদের চেষ্টা সফল হ'তে পারত না, যদি গিলক্রাইস্টের মত লোক ঐ কলেজে বাঙালা বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব পেতেন। কারণ গিলক্রাইস্ট, কেরীর মত আগেই বঙ্গজ পণ্ডিতদের খপ্পরে পড়েননি। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উরদু-বিভাগের প্রিন্সিপাল রূপে তিনি যে-স্বাভাবিক ভাষা-চেতনার পরিচয় দেন এবং সমকালীন মুছলিম লেখকদের সহায়তা ও পরামর্শ নেন; উইলিয়ম কেরী তা করেননি। তিনি নিজে প্রধান হ'লেও পণ্ডিতদের প্রাধান্য তাঁর ওপর এত বেশী ছিল যে, তাঁর সহকারী; **রাম রাম বসুর পর যখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার** ঐ পদে নিযুক্ত হন; তখন বসু অপেক্ষা বিদ্যালংকারের প্রভাব-ই তাঁর ওপর বেড়ে যায়। এর ফল কি হয়, সে-বিষয়ে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—"ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দিবার পর হইতে কেরীর ঝোঁক বাড়িল, সংস্কৃতের দিকে। কেরী যতদিন রাম রাম বসুর প্রভাবাধীন ছিলেন, ততদিন তাঁহার রচনা-রীতি—বাইবেলের অনুবাদের ভাষা অনুসারে—অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ ছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাবে আসিয়া কেরী সংস্কৃত শব্দের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার ফলে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাষায় সংস্কৃতের ছায়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া পড়িতে লাগিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থের আদর বাড়িতে লাগিল।"(পৃ. ১১)। এভাবে ফোর্ট উইলিয়মীয় পণ্ডিতরা কেরী, মার্শম্যান ওগয়রহকে, কব্জা ক'রতে না-পারলে এবং "সারমেয়-বাচ্চা"কে সহস্রবর্ষবয়সী "ছাগ-ছানা" ব'লে কবুল করাতে না পারলে, ঐ 'অশ্মীভূত বৃক্ষ পুষ্পবন্ত' হ'তে পারত না। কিন্তু মরা গাছ ফুলে ফলে ছেয়ে যাবার কথা এটুকুতেই শেষ নয়। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় বলতে হয়—"এহ বাহ্য আগে কহ আর!"

কেননা, মরা গাছ ফুলময় হবার ঘটনার পেছনে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-কেন্দ্রিক আরও দু'টো কথা না-ব'ললেই নয়। তার একটা হ'ল—যাঁরা সেদিন বাঙালা-সরকারের বিভিন্ন পদে চাকুরী পাবার যোগ্যতা অর্জনের আশায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙালা শিখতে ভর্তি হ'তেন, প্রকৃত বাঙালা ভাষা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা থাক বা না-থাক, যা তাদের শেখানো হ'ত; তা-ই 'বাঙালা' ব'লে শিখতে হ'ত এবং জানতে-মানতে হ'ত। এই-জানা, জেনে ও মেনে 'বাঙালা ভাষায় জ্ঞানী' ব'লে ঐ সব পণ্ডিতের সার্টিফিকেট না পেলে, সরকারী বড় বড় চাকুরীর বড় পদ পাওয়া কারো চ'লত না। সেজন্য বিড়ালকে 'বাঘ' বলা ও লেখা ভিন্ন তাদের কোন গতি ছিল না। এমনি ভাবে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতান, যে-সব তালবিলিম বা ছাত্রকে 'ময়ুর' বানাবার নাম ক'রে প্যাঁচা বানাতেন, তাঁরা কেমন বাঙালা ভাষায়

www.pathagar.com

'হাফেজ' হ'তেন এবং কেমন কামেল ও মন-মানসিকতার অধিকারী হ'তেন; তা তাদের একজনের লেখা একটি রচনার নিচেয় তুলে ধরা কোটেশন্ থেকেই বোঝা যায়। যথা—"মানুষেরদের নীতিজ্ঞতা শ্বছতাপ্রাপ্তি সম্বাদিভ্রম ন্যায় যখন আমরা দেখি তখন বিস্ময়াপন্ন হই। সকলে বোঝে যে, ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের ভিন্ন ভিন্ন রীতির এই কারণ যে, আপন আপন স্বভাব এবং গ্রীষ্ম শীতের গুণ বহুজ্ঞ দেশীয় ব্যবস্থাপকেরা ব্যবস্থা করণ কালে এই দুই কারণ প্রধান করিয়া মানিয়াছেন সর্ব্বদেশে পৃথক পৃথক ব্যবহার সংসারের চলন নিমিত্ত অবস্য মান্য হইয়াছে।

ব্রাহ্মণেরা বলে সৃষ্ট্যারম্ভে ঈশ্বর পৃথক পৃথক চারিবর্ণ সৃজন করিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহাদিগের পৃথক পৃথক ধর্মাচার দ্বিজধর্ম্ম এই শুদ্ধাচার যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়াচার রাজধর্ম্ম ব্রাহ্মণরক্ষণ ধনুর্বিদ্যা অভ্যাসন শিষ্ট পালন দুষ্ট দমন রাজ্য শাসন প্রজাপালন ন্যায্য কর গ্রহণ বৈশ্যবৃত্তি কৃষি কর্ম বাণিজ্য শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ সেবা মাত্র।

অন্য শাস্ত্র যদি **ভাষাতে** তর্জমা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয় যেমন মহাভারতের তর্জ্জমা **ভাষাতে কাশীদাস নামে এক শূদ্র করিয়াছিল** সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শাপ দিয়াছিল। সেই ভয়েতে অন্য কেহ এখন সে কর্ম্ম করে না।" ইত্যাদি। জহর লাল বসুর 'কোট' করা এ-লেখা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোন্ ছাত্র, কবে, কি উপলক্ষে লেখেন; তা তিনি জানানি। লেখাটি যার-ই হোক, ঐ ছোট্ট কোটেশনের মধ্যে যে বড় ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য নিহিত—তা হ'ল; 'ছাত্ররা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে যে "ভাষা" শিখত তাকে বাঙালা ব'লত না বা ব'লতে চাইত না। তারা শিখত যে এটা "ভাষা" মাত্র এবং এ-ভাষা সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ঘৃণ্য, হীন ও হেয়। এ-ভাষায় ধর্মকথা লিখলে পাপ হয়, পতিত হ'তে হয়। আগের কালে কাশীদাস নামক একজন লোক এই পাপ কাজ করায় ব্রাহ্মণরা তাকে শাপ দেয় ও শূদ্র বানায়। সেই ভয়ে আজও কেউ রামায়ণ মহাভারতকে "ভাষায় লেখে না"। অর্থাৎ বাঙালায় লেখে না।

বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষা সম্পর্কে হিন্দুদের বিদ্বেষের যে-কথা গত কয়েক বছর যাবৎ বলা হ'চ্ছে, এটি তার আর একটি সমর্থন-প্রাপ্তি মাত্র। এভাবে, ফোর্ট উইলিয়ম-এর 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' উস্তাদরা শত শত বছর ধরে মুছলিম-অমুছলিম আম জনকওমে চালু বাঙালার অবিভক্ত ভাষা-ভূখণ্ড দু'ভাগে বিভক্ত ক'রে যে-রোয়েদাদ রেখা তাদের তাল বেলেমদের মাথায় ঢোকান, তার-ই ফলে তৈরী হয় "বাঙালা ভাষা"র পাশে 'বঙ্গভাষা'র নয়া ভূমি। আর রোজ-ব-রোজ বাঙালা ভাষার পাড়

www.pathagar.com

ভাঙতে থাকে এবং পলি জ'মে চর প'ড়ে, তার পরিসর বাড়তে থাকে, বাড়তেই থাকে। তাতে ধীরে ধীরে ছোট হ'য়ে আসতে থাকে ফারছী-বাঙালার চৌহদ্দি; আর বড় থেকে বড় হ'তে থাকে সংস্কৃতের অবৈধ সন্তানের দাপট। এক-ই-সাথে রামমোহনের চেষ্টা তদ্‌বিরে, দাবীতে, পরামর্শে ১৮৩৬ সালে অফিস-আদালত থেকে সরকারী কাজকামের ভাষা, ফারছী উঠে গেলে ভাঙনের ঐ বেগ এবং গতি আরও বাড়ে, আরও খরতর হয়। তারপর শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র তাকে 'পয়েন্ট অব নো-রিটার্ন-এ পৌঁছে দেন।

*

১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালুর পর নতুন অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন, নতুন জমিদার শ্রেণী গঠন এবং শত শত বছরের স্থিতিশীল সুসমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল গ্রামীণ-অর্থনীতির মুছলিম ধারাটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভেঙে দিয়ে যখন 'ইতিহাসে অজ্ঞাত' এক চরম বর্বর শাসন-শোষণ নির্যাতনের রাজত্ব কায়েমে উদ্যোগ নিচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন ও কলিকাতা হাইকোর্টের সাথে যুক্ত লোটাকম্বল সর্বস্ব 'মায়ে তাড়ানো, বাপে খেদানো' এবং চরিত্রহীন পণ্ডিতরা কেবল ভাষা-কালচারের রোয়েদাদ-রচনা করেনি; সেই সাথে শিক্ষা, সাহিত্য এবং জনগণকে বিভক্তি কারক, রোয়েদাদও ঘোষণা করে। তার-ই ফলে, ইংরেজরা তাদের কাছ থেকে যেমন 'বঙ্গ ভাষা'কে 'বাঙালা ভাষা' বলে শেখেন; তেমনি শেখেন যে,'মুছলমানরা বাঙালী নয়; তারা কেবলি মুছলমান; বাঙালী মানেই হিন্দু।' এর ইসাদী রূপে জন ডি. পিয়ার্সন-(১৭৬১-১৮৩১)এর 'পত্র কৌমুদী' নামক কেতাবের একটি কোটেশন হাজির করা যায়। ঐ কেতাবের এক স্থানে লেখা হ'য়েছে—"আর বালকেরা এমতেহান দিবার নিমিত্তে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া দাড়াইতেছে। *** ইতিমধ্যে সাহেব ও **মুছলমান** ও **বাঙ্গালী** লোকেরা গাড়ী ও পাল্কীতে চড়িয়া আইলেন।" (পৃ. ১০৯)।

আমি এতকাল মনে ক'রতাম, বঙ্কিমচন্দ্রই পহেলা বাঙালী জাতির রোয়েদাদকারী। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, তা নয়; তারও পূর্বসূরী ফোর্ট উইলিয়মীয় বঙ্গজ ব্রাহ্মণ-উস্তাদরাই তখনকার সকল ইঙ্গ-বঙ্গ আলেমকে শিখিয়েছেন যে, "সাহেব" মানে ইংরেজ; মুছলমানরা 'মোহমেডান' আর "বাঙালী" মানে তারাই। হিন্দুরাই। এই-এলেমে এলেমদার সাহেবান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভাষা-বিভক্তিতে কামিয়াব না-হ'লে, ১৯৪৭ সালে মাউন্ট ব্যাটেনকে হিন্দুস্তান ভাগ করতে আসতে হ'ত না। আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কায়েম না হ'লে শত শত বছর ধ'রে চালু বাঙালীর এক ও অভিন্ন বাঙালা ভাষার এবং শিক্ষা-সাহিত্যেরও রোয়েদাদ রচিত হ'ত না। তৈরী হ'ত না—পাকিস্তান। তৈরী হ'ত না—বাঙলাদেশ।

www.pathagar.com

"অশ্মীভূত বৃক্ষঃ পুষ্পবন্তৌ"-এর মত সেকালের সংস্কৃত-বাঙালা কেবল মরা ভাষা নয়; তা পুরানা জামানার ফসিলে পরিণত হওয়া পাথুরে ভাষাও । এই অশ্মীভূত বা পাথুরে কাঠকে যদি ফুল গাছ গণ্য করা যায়; তো সেই গাছে কোনদিন ফুল ফুটতে পারে, তা পাগলেও ভাবতে পারে না। কিন্তু পাগলে যা ভাবতে ও ক'রতে পারে না; পণ্ডিতেরা তা পারেন; করেন। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গজ পণ্ডিতান যখন বাঙালদের হাইকোর্ট দেখাবার মত; ইংরেজদেরও যখন "হাইকোর্ট" চেনাতে সমর্থ হ'লেন, তখন জনগণ তা না-পছন্দ ক'রলে কি হবে, ' অশ্মীভূত বৃক্ষই পুষ্পবন্ত' হ'ল। আর তা, শিমূল ফুলের চমৎকার রঙের আকর্ষণ নিয়ে একশ' বছরের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ল সবখানে, সারা বাঙালায়। 'বাঙালা ভাষা' নামটা একেবারে মুছে ফেলা সম্ভব হ'ল না, কৌশলগত কারণেই; তবে বিশেষ ভাবে জোর দেয়া হ'ল "সাধু ভাষা", "বঙ্গ ভাষা"র ওপর। আর বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষাকে ভাষা, "প্রাকৃত ভাষা" "ম্লে-চ্ছ ভাষা", ইতর ভাষা" ব'লে দূরে সরিয়ে দেয়া হ'ল—পর্দার একেবারে আড়ালে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা এভাবেই এক-ই 'বাঙালা ভাষা'র দু'টি ভাগ ও দু'টি ধারা পয়দা করেন। যার মূল ধারাটি এখন মুছলমানদেরও চোখের আড়ালে চ'লে গেছে।

এজন্যই দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—'বড় সু-কর্মের জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছিল'।

এটা সু-কর্মই বটে। কারণ এর হিন্দু জাতীয়তাবাদী তাৎপর্য এই দাঁড়িয়েছে যে, **ফোর্ট উইলিয়ম দূর্গ প্রতিষ্ঠা ক'রে** মুছলমানদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হ'য়েছে। আর **ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-প্রতিষ্ঠা ক'রে** ছিনিয়ে নেয়া হ'য়েছে—মুছলমানের ভাব, ভাষা, শব্দ, বানান, ব্যাকরণ, অভিধান—সব কিছু। আর তা এমন সূক্ষ্ম কারচুপি ও কৃৎকৌশলের সাহায্যে করা হ'য়েছে যে, ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার এক শ' সাতচল্লিশ বছর পর আজাদী লাভ ক'রেও আমরা নিজেদের ভাষা, বানান, বাক্-ভঙ্গি চিন্‌তে পারিনি। চিনতে পারিনি—আমাদের নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও। আজও পারছি না। ফলে, এই ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ফোর্ট উইলিয়মীয় বেড়াজাল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, পুনরায় আমাদের অক্টোপাশের মত আঁকড়ে ধ'রেছে। এবার তা ছিনিয়ে নিচ্ছে, আমাদের নাম, ধর্ম, জাতি-পরিচয়, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব—সব কিছু।

তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষা-ধারায় বিদ্যাসাগরীয় "ভাষা"-গোষ্পদে আমাদের জাতীয় জীবনের দেড় শ' বছরে সাঁতার কাটার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে,

আমরা আজ আমাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অন্দর মহল থেকে সম্পূর্ণ রূপে বাইরে চ'লে আসতে—প'ড়ে থাকতে, বাধ্য হ'য়েছি! আমরা ফারছী-বাঙালা হারিয়েছি। সংস্কৃত-বাঙালা শিখতে পারিনি। আর বাঙালা ও সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছি।

গ্রন্থপঞ্জী

১. রোমিলা থাপার — ভারতবর্ষের ইতিহাস
কলি–১৯৯০।

২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ
কলি–১৯৮৯।

৩. সুধাকর দ্বিবেদী — হিন্দি—অস্তিত্ব কি তলাস
নয়া দিল্লী-১৯৮২।

৪. দীনেশচন্দ্র সেন — বৃহৎ বঙ্গ-১ম খণ্ড, ও ২য় খণ্ড
কলি, ১৯৯৩।

৫. দীনেশ চন্দ্র সেন — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
কলি–১৩৫৬।

৬. কৃষ্ণদাস কবিরাজ — চৈতন্য চরিতামৃত
কলি-১৩৯৭।

৭. শেখ পরাণ — নছিহত নামা (অমুদ্রিত পুথি)

৮. শেখ মুত্তালিব — কায়দানি কিতাব (অমুদ্রিত পুথি)

৯. নীহার রঞ্জন রায় — বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)
কলি-১৪০০।

১০. এস. এম. লুৎফর রহমান — বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস-১ম খণ্ড
ঢাকা-২০০৪।

১১. রামগতি ন্যায়রত্ন — বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব
কলি–১৮৭২।

১২. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার — রাজাবলী
কলি–১৩১১।

www.pathagar.com

১৩. রাম রাম বসু	তোতা কাহিনী (নামপত্র ছিন্ন)।
১৪. রামমোহন রায়	গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ কলি-১৮৩৩।
১৫. গোলাম আহ্মাদ মোর্তজা	চেপে রাখা ইতিহাস বর্ধমান-১৯৮৬।
১৬. গোলাম আহ্মাদ মোর্তজা	বজ্র কলম -১। কলি-১৯৯৯।
১৭. গোলাম আহ্মাদ মোর্তজা	এ এক অন্য রকম ইতিহাস কলি. -২০০৪।
১৮. আমলেন্দু দে	বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ কলি.-১৯৭৪।
১৯. সুকুমার সেন	ইসলামি বাংলা সাহিত্য বর্ধমান -১৩৫৮।
২০. গোপাল হালদার	বাঙ্লা সাহিত্যের রূপ-রেখা -১ম খণ্ড ৩য় সংস্করণ, কলি-১৩৭০।
২১. গেপাল হালদার	বাঙ্লা সাহিত্যের রূপ-রেখা-২য় খণ্ড ১ম সংস্করণ, কলি-১৩৬৫।
২২. জহর লাল বসু	প্রাচীন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস কলি-১৯৩৬।
২৩. আ. কা. মু আদম উদ্দীন	পুথি সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা-১৯৬৯।
২৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাঙ্গালা ভাষার ইতি বৃত্ত ঢাকা-২০০২।
২৫. মুহম্মদ এনামুল হক	মুছলিম বাঙ্গালা সাহিত্য ঢাকা-১৯৬৫।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের হিন্দু কলমে লেখা
দুই জাতির
দুই বাঙালা ভাষার নমুনা

আজকের দিনে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙলাদেশী মুছলমানদের অধিকাংশের-ই আত্মসচেতনতা নেই। নেই তাঁদের আপন কওমী চেতনা, ভাষা-চেতনা, সাহিত্য-চেতনা এবং বিচার-বিবেচনাও। সেজন্য তারা তাকায়, কিন্তু দেখে না। তারা বই কেনে, কিন্তু পড়ে না। আর যারা পড়ে, তারা পড়ার সময় বোঝার চেষ্টা করে না। একজন পাঠক যখন—কি প'ড়ছে; কেন প'ড়ছে—সে-বিষয়ে খেয়াল করে না; তখন তার পড়ুয়া-মন; হয়,—সেই চোখের **মত, যে-চোখ কাঁচ বা পাথর দিয়ে বানানো; যে-চোখ তাকায়; কিন্তু দেখে না। আর তার ফলেই এ-দেশে কলাবিদ্যার কোন্ বাস্তব প্রায়োগিক মূল্য নেই। আমরা বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা-ব্যবস্থা চাই; কিন্তু কলাবিদ্যারও যে বৈজ্ঞানিক রূপ আছে; সে-বিষয়ে কেউ সচেতন নন। তাঁরা বাস্তব জীবনে প্রয়োগমূলক জ্ঞান ও কর্মের ওপর গুরুত্ব দেন; কিন্তু ভাবেন না যে; কলাবিদ্যা তথা জাতীয় ভাষা, সাহিত্য এবং সুকুমার শিল্প, গবেষণা ইত্যাদিরও প্রয়োগ মূল্য আছে; আর আছে প্রায়োগিক রূপ। কেবল যন্ত্রপাতির ব্যবহার নয়; ভাষা-বাক্যের ব্যবহার আর সেগুলোর বাস্তব-সম্মত বর্তমান ও অতীত ঐতিহাসিক প্রয়োগ-তাৎপর্যও যে, মানবিকী বিদ্যা—(Huhmanities)র অন্তর্গত, জাতির পথ-প্রদর্শক, তা 'বিটুইন দি লাইনস্'-এর পাঠোদ্ধার ক'রতে না শিখলে, বোঝা যায় না।**

শিক্ষার এই ব্যর্থতার কারণেই গত এক শ' বছরে, এ-জাতির সামনে যে-সব সত্য এসেছে—তার দিকে আমরা ভালভাবে তাকাইনি; অথবা চোখ তুলে তাকিয়েছি; কিন্তু মন খুলে দেখিনি। মন খুলে পড়িনি। সেজন্য আমি যে-সব তথ্য পাঠকানের সামনে হাজির ক'রছি; সেগুলো নতুন কিছু নয়। বানানো কিছু নয়। অনেকের চোখেই সেগুলো প'ড়েছে। কিন্তু আমার মত তাঁরা কেউ তাকাননি। দেখেননি। আর সেজন্যেই সে-সব জিনিসের যে-প্রয়োগ মূল্য ও প্রায়োগিক বাস্তবতা—আমার চোখে-মনে ফুটে উঠেছে; অন্য কারো মনে-মগজে তা ফুটে ওঠেনি। তাই তাঁরা সে-সব ঐতিহাসিক জাতীয় উপাদানের—'ইংগিত, ভঙ্গি,

www.pathagar.com

সংগীত ও ক্রন্দন' শুনতে পাননি।

তাছাড়া , আরও আছে দিন-কানার দল; চোখ থাকতে কানার দল এবং দেখেও না-দেখার এবং ইচ্ছে ক'রে— না-বোঝার, না-মানার দল। সেজন্য আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে যে-সব সত্য বাঙালা সাহিত্যের পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও গবেষকদের সামনে এসেছে এবং যাঁরা তা নিয়ে আলোচনা-গবেষণা ও লেখালেখি ক'রেছেন—তাঁরাও কেউ—এই নিবন্ধে যে-সত্য তুলে ধরা হবে; সে-সত্যের মুখোমুখী হননি। হ'তে পারেননি। দিনকে—'দিন' বলা হবে, না—'রাত' বলা হবে, এই নিয়ে যে-জাতির মধ্যে শতাব্দী ব্যাপী তর্ক চ'লতে থাকে; তর্ক চলে—মুছলমান ও হিন্দু দুই জাতি, না এক জাতি, নিয়ে—সে-দেশের-ই নথি-পত্রে কি লেখা ও বলা হ'য়েছে—তার দিকে তাকাবার কার ফুরছৎ কখন? তাদের চোখে আঙুল দিয়ে সত্যকে দেখাবার-শেখাবার উপকরণের অভাব না থাকলেও তারা সেদিকে তাকায় না। অথবা তাকালেও দেখে না। সে-দেশের সেকারণেই আজ **এক শ্রেণীর শিক্ষিত গাড়োল মুছলমান শেখায়—বাঙালা ভাষা এক, বাঙালী জাতি এক, মুছলমান হিন্দু—এক; 'এপার বাংলা, ওপার বাংলা'—এক দেশ, এক জাতি। সে-জাতির বয়স তিন হাজার বছর।**

কিন্তু তাদের এলেম–তালিম, এলান-বয়ান যে সত্য নয়; তা উনিশ শতকের একাধিক নমুনা-নিশানা দেখে বোঝা যায়। বাঙ্‌লাদেশের মুছলমান ও হিন্দু যে, এক দেশের এক জাতি নয়; এক-ই দেশের দুই জাতি; সে-কথা হিন্দুদের-ই।—উনিশ শতকে দুই জাতির, দু' কিছিমের বাঙালা ভাষার-নমুনা হিন্দুরাই হিন্দু-কলমে লিখে রেখে গিয়েছেন। তাই পাঠকগণের এবার সেদিকে নজর বিশেষভাবে আকর্ষণ ক'রছি। যখন সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে আজকের মত বাদ-বিবাদের বালাই ছিল না, সেই সময়, উনিশ শতকে, সাধারণ শ্রেণীর হিন্দুরা—মুছলমান ও হিন্দু জাতির ভাষা-ব্যবহার শেখাতে গিয়ে জানান—কোন্ জাতির খৎপত্র কি রকম ভাষায় লিখতে হবে। প্রথম নোছখাটি অবশ্য কবিতায় লেখা। যথা—

"লিখনের পাটাপাট লিক্ষতে—

"শ্রীগুরু চরণ পদ্ম বন্দিয়া মস্তকে
কহিব অপূর্ব কথা ষুন সর্বলোকে।
পাঠ পত্র লিখিতে চাহিএ বুদ্ধি বাড়া
অল্প বুদ্ধি নাহি জানে ইহার পাহাড়া।

হিষ্ট চিত্রে ইস্টে দেবে নিবেদন পত্র
অবধানে তার কথা কহি ষুন তত্ত্ব॥
অতি দিন হিন লিখি লিখি নিজ নাম
দণ্ডবৎ বহু বহু লিখিবে **প্রণাম**।
অন্য অন্য গতিক পত্র লিখি সিরনামা
লিখিবে তাহার কথা **ষুন**।
সর্ব্বপর ইস্বর লিখিবে এক মোনে
প্রভুর পদ্মের ধ্বনি লিখিবে জতনে।
ব্রাহ্মনে লিখিতে পত্র বহু ভক্তি চাই
অবধানে তার কথা কহি ষুন ভাই।
ভিত্রানুভিত্য কিবা সেবক আভাস
নিজ নাম লিখি **পরে প্রণাম** প্রকাস।
অনেক ভকতি স্তুতি নিবেদন আর
......লিখিবে তাহার।
ব্রাহ্মনে লিখিবে ষুদ্রে ষুভাসি বলিএ্যা
সিরনামা অ....ষুপিস্ট দিয়া।
ষুদ্রের চাকর জদি হএত ব্রাহ্ম[ন]
প্রণাম লিখিবে তারে লিখি নিবেদন।
সিরনামা লিখিবে তারে কোরিএ্যা বিবেচনা
পুজ্য বলি তাহাকে লিখিতে নাহি মানা।
ব্রাহ্মণে লিখিবে তারে **আজ্ঞাকারি** বলি
সিরনামা **আসিব্বাদ** প্রতিপাল্য বলি।
পিতামহো মাতামহো আদি জত জন
সেবকানু সেবকস্য লিখিবে লিখিবে লিখন।
পাদপদ্ম ধ্যান কোরি লিখিবে প্রণামা।
পরম পূজনিয় বলি তার সিরনামা।
পিতা জেটা কুড়া সে জেস্ট সহদর
মষুয়া তাউয়া আদি জত গুরুতর।
জননি সাসুড়ি মাসি সোষুর মাতুল
সভাকে লিখিতে...

বন্দনিয় বলি তারে উপযুক্ত হয় ।
সম্পক্ষ গুরূতর অন্ন জাতি থাকে
নমস্কারা নিবেদন পত্র লিখি তাকে ।
সিরনামা লিখিবে ইহয়া সাবধান
বিবিধ গুলান হয় তাহার বাখান ।
প্রতিপাল্য বলি লিখি আশ্রয় জাহার
মদেকান্ত বলি লিখি সিরনামা তার ।
পালিত জনেরে লিখি প্রতিপালক
মাসি খুড়ি জেটুই লিখিবে **সেবক** ।
ভগ্নিপতির ভরি কিবা **নারির ভগ্নি জেস্ট**
বিনয় বিহিত তারে পত্র লিখে ছোট ।
স্তুতিপাঠ স্যামিকে লিখিবে নারিজনে
সিরনামা **প্রাণপ্রিয়** লিখিবে জতনে ।
নারি হয়া স্যামিজনে লিখিবে সেবক
সিরনামা দিবে তার দম্পতি
সিরনামা লিখিবে করিঞা বহু দাপ
....সমহ লিখি মহজোগ্য প্রতাপ ।
নিচ লোক সেহ **জদি হয় মহাজন**
নিবেদন লিখি তারে বিহিত বচন ।
সিরনামা লিখিবে হইঞা মহাবিস্ট
মদেক সদয় লিখি ষুজন গরিস্ট ।
বড়লোক হয় জদি খোট্টা মোছলমান
বন্দিগি লিখিবে তারে কুন্নিস সেলাম ।
চলেস্টেরে (?) দোস্তা লিখি জেস্ট হইলে হেবা
মেহেরবানগি বলি সিরনামা দিবা
রাম রাম বলিয়া লিখি **খেত্রি ধর্ম্মপুতে**
সন্মাহিম বলি তারে সিরনামা দিবা ।
ষুপিষ্ট বলি সিরনামা দিবা ।
কবুলতি মচলকা আর ফারখতি
লিখিতং বলিঞা সভে আরম্ভিলু ভাতি ।”...

www.pathagar.com

এ-বয়ান থেকে ছাফ জানা যায়—মুছলিম ও হিন্দুভেদে খৎ-পত্রের ভাষা ভিন্ন ছিল। ছিল—দুই জাতির দু'রকম বাঙালা ভাষা। ফলে, 'সিরনামা' (এটি ফারছী শব্দ) বা সম্বোধন লিখতে পহেলা লিখত—"প্রণাম বহুৎ বহুৎ দণ্ডবৎ"। কিন্তু সবার উপরে লিখতে হ'ত—"ঈশ্বর"। ব্রাহ্মণের নিকট খৎ লিখতে হ'লে হিন্দু লেখক পহেলা লিখত—"ভৃত্যানুভৃত্য" বা "সেবক"। এর পর নিজ নাম লিখে, পরে লিখত—"প্রণাম"। ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকে খৎ লেখে; তবে তিনি সম্বোধনে লিখবেন—"সুভাষি" বলে। আর ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রের চাকর হয়, তা হ'লে, সে তার প্রভুকে সম্বোধন ক'রবে—"নিবেদন" লিখে, তারপর লিখত—"প্রণাম"। তাঁকে "পূজ্য" ব'লেও লেখা যেতে পারে। আর উল্টো অবস্থায়, ব্রাহ্মণ তাকে "আজ্ঞাকারী" এবং 'আশীর্বাদ প্রতিপাল্য" ব'লে লিখবে। হিন্দু পত্র-লেখক তাঁর পিতামহ-মাতামহর নিকট লেখার সময় সম্বোধনে লিখবে— "সেবকানুসেবকস্য"; তারপর "প্রণাম"। অন্য আত্মীয়-আত্মীয়া-মুরুব্বীদের "বন্দ্যনীয়" ব'লে লেখাই বিধি। এছাড়া, সম্পর্ক অনুসারে সম্বোধনে (সিরনাম) "প্রতিপাল্য মদেকান্ত", "প্রতিপালক", "সেবক", "বিনয় বিহিত", লিখবে। আর স্ত্রী—স্বামীকে "স্তুতি"-বচন লিখে—তারপর লিখবে "প্রাণ প্রিয়" এবং "সেবক"।

আর সম্বোধক যদি প্রতাপশালী হয়, তাহ'লে তাঁকে খৎ লেখার সময় "মহজোগ্য প্রতাপ" লিখতে হবে।

কিন্তু নিচ জাতির লোক যদি 'মহাজন'ও হয়; তবে তাকে "নিবেদন" লেখাই যথেষ্ট।

অপর দিকে, খোট্টা মুছলমান যদি বড়লোক হয়, তবে তাঁকে সম্বোধন ক'রে লিখতে হবে—"বন্দিগী"। অথবা "কুর্ণিশ-সেলাম"। কিন্তু কালেক্টরে দলিল-দস্তাবেজ-এর হেবানামা লিখতে হ'লে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে "মেহেরবানগি" ব'লে শিরোনাম বা সম্বোধন লিখতে হবে। কবুলিয়ৎ, মুচুলেকা, ফারখতি বা ছাড়পত্র ইত্যাদিতে "লিখিতং" ব'লে শুরু করা আবশ্যক। (পৃ. ৯৬)।

শুধু শিরোনাম নয়; তার পরও কিভাবে লেখা শুরু ক'রে এগিয়ে নিতে হবে, সে-বিষয়ে অপর একটি রচনায় বলা হ'য়েছে—"শ্রীগুরু চরণে সিস্যের পত্র লিখিবার ধারা—অথ গ্রাম লিখিবার ধারাঃ—

গ্রাম লিখিবার পূর্ব্বে। সাকিম মৌজে কিম্বা মোকাম এই এক কথা লিখিবে। জেমন সাকিম কলিকাতা মৌজে কলিকাতা কিম্বা মোকাম কলিকাতা আর আপনার গুরুর বাষ জে গ্রামে সে গ্রামের নাম লিখিতে কিম,বা কহিতাগ্রে শ্রী ব্যবহার করিবে

www.pathagar.com

জেমন শ্রীপাঠ খড়দহ॥

অথ পত্র লিকিবার ধারা

পিতামহ মহাসয়ে প্রণতি করিয়া। তারে লিখি সেবকানু সেবক বরিয়া। প্রিতা পিতাপিতৃব্য জেষ্ট ভ্রাতাদী সমতুল। জেষ্টম মধ্যম আর সষুর মাতুল॥ জ্ঞাতিবন্ধু আদি করি জত গুরুজন। **সেবক প্রণাম** করি লিখি নিবেদন। **পরম পুজনি** বলি দিবে সিরনাম। পত্রের নিয়ম এই স্তির করিলাম।॥ ছোট ভাই পত্র আদী ভাগিনা জত থাকে। **পরম ষুভাসি** করি পত্র লিখি তাখে। মঙ্গল উন্নতি করি আসীয়ে লিখিবে। **পরম কল্যাণ** বলি সিরনাম দিবে। বন্ধ্যা নারি সান্ত সেবিকা পতিকে লিখিবে। **মহামহিম** বলি শেষে শিরনামা দিবে॥ কন্যা প্রিতাকে লেখে করিয়া **প্রণাম**। **পরম পুজনি** করি দিবে সিরনাম। ভগ্নিপতি জেষ্ট হইলে লিখি **আজ্ঞাকারি**। মধ্যম কনেষ্ট হইলে **নমস্কার** করি।। আর পত্নি জেষ্ট ভ্রাতা **আজ্ঞা** কারি পাট লিখি এই দোহাকার॥ ব্রহ্মণ হইলে লেখি **সেবক** প্রণাম। **বন্দে চাকর** লিখি **জবনে সেলাম**। বড় বড় জোনে লিখি **আজ্ঞাকারি** বলে। ত্বদিয় নোমস্কার লিখি **সমজগ্য হলে**। কিঞ্চিত লিখিল **পাতি** সভে জ্ঞাতো করি। সব্বত্রে লিখিবে পাতি এইরূপ করি॥"

এরপর, হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও সম্পর্ক-অনুসারে খৎপত্রাদি কিভাবে লেখা শুরু ক'রতে হবে—সে-বিষয়ে জনৈক হিন্দু লেখকের বয়ান—

১. শ্রীগুরু চরণে সিষ্যের পত্র লিখিবার ধারা—

শ্রীপাদপদ্ম সেবিতানু সেবিত শ্রীব্রজবাসী দাষ বৈরাগ্য সষ্টাঙ্গাসংখ্য প্রণামান্তর সবিনয় নিবেদনঞ্চ আদৌ ভবত ঘোর ছুস্তার ভাবার্ণব গভির নির তরঙ্গে রঙ্গে নিস্তার কার সার শ্রীচরণারবিন্দ কিপা অবলম্বনে নিরাস্তর স্মারক ভিত্রের সতত ষুভামিতি বিসেষ—

সরিনামা—

পরম ধ্যানেন বন্দীত শ্রীশ্রীপরাৎপর ঠা্কুর মহাষয় শ্রীচরনাম্বুজেষু—

২. গুরু সিষ্যের প্রিত্তত্র পর লিখিবার ধারা—

নিত্ত কুশলাকাঙ্খিত শ্রীহারাধোণ দাষ সৌ—

পরমা ষুভাসী জুক্তা ভয়বরা বিজ্ঞাপনঞ্চ দো ভবত কায়িক বাচিক মানসীক সকলাভিষ্ট সিদ্ধা কমনা পর দেবতা সমিপে অনবরত প্রার্থনা করণে অস্মাকঞ্চ

পরমানন্দ মতি বিসেষ—

সিরনামা—

সদানুগ্রহপ্রিয় পরমাজ্ঞেজুত শ্রীব্রজবাসী দাষ বৈরাগ্যং-
বাবাজী মনো অভিলাষ সুভেষু—

৩. গুরু সিসের প্রতি পত্র লিখিবার ধারা

সদা যুভানুধ্যায় শ্রীমথু[রা]নাথ গোস্বামী পরম মোদজনিত বিজ্ঞাপনঞ্চ আদৌ তোমার বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল কামনা সদাসব্বদা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ হয় বিসেষঃ পরে ।—

সিরনামা—

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত রাধামোহন দেবসর্ম্মণ বাবাজীও পরম কুসলেষু—

৪.গুরু পত্নিকে সিষ্যর পত্র লিখিবার ধারা—

শ্রীপাদপঙ্কজ ধ্যান হিন শ্রীরাধামোণ দেঘাষ প্রেণামসন্তর নিবেদঞ্চাদৌ এ আজ্ঞা বত্রী জনার নিস্তার কারণ অপরা সংসার সাধারণ পারাপার তরনি শ্রীচরণধ্যান জ্ঞান লোচনে জ্ঞানাঞ্জন প্রদাণ করিতেছেন তদর্থে পরম মঙ্গল বিষেষ—

সিরনামা—

শ্রীচরণ সসি জ্যোতি প্রকায মন তিমির নাসীনী শ্রীমতি ইস্বরি গুরু পত্নি মাতা ঠাকুরানি শ্রীচরনে মোন চোকর মকরন্দ পানেষু—

৫. সিস্যকে গুরু পত্নির প্রতি উত্তর লিখিবার ধারা—

ভব মঙ্গলা কাঙ্খি শ্রমিতি আনন্দ মহি দেব্যা পরম যুভাসীসাং রাসয় মোতামার সকলানন্দ মন বাঞ্ছা রাখে আশু বরার্পন করিতেছি তদার্থে অত্রানন্দ বিশেষ—

সিরনামা—

সদা সুখাভিলাষ স্বস্তু শ্রীষুত রাধামোহন ঘোষ বাবাভাগ্র্যাদএষু—

দিতিয় ভাগ—

৬. আত্ম সম্পর্কীয় পিতামহকে ও মাতামহকে পত্র লিখিবার ধারা-পুত্র দোহিত্র এই দুই জনার উক্তী ।-শ্রীচরনাশ্রিত ভিত্ত্যানুভিত্ত শ্রীরত্নেস্বর দেবসর্ম্মণ প্রেণামানন্তর নিবেদঞ্চাদৌ মহাসএর শ্রচিরণ ধ্যাণ পূর্ব্বকে এ সিস্যানুসিষ্যের মঙ্গল

www.pathagar.com

বিসেষ—

সিরনামা—

পরম জ্ঞান ধাণ কল্পনিয় শ্রীযুক্ত পিতামহ ঠাকুর মহাসয় শ্রীচারাণ সরসিরূহ রাজেষু কিম্বা মাতামহকে লিখে তবে

৭.শ্রীযুক্ত মাতামহ ঠাকুর মহাসয় শ্রীচরণ সরসি রুহ রাজেষু—

ঐ পাঠের উত্তর।

৮. পৌত্র ও দোহিত্রকে পত্র লিখিবার ধারা-পিতামহ ও মাতামহর উক্তী-অবস্ব পুস্যানুপুস্য শ্রীবৈষ্ণবচরণ দেবশর্ম্মণ পরম কল্যাণমওং বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার অতুল জস গৌরবার্থে শ্রীশ্রী দ্রারায় প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্র মঙ্গল বিসেষ।-পরে তোমার শ্রীকর কমলঙ্কিত পত্রী দিষ্ট পুস্তকে পরমাপইত হইলাম ইতি-

প্রাণাধিক প্রিয় পরম কল্যানিয় শ্রীযুক্ত রত্নেস্বর বন্দোপাধ্যায় অতুল বৈভবে চীর জিবেষু।-পুতার জেঠা ও পীতার

৯. খুড়া ও পুতার মাতুল ও পুতার মেস ও পুতার পিসে ও মাতার জেঠা ও মাতার খুড়া ও মাতার মাতুল ও স্বষুর ইত্যাদী বেকক্তী দীগ্যকে পত্র লিখিবার ধারা-পুত্র ও দৌহিত্র ইত্যাদী বেকক্তির উক্তী

সেবকানু সেবক শ্রীচন্দ্রমোহণ ঘোষ প্রণামা পরমপদ পাপ্রজন্য নিবেদঞ্চাদৌ মহাসএর শ্যীচরণ স্বরণ ধ্যান জ্ঞান সাধন মাত্রে অত্রানন্দ বিসেষ—

১০. পিতামহ ও মাতামহ ও ভ্রাতাদিগ্যকে—

সিরনামা—

পরম পুজনিয় সমাচ্চিনীয় শ্রীযুক্ত মধ্যাম ঠাকুর দাদা মহাসয় কিম্বা তিতী ঠাকুর দাদা মহাসয় শ্রীপদ পঙ্কজ কায়জ মনজ স্বরণেষু-

প্রত্তুতত্তর—

১১. ভ্রাতার পুত্র ও ভগ্নির পুত্র ও সালির পুত্র ও ভাতার দহিত্র ও ভগনির দহিত্র ও জামাতা ইত্যাদী দিগ্যকে পত্র লিখিবার ধারা—

প্রিতিপরানুপ্রিতি পাল্য তব কুসল চিরকারি শ্রীগুরুচরন দাষস্য পরমষু

www.pathagar.com

আসীব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার অচলা কোমলা সরলান্তকরণে অনবরত অমর বর অচলান্তর তব পাথনা পূর্ব্বকে মমৌর কুষল বরম্বিসেষ ।—

সিরনামা—

পরম প্রায়বর গুনসাগর শ্রীযুক্ত নবিনচন্দ্র মিত্র মমৌব চিত্তপুরকজন ছিরজিবেষু—

এই রচনাটির কাল-পরিচয় পাওয়া না গেলেও, ১২৫৬ (১৮৪৯ খৃ.) সালে লিখিত "জ্ঞান কৌমুদী"-গ্রন্থে নানা শ্রেণী ও পেশার লোকদের যে বহুতর পত্র লেখার রীতি-রেওয়াজের কথা বলা হ'য়েছে—তা নিচেয় তুলে ধরা হ'ল। যথা—

"**অথ জ্ঞানকোমুদি গ্রন্থকৃত পত্র লিখিবার ধারা। শ্রীগুরুচরণে সির্শ্যের পত্র** লিকিবার ধারা॥ শ্রীপাদপদ্ম সেবিতানু সেবিত শ্রীকালিকিঙ্কর দেবসর্ম্মনঃ সাষ্টাঙ্গাসজ্ঞ্য প্রণামানন্তর সবিনয় নিবেদনঞ্চাদ্যে ভবতো ঘোর দুস্তার ভবান্নব ঘবির নির তরঙ্গ রঙ্গে নিস্তার কারশার শ্রীচরণাবিন্দ কৃপাবলম্বনে নিরান্তর স্বারক ভৃর্ত্যের শতত সুভমিতি বিসেষঃ॥ পরে আপনার অভিলাস মত লিখিয়া সিরনামা দিবে। **সিরনামা**॥ পরম ধ্যানেন বন্দিত শ্রীশ্রীপরাৎপর ঠাকুর মহাসয় শ্রীচরনাম্বুজরেনুষ॥ গুরূপতিএক সির্ষ্যের লিখিবার ধারা॥ শ্রীপদপঞ্চজধ্যানহীন শ্রীরামমোহন সর্ম্মন প্রণামানন্তর নিবেদনঞ্চাদো এ য়াজ্ঞানু বৃর্ত্তিজনার নিস্তার কারণ অপারা সংসারা সারায়র পারাপার তরনি শ্রীচরনধ্যানাজ্ঞান লোচনে জ্ঞানাঞ্জন প্রদান করিতেছেন তদর্থে পরম মঙ্গল বিশেষঃ সিরনামা। শ্রচিরণ সসিজেহ্যাতি প্রকাস মনো তিমির নাসিনী শ্রীমতি ঈশ্বরি গুরূপত্নি মাতা ঠাকুরানি শ্রীচরনে মন চকোর মকরন্দ পানেষু॥ গুরূপত্রকে সির্স্যের্দ্ধের লিখিবার ধারা। শ্রীপদপঙ্কজ ধ্যাঅইন শ্রীনিলমনি দেবসর্ম্মন প্রণামান্তর নিবেদনঞ্চাদো হমহাসএর শ্রীচরণ পদ পঙ্কজে মনভৃঙ্গ মরকন্দ পানাবসক্ত মর্ত্তরূপে ভ্রমণ করিতেছী তদর্থে সানন্দ বিসেষঃ। সিরনামা। অপার সংসার সিন্ধু তরনিরূপ শ্রীশ্রীঠাকুর পুত্র ঠাকুর মহাসয় শ্রীচরণ কমলে মনোপিতম্বে। মাতাও বিমাতা ও জেঠাই ও খুড়ি ও মাতুলানি ও পিসি ও মাসি ও শাষুড়ি এই কএক ব্যক্তী স্ত্রীলোকের উক্তি ॥ অবর্স্য পুস্যাশীর্ব্বাদ দাইকা শ্রমিতি ভুবনের্শ্বারি দেব্যা পরম ষুভাসীশাংরাসয় সন্ত পরং তোমার য়চলা লক্ষী শ্রীস্থানে পার্থনা করিতেছী তাহাতে যত্রানন্দ বিসেষঃ॥ সিরনামা ॥ মমৈব প্রতিপালক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবাজিউ কল্যাণরেষু॥ মাতা ও বিমাতা ও জেঠাই ও খুড়ি মাসি পিসি ও মাতুলা। ও শাষুড়ি এই কএক ব্যক্তী স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোকের পত্র লিখিবার ধারা॥ কন্যা ও

www.pathagar.com

সপত্নি কন্যা ও ভাষুরের কন্যা ও দেবরের কন্যা ও ভাগ্নি ও ভ্রাতৃকন্যা ও ভগ্নিকন্যা ও পুত্রবধূ এই কএক ব্যক্তী স্ত্রীলোকের উক্তী ॥ শ্রীচরণকমলা শ্রীতে দাস্যা শ্রীমতি সান্তকুমারি দাস্যা প্রণামা সত সহস্র নিবেদনঞ্চাগে শ্রীমতির শ্রচিরণ স্বরণ মাত্রে অত্র মঙ্গল বিসেষঃ শিরনামা ॥ পরম করুনারাবিত্র পরম পুজনিএ শ্রীমতি মাতাঠাকুরানি কিম্বা বিমাতা ঠাকুরানি কি সস্ত্রি মাতা ঠাকুরানি শ্রীচরণদ্বএষু॥ স্বামিকে স্ত্রীলোকের পত্র লিখিবার ধারা॥ শ্রীচরণ সরসি দিবেনিসি শাধন প্রিয়াসিদাসি শ্রীমতি মালতি মঞ্জরি দেব্যা প্রণম্য রম্য প্রিয়মর প্রানের্শ্বর নিবেদনঞ্চাদো মহাসএর শ্রীপদ সররুহ স্বরণামাত্রে অত ষুভম্বিশেষঃ সিরনামাঃ অহিক পারত্রিক নিস্তার কত্রিক ভবার্ন্নব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেম্বর মধ্যম ক্ষট্টাচার্য্য মহাসয় পদ পল্লবাশ্রয় প্রদানেষুঃ জেষ্ট সালক জেষ্টাভগিনিরি পতি এই দুইব্যক্তীকে পুরুসের পত্র লিখিবার ধারা॥ কনিষ্ঠা ভগিনিপতী ও শালকের উক্তী ঃ আজ্ঞাকারি শ্রগিঙ্গাকিসোর দাস ঘোসর্শ্য সবিনয় পুর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চাগে মহাসএর য়নুগ্রহাস্বয় মাত্রে অত্র ষুভম্বিসেষঃ সীরনামা॥ মদেকশ্বদয় মমাস্ত্রয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বষুজা মহাসয় মৎপ্রতিপালকেষুৎ কনিষ্ঠা ভগ্নিপতি কনিষ্টা সালককে লিখিবার ধারা॥ জেষ্ট সালক জেষ্ট ভগ্নিপতির উক্তি। অবষ্য পুস্য শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাষ বষো শর্ব্বদা ষুখাভিলাষ তব বিজ্ঞাপনঞ্চাদো তোমার যুস্থিরা। কমলা শ্রবণমাত্রে য়ত্রসুভং বিসেষঃ সিরনামা॥ সর্ব্বগানভিসিক্ত শ্রীযুক্ত গঙ্গাকিসোর ঘোসাজা মমাএষু॥ ক্ষেত্রিয় চাকরকে পত্র লিখিবার ধারা বৈস্য ও ষুদ্র এই দুই জাতি মনিবের উক্তী ॥ সদাষুমঙ্গল চিন্তাকারি শ্রীনরেন্দ্র নারায়ন বিসারদ গুপ্ত কিম্বা দাষবিদ পরম প্রিয়বর বিজ্ঞাপনঞ্চাদো তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী করিতেছেন তাহাতে য়ত্র মঙ্গল পরং॥ সিরনামা ॥ নানাগুনাভিক্তি শ্রীযুক্ত ষুভদ্রাকুমার যাহাতা পরম ধাক্ষিকবরেষু॥ বৈস্য ও সুদ্র এই জাতি মনিবককে লিকিবার ধারা। বৈস্য ও ষুদ্র এই দুই জাতি চাকরের উক্তি। আজ্ঞাকারি কালী নিতাই বিশারদ গুপ্তদ কিম্বা দাষ শিংহ স্ববিনয় পুর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদো মহাসএর মহোন্নতি শ্রীশ্রীদ্বারায় পার্থনা পুর্ব্বক অত্র মঙ্গল বিসেষঃ॥ সিরনামা ॥ মমাশ্রয় সদাশ্রয় শ্রীযুক্ত মদন মো[হ]ন কিম্বা বষুজা মহাসয় দিন প্রতিপালকেষু॥ বৈস্য সুদ্র এই দুই জাতি চাকরকে লিখিবার ধারা॥ বৈস্য ষুদ্র এই দুই জাতি মনিবের উক্তি ॥ ষুভানুধ্যাই শ্রীমদন সঙ্কর সেন পরম প্রিয়তম বিজ্ঞাপনঞ্চাদো তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী করিতেছেন তাহাতে য়ত্র মঙ্গল বিশেষঃ শিরনামা সর্ব্বগুণালস্কৃত শ্রীযুক্ত কালি নতাই শেন সদাশএষু॥ পিত্রালয়স্ত কন্যা স্ত্রীর্ধম্মিনি হইলে তার পিতা ঐ কন্যার শ্বসুকে লিখিবার ধারা॥ কন্যার পিতার উক্তি। আজ্ঞাকারি শ্রীফলনা যবিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনাঞ্চাদো শ্রীবৈবহিক মহাসএর শ্রীশ্রী কমলা অচলা পুর্ব্বক মশ্মাকং ষুভস্বসেষঃ মদেক শ্বদেয় ফলনা সদাশএষু॥

www.pathagar.com

ইতি সমাপ্ত—সন ১২৫৬ বারসর্ত্ত ছাপার্ন্ন সাল তাং— ।"

এরপর ১২৭১ বনাম ১৮৬৪ সালে লিখিত একটি 'আদর্শ লিপি'র উল্লেখ করা যায়। তাতে কেবল হিন্দু নয় মুছলমানের তরফে খৎপত্র লেখার ভাষা, শব্দচয়ন ও রীতি-নীতির কথা বলা হ'য়েছে। যথা—

লিপিতে—"মোছলমানের প্রকরণ"—কি রকম;—মুছলমানরা কি রকম ভাষায়, কেমন শিরোনাম লিখবে, তার নমুনা লিখতে জনৈক হিন্দু লেখকের কলমে লেখা হ'য়েছে—"পির মুরীদকে খত লিখিবার সেরেস্তা—সন ১২৭১ সাল—

মোছলমানের প্রকরণ—

১. পির মুরিদকে খত লিখিবার সেরেস্তা—

বকদম দরখা দেমি আউয়র দায় ওয়ক্ত বন্দিগী বজাভ সয়দা সহু আখবত বেহেতেরি এরেদাবাদ ছাহেব মেহেরবানি ফরমুদা সোদ যুরাত বান্দার বেহেতর সোদ পির মুরিদ যুপাদ ঃ **তামামকে সেরেস্তা** লিখিবে ইতি–

সিরনামা—

আউয়ল আকবত তাজেন্দিগি আফত বফেরাষুত কোনেন্দা বদর গাহে আল্যাতাল্যা বেফাকত ফরমুদা শ্রীযুক্ত ছএদ নুরল হোদা মুরিদজী ছাহেব বয়সেনেষু—

জবাব—

২. খাদীমকে খত লিখিবার সেরেস্তা পির মুরিদের জবানী—

বাদ্দতা তাজেন্দিগি তছরূপ গুনা বহগুনা মহকুপ বকসেষ বদরগাহে মেন্নত কোনেন্দা শ্রীযুত হুরল হোদা দৌওয়া বহুত বহুত বাদ তোমার খেয়েরখোবি নাবিনওা জেসরোষ মারা বেহেতের সোধ–

সিরনামা—

আউয়াল এনছাল বরও সল ছাল্যো মওলা দেলদর গোষ খোষবয় জোবান ও জালা বাবাজান মোছরে এমান শ্রীযুক্ত মহামদ সরিফ জেন্দে গালি এন ছালি রওসনেষু—

৩. দাদোকে পোতার খত লিখিবার সেরেস্তা—

খাদেম দর খাদেম শ্রীছএদ এনাতুল্লা সেলাম বহুত বহুত বাদ দাদো ছাহেবের

www.pathagar.com

কদম পাহানা ষুরাত এ খাদেমের ওতিন আখেরের খয়ের খুবি সোদবাদ চার পাচ মাহিনা তলব ছাহেবের বেহেতেরি খবর গোষ গোজর না হবাতে হকতাল্লা কিতক প্রেসানিতে রাখিয়াছেন তাহা নবেস্তা খানিতে দোরস্তা মোস্কে ছাহেব হাজরাহ মেহেরবানি ষুরত খত লিখিয়া বান্দারকে সরফরাজ করিতে হুকুম ষুরাত ও মেদবার আচি আঘন মাহাতক ছাহেব মহষুব জেলা মুরষুদাবাদ রয়না হইবেন রেজেষ্টরি পাষ আদায় করিয়াছেন দাদ ছাহেব এ গোলামের বেহেতরির পয়াস্তে শ্রীশ্রীদরগায় মানাজাত ফরমাইতে হুকুম হয় আরজ সোদ—

সিরনামা—

দোয়া বরদেয়া কোনেন্দো আসব অলি দাদোজী ছাহেব কদমেষু—

৪. পোতাকে দাদোর খত লিখিবার ধারা—

মর হোম দোয়া কোনেন্দা শ্রীছএদ আসরফ আলি খেয়ের বহুত বহুত শ্রীদর-ওয়াগায় মেন্নত এরেদায় মোত্তেদ আছি ষুরাত মজকুরে এ দোরবেসের খেয়ের খুবি সোদ পেত্তে খতে জাহের করিয়াছে মোঃ জোবানী ছাহেবের পাহানা পাথরাইয়া উমেদর আছী ফেলাহক দিগর আদমীর জোবানি আহয়াল ঝকের হইয়াছি ইতাদী—

সিরনামা—

আউয়ালে এনছাল দর গোষ খোষবর জোয়ান বরওয়ান ছাল্যে মওলা দেল উজালা ভাইজানের মছলে এমান শ্রীযুক্ত ছএদ এনাতুল্লা জেন্দে গালিব এনছালি বর সনেষু—

৫. দাদী ও নানীকে খত লিখিবার ধারা—

পোতা ও নাতি এই দোনর জবান—

কদম পাহানা বরদার খেদমত গার শ্রীসেখ আমান উল্লা বন্দীগি বেষুমার আরজ দাদিজির বক্ষে ও নানিজীর দোয়া নেকনজর রোয় বান্দার বেহেতরি সোধ—

সিরনামা—

খাদেমেরা আকবর ওসানি বলন্দ করদানি শ্রীমতি দাদীজী হয়া নানিজী কদম পাহানা ফরমুদেষু—

৬. উপরের লিখিত **পাট** ও **সিরনামা** দাদী ও নানি পুপাদী গয়রহকে লেখা জায়। **পোতা** ও **নাতি** এই দোনকে খত লেখার জওয়াব সেরেস্তা দাদি ও নানি

www.pathagar.com

এই দোনর জোবান ।—

বদরগাহে ছাল্যে মওলা মেহের মেন্নত কদ্রনি শ্রীমতি আকবড়ি (আকবরি) বিবি দোয়া বুহত বহুত ভাইজির খেয়ের খোবি ষুরাত তামাম বেহেতর সোধ—

সিরনামা—

খোজেস্তা এতোবার শ্রীসেখ আনরুল্লা ভাইজী বা জেন্দেগানি এনছানি বলন্দেষু—

৭. উপরের লিখিত **পাট** ও **সিরনামা** পোতা ও নাতি সুপাদী তামামকে লিখিবেক মিয়াজী ও মামুজী ও খালুজী ও ফুপুজী ও ছছুরা ও বর ভাই ষুপাদকে খত লিখিবার সেরেস্তা-পাহানা বরদার শ্রীসেখ ভিক্ষু সেলাম বন্দীগি বেসোমার বাবছাহেবের ফরমাবরদারি খেদমতে এ গোলামের বেহেতর সোধ—

সিরনামা—

মোছোল্লম সেবক কোনেন্দা শ্রীযুত সেখ কেবলেগা ছাহেব এয়া চাচাজি ছাহেব এয়া মামুজী ছাহেব এয়া খালুজী ছাহেব এয়া ফুপুজী ছাহেব এয়া বড়া ভাইজী ছাহেব নেক নজর ফরমুদেষু—

৮. জওয়াব লেড়কা ও ভাতিজা ও ভাঞ্জা ও দাদমাদ ওগয়রাকে লিখিবার সেরেস্তা—

মিঞা ও চাচা ও মামু মজকুড়ার জোবানি-আষেষ ফরমুদা শ্রীসেখ তাজুদ্দীন সোকর বেহদা বকসেষ বাদ সোনেরা বর বাগবক্ত ব্বক্ত বর খোরদন ষুরাত পরদাক্ত সনিদোমকে বেহেতর সোধ-

সিরনামা—

তাজেন্দেগি খোদাস্ত নেকনবিষ জেন্দাজ শ্রীযুক্ত সেখ ভিক্ষু বাবাবাজান এয়া ভাই জান এনঝচানি বাহালেষু—

৯. বড়া সালা ও বড়া বুহ্নাই রাকে খত লিখিবার সেরেস্তা—

ছোট বুনাই ও ছোট সালার জোবানি-বজের দো পয়া দৌরত পর উয়র সিইফত এরাদ কেরদার শ্রীছেয়েদ জালালদ্দিন ছালাম বহুত বহুত ছাহেবের মেহেরবানি ষুরাতে এয়া গরিবের খেয়ের খোবি সোধ—

www.pathagar.com

সিরনামা—

নেহাএৎ নেক নজর কোনেন্দা শ্রীযুক্ত সেখ কুতবদ্দীন ছাহেব মেহেরবানেষু—

জওয়াব—

১০. ছোট বহ্বাই ও ছোটা সালাকে খত লিখিবার ধারা—বরা বহ্বাই ও বর সালাকে জোবান—

আসেষ কেরদার শ্রীসেখ কুতবদ্দীন বাজ বন্দীগী ছাহেবের নেহাএত নেকবক্ত রওসন ষুরাত মেরা খেয়ের খোবি সোধ—

সিরনামা—

বেখাতের ফমিদী শ্রীষুত ফমিদা শ্রীষুত সেখ জালালদ্দীন ছাহেব বাজেন্দেগি খোষ মেজাজেষু—

১১. দোস্তকে খত লিখিবার ছেরেস্তা—দোস্তের জোবান—

দরবাগ মেহের রই আপ্ত এরেদা কেরদার শ্রীসেখ গোলাম এজদানি সেলাম বন্দীগী বহুত বহুত বাদ দোস্ত ছাহেবের খোসা ও বেখোষ রপ্তনু সনিদমকে মেরা বেহেতরি জেন্দাস্ত সোধ— ।"

উক্ত রচনায় বলা না হ'লেও এটা সত্য যে, দলিল-দস্তাবেজ লেখার সময় তখনকার মুছলমানরা লিখতেন—"ইয়াদীকীর্দ্দ" আর হিন্দুরা লিখতেন—"কস্য পত্রমিদংকার্য্যাঞ্চাগে"। তাছাড়া, দলিলে মুছলিম-লেখন-রীতি অনুযায়ী দত্তা-গ্রহীতার নামের পরে লেখা হ'ত ওয়ালেদে বা "ওলদে"। আর হিন্দু রীতি অনুযায়ী লেখা হ'ত "পিং"। তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুরাও "ওলদে। ইব্নে" লিখতেন। পরে, ক্রমে এ-রীতি উঠে যায়। এবং হিন্দু রীতি-ই সবখানে দখল পায়।

যাহোক, উপরের কোটেশন ও আলোচনা থেকে পষ্ট জানা যায়, মুছলমানদের ভাব, ভাষা, রীতিনীতি, আদব-কায়দা, তমিজ-তাজিম আর হিন্দুদের ভাব, ভাষা, বিধি-বিধান, সভ্যতা-ভদ্রতা, বিনয়-সম্মানবোধ এক নয়—পৃথক। তাই বিশেষভাবে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য বাঙালা ভাষা যে, ইছলামী বাঙালা জবান ছিল—তা উপরের নমুনাগুলোয় পষ্ট। অতএব, এক-ই দেশের অধিবাসী হ'লেও মুছলমানের বাঙালা ভাষা; আর হিন্দুদের 'বঙ্গ ভাষা'-সাধুভাষা যে, এক নয়—তা না-কবুল করার উপায় নেই। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অজ্ঞাত-

www.pathagar.com

নাম হিন্দু লেখকের কলম থেকে জাত উক্ত নমুনাগুলো থেকে তা বেশক বলা যায়। সেই সাথে এ-কথাও বলা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরে বিভাজিত বাঙালা ভাষার ঐ দু'রূপ—সংস্কৃত-বাঙালা ও ফারছী-বাঙালার মধ্যে কোন্‌টা প্রকৃত বাঙালা বা বাঙালীর বাঙালা—তা নমুনাগুলোয় স্পষ্ট। অতএব, বাঙালায় ভাষা-ভিত্তিক জাতিও যে, দু'টি—মুছলমান ও হিন্দু—তা তর্কাতীত সত্য। অথচ হালে আমরা সেই সত্য সম্পর্কে গাফেল বা উদাসীন। আমরা এখন পাকা-আম ডিসেকশন ক'রে না দেখলে, চোখে দেখে টের পাইনে—আমটা পাকা—না কাঁচা।*

---

* এ-আলোচনার সমস্ত কোটেশন-ই ভারতীয় বাঙালা থেকে প্রকাশিত পঞ্চানন মণ্ডলের 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র'-গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

ড. এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান-এর

বাঙালীর লিপি-ভাষা বানান ও জাতির

ব্যতিক্রমী ইতিহাস

(১ম খণ্ড)

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালা বিভাগের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ড. এস.এম. লুৎফর রহমানের "বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস" প্রকাশিত হ'য়েছে। এ-গ্রন্থ সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চেতনার-আলোকে আলোকিত একখানি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এতে সংযোজিত তিনটি প্রবন্ধ তাঁর সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৩ সালের বাঙালা বিভাগীয় "সাহিত্য পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে প্রবন্ধগুলোর ব্যতিক্রমী তথ্য ও বক্তব্য পাঠকদের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করে। রচনাত্রয় হ'ল—"বাঙালা লিপির উৎস-নির্ণয়ে তন্ত্র-সাহিত্য", "উনিশ শতকের ফারছী-বাঙালায় লেখা মুছলিম গদ্যের নমুনা" এবং "বাঙালা ভাষায় আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম"। নাম থেকেই স্পষ্ট—রচনাগুলো সাধারণ নয়; অসাধারণ চিন্তা-ভাবনা ও তথ্য-আহরণের ফসল।

বর্তমান পুস্তকে, এই তিনটি নিবন্ধের সাথে যোগ করা হ'য়েছে আরও চারটি রচনা; যথাক্রমে "বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার নাম ফারছী বাঙালা", "মুছলমানরাই বাঙালা ভাষার আদি ওয়ালেদ", "মুছলমানরাই বাঙালা গদ্যের আদি জনক" এবং "পাঁচ শ' বছরের বাঙালা সাহিত্যে বাঙালীর জাতি-পরিচয়"। নিবন্ধগুলোর প্রত্যেকটির নাম থেকেই ব্যতিক্রমী ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় লেখক এসব রচনার তত্ত্ব, তথ্য ও সিদ্ধান্ত কোথা থেকে কি ভাবে আহরণ ক'রেছেন—তা গ্রন্থ-ভূমিকা "দিবাচা"য় জানিয়ে দিয়েছেন। এই মুখবন্ধটি পুরোপুরি প'ড়লে, সমগ্র গ্রন্থের অসাধারণত্বের উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে। এমনকি, বই হাতে নিলেই যে-কোন পাঠক প্রথম যে-বিস্ময়ের মুখোমুখী হ'বেন—তা হ'ল—লেখক কিছু কিছু শব্দের প্রচলিত বানান লেখেননি; যেমন—ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, ফার্সী, হোসেন ইত্যাদি। তিনি এসব শব্দের বানান লিখেছেন—'ইছলাম', 'মুছলিম', 'মুছলমান,' 'ফারছী', 'হোছেন' প্রভৃতি। এরকম কেন লিখেছেন—তা জানার কৌতূহল আগেই যদি কেউ মেটাতে চান,

www.pathagar.com

তবে ড. রহ্‌মান—তাঁকে প্রথম "বাঙালা ভাষায় আরবী-ফারছী ও উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেটি সুপরামর্শই। তিনি "বাংলা" শব্দের ঠিক ও বেঠিক বানানের দিকেও দেশী-বিদেশী-সূত্রে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন।

এ-গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকার অংশ-বিশেষ; গত বছর একটি জাতীয় দৈনিকের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হ'লে, জনৈক ফয়েজ আলম তার যে-আলোচনা করেন; গ্রন্থকার সে-রচনাটি পরিশিষ্টে মুদ্রণ ক'রেছেন। ফলে, গ্রন্থ-পাঠক; লেখকের বক্তব্যের উৎস-সম্পর্কীয় মূল্যায়ন জানতে পারবেন; যা লাভের ওপর অতিরিক্ত প্রাপ্তি ব'লে গণ্য হবে।

বস্তুতঃ এ-গ্রন্থের প্রত্যেকটি নিবন্ধ সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনার অবকাশ থাকলেও আমি এখানে শুধু "বাঙালা ভাষায় আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম" শীর্ষক নিবন্ধের দু'একটি বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোকপাত ক'রব।

আমার বিবেচনায়—ড. এস.এম. লুৎফর রহমান-রচিত "বাঙালা ভাষায় আরবী-ফারছী-উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম"–শীর্ষক প্রবন্ধটি একটি দৃষ্টি-আকর্ষণকারী গবেষণামূলক নিবন্ধ। সুলিখিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এ-নিবন্ধের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ ক'রে চিন্তাশীল পাঠকগণ বাঙালা ভাষার এক বিশেষ শ্রেণীর শব্দের বানান সম্পর্কে ব্যতিক্রমী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হ'তে বাধ্য। কারণ গবেষক কোন আপ্তবাক্যে বিশ্বাস না ক'রে যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে তাঁর অভিমত ব্যক্ত ক'রেছেন, যা জানা; বর্তমানে আমাদের লেখালেখির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তিনি যে-সব শব্দের বানানের সংস্কৃতায়নের কথা উলে-খ ক'রেছেন—সেগুলোর বর্তমান ভিত্তিই যে দুর্বল ও অগ্রহণীয়—তা দেখিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি প্রতি-বর্ণায়নের প্রতি সার্বিক কটাক্ষ ক'রে লিখেছেন—"যে–কোন অর্থেই প্রতিবর্ণায়ন একটি ভুল ভাষাতাত্ত্বিক পদক্ষেপ।" তিনি আরো লিখেছেন—"তাই প্রয়োজন—প্রতিবর্ণায়ন নয়; প্রতিরূপ-আওয়াজ উৎপাদন। অনুরূপ ধ্বনি-উৎপাদন।"

ড. রহ্‌মানের এসব বক্তব্যের স্বপক্ষে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজী ভাষার দিকে একটু লক্ষ্য ক'রলেই দেখতে পাওয় যায়. ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম

www.pathagar.com

হরফটির 'A'-এর উচ্চারণ কখনো 'অ', 'আ', বা 'অ্যা'। উদাহরণ—Rahim (রহিম), Karim,(করিম)—এখানে 'A'-এর উচ্চারণ—'অ'। আবার Arjumand (আরজুমান্দ), Asma (আছমা), Abdul (আবদুল),—এখানে 'A' এর উচ্চারণ 'আ' ধ্বনি। এবং Ago (অ্যাগো)—পূর্বে; Agonostic (অ্যাগোনস্টিক)—আজ্ঞেয়বাদী,—এখানে 'A'-এর উচ্চারণ 'অ্যা'।

প্রতিবর্ণায়ন করার ফলে যে-ভুল উচ্চারণ ঘটে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ August (অগাস্ট) শব্দটি। এখানে A-এর উচ্চারণ—'অ' লক্ষণীয়, বেশির ভাগ লেখক-ই প্রতিবর্ণায়ন করেন ব'লে অগাস্টকে "আগষ্ট" উচ্চারণে লিখে থাকেন। তাঁরা শুদ্ধ ক'রে অগাস্ট উচ্চারণ ক'রতে পারেন না বা ক'রেন না।

এবার ইংরেজী 'U'-বর্ণের উচ্চারণের দিকে মনোযোগ দিলে দেখা যায়—But (বাট), Cut (কাট), Put (পুট)। এখানে 'U'-এর উচ্চারণ যথাক্রমে 'আ', 'আ', 'উ'। এছাড়া ইংরেজীতে প্রথম পাঁচটি বর্ণ এক-ই হওয়া সত্ত্বেও শেষ তিনটি হরফের কারণে উচ্চারণ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়; এরকম দু'টি শব্দ যথাক্রমে—Chaldean (ক্যালডীয়ান)—ক্যালডীয় বা ব্যাবিলন সংক্রান্ত ও Chaldron (চলড্রন)—কয়লার পরিমাণ বিশেষ।

বাঙালা ভাষায় আরবী-ফারছী শব্দের প্রতিবর্ণায়নের মানদণ্ড রূপে গৃহীত ইংরেজী বর্ণমালার-ই যখন এরকম অবস্থা, তখন যে-কোনো অর্থে "প্রতিবর্ণায়ন" যে "একটি ভুল ভাষাতাত্ত্বিক পদক্ষেপ" তা বলা চলে।

প্রতিবর্ণায়নের ফলে বাঙালায় অসংখ্য প্রচলিত ভুলের জন্ম হ'য়েছে। যেমন: জন্মাষ্টমী, অষ্টম ইত্যাদি। এই দু'টি শব্দে মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এ-দেশের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোক—মাষ্টার, রেজিষ্ট্রেশন, ষ্টার, ষ্টেডিয়াম ইত্যাদি লিখে থাকেন। ইংরেজী শব্দের এরকম ভুল বানান লেখার প্রবণতা এখনও অপ্রতিহত গতিতে চ'লছে। অথচ ব্যাকরণ সম্বন্ধে যিনি কিঞ্চিৎ জ্ঞান রাখেন, তিনি নিজেও জানেন ইংরেজীতে মূর্ধন্য-'ষ' মূর্ধন্য-'ণ'–এর কোনো উচ্চারণ বা ব্যবহার নেই। প্রকৃত পক্ষে উপর্যুক্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ রূপ হবে মাস্টার, রেজিস্ট্রেশন, স্টার, স্টেডিয়াম ইত্যাদি। বাঙালাতে সাধারণতঃ র, ষ, ক্ষ-এর পরে মূধর্ণ্য-'ণ' ব্যবহার করা হয়। এছাড়া 'ট' বর্গীয় বর্ণের পূর্বে 'ণ' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইংরেজীতে 'ণ'-এর ব্যবহার নেই, তা সত্ত্বেও প্রতিবর্ণায়নের প্রবণতার ফলে, এরকম অসংখ্য প্রচলিত ভুল বানানের জন্ম হ'য়েছে। উদাহরণ হিসেবে, বাঙলাদেশে প্রচলিত টাকার নোটের কথা বলা যায়। এ টাকার

www.pathagar.com

ওপরে—"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বে প্রবর্তিত
লুৎফর রহমান সরকার"

এই কথার নিচেয় লেখা "গভর্ণর" যা ভুল বানানে লেখা হ'য়েছে; এর শুদ্ধরূপ হবে—'গভর্নর'।

আবার লণ্ডন, ষ্ট্যাণ্ড, কর্ণার, হর্ণ ইত্যাদি বানানে 'ণ' ব্যবহার করা হয় ব্যাকরণ-জ্ঞান না থাকার কারণে। এসব স্থানে হওয়া উচিত লন্ডন, স্ট্যান্ড, কর্নার, হর্ন ইত্যাদি।

প্রতিবর্ণায়নের ফলে ভাষা হ'য়ে উঠেছে অসংস্কৃত, অসংযত ও অনাকাঙ্ক্ষিত, তাই খ্রীষ্টীয় সনকে খ্রীষ্টীয় না লিখে লেখা হ'চ্ছে 'ইংরেজী'। প্রতিবর্ণায়নের কুপ্রভাবে এদেশের লোকেরা মনে করে বাঙালা সনের মতই ইংরেজী সন। আসলে ইংরেজী সন ব'লে কিছু নেই। ইংরেজ শাসকরা খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তারা খ্রীষ্টীয় সনকে অনুসরণ ক'রতো, যা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সাথে সম্পর্কিত। সেটাকেই ভুলক্রমে ইংরেজী সাল ব'লে এযাবৎ লিখে আসা হ'চ্ছে। প্রতিবর্ণায়ণের কুপ্রভাবে এমনটি ঘ'টছে।

ড. রহ্মান তাঁর প্রবন্ধে আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের বাঙালা বানানে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সমালোচনায় 'ছ' স্থানে 'স'-এর ব্যবহারে আপত্তি জানিয়ে ব'লেছেন—"বাঙালা লিপির ইতিহাস-এর দিক থেকে বিচার ক'রলেও ড. (সুনীতিকুমার) চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না। কারণ বাঙালীর বাঙালা ভাষার পাঁচ-সাতশ' বছরী অবিচ্ছিন্ন , অবিভক্ত মূলধারায় 'শ'–ধ্বনিটি ছিল অনাত্মীয় বা foreign. তাঁদের লিখিত পুথি-পুস্তকে তো বটেই, বাঙালা লিপির অনুক্রমেও তালব্য 'শ' নয়, দন্ত্য 'স'-এর ছিল অগ্রাধিকার।"

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের এ-বক্তব্য যে প্রামাণিক, তা বাঙালা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে পরিচিত 'চর্যাপদে'র লিপি-বিশে-ষণ ক'রলে জানা যায়। অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যায়, চর্যাপদে ব্যবহৃত শব্দে 'স' হরফ-এর সংখ্যা 'শ'-এর চেয়ে প্রায় ১২ গুণ বেশী।

প্রমাণ স্বরূপ পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়—

www.pathagar.com

সারণী-১

চর্যার-সংখ্যা	'স'-হরফের ব্যবহার	'শ'-হরফের ব্যবহার	চর্যার-সংখ্যা	'স'-হরফের ব্যবহার	'শ'-হরফের ব্যবহার
চর্যা-১	৭	X	চর্যা-২৬	১৪	X
চর্যা-২	৬	X	চর্যা-২৭	১৩	X
চর্যা-৩	৬	৩	চর্যা-২৮	২০	১
চর্যা-৪	৪	৪	চর্যা-২৯	৯	X
চর্যা-৫	৩	X	চর্যা-৩০	৮	X
চর্যা-৬	১১	১	চর্যা-৩১	৫	X
চর্যা-৭	৭	X	চর্যা-৩২	৬	X
চর্যা-৮	৪	X	চর্যা-৩৩	৭	১
চর্যা-৯	৮	X	চর্যা-৩৪	৯	১
চর্যা-১০	১০	X	চর্যা-৩৫	৫	১
চর্যা-১১	৩	৩	চর্যা-৩৬	১০	১
চর্যা-১২	৪	১	চর্যা ৩৭	১১	১
চর্যা-১৩	৯	২	চর্যা-৩৮	৫	X
চর্যা-১৪	৮	X	চর্যা-৩৯	১৩	X
চর্যা-১৫	১৫	X	চর্যা-৪০	১৩	X
চর্যা-১৬	৯	X	চর্যা-৪১	১৮	X
চর্যা-১৭	১৪	X	চর্যা-৪২	১০	১
চর্যা-১৮	৬	X	চর্যা-৪৩	১১	X
চর্যা-১৯	৭	X	চর্যা-৪৪	৯	X
চর্যা-২০	৬	X	চর্যা-৪৫	৯	X
চর্যা-২১	৯	১	চর্যা-৪৬	৫	১
চর্যা-২২	১২	১	চর্যা-৪৭	৬	৪
চর্যা-২৩	১৪	X	চর্যা-৪৮ মূল পাঠ পাওয়া যায়নি।		
চর্যা-২৪ মূল পাঠ পাওয়া যায়নি।			চর্যা-৪৯	৬	১
চর্যা-২৫	১	X	চর্যা-৫০	১৪	৭
			সর্বমোট =	৪১৪	৩৪
				৯১,৭৯% =	৮.২১%মাত্র।

উপরের তালিকা অনুযায়ী শতকরা প্রায় ৯২% ক্ষেত্রে 'স' এবং মাত্র ৮% ক্ষেত্রে 'শ' ব্যবহৃত হ'য়েছে। তাহলে 'স' হরফটি যে, বাঙালীর আত্মীয় সম্পর্কের হরফ এবং 'শ' হরফটি অনাত্মীয়—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আরও লক্ষণীয়, চর্যাপদের ৫০টি চর্যার মধ্যে অর্ধেকের-ই বেশী অর্থাৎ ২৬টি চর্যায় তালব্য 'শ'-

www.pathagar.com

হরফ একেবারেই নেই ।[১]

এ-প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য হ'ল—হ্যালহেড-রচিত বাঙালা ব্যাকরণের মুদ্রিত উদ্ধৃতির আলোকচিত্র[২] থেকেও দেখা যায় একটি পৃষ্ঠায় দুইটি শব্দে 'শ' হরফের ব্যবহার র'য়েছে । আর সতেরটি শব্দে 'স' হরফের ব্যবহার বিদ্যমান ।

আলোক-চিত্রটি লক্ষ্য ক'রলে আরও দেখা যায়,আধুনিককালে যে-সব শব্দে 'শ' ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে, তখন সে-সব শব্দে 'স' ব্যবহার করা হ'ত । উদাহরণঃ সুনি, সুনিয়া, সুন ইত্যাদি ।

আবার এখন যে-সব শব্দে 'য' ব্যবহার করা হয়, তখন সে-সব স্থানে ব্যবহার করা হ'ত 'জ' । উদাহরণ 'জত', 'জদি', 'জখন' ইত্যাদি ।

নিম্নে হ্যালহেড-রচিত ব্যাকরণের আলোকচিত্রের ফটোকপি সংযোজিত হ'ল—

মর্য্যদা থাকিতে কেনো নাজাহো উঠিয়া ।
আপন সদৃশ স্থানে উঠি বৈস গিয়া ॥

এত সুনি সোমদত্ত কোপেতে জলিল ।
অগ্নির উপরে জেন ঘৃত ঢালি দিল ॥

সোমদত্ত বলে সেনী নাকরিস গর্ব্ব ।
তোমার মহিমা জত আমি জানি সর্ব্ব ॥

কোন দোষে দোষী আমি কহত সত্বর ।
এত কটু ভাসা মোরে কহিস বর্ব্বর ॥

তোমা হইতে নিচ কেবা আছয়ে মানুষে ।
মোর অগোচর নহে জানিয়ে বিশেষে ॥

এতেক সুনিয়া সেনী অতি ক্রোধ মন ।
কোপে ডাক দিয়া বলে সুন সর্ব্ব জন ॥

---

১. দ্রষ্টব্য, ড. এস.এম. লুৎফর রহমান । বৌদ্ধ চর্যাপদ (ঢাকা ১৯৮৬) । চর্যাপদের মূল পাঠ সমূহ ।
২. উদ্ধৃত, গোলাম মুরশিদ । বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব । (বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫), পৃ. ৫৯ ।

www.pathagar.com

এ-ছাড়া, আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে, মুছলিম আমলের কবি শেখ চাঁদ-রচিত 'সবে মেরাজ' পুথির একটি পৃষ্ঠার নমুনা[৩] ও তার আধুনিক বাঙালা পাঠ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। তা থেকে দেখা যায়, বাঙালা ভাষায় আধুনিক কালের শ, ষ, স-এর মধ্যে সেকালেও স-এর-ই গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি ছিল অধিক। শ, ষ-এর নয়। নিচে উপস্থাপিত ফটোকপি দেখলে তা বোঝা যায়।

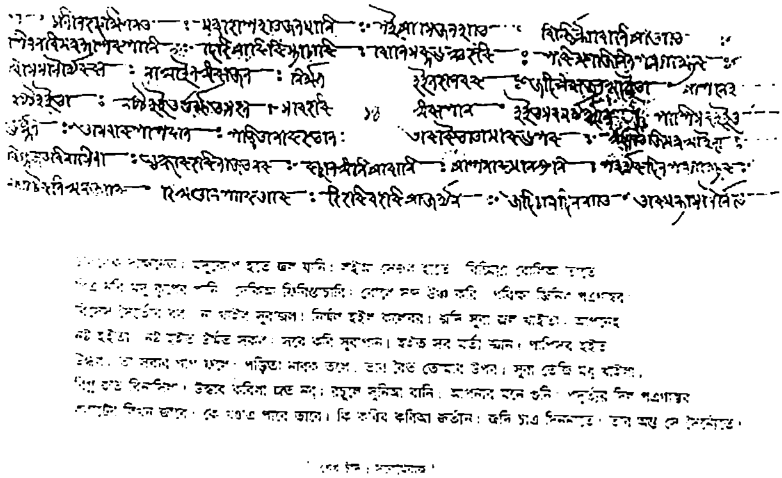

অতএব, গ্রন্থকার তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচীন শিলালিপি থেকে শুরু ক'রে বর্ণমালার (১৭৭৩ সালের হস্তলিখিত) ছবি তুলে ধ'রে 'স'-এর পক্ষে যেসব তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন ক'রেছেন—তা নাকচ করা যায় না।

এছাড়া ড. রহমান তাঁর প্রবন্ধে আরও একটি অভিমত দান ক'রে ব'লেছেন—"বৃটিশ-পূর্ব আমলে, বাঙালীর মূল ধারার বাঙালা সাহিত্যে (পুথি-কেতাবে) অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর কোন স্থান ছিল না।" এ-বক্তব্য অত্যন্ত

৩. দেখুন, খোন্দকার মুজাম্মিল হক। পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সম্পাদনা। (১ম প্রকাশ, ঢাকা-২০০০), পৃ. ২১৫।

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ—তা স্বীকার না ক'রে গত্যন্তর নেই।

কেননা, বাঙালা সাহিত্যের আদি নিদর্শন রূপে পরিচিত চর্যাপদে একটি মাত্র শব্দে (৩৪ নম্বর চর্যায়) বিসর্গ হরফের ব্যবহার আছে। আর আছে—৪/৫টি শব্দে 'অনুস্বার' হরফের ব্যবহার। কিন্তু চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার অনেক। তবে ড. রহ্‌মানের সমর্থনে একথা বলা যায় যে—'চর্যাপদ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কথা বাদ দিলে, মুছলিম পুথি-কেতাবে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার বিরল। নেই বললেই চলে। বাঙালীর ভাষা-ব্যবহারের মূলধারায় যে; অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু বর্জিত শব্দ ব্যবহার করা হ'ত, সৈয়দ আকবর-রচিত 'জেবুলমুলক সামারোখ' পুথির নমুনা[৪] পর্যবেক্ষণ ক'রলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু যে বাঙালা-ভাষার মূলধারায় ছিল না, তা ঠিক। উদাহরণস্বরূপ সৈয়দ আকবর-রচিত নিম্নোক্ত পুথির নমুনা-পাঠ লক্ষণীয়।

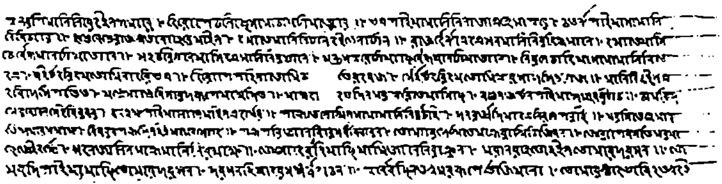

[illegible]

[illegible]

৩. দেখুন, খোন্দকার মুজাম্মিল হক। পূর্বোক্ত, ২১৯।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গতঃ উলে-খ্য যে, অকারণ বিসর্গের ব্যবহার অসংখ্য প্রচলিত ভুলের জন্ম দিয়েছে। যেমন:—মোঃ, আঃ, ডঃ, ডাঃ, চৌঃ, প্রাঃ ইত্যাদি। লেখনরূপে এ-সকল বিসর্গের কোলন রূপে ব্যবহার ব্যাকরণ-অনুমোদিত নয়। এ-বিষয়ে ড. মাহবুবুল হক 'বাংলা বানানের নিয়ম' নামক গ্রন্থে নাতিদীর্ঘ আলোচনা ক'রেছেন। তা গুরুত্বপূর্ণ। খোদ 'বাংলা " শব্দে অনুস্বারের অপব্যবহার সম্পর্কে ড. রহমান পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন। তিনি ড. সুনীতিকুমার ও মেরি ফ্রান্সিস ডানহামের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে, তাঁদেরও আপত্তির উলে-খ ক'রেছেন। সেদিকে কোন লেখক-পাঠক মনোযোগ দিয়ে এ-শব্দের বানান নির্ভুল ভাবে লেখার প্রয়াস পাবেন কি? এরকম অনুস্বার ব্যবহারের ফলে, আরেকটি প্রচলিত ভুল 'অংক' শব্দটি। যার শুদ্ধ বানান 'অঙ্ক'। অঙ্ক শব্দের অভিধানিক অর্থ যথাক্রমে "(১) চিহ্ন; লেখা; (২) কলঙ্ক, (৩) রাশি (গণিতে), আঁক, সংখ্যা, গণনা (৪) পরিমাপ, (৫) ক্রোড়; কোল; (৬) নাটকের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ, (৭) উদর বা পেশী; (৮) পাতার উপরিভাগ।" এ-ভুলটি হ'য়েছে—অকারণ অনুস্বার ব্যবহারের প্রবণতা থেকে। এরকম আরও ভুল হ'ল—ভংগ,বংগ, সংগে, গংগা, ইত্যাদি। অকারণে অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার-ই শুধু নয়; অকারণে তৎসম বা বিদেশী শব্দও হ্রস্ব-'ই' কার দিয়ে লেখা হ'য়ে থাকে। সংস্কৃত-আশ্রিত ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতেরা হুকুম জারী ক'রেছেন—দেশী ও বিদেশী শব্দে হ্রস্ব-'ই'-কার ব্যবহার ক'রতে হবে। অর্থাৎ বাঙালি, জানুয়ারি ইত্যাদি বানান লিখতে হবে। অথচ সংস্কৃত দেশী; না, বিদেশী তা বলা হয় না—কৌশলগত কারণে। বিদ্বানমাত্রই জানেন, আর্যরা বহিরাগত এবং তাদের ভাষা—সংস্কৃতও বিদেশী। ফলে, 'বাঙালা' লিখতে অনুস্বার-ব্যবহার এবং 'বাঙালী' লিখতে দীঘ-ঈ কারের বদলে হ্রস্ব-ইকারের ব্যবহার ক'রে—'বাংলা', 'বাঙালি' লেখা; 'বাঙালী'র বানান-চেতনার ঐতিহ্যবিরোধী। চর্যাপদে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ:—

"আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।" (৪৯ নম্বর চর্যা)।

লক্ষণীয় এখানে 'বঙ্গালী' ('বাঙালী' বোঝাতে) দীর্ঘ-ঈ কার দিয়ে লেখা হ'য়েছে।

এমনিভাবে, বাঙালা ভাষার প্রবহমান ধারার ওপর সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ্যবাদী পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রভাব যে, বাঙালা ভাষার বানান, লিখন-পদ্ধতি, উচ্চারণ ও মিষ্টতার বহু ক্ষতি ক'রেছে—তা স্বীকার ক'রতেই হবে। বাঙালা শব্দকে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যে, গ্রন্থকার-কথিত মুছলিম আমলের মূল

www.pathagar.com

বাঙালী জাতীয় চেতনার ঐক্য বিরোধী—তা অন্য সূত্র থেকেও জানা যায়। সে-বিষয়ে—প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. এম.এ. রহিমও ব'লেছেন—"বাংলা ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞাসূচক ঔদাসীন্য এবং সংস্কৃত প্রভাবিত গৌড়ের (উত্তর ও পশ্চিম বাংলা) হিন্দু রাষ্ট্র ও সমাজের নিকট বাংলা ভাষাও যুগ যুগ ধ'রে অপাংক্তেয় থেকে যেত এবং এর বর্তমান গৌরবের আসন থেকে বঞ্চিত হ'ত। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানরা কেবল রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেনি, তারা বাংলা ভাষা-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক ঐক্যেরও প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন।"[৫]

অতএব, ড. এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান, তাঁর "বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতি"র যে-"ব্যতিক্রমী ইতিহাস" তুলে ধ'রেছেন—তা ভুলের বিরুদ্ধে শুদ্ধতার, বিভক্তির বদলে ঐক্যের এবং আমাদের ভাষা-শিক্ষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের সহস্রবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অকথিত-ইতিহাস। আশা করা যায়, সে-বিষয়ে জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং গ্রন্থটি লিপি-ভাষা-শিক্ষা-সাহিত্য ও জাতি সম্পর্কে সবাইকে নতুন এক বিশুদ্ধ চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ক'রবে। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রের-ই এ-গ্রন্থ খানি পাঠ করা উচিত। আমরা গ্রন্থখানির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায় রইলাম।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
এম. ফিল গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহ্‌মানের
অন্যান্য গ্রন্থ

১. মেসোপটেমিয়ায় নজরুল (২০০৫)	২০০/-
২. বাঙ্‌লাদেশী জাতীয়তাবাদ (২০০৫)	২০০/-
৩. বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস-১ম খণ্ড, (২০০৪)	২৫০/-
৪. বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান্‌ ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস-২য় খণ্ড, (২০০৫)	৩০০/-
৫. বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস-৩য় খণ্ড, (২০০৬)	৩০০/-
৬. লালন-জিজ্ঞাসা (২য় সংস্করণ- ২০০৫)	২০০/-
৭. বৌদ্ধ চর্যাপদ (২য় সংস্করণ-২০০৫)	৩০০/-
৮. বাঙালা ভাষা বানানের ঐতিহাসিক বিপর্যয়—উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন (২০০৫)	২৫০/-
৯. বাঙ্‌লাদেশী কথা-সাহিত্যের তিন আমল (২০০৬)	১৮০/-
১০. আধুনিক কালের কবি ও কবিতা (২০০৬)	১৭০/-
১১. বাঙলাদেশী লোক-চিকিৎসা (২০০৪)	২২০/-
১২. বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস (২০০৫)	১৯০/-
১৩. ধুমকেতু ও তার সারথি (যন্ত্রস্থ)	
১৪. আধুনিক জাতি-তত্ত্বের নিরিখে বাঙালীর জাতি-পরিচয় (যন্ত্রস্থ)	
১৫. নজরুল ইসলামের 'সুর ও শ্রুতি' (যন্ত্রস্থ)	
১৬. লালন-গীতি চয়ন-১ম–৪র্থ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)	
১৭. বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান (২য় সংস্করণ-যন্ত্রস্থ)	
১৮. লালন শাহ্‌–জীবন ও গান (৩য় সংস্করণ-যন্ত্রস্থ)	
১৯. বাঙ্‌লাদেশী জারী গান (২য় সংস্করণ-যন্ত্রস্থ)	

(১১ ও ১২ সংখ্যক গ্রন্থ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ও ১৩,১৪,১৫ গ্রন্থগুলোও বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিতব্য)।

www.pathagar.com